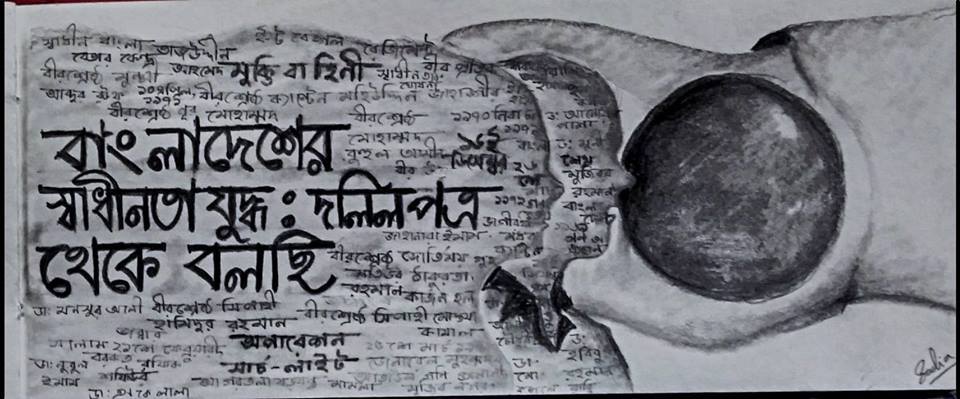
# বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র থেকে বলছি

**(১৫ তম খণ্ড)**

**সাক্ষাৎকার**



প্রকাশকঃ



# উৎসর্গঃ

**১) International Crime Strategic Forum:**

বাংলাদেশে চলমান একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে ট্রাইবুনালকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে গঠিত পেশাজীবী সংগঠন।



**২) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র (মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ):**

মুক্তিযুদ্ধের বই-দলিল-ভিডিও-অডিও-সংবাদপত্র-গেজেট-ছবি নিয়ে গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল লাইব্রেরী।



**৩) অবহেলিত ও নিযার্তিত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে আমরাঃ**

অবহেলিত ও নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন।



# অ্যাটেনশন!

**পরবর্তী পেজগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু কথা জেনে রাখুনঃ**

* ডকুমেন্টটি যতদূর সম্ভব ইন্টার‌্যাক্টিভ করা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের ভেতরেই অসংখ্য ইন্টারনাল লিংক দেয়া হয়েছে। আপনি সেখানে ক্লিক করে করে উইকিপিডিয়ার মতো এই ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পরিভ্রমণ করতে পারবেন। যেমন প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নীল বর্ণে ‘**সূচিপত্র**’ লেখা শব্দটিতে **কি-বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে** ক্লিক করলে আপনি সরাসরি এই ডকুমেন্টের সূচিপত্রে চলে যেতে পারবেন।
* শুরুতেই ‘**পূর্বকথা**’ শিরোনামে আমাদের এই উদ্যোগ নেয়ার পিছনের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
* তারপর ‘**দলিল প্রসঙ্গ**’ শিরোনামে কিছু লেখা আছে। এটি যুদ্ধদলিলের ১৫ তম খণ্ড থেকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আপনারা জানতে পারবেন যে এই ডকুমেন্টে আসলে কী কী আছে।
* এরপর ‘**আমাদের কিছু কথা**’ শিরোনামে আমরা যারা এই খণ্ডটি নিয়ে কাজ করেছি, তাঁদের নাম, পরিচয়, ফোন নাম্বার প্রভৃতির গেটওয়ে ফেসবুক লিংক আকারে দেয়া আছে। আপনার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে কি-বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে উনাদের নামের উপর ক্লিক করলেই উনাদের ফেসবুক প্রোফাইলে সরাসরি চলে যেতে পারবেন।
* তারপর ‘**সূচিপত্র**’। এখান থেকেই মূল দলিল শুরু। সূচিপত্রটি সরাসরি দলিলপত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূচিপত্রে লেখা পেজ নাম্বারগুলো যুদ্ধদলিলের মূল সংকলনটির পেজ নাম্বারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে। আপনার মূল দলিলের পিডিএফ ডাউনলোড করে মিলিয়ে দেখতে পারেন।
* পিডিএফ ডাউনলোড লিংকঃ

<http://www.liberationwarbangladesh.org/2014/06/blog-post_1121.html>

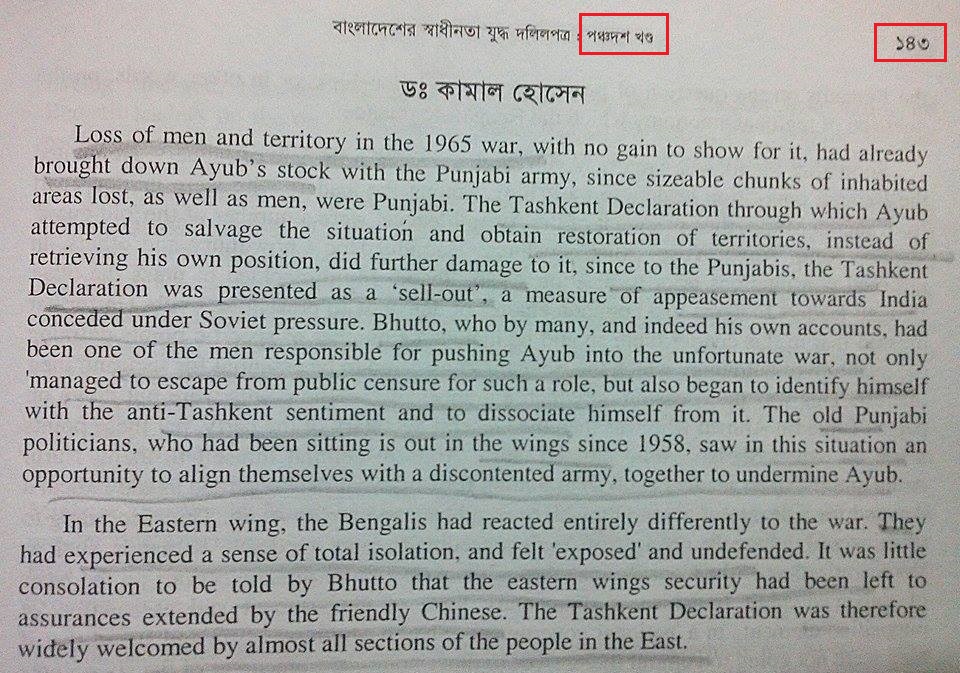
* ডকুমেন্টটির শেষের ২ পৃষ্ঠায় ‘**শেষ কথা**’ শিরোনামে আমাদের এই উদ্যোগের ভবিষ্যৎ গতিপথ নিয়ে কিছু জরুরি কথাবার্তা আছে। সেগুলো অবশ্যই পড়বেন।
* যুদ্ধদলিলে মোট ১৫ টি খণ্ড আছেঃ

প্রথম খন্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)  
দ্বিতীয় খন্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)  
তৃতীয় খন্ড : মুজিবনগর : প্রশাসন  
চতুর্থ খন্ড : মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা  
পঞ্চম খন্ড : মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম  
ষষ্ঠ খন্ড : মুজিবনগর : গণমাধ্যম  
সপ্তম খন্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র: সরকারী ও বেসরকারী   
অষ্টম খন্ড : গণহত্যা, শরনার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা  
নবম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)  
দশম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২)  
একাদশ খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)  
দ্বাদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত  
ত্রয়োদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র  
চতুর্দশ খন্ড : বিশ্বজনমত  
পঞ্চদশ খন্ড : সাক্ষাৎকার

* এটি ১৫ তম খণ্ডের অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত দলিলের ইউনিকোড ভার্শন। এই খণ্ডে প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা বাংলা দলিলের পাশাপাশি ১০০ পৃষ্ঠা ইংরেজি দলিলও রয়েছে। আপনাদের জন্য আমরা সেগুলো অনুবাদ করে দিয়েছি।
* এই ডকুমেন্টে প্রতিটি দলিলের শুরুতে একটা কোড দেয়া আছে।

<খণ্ড নম্বর, দলিল নম্বর, পেজ নম্বর>

অর্থাৎ <১৫,১৮,১৪৩-৯৩> এর অর্থ আলোচ্য দলিলটি মূল সংকলনের ১৫ তম খণ্ডের ১৮ নং দলিল, যা ১৪৩ থেকে ১৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দলিল নম্বর বলতে সূচিপত্রে উল্লিখিত নম্বরকে বুঝানো হচ্ছে। উদ্ধৃত দলিলটি ডঃ কামাল হোসেনের একটি সাক্ষাৎকার। বুঝার সুবিধার্থে দলিলটির শুরুর অংশ দেখে নিনঃ



* দলিলপত্র পাঠকালে কোডিং বুঝতে আপনাদের কোন সমস্যা হলে সাথে সাথে [আমাদের ফেসবুক পেইজে](https://www.facebook.com/muktizuddho1971?fref=ts) মেসেজ পাঠাবেন। আপনাকে হেল্প করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত।
* দলিলে বানান সহ বেশ কিছু ভুল আমরা খুঁজে পেয়েছি। সেগুলোকে হলুদ মার্ক করা হয়েছে।
* এই ফাইলটি আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলে সংরক্ষিত করা থাকলে ভবিষ্যতে আপনি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যে বিতর্কিত কোন ইস্যু সম্পর্কে অত্যন্ত সহজে দলিলপত্রের রেফারেন্স দেখাতে পারবেন। আপনার নিজের এলাকার ঘটনাবলী জানতে পারবেন। কোনদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্ট্যাটাস বা অন্যকিছু লিখতে ইচ্ছা হলে এখান থেকে সরাসরি কপি করে সহজেই লিখতে পারবেন।
* মনে করুন, ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে আপনি কোন ম্যাগাজিনে একটি লেখা দিবেন। এই ফাইলে তখন ২৬ শে মার্চ লিখে সার্চ দিলেই ১৫ তম খণ্ডের সেই সংক্রান্ত সকল দলিল পেয়ে যাবেন। ফলে রেফারেন্স নিয়ে লিখতে আপনার খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই। আমরা যেন সঠিক ইতিহাস চর্চা করে বেড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম হয়ে উঠি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জাতি নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতির চেয়ে দুর্বল সত্ত্বা পৃথিবীতে আর কিছু নেই।
* মনে করুন, আপনি নিজের এলাকা নিয়ে জানতে চান। তবে নিজের এলাকার নাম লিখে এই ডকুমেন্টে সার্চ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মিরপুর এলাকার হলে **Ctrl+F চেপে** “মিরপুর” লিখে সার্চ করুন। ১৫ তম খণ্ডের মিরপুর নিয়ে সকল দলিল আপনার সামনে চলে আসবে। দেশকে জানার প্রথম শর্তই হলো নিজের এলাকাকে জানা।
* আপনি চাইলে নিজের সুবিধামতো ডকুমেন্টটিকে সহজেই কয়েক ভাগে কপি করে ভাগ করে আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারেন। মনে করুন, আপনি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে জানতে আগ্রহী। তখন ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ লিখে সার্চ করে প্রাপ্ত সকল দলিলে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত অংশ কপি করে আলাদা ফাইল তৈরি করুন। পড়তে, বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে।
* অনুবাদকে সবুজ রং দিয়ে মার্ক করা হয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে সারসংক্ষেপটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। এবার বিস্তারিত।

# পূর্বকথা

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে চাই। কোথা থেকে শুরু করবো?

প্রশ্নটা ক্রিটিকাল। বাজারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক হরেক পদের কিতাব রয়েছে। তবে বেশীরভাগ বইয়ে একটা প্রগাঢ় সমস্যা রয়েছে। রাইটাররা ইতিহাস জানানোর পাশাপাশি সেই ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যাটাও সাথে ইনকর্পোরেটেড করে দেন। অর্থাৎ ইতিহাস আংশিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পরে। তাই আর্টিকেল/ব্লগপোস্ট/স্ট্যাটাসে উনাদের ব্যাখ্যা পড়ার পাশাপাশি আপনাদের আসল সোর্সগুলো সম্পর্কেও ক্লিয়ার আইডিয়া রাখতে হবে। নতুবা আপনি ক্রমশঃ উনাদের ফিলোসফির প্রতি উইক হয়ে পড়বেন। মানুষের মন বড়ই দুর্বল জিনিস।

পাশাপাশি আরেকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্প/উপন্যাস/কবিতা সুখপাঠ্য হলেও কখনই যেন তা ইতিহাসের ‘রেফারেন্স’ হিসেবে না-আসে। ইতিহাস নির্ভর ফিকশন বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাহিত্যমাধ্যম। তবে বাইরের দেশে সে সকল বইয়ের ফ্ল্যাপে উল্লেখ করা থাকে যে, এটা নিছকই একটা ‘ফিকশন’, একে ইতিহাসের ‘রেফারেন্স’ হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না।

কিন্তু আমাদের দেশের আমজনতা একথা বুঝতে চান না। উনাদের কাছে শাহাদুজ্জামানের ‘ক্রাচের কর্নেল’ কিংবা হুমায়ূন আহমেদের ‘দেয়াল’ বা ‘জোছনা ও জননীর গল্প’ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য রেফারেন্সমাধ্যম, যা সর্বাংশে ভুল!

তাই আমাদের প্রয়োজন একটি 'স্টেবল এন্ড অফিশিয়াল' রেফারেন্স মাধ্যম, যেখানে রাইটারের নিজস্ব ফিলোসফি ইনকর্পোরেটেড করা হয় নাই।

এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত এবং হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র’ শীর্ষক সংকলনটির নামই সর্বাগ্রে চলে আসবে। এর একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে। '৭২ সালে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টেশন শুরু করেন। তবে সেই কাজ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের দলিল লিপিবদ্ধ করার জন্য ’৭৭ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান পুরোদমে এই প্রজেক্ট হাতে নেন। '৮২ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে দলিলপত্রের ফার্স্ট প্রিন্ট প্রকাশিত হয়। ’০৩ সালে চারদলীয় আমলে হয় পুনঃমুদ্রন। আবার ’০৯ সালে মহাজোট আমলে রিপ্রিন্ট। অর্থাৎ এই বইটির প্রকাশনায় সকল দর্শনের গভমেন্টই কমবেশী কাজ করেছে এবং কোন গভমেন্টের আমলে প্রায় কোন প্রকার এডিটিং করা হয় নাই বললেই চলে। তাই এখানে রক্ষিত ডকুমেন্টকেই নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রাইমারি সোর্স হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

দলিলপত্রের বাজারমূল্য অত্যধিক। প্রায় ১৫ হাজার টাকার মতো। ওজনও প্রায় এক মন। প্রায় ৫০% দলিল ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। পড়তে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন। তাই আমাদের ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে সেই ১২,০০০ পৃষ্ঠার দলিলপত্র বিনামূল্যে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাশাপাশি আমরা এরকম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলের মাধ্যমে বাংলা দলিলের পাশাপাশি ইংরেজিগুলোও অনুবাদ করে আপনাদের কাছে ধীরে ধীরে পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের ফেসবুক পেজ থেকেও সকাল ১০ টা, সন্ধ্যা ৬ টা এবং রাত ১১ টায় প্রতিদিন সেগুলো আপলোড করা হচ্ছে। নিচে আমাদের ফেসবুক পেজের লিংক দেয়া হলো। পেজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। তথ্য হোক উন্মুক্ত। আমাদের পরিচয় হোক একটাইঃ মুক্তিযুদ্ধ...

<https://www.facebook.com/muktizuddho1971>

# দলিল প্রসঙ্গঃ সাক্ষাৎকার

*(পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো মূল দলিলের পৃষ্ঠা নাম্বার অনুযায়ী লিখিত। এর সাথে এই ওয়ার্ড ফাইলের পৃষ্ঠা নাম্বার রিলেটেড নয়)*

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুদ্রিত দলিলপত্র-খণ্ডসমূহের সম্পূরক হিসেবে এই খণ্ডটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক দশক পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের গুরুদায়িত্বে এই প্রকল্পের সামনে একটি প্রধান সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্য হাতে পাওয়া ।এই প্রসঙ্গে ভূমিকায় বিশদভাবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক দলিলপত্র প্রকল্পে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রথম থেকে চর্তুদশ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর কোন লিখিত দলিল নেই । আবার প্রাপ্ত দলিল ও তথ্যাদি কোনো ঘটনাদির ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে যেসব ক্ষেত্রে ঐ সকল ঘটনার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিংবা যারা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মৌখিক বিবরণই সম্যক ধারণা দিতে পারে। এছাড়া নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিত্ব -যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের তৎপরতার নানা কথা একমাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অতএব এই খণ্ডটি স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের দলিলপত্র খণ্ড সমূহের অন্তর্ভূক্ত হয়।

প্রকল্প সংগৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ মোটামুটিভাবে দলিলপত্র খন্ডসমূহের তিনটি পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে । জনসাধারণের কাছ থেকে নেয়া গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ অষ্টম খন্ডে, সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ‘সশস্ত্র সংগ্রাম ‘ ৯ম ও ১০ম খন্ডে এবং রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, দূত ও কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক , বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও জন প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই খণ্ডটি প্রস্তুত করা হয়েছে ।

প্রকল্প সাক্ষাৎকার গ্রহণের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য সকলের নামই ছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। প্রকল্পের সীমিত সময়সীমা মধ্যে ও গবেষকদের স্বল্পতা দরুণ অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে সাক্ষাৎকার দাতাগণের পক্ষ থেকে প্রকল্পের সাফল্য ও নিরপেক্ষতার সম্পর্কে সংশয় ও এক দশক আগের স্বাধীনতাযুদ্ধকালের ঘটনাবলি যথাযথভাবে বলবার বা লিখার জন্য উপযুক্ত সময় ও প্রস্তুতির অভাবে অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে সমর্থ হন নি। আবার অনেকে প্রকল্প কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে ও অনেকদিন ঘুরিয়ে অবশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কয়েকজনের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ সুদীর্ঘ বিবরণ পেয়েছি এবং সেগুলো এখানে মুদ্রিত হয়েছে ।এগুলোর অধিকাংশ অন্যান্য খণ্ডে মুদ্রিত দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত।

প্রকল্পের গৃহীত সময়সীমার মধ্যে সাক্ষাৎকারদাতার মূল বক্তব্য আমরা ছাপাবার প্রয়াস পেয়েছি, প্রত্যেকটি বিবরণের শেষে তারিখও মুদ্রিত হয়েছে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় বিবরণদাতাকে প্রকল্পের সাধারণ কিংবা বিশেষ প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছিল। তিনি কখনো সেটি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেছেন, কখনো আংশিকভাবে কয়েকটি বিবরণ তাঁরা নিজেরাই লিখে দিয়েছেন কোন প্রশ্নমালা ছাড়া। এই সবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রশ্নসমূহ বাদ দিয়ে শুধু বক্তব্য মুদ্রিত করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার সমূহের ক্রমবিন্যাস বিবরণদাতার নামের আদ্যক্ষর অনুসারে করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকারসমূহ বাংলা একাডেমী কর্তৃক স্বাধীনতা লাভের অনতিপরে (১৯৭৩-৭৪) গৃহীত হয়েছিল। তথ্যাদির স্বল্পতা সত্ত্বেও স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে এদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এগুলি বাছাই করা হয়েছে বিবরণীতে উল্লেখিত তথ্য ও ঘটনাদির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মুদ্রণের কাজ যুগপতভাবে করতে হয়েছে এবং এ কারণেই অপেক্ষাকৃত পরে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার সবশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে আদ্যাক্ষর ক্রম ব্যাতিক্রমে।

এই খন্ডে মুদ্রিত সাক্ষাৎকারসমূহ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তথ্য উদঘাটিত করবে বলে আমরা আশা করি।

# আমাদের কিছু কথা

এই খণ্ডটি পিডিএফ থেকে ইউনিকোডে নিয়ে আসতে সর্বমোট ২৪ জন কাজ করেছেন। উনাদের সকলের পোর্টফোলিও যার যার নামের সাথে ফেসবুক লিংক আকারে দিয়ে দেয়া হলো। ইটারনেট কানেকশন থাকা অবস্থায় Ctrl চেপে লিংকটি ক্লিক করলেই আপনারা উনাদের ফেসবুক আইডি পেয়ে যাবেন। উনাদের মধ্যে ৪ জন নিজেদের ছবিতে আমাদের মাস্কট ‘মাউ’-কে বসাতে সদয় অনুমতি প্রদান করেছেন।

‘মাউ’ নামক বিড়ালটির কাল্পনিক চিত্র ডেভিয়েন আর্ট থেকে নেয়া হয়েছে। আর্টিস্টের নাম এলদার জাকিরভ। মূল আইডিয়া দিয়েছেন আন্দ্রে সেলিউট। ২০১২ সালে এটি সহ আরো কিছু ছবি হার্মিটেজ ম্যাগাজিনের জন্য আঁকা হয়েছিল। এটি কিউট, এলিগ্যান্ট এন্ড এজুকেটেড পিপলের প্রতিচ্ছবি। আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে এরকম মন-মানসিকতা সম্পন্ন হিসেবে দেখতে চান। নিম্নে কম্পাইলারদের মনের কিছু কথা তুলে ধরা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)



[**মাঈমুনা তাসনিম**](https://www.facebook.com/hiddenbirdmm)

সত্যিকার অর্থে ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র থেকে বলছি’ শীর্ষক প্রজেক্টে কাজ করতে করতে আমি নিজেই সমৃদ্ধ হচ্ছি। একজন শিক্ষক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সবসময় আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জানাবার চেষ্টা করে এসেছি। আর দেশের একজন নাগরিক হিসেবে জানানোর চেষ্টা করে এসেছি আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের। ধন্যবাদ এই প্রোজেক্ট সংশ্লিষ্ট সবাইকে, কারণ এখন আমার তথ্যসূত্রটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। আমাদের পূর্বসূরী-উত্তরসূরী সকলের কাছে অনুরোধ, সাহিত্য নির্ভর ইতিহাসে আস্থা না রেখে আমরা যেন নির্ভরযোগ্য দলিলভিত্তিক সঠিক ইতিহাসটা জানার এবং আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টাটুকু করি। কেননা, বিপরীতমুখী চেষ্টা কিন্তু থেমে নেই। থেমে নেই ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টাও। পরিকল্পিত ঐ সব প্রয়াসের বিপরীতে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, হতে হবে সক্রিয়। হাঁটতে হবে অনেক পথ। যদি হতাশ না হই, আর যদি হতাশ না করি, তবে জয় আমাদের হবেই।



[**রিফাত আহমেদ**](https://www.facebook.com/mohammadkausar.ahmed)

“তথ্য হোক উন্মুক্ত, আমাদের পরিচয় হোক একটাইঃ মুক্তিযুদ্ধ...” এই শ্লোগান বুকে নিয়ে আমরা একদল তরুণ-তরুণী কাজ করে যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য সংকলন ‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র’ নিয়ে। সংকলনটি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত। এটি যাতে সহজেই অনলাইনে পাওয়া যায়, সে জন্য তা ইউনিকোডে রুপান্তরিত করাটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। প্রত্যেকটি সৃজনশীল কাজের পিছনে নিশ্চয় একজন ব্যক্তি ব্যক্তি থাকেন, যিনি প্রাথমিক উদ্যোগ নেন এবং নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এই কাজের উদ্যোগ নিয়েছিলেন লিও ভাই, যিনি প্রথমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে উনার চিন্তাধারা শেয়ার করেন এবং বলেন যে বাজারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক হাজারো রকমের বই রয়েছে। যার অধিকাংশই লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ ইনকর্পোরেটেড করে লেখা। অর্থাৎ তা প্রভাবিত ইতিহাস। তাই তিনি প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্য এই মহৎ কাজের উদ্যোগ নিলেন। আর মূল কথা হচ্ছে সংকলনটি প্রায় ১২ হাজার পৃষ্ঠার এবং ১৫ খণ্ডে বিভক্ত। বাজারে যার দাম প্রায় ১৫ হাজার টাকা। তার উপর এখানের ৬০০০ পৃষ্ঠার মতো দলিল ইংলিশে লিপিবদ্ধ করা আছে। তাই একজন পাঠকের পক্ষে এত বড় বই কেনা ও পড়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এসব চিন্তা থেকে উনার সাথে একমত পোষণ করলাম এবং কাজের সাথে একাগ্রতা প্রকাশ করে এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ইতিহাস জানতে শুরু করলাম। কম্পাইলের কাজগুলো করতে গিয়ে আমি অনেকবার শিহরিত হয়েছি, হয়েছি আনন্দিত। তবে কিছু কিছু ঘটনা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই সংকলনটি অনলাইনে সকলের জন্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে প্রজন্ম জানতে পারবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের রূপরেখা এবং সেখানে কার ঠিক কী অবস্থান ছিল। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। তারপরও কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে বিতর্কিত ইতিহাস পাওয়া যায়, যা পাঠককে বিভ্রান্ত করে। তাই এই সংকলনটি পড়ার মাধ্যমে পাঠক পাবে স্বচ্ছ ধারণা, প্রজন্ম পাবে সঠিক শিক্ষা। আমি এখানে কাজ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি, পাশাপাশি প্রকৃত ইতিহাস জানছি। ধন্যবাদ সবাইকে।



[**তাজমুল আখতার**](https://www.facebook.com/tajmul42)

ইঞ্জিনিয়ার লিও ভাই একদিন ফেসবুকে একটা পোস্ট দিলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র তিনি ইউনিকোডে লিপিবদ্ধ করতে চান। আর এ জন্য কয়েকজনের সহযোগিতা দরকার, যারা তাঁকে বিভিন্ন দলিল কম্পাইল করতে সহায়তা করবে। তখন কোন চিন্তা ছাড়াই লিও ভাইকে নক করে জানালাম যে, এই ব্যপারে তাঁকে আমি কম্পাইলেশনে সহায়তা করতে আগ্রহী। এর প্রধান কারণ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রকে মোটামুটিভাবে সর্বজনগৃহীত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলা চলে। কারণ এতে লেখকের কোন নিজস্ব ব্যাখ্যা নেই। আছে মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্দিকারীদের বয়ান। তাই ভাবলাম কিছু কম্পাইল করে যদি মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ইতিহাস-সাগরের কিছু নুড়ি আহরণ করতে পারি, তাতে ক্ষতি কী?

যখন প্রজেক্টের কাজ শুরু করলাম তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝতে সক্ষম হলাম, আসলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য কী আর আসল ফ্যাক্ট কী! প্রতিটি দলিল কম্পাইলের সাথে সাথে জানার দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকলো। পাশাপাশি অন্যদের লেখা পড়তে পড়তে উপলব্ধি করলাম যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ব্যপারে আসলে আমরা কতোটা অজ্ঞ। সমস্যাটা আমাদের জানার পরিধির, সমস্যা আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের, যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জনতার কাছে সহজলভ্য করতে পারেন নাই। এই দলিলপত্রের বাজারমূল্য ১৫,০০০ টাকার কাছাকাছি। কে নিজের পয়সায় কিনবে এই দলিল? কয়জন? দলিলের মাঝে প্রায় ৬,০০০ পৃষ্ঠা আবার ইংলিশে লিপিবদ্ধ। কে করবে সেগুলোর অনুবাদ? কে বুঝিয়ে দেবে প্রশাসনিক মারপ্যাচের ভাষা? কে হবে সেই সূর্যসন্তান?

স্বপ্ন দেখি একদিন বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বীরদের সম্পর্কে জানবে, তাঁদের সম্মান করবে, নিজের দেশকে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো করে ভালবাসবে আর ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। স্বপ্ন এটুকুই, বাস্তবে নিয়ে যাওয়া আপনাদের হাতে, শুধু আপনাদের হাতে...



[কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ (ইশরাত কনক)](https://www.facebook.com/israt.kanak.7?fref=ts)

আমি কনক। ‘আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম’-এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি। ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: থেকে বলছি’ প্রোজেক্টের একজন সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের ইতিহাস, আমাদের ভালোবাসা-শ্রদ্ধার ইতিহাস। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ইউনিকোডে এই দলিলপত্র ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লিও একদিন এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। উনার মাধ্যমেই এ প্রোজেক্টের সাথে আমার সংযুক্ত হওয়া। দলিলপত্র নিয়ে কাজ করা নিঃসন্দেহে গর্বের ব্যাপার। এ প্রোজেক্টে কাজ করতে পেরে আমি ভীষণ খুশি :D

১৫ তম খন্ডের ১২ তম সাক্ষাৎকারটি নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম। সেটি ছিল জনাব এম, আর সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার। যুদ্ধপূর্ব জাতীয় পরিষদের সদস্য, যুদ্ধকালীন প্রশাসনিক পরিষদ প্রধান, ইস্টার্ন জোন। এছাড়া উনি যুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধের রণকৌশল, পাকিস্তানি হানাদারের বর্বরতার চাক্ষুষ প্রমাণ যেন ফুটে উঠেছে এখানে। এ প্রোজেক্টে কাজের শুরুতে লিও ভাইয়ের নির্দেশে দলিলপত্রের ছবি নিয়ে একটা অ্যালবাম তৈরি করেছিলাম আমি। নানা ধরনের রিএকশন আসা শুরু হয় তখন থেকে। সমস্যা নেই। কলম চলবে। আমরাও এগিয়ে যাবো। দুঃখের ব্যাপার হলো, এ প্রজন্ম এখনো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানে না। তবে আর বেশিদিন নয়, জানতে না চাইলেও জানানো হবে। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে কতদূর যাই ☺



[**দীপায়ন অর্ণব**](https://www.facebook.com/idi0tic)

ফেসবুকে প্রথম আসি সম্ভবত ২০০৮-এর শেষ দিকে। তখন ফেসবুকে এত মাতামাতি হতো না কিছু নিয়েই, বা কোন কিছুতেই আলোচনার মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ততোটা জনপ্রিয় হয়ে উঠে নি। ব্লগে লিখতাম না, তবে পড়তাম। একটা সময় বেশ কয়েকজনের লেখাই ভালো লাগতে শুরু করলো- ব্লগে, ফেসবুকে। এরমধ্যে একজনের ব্লগ এবং ফেসবুক ওয়ালে মোটামুটি নিয়মিত ঢু মারতাম। মানুষটার নাম অমি রহমান পিয়াল। আমি খুব বেশি রকম নিশ্চিত, গত পাঁচ-ছয় বছর আগের সময়টাতেও মুক্তিযুদ্ধ-বঙ্গবন্ধু-মুক্তিবাহিনী এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের মতো যারা তরুণ, তারা খুব বেশি রকম বিভ্রান্ত ছিল। সেই বিভ্রান্তিটাও যে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর নিজেদের আদিপাপ ঢাকার জন্যই তৈরি করা, সেটাও হয়তো আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে বললে, পিয়াল ভাইয়ের ব্লগপোস্টগুলো পড়ার পর থেকে, দালিলিক বিভিন্ন প্রমাণপত্র দেখার পর থেকে সেই বিভ্রান্তিগুলো আস্তে আস্তে দূর হতে শুরু করলো। অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, এতদিন কি ভুল ইতিহাসই না শেখানো হয়েছে আমাদের। এরপর আরো অনেককেই দেখলাম সেই বিভ্রান্তিগুলো দূর করার, সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পরিসর বড় হতে লাগলো, সঠিক ইতিহাসের চর্চাটা শুরু হতে লাগলো অনলাইনে। সেই ধারাবাহিকতাতেই এরপর হঠাৎ একদিন এলো 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র থেকে বলছি' প্রজেক্ট। উইকিপিডিয়ার মতো, সাধারণ অনলাইন ব্যবহারকারীদেরকে একটা প্লাটফর্মে নিয়ে এসে তাদের সবার চেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পুরো ইতিহাসকে একটা ক্যানভাসে নিয়ে আসার অসাধারণ এক প্রজেক্ট। এটা সম্ভবত, এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ফেসবুকভিত্তিক সবচেয়ে অসাধারণ উদ্যোগ। তবে আমার দুর্ভাগ্য, অনিবার্য কিছু ব্যক্তিগত কারণে আমি এই প্রজেক্টের সাথে খুব একটিভলি যুক্ত হতে পারি নি। সেটা নিয়ে আমার আফসোস আছে অবশ্যই। তবে একই সাথে গর্বও আছে। আমারই চেনা কিছু মানুষ, আমাদের জন্মের সঠিক ইতিহাসকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন অনলাইনে, এরচেয়ে ভালো ব্যাপার আর কি হতে পারে? আমরা হয়তো একটা সময় পর্যন্ত বিভ্রান্ত ছিলাম, এখনো অনেকেই বিভ্রান্ত আছে। কিন্তু 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র থেকে বলছি' এর মতো অসাধারণ এই প্রজেক্টটা যদি ইতিহাসের সকল সত্য পাঠ নিয়ে অনলাইনে টিকে থাকতে পারে, তবে পরবর্তী প্রজন্মকে চাইলেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্ত করা যাবে না- এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

-ধন্যবাদান্তে,

দীপায়ন



[**Taeen Ull Hoque**](https://www.facebook.com/taeen)

লিওকে চিনতাম একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের লোক হিসেবেই। তিনিই প্রথম সুযোগ করে দেন মুক্তিযুদ্ধের দলিলভিত্তিক এই প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করার। সেই থেকে শুরু......

আমি চাই, প্রোজেক্টের অফিশিয়াল পেজটি বাংলা ভাষা-ভাষীদের সবচাইতে বেশি লাইকযুক্ত পেজ হোক। দলিলের প্রতিটি খণ্ড যেন প্রতিদিন কারো না কারো হোমপেইজ কিংবা টাইম লাইনে শেয়ার হয়। তবেই তো কেবল স্বাধীনতার চেতনা আস্তে আস্তে তার লুপ্ত বিশুদ্ধতা ফিরে পাবে।



[**অনয়**](https://www.facebook.com/Farhan.Tanvir.Chowdhury)

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর জন্ম নেয়া একজন তার মাতৃভূমিকে কিভাবে দেখবে বা এর উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে কতটুকু আগ্রহী হয়ে উঠবে তা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তার আশেপাশের বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর। তারাই পারে এই নবীনকে মুক্তিযুদ্ধ ও তার আগের ও পরের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে, তাকে সচেতন করে তুলতে। আর তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার পরিণতির হাজারো নমুনা আমরা আমাদের আশেপাশে দেখতে পাই। বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস গুলিয়ে ফেলার মত ঘটনাও অহরহ ঘটতে দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে আমি ঐ নবীনকে দোষ দেয়ার পক্ষপাতি নই। বরং আমি ঐ প্রবীণকে দোষ দিই যে তার পাশে থেকে তাকে হাতে কলমে শিখিয়ে বড় করে তুলেছে। হতে পারে সে নবীনের বাবা- মা, হতে পারে সে তার শিক্ষক। তারই দায়িত্ব ছিল তার পাশের নবীনকে স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কারন একজন নবীন এটাই জানে না যে সে কি জানে না! তাই জন্ম থেকেই সে আগ্রহ নিয়ে আসবে নিজে যেচে এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে এমনটা ভাবা বোকামি। সমস্যার শেষ কিন্তু এখানেই না। এখন যদি প্রথম সমস্যার সমাধান হয়েও যায় এরপর আরো বড় এক সমস্যা সামনে চলে আসে। বড় সমস্যা বললাম এজন্য যে জ্ঞানের চেয়ে ভ্রান্ত জ্ঞান আমার দৃষ্টিতে অধিক ক্ষতিকর।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ চিন্তাধারায় কোন না কোন দিকে বায়াসড। মানে তাদের চিন্তাধারা বাহ্যিক কোন না কোন প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত। নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। তো এসব লোকেরা যখন কোন কিছু বর্ননা করে তখন এই বায়াসনেস এর প্রভাব তার কথার মাঝেও চলে আসে। আর এভাবে যখন তা এক মুখ থেকে আরেক মুখে যেতে থাকে তখন এ কথার এ অভিযোজন প্রতি ধাপে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও এর প্রভাবের বাইরে নয়। যেখানে নবীনরা প্রবীনের উপর নির্ভরশীল সেখানে এ বাহ্যিক প্রভাব কখনোই কাম্য নয়। কারন এভাবেই ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর এ প্রভাব কিন্তু আমরা হরহামেশাই আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে আজ কতো বিভেদ, কত মতান্তর।

স্বাধীনতা যুদ্ধের যে দলিলপত্র রয়েছে তা মোটামুটি বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত বলা যায়। রেফারেন্স হিসেবে এটি ব্যবহার করা যায়। এটা মোট ১৫ খন্ডে বিভক্ত এবং মূল্য প্রায় ১৫ হাজার টাকার কাছাকাছি। ফলে এটা সকলের জন্য সহজলভ্য নয়। তবুও যদিও বা আপনি এটা কিনেও ফেলেন তবুও ১৫ হাজার পাতার এ বই থেকে আপনার কাঙ্খিত তথ্য খুজে পাবেন এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

এ সমস্যা সমাধানে প্রথম এগিয়ে আসতে দেখি লিও ভাইকে। তিনি এই দলিলের ইউনিকোড কপি তৈরি করার উদ্যোগ হাতে নেন। কম্পাইল ও অনুবাদ তৈরি করার মাধ্যমে এই দলিল সহজলভ্য ও বিনামূল্যে সকলের কাছে পৌছে দেয়াই ছিলো এটার উদ্দেশ্য। আর এজন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবক আহবান করেন। আর আমরা যারা এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত তারা অনেকেই সাড়া দিই তার ডাকে। আর এভাবেই আমি "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র থেকে বলছি" প্রোজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হই।

বাকিটা ইতিহাস ☺



[**মেহজাবীন মোস্তফা**](https://www.facebook.com/mehjabeen.mostafa)

ইন্টারনেটে প্রায় নিয়মিত বিচরণ থাকলেও সক্রিয়তা বাড়ে ২০১১ সালের শুরুতে ফেসবুকে প্রবেশের পর। এরপর ধীরে ধীরে ব্লগিং সাইটগুলোতেও ঢুঁ মারতে থাকি। সেই বয়সে রোমান পোলানস্কির সিনেমার প্রশংসা করতে শিখে গিয়েছিলাম অথচ আর দশজন সমবয়সীর মতোই মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের সংকট ছিল ভয়াবহ। সেসময় ফেসবুক এবং ব্লগিং সাইটগুলোতে অনেকেই লিখতেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে (এখনো প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে)। আগ্রহ নিয়ে সেগুলো পড়তে শুরু করি এবং ধীরে হলেও ধারণা গড়ে উঠতে থাকে।

আমাদের পরিবার থেকে নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার রীতিটি খুব বিরল। পাঠ্যবইগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠ্যের ব্যপ্তি এবং তথ্যসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এরপর রয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপপ্রচার এবং ইতিহাসবিকৃতি। এদের সমষ্টিগত ফলাফল হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে জনসাধারণের বিভ্রান্তি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করি। সেই সময়টায় প্রথম অনুভব করি নিজেদের ইতিহাস জানার এবং জানানোর তাগিদটুকু।

২০১৫ সালে একটি চমৎকার উদ্যোগ নেওয়া হয় স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রগুলো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। থান ইটের মতো মোটা মোটা ১৫ টি খণ্ডের একেকটা বই বাজারে পাওয়া গেলেও সেটাকে "জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো" বলা যায় না। ইচ্ছে থাকলেও বেশকিছু পয়সা খরচ করে একেকটা খণ্ড কেনা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন। আবার স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে এ টু জেড জানার জন্য এ দলিলপত্রকে মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ডকুমেন্টেশন ই-বুক আকারে অনলাইনে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এই উদ্যোগের লক্ষ্য। প্রায় শুরু থেকে আমি এখানে উৎসাহের সাথে কাজ করেছি আরও অনেকের সাথে। আমার জন্য ব্যাপারটি শুধু কাজ করা ছিল না, কাজ করতে করতে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ জানতে পেরেছি। এ প্রোজেক্টের সাথে জড়িত একেকজন মানুষজন দিনরাত পরিশ্রম করে ১৫ নম্বর খণ্ডটির কাজ শেষ করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহ যোগ করে অনলাইনকে আমরা আরেকটু সমৃদ্ধ করতে যাচ্ছি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে সকল বিভ্রান্তি, অপপ্রচার দূর হোক এবং প্রজন্ম জানুক নিজেদের সঠিক ইতিহাস - এটির সফল বাস্তবায়ন আমাদের প্রোজেক্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বীজ বুনে দিয়ে যাচ্ছি, ফল হোক শুদ্ধতম।

- মেহজাবীন মোস্তফা।



[**সানজানা এস পায়েল**](https://www.facebook.com/sanjana.shaibal)

**অশেষ শুভকামনা রইলো ☺**



[**হুসাইন মোহাম্মদ ইশতিয়াক**](https://www.facebook.com/hmishtiaq)

আমি হোসেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক। জন্ম কর্ম লেখাপড়া বেড়ে উঠা সিলেটে। প্রথম কোন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে লগ-ইন করেছিলাম ২০০৫-০৬ এর দিকে। তখন যে কয়টা সাইটে লগ-ইন করতাম সেগুলোতে বাংলাদেশীর সংখ্যা খুব কম ছিলো বিধায় পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ফেইসবুকে জয়েন করলাম।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র থেকে বলছি" নামক প্রজেক্টের সম্পর্কে প্রথম অবগত হই ইঞ্জিনিয়ার লিও ভাই মারফত। উনি এই প্রজেক্টের প্ল্যানিং নিয়ে একটা পোষ্ট দিয়েছিলেন। যারা এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা যেন উনাকে ইনবক্সে মেসেজ দেয়। আমি সাথে সাথেই মেইল করলাম "আই এম ইন" কারন তখন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু করার মতো বিরল সুযোগ ও সময় আর পাবো কিনা! সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ বলে কথা!

তারপর সময় চলতে লাগলো। কাজও উঠতে লাগলো যার প্রমাণ দলিলপত্রের এই ১৫ তম খণ্ড ☺



[**রাজু**](https://www.facebook.com/razu.romeo)

খুব সম্ভব ২০০৮ সালের শেষের দিকে ফেসবুকে সাইন আপ করি সর্বপ্রথম। এছাড়াও অনলাইনে কিংবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা এবং বাংলাদেশ নিয়ে কিছু থাকলে পড়ার লোভ সামলাতে পারতাম না। মুক্তিযুদ্ধ, যা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন, আর দশজন বাংলাদেশীর মত আমার কাছেও তা পৃথিবীর সবচাইতে বড় আবেগের বিষয়।

ইঞ্জিনিয়ার লিও নামক ফেসবুক আইডি থেকে সর্বপ্রথম যখন মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র কম্পাইল করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন আমি সাথে সাথে আমার আগ্রহের কথা জানাই (যদিও তেমন কোন সাহায্যই করতে পারি নি)

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার আগ্রহ কোথা থেকে আসে জানি না , কিন্তু এটা বলতে পারি যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের প্রতি আমার ঘৃণা অন্তর থেকেই আসে। কারণ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পরিচয়, আমাদের, উত্থান এবং পরিণতির সূচনালগ্ন।



[**আশফাকুল ইসলাম তন্ময়**](https://www.facebook.com/pathorer.golpoker)

আমার ফেসবুকের শুরুটা ছিল এসএসসি পরীক্ষার পরে... তখন প্রথম ডেক্সটপ কম্পিউটার কিনি এবং নীল-সাদা জগতে পা রাখি...

মনে আছে প্রথমবার এক বন্ধুকে ম্যাসেজ করতে গিয়ে নিজের ওয়াল এ পোস্ট দিয়েছিলাম... তখন বুঝতাম না শুরুতে অনেক কিছু...... এরপর থেকে আস্তে আস্তে এই ভার্চুয়াল জগতে সময় দেয়া বৃদ্ধি পেল...

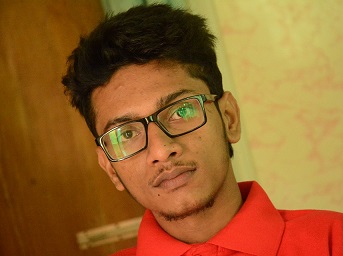
প্রথম দিকে বিভিন্ন ধরণের পোস্ট পেতাম... নিজের জ্ঞান এর ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি হলো...

ধীরে ধীরে অনেক কিছু জানলাম... মুক্তিযোদ্ধার ছেলে হওয়ায় মুকিযুদ্ধ নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল...আস্তে আস্তে অনেক কিছু জানলাম বুঝলাম... মনের কোণে একটা অতৃপ্তি ছিল যে এই বিষয়টা নিয়ে যে আমরা নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানি না, ইতিহাস জানি না... যেটা জানি তার মধ্যে অনেক ভুল আছে... এখানে সেখানে অনেক লেখা পড়েছি কিন্তু সুন্দর করে সাজানো-গোছানো কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে নি...

অনেকদিন পর ইঞ্জিনিয়ার লিও ভাইয়ের একটা উদ্যোগ চোখে পড়ল... একবার দেখেই মন থেকে বলে উঠলো, এটাই খুঁজছিলাম এতদিন.....একদম সঠিক তথ্য অর্থাৎ বিভিন্ন খবরের কাগজের লেখা এবং অনেকের সাক্ষাৎকার মিলে যখন অনলাইনে এটি সবার কাছে পৌঁছে যাবে, তখন মনে হবে আসলেই কিছু করতে পেরেছি....তাই ভাইয়ার সাথে কথা বলে কাজ শুরু করে দিলাম এবং যত কাজ করলাম তত অবাক হচ্ছি যে কত কিছু যে জানি না...

তবে মনে একটা প্রত্যয় আছে যে করেই হোক নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য তুলে ধরতেই হবে... নিজের জন্ম যদি ভুলে যাই তবে নিজের যে কিছুই থাকবে না!

আমার আব্বু দেশের মুক্তির জন্যে নিজের রক্ত ঝরিয়েছেন, তার ছেলে হয়ে যদি এই সামান্য অবদান রাখতে না পারি তবে নিজেকেই ব্যর্থ মনে হবে...তাই শুরু হলো পথচলা।



[মারুফ আহমেদ](https://www.facebook.com/rockstaah.maruf)

আমাদের না বলা কথাগুলো কাজের মাধ্যমেই ফুটে উঠুক ☺



[সামিউল হাসান প্রান্ত](https://www.facebook.com/samiulhasan.pranto?fref=ts)

আমাদের দল-মতের বিভেদ থাকলেও জাতিগতভাবে কিছু বিষয়ে ঐকমত্য থাকা জরুরী। মুক্তিযুদ্ধ তেমনি একটি ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধ বরাবরই আমার আগ্রহের বিষয়। যখনই সুযোগ পেয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। এই প্রোজেক্টে আসার পেছনে কোন নাটকীয় ঘটনা নেই। লিওর ফেসবুক পোস্ট থেকে জানতে পারি এই প্রোজেক্টের ব্যাপারে, তারপর আমার তরফ থেকে খুব ক্ষুদ্র কিছু কাজ তাতে যোগ করা হয়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে ভেতরে। এই প্রোজেক্টের সফলতা কামনা করি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে। তথ্য হোক উন্মুক্ত। আমাদের পরিচয় হোক একটাইঃ মুক্তিযুদ্ধ...



[আমিনুল হক পলাশ](https://www.facebook.com/aminul.hoque.polash?fref=ts)

অনেক কাজ এখনো বাকি। সেগুলো শেষ করে কথা হবে ☺

# সূচিপত্র

(কি-বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে এখানকার যে কোন বিষয়ে উল্লিখিত ব্যক্তির নামের ক্লিক করে আপনারা সরাসরি সেই দলিলে চলে যেতে পারবেন)

*(পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো মূল দলিলের পৃষ্ঠা নাম্বার অনুযায়ী লিখিত)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ১ | আজিজুর রহমান মল্লিক, অধ্যাপক  উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;  বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা | ১ |
| ২ | আফসার আলী আহমেদ  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় পরিষদ সদস্য, রংপুর | ১৪ |
| ৩ | **আব্দুর রাজ্জাক মুকুল**  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৩) | ১৫ |
| ৪ | আব্দুল করিম খন্দকার  পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর জ্যৈষ্ঠতম বাঙ্গালি অফিসার,  বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ | ১৭ |
| ৫ | আবদুল খালেক  সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল,  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপি | ২৫ |
| ৬ | আবদুল বাসিত সিদ্দিকী  আওয়ামী লীগ দলীয়  প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, টাঙ্গাইল | ৩৫ |
| ৭ | আবদুল মালেক উকিল  আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, নোয়াখালী;  অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিশেষ প্রতিনিধি | ৩৬ |
| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ৮ | আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি  উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;  বহির্বিশ্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি এবং  লন্ডনে বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতা | ৪২ |
| ৯ | আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার  আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা,  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উপদেষ্টা | ৫১ |
| ১০ | আসহাবুল হক, মৌলভি  গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম | ১১০ |
| ১১ | এ, এম, এ মুহিত  অর্থনৈতিক কাউন্সিলর, পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন;  আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিক ও  যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা | ১১৩ |
| ১২ | এম আর সিদ্দিকী  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় পরিষদ সদস্য, চট্টগ্রাম;  প্রশাসনিক পরিষদ প্রধান, ইস্টার্ন জোন;  বাংলাদেশ মিশন প্রধান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা | ১২১ |
| ১৩ | এম এ হান্নান  আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রাম;  লিয়াজো অফিসার, পূর্বাঞ্চলীয় জোন | ১২৭ |
| ১৪ | ওয়াহিদুল হক  সাংবাদিক | ১৩০ |
| ১৫ | কণিকা বিশ্বাস  আওয়ামী লীগ দলীয়  সংসদ সদস্যা, ফরিদপুর (সংরক্ষিত আসন) | ১৩৩ |
| ১৬ | কাজী জাফর আহমেদ  সভাপতি, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন (ভাসানিপন্থি ন্যাপ নেতা) | ১৩৪ |
| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ১৭ | কামাল সিদ্দিকী, ডক্টর  মহকুমা প্রশাসক, নড়াইল;  ব্যক্তিগত সচিব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী,  গণপ্রজানতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ১৩৯ |
| ১৮ | কামাল হোসেন, ডক্টর  আওয়ামী লীগ নেতা | ১৪৩ |
| ১৯ | খন্দকার আসাদুজ্জামান  যুগ্মসচিব, অর্থ, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার;  অর্থ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ১৯৩ |
| ২০ | জয় গোবিন্দ ভৌমিক  জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা;  রিলিফ কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ১৯৮ |
| ২১ | দেওয়ান ফরিদ গাজী  আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য;  প্রশাসনিক পরিষদ প্রধান, উত্তর-পূর্ব জোন  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ২০৪ |
| ২২ | দেবব্রত দত্ত গুপ্ত  অধ্যাপক, চৌমুহনী কলেজ;  উপ-পরিচালক ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী  ইয়ুথ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেট, পূর্বাঞ্চলীয় জোন | ২০৫ |
| ২৩ | মণি সিংহ  সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | ২১৩ |
| ২৪ | মনসুর আলী  আওয়ামী লীগ দলীয়  প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, খুলনা | ২২৩ |
| ২৫ | মমতাজ বেগম  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় পরিষদ সদস্য (মহিলা আসন), কুমিল্লা | ২২৪ |
| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ২৬ | মোশাররফ হোসেন  আওয়ামী লীগ দলীয়  প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, চট্টগ্রাম | ২২৫ |
| ২৭ | মোহাম্মদ আজিজুর রহমান  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় পরিষদ সদস্য, দিনাজপুর | ২২৭ |
| ২৮ | মোহাম্মদ আজিজুর রহমান  আওয়ামী লীগ দলীয়  প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, সিলেট | ২২৯ |
| ২৯ | মোহাম্মদ আবদুর রব, মেজর জেনারেল (অব:)  আওয়ামী লীগ দলীয়  প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, সিলেট;  বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ | ২৩২ |
| ৩০ | ইউসুফ আলী, অধ্যাপক  আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা,  মুজিবনগরে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক | ২৩২ |
| ৩১ | মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ  আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, রাজশাহী | ২৪৪ |
| ৩২ | মোহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী  আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, রংপুর | ২৪৫ |
| ৩৩ | মোহাম্মদ শামসুল হক, অধ্যাপক  পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ২৪৮ |
| ৩৪ | মোহাম্মদ হুমায়ূন খালিদ, অধ্যক্ষ  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় পরিষদ সদস্য, টাঙ্গাইল | ২৫১ |
| ৩৫ | মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ  দৈনিক ‘জয়বাংলা’ সম্পাদক  নওগাঁ থেকে প্রকাশিত (মার্চ- এপ্রিল' ৭১) | ২৫২ |
| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ৩৬ | রেহমান সোবহান, অধ্যাপক  পাকিস্তান আমলে পূর্বাঞ্চলীয় পৃথক অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা ও  বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা | ২৬৩ |
| ৩৭ | শাহ জাহাঙ্গীর কবীর  আওয়ামী লীগ দলীয়  জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৩) | ২৯৩ |
| ৩৮ | সাঈদ-উর-রহমান  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র;  যুবশিবির ‘পলিটিক্যাল মটিভেটর’ | ২৯৪ |
| ৩৯ | সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক  ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য | ২৯৮ |
| ৪০ | সিরাজুর রহমান  অনুষ্ঠান কর্মকর্তা, বাংলা বিভাগ,  বিবিসি, লন্ডন | ৩০২ |
| ৪১ | সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক  সভাপতি, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;  সভাপতি, বাংলাদেশ আর্কাইভস | ৩০৫ |
| ৪২ | অজয় রায়, ডক্টর  রিডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;  বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক (জুলাই ৭১ হতে) | ৩১৩ |
| ৪৩ | নির্ঘণ্ট | ৩৩৭ |



[ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<**১৫,১,১-১৪**>

# [অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সমগ্র দেশবাসীর মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ হয়। ৭ ই মার্চে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বেতার মারফত আমাদের শোনার সুযোগ হয় ৮ই মার্চ সকালে। ঐদিনই আমার পরামর্শ অনুসারে শিক্ষকেরা একটি সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান,সৈয়দ আব্দুল করিম,অধ্যাপক মুহাম্মদ রশিদুল হক ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব ফজলী হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

তখন থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত স্বাধীনতা -সংগ্রামের জন্য আমরা এক ধরনের প্রস্তুতি নিই। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ -এর ডক্টর আব্দুল হাইয়ের সংগে অধ্যাপক রশিদুল হক ও অধ্যাপক শামসুল হককে (তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেই। কারণ তিনিও আমাদের মতই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে আমার জানা ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরিতে হাতবোমা,গ্রেনেড ইত্যাদি তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করতে অধ্যাপক শামসুল হককে গোপনীয় মৌখিক নির্দেশ দেই।  কিছু কিছু ছাত্রকে সামরিক ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করা হয় ডঃ হাইয়ের উদ্যোগে। ইউ, ও, টি,সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ডক্টর এস, এম, আতাহারকে আমি নির্দেশ দেই ইউওটিসি-র রাইফেলগুলো সক্রিয় করার চেষ্টা করতে। চট্টগ্রাম  শহরে আয়োজিত সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ-সভা ও বিক্ষোভ-মিছিলে অন্যান্য অনেকের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও  ডঃ আনিসুজ্জামান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরও আগে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষে আহতদের জন্য আমার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্ররা  রক্ত দান করেন।  
  
২৩ শে মার্চ সকালে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ঐদিন বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে সকল পর্যায়ের শিক্ষক ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতিবাদ মিছিল বের হবে এবং তারপরে প্যারেড গ্রাউন্ডে আমার সভাপতিত্বে শিক্ষক-জনতার সভা হবে। যদিও এ সম্পর্কে আমি আগে কিছু জানতাম না, তবু এই মিছিল ও সভায় আমি শিক্ষক ছাত্রসহ যোগ দেই। মিছিল বেশ বড় হয়, সভায় জনসমাবেশও হয় প্রচুর। পলো গ্রাউন্ডের এই জনসভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না তাছাড়া মাঠের চারিদিকে বাড়ীর ছাদেও অনেক নারী পুরুষ  জড়ো হয়। এই সভায় আমি জনতার সংগ্রামের সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করি।  বাঙালির ন্যায্য অধিকার অর্জন করা পর্যন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবো সে অঙ্গীকার ও করি। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল করিম, অধ্যাপক আর আই চৌধুরী  ও স্থানীয় নেতা মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী। উল্লেখ্য যে এই সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার প্রাক্তন ছাত্র  এবং তৎকালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ।  সভা চলাকালে সংবাদ আসে যে অস্ত্র বোঝাই 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দেবার জন্য প্রায় ১০/১৫ হাজার মানুষ  বন্দর এলাকায় বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করা হচ্ছে। সভায় উত্তেজনা বাড়ে।  এমতাবস্থায় সভা মুলতবী করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করি কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের কাছে ব্যারিকেড দেখে আবার ফিরে আসি এবং রাঙ্গুনিয়া হয়ে গ্রাম্য পথ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরি অনেক রাতে। অচিরেই যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিরস্ত্র জনসাধারণের  মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তখন আর আমার  ও আমার সহকর্মীদের মনে কোন সংশয় থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ২৪ শে মার্চ সকালে UBL (তদকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড-এর আঞ্চলিক ম্যানেজার জনাব কাদের এবং চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার জনাব শামসুল হকের (উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় শহীদ হন) সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথাবার্তা হয়। সেই আলাপের ভিত্তিতে হাটহাজারী ও রাউজান থানার সঙ্গে আমি টেলিযোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করি এবং শত্রুসৈন্য পথে বেরিয়ে পড়লে স্থানীয়  জনসাধারণের সাহায্যে যাতে তাদের প্রতিরোধ করতে পারি তার জন্যও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার  পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

২৫ শে মার্চ সারাদিন খুব  উদ্বেগের মধ্যে কাটে।  শহরের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে,এসব খবর টেলিফোনে পাই।  যেমন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ জনাব ইউ, এন, সিদ্দীকির বাড়ীতে এসে কিছু লোক তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র চাইলে তিনি আমাকে ফোন করেন পরামর্শের জন্য।   আমি তাকে অস্ত্র দিয়ে দিতে বলি। বিরাজমান অস্থিরতা ও উত্তেজনার ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয়েও এসে লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও শিক্ষকদের নিয়ে আমার অফিসঘরে  বসে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি।

২৫ শে মার্চ রাত ১০ টার পরে আমার বাসায় টেলিফোন করে ঢাকা থেকে খবর দেন যে,পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার পথে বেরিয়ে গেছে,সম্ভবত: সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে  এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই খবর পেয়েই আমি শিক্ষকদের কয়েকজনকে আমার অফিসে আসতে বলি। এদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আর, আই চৌধুরী, অধ্যাপক করিম, অধ্যাপক মুহম্মদ আলী, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব মাহবুব তালুকদার, ওসমান জামাল ও রেজিস্টার খলিলুর রহমান ছিলেন। আমরা প্রথমে চট্টগ্রাম সাংবাদিকদের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিই। তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। এই সময় আমার আত্মীয়  কুমিল্লার ডি, সি. শামসুল হক খান-এর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তিনি জানান, যে কোন মুহূর্তে তাঁর জীবন  বিপন্ন হতে পারে। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকে ক্যান্টনমেন্টে গাড়ীর জ্বালানী সরবরাহ আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অবিলম্বে কুমিল্লা সার্কিট হাউস থেকে সরে গিয়ে গ্রামের দিকে আশ্রয় নিতে বলি। আর পর তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি। তাকে সামরিক বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল সে খবর অনেক দিন পরে পাই।

কুমিল্লার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টায় ঢাকার 'পূর্বদেশ 'ও 'ইত্তেফাক’ অফিসে এবং আমার আত্মীয় ঢাকাস্থ নরউইচ ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স - এর তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান খানের সঙ্গে টেলিফোনে  যোগাযোগ করতে সক্ষম হই।  কেউ কেউ সেখান থেকে বললেন যে, একটা কিছু ঘটেছে, কেউ কেউ বলেন কোন মারাত্মক ঘটনার খবর তাঁদের জানা নেই। তবে শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ট্যাঙ্ক ও সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে।  এ সময় চট্টগ্রামের একজন সাংবাদিক জানান যে, শেখ মুজিব আত্মগোপন করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আমরা যখন ঢাকায় কথা বলছি,তখন ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন সংযোগ হঠাৎ  ছিন্ন হয়ে যায় অনুমান রাত ১১ টার দিকে। আমরা আরো দু-তিন ঘণ্টা বসে থেকে আলাপ-আলোচনা করি এবং সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ঢাকাতে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে  এই যুক্তির ওপর  আমি বার বার জোর দিই। এর প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তুতি জোরদার করার সিদ্ধান্ত  নেই এবং সেই রাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর এর অফিস আমাদের স্থানীয় সংগ্রাম প্রচেষ্টার সদর দপ্তরে পরিণত হয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমার ওপরে বর্তায়। সারা রাত অফিসে কাটিয়ে ভোর সাড়ে চারটায় বাসায় ফিরে এসে সবেমাত্র গোসল করতে বাথরুমে গিয়েছি তখন চট্টগ্রাম শহর থেকে কোষাধ্যক্ষ সিদ্দিকী সাহেবের ফোন পাই।  তিনি জানেন যে তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন তদানীন্তন ই বি আর-এর যুবক অস্ত্রসহ উপস্থিত হয়েছে।  তারা এই বাড়ীতে  ঘাঁটি স্থাপন করবে শত্রু পক্ষের মোকাবেলার জন্য। আমি  ফোনে সেই উত্তেজিত যুবকদের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে তারা জীবন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্রসহ বেরিয়ে এসেছে এবং আরও দল বের হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ও গুলিগোলা আছে। তারা সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ী থেকে ক্যান্টনমেন্ট -এর সঙ্গে যুক্ত শহরের রাস্তার ওপর নজর রাখবে এবং পাকিস্তানী সৈন্য রাস্তায় বের হলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এ বাড়ী তাই তাদের দরকার।  আমি সিদ্দিকী সাহেবকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে কাছাকাছি অন্য বাড়ীতে যেতে বলি এবং এদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে বলি। তখন শহরে স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।  টেলিফোনে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম এবং ছেলেরাও জানাল তাদের দক্ষিণ দিকের একটা বাড়ী থেকে এ বাড়ী লক্ষ্য করে গোলা ছোড়া হচ্ছে এবং বিদ্যুতের তারের খুঁটিতে আঘাত লেগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি দক্ষিণের ঐ অবাঙালি বাড়িতে আগেই প্রস্তুতি হিসেবে শত্রু সৈন্য মোতায়েন ছিল।

২৬ শে মার্চ সকালে এ খবর আসার পর আওয়ামী লীগের জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও জনাব এম, এ, হান্নানের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আরও খবর জানতে পারি। কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রফিক সি, আর, বির  টিলায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামান এর সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথা হয় এবং পারস্পরিক এলাকার সংবাদ বিনিময় হয়। চট্টগ্রাম ডাকবাংলোতে অথবা রেলওয়ে রেস্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের একটি অফিস কাজ করছিল। সেখান থেকে একজন টেলিফোন করে আনিসুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনান এবং তা লিখে নিয়ে সবাইকে জানাতে বলেন। এরপর চট্টগ্রামের বেতার তরঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা শুনতে পাই। জনাব এম, এ, হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন এবং পরে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হতে নির্দেশ দেন। আমি টেলিফোন করে কালুরঘাটে এবং ডাকবাংলোতে বলি যে,এই ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার, কেননা, ওরকম জমায়েতের ওপর বিমান থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। পরে তাঁরা এই সমাবেশ বাতিল করার ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে আমার যে আশঙ্কা ছিল পরবর্তী সময়ে তা সত্যে পরিণত হয়। পাকিস্তানের কয়েকটি জঙ্গি বিমান চট্টগ্রাম  শহর প্রদক্ষিণ করার পর কালুরঘাটে  বোমা বর্ষণ করে।  
  
২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি থেকে জিলা প্রশাসক  জনাব হাসান তৌফিক ইমাম টেলিফোনে আমাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর চট্টগ্রাম থেকে ইপিআর -এর জওয়ানদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। রাতে প্রায় আড়াইশ জওয়ান ক্যাম্পাসে এসে  পৌঁছান।  আমরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আলাওল হল ও এ, এফ, রহমান হলে থাকবার ও খাওয়ার  ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমরা শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেই। যেমন কেউ খাবারের তত্ত্বাবধান করেন, যানবাহনের দায়িত্ব নেন কেউ, পেট্রোলের জন্য পাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্লিপ দেবার দায়িত্ব দেয়া হয় কাউকে, ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবার নেতৃত্ব নেন কেউ। আমি অফিসে থাকি এবং আমাকে সর্বক্ষণ সহায়তার ভার দেয়া হয় আনিসুজ্জামানকে।

ই, পি, আর- এর জওয়ানদের প্রতিরোধ কার্যক্রমে  তাৎক্ষনিকভাবে নেতৃত্ব দেবার জন্য পেয়েছিলাম সুবেদার আব্দুল  গণিকে। সেই রাতেই আমার অফিস থেকে সি, এস, আই,আর-এ ড: হাইকে ফোন করে ক্যান্টনমেন্টের যতটুকু খবর আঁচ করা সম্ভব, তা জেনে নিই এবং ই, পি, আর -এর জওয়ানদের দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর দিক (হাটহাজারী রাস্তার পূর্বদিকের এলাকা) ঘিরে রাখার কৌশল স্থির করা হয়। ক্যান্টনমেন্টের উত্তরাঞ্চলে ছিল পাহাড় ও জংগল এবং সামান্য জনগোষ্ঠীর বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাপগ্রাফিক ম্যাপ ছিল। আমার অফিসে বসে ম্যাপ দেখে ট্রেঞ্চ কাটার জায়গা নির্দিষ্ট হয় এবং ক্যাম্পাসে কনট্রাকটরদের শ্রমিক দিয়ে রাত্রেই পরিখা খনন করা হয়। পরদিন জওয়ানদের নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রত্যেককে প্যাকেট লাঞ্চ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে গ্রাম্য জনসাধারণ আমাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁরা সাধ্যমত চাল-ডাল-তরকারী, আটা, ময়দা, গরু, ছাগল, মুরগী আমাদের কাছে পৌঁছে দেন দান হিসেবে। তবে তাঁদের কাছ থেকে কোন অর্থ আমরা গ্রহণ করিনি। সৈন্যদের পথ দেখানোর কাজেও তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করেন। উল্লেখ্য যে, ই, পি, আর-দের সাহায্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক মাইল দূরে রেল লাইনের পূর্ব দিকে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস সেট স্থাপন করা হয়েছিল।

২৭ শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।

২৭শে ও ২৮শে মার্চ ই, পি, আর-এর আরও কিছু জওয়ান এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে আত্মরক্ষা করে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এদের সংখ্যা দাঁড়ায় চারশো’র বেশী। কিন্তু ই, পি, আর ও ই, বি, আর-এর জওয়ানদের একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এস, পি শামসুল হক,  মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ ছিলো। পরস্পরের কাছে পরিচিত হবার জন্য আমরা ভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করতাম। আমাকে দেয়া নাম ছিল ‘ডানিয়েল’। যোগাযোগ করা ক্রমশ: কঠিন হয়ে উঠছিলো, কেননা ক্রমেই তাঁদের অবস্থান এমন জায়গায় হচ্ছিল যেখানে টেলিফোনে কথা বলা যাচ্ছিল না। যাহোক,বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থানরত জওয়ানদের যুদ্ধ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ক্যাপ্টেন রফিক-এর মারফত চেয়ে পাঠাই। তাঁরা পাঠান একজনকে। (পরে দেখি তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ও আমার বড় ছেলের বন্ধু)। তাকে নিয়ে একটা ভুল বুঝা-বুঝি হয়। তিনি সরাসরি আমার অফিসে এসে জওয়ানদের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ক্যাম্পাসে আমার সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র দেখে আরও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বর্ডারে যাবার কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে কর্তব্যরত অধ্যাপকের কাছে একটি গাড়ী চান। অধ্যাপক একথা আমাকে ফোনে জানান। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া কিংবা মেজর জিয়া যে তাকে পাঠিয়েছেন তা তিনি জানালেও আমরা সরাসরি কোন খবর কালুরঘাট থেকে পাইনি বলে উক্ত অফিসার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তাকে আমি আমার অফিসে ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাতেও সন্দেহ নিরসন না হওয়াতে ই, পি, আর-এর এক নায়েক এবং দুই সিপাহীর সাহায্যে তাকে এবং তার দু’জন সহচর ছাত্রকে নিরস্ত্র করি এবং ভাইস চ্যান্সেলরের ভিজিটরস রুমে পাহারাধীন রাখি। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বলি যে দেশ এক সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ অবস্থায় কারও চালচলনে সন্দেহের উদ্রেক হলে তাকে নজরবন্দী রাখতে হয়। মেজর জিয়ার ক্যাম্প থেকে তাঁদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়াকে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি বলেন যে, উক্ত অফিসারকে দু’জন ছাত্রসহ পাঠিয়েছি। আমার বক্তব্য, তাই যদি হয়, তবে আমার সঙ্গে দেখা না করে এখানকার দায়িত্ব না নিয়ে চলে যাচ্ছিল কেন। যাহোক,তখন ওই অফিসারকে মুক্ত করে আমি জিয়ার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই এবং অন্য কোন সিনিয়র অফিসার পাঠাতে অনুরোধ করি। সঙ্গের দুজন ছাত্রকেও তার সঙ্গে পাঠাই কারণ এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা প্রতিরোধ সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে মেজর জিয়ার ক্যাম্পে গিয়েছিলো। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নির্দেশে অফিসারকে নিয়ে আমাদের এখানে আসে। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নয়। ছাত্রদের পরিচিতি সম্বন্ধে স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে (জনাব আখতারুজ্জামান তাঁদের মধ্যে একজন) খবর নিয়ে জানতে পারি যে, তাঁদের বক্তব্য সত্য। তখন ওই দুটি ছাত্রকে দিয়ে উক্ত অফিসারকে কালুরঘাট পাঠানো হয় ক্যাপ্টেন রফিকের নিকট। ছাত্র দুটি যখন ফিরে আসছিলো তখন তাঁরা পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পাস থেকে সংগ্রাম পরিচালনার সময় আমাদের ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুইজন সদস্য আব্দুর রব (তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক) এবং ফরহাদ কাপ্তাই রোডের ওপর এক গেরিলা অপারেশনে মৃত্যুবরণ করে।

২৯শে মার্চ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় তাঁরা অবস্থান পাল্টেছেন, কিন্তু আমাদের খবর দেবার সময় পাননি।

পক্ষান্তরে আমরা চট্টগ্রাম শহরের পতনের সংবাদ পাই। ইতিমধ্যে শত্রুর গুলিতে পরিখায় অবস্থানরত আমাদের কয়েকজন জওয়ান আহত হয়। এমতাবস্থায় প্রতিরোধ এখান থেকে জোরদার করা সম্ভব নয় বলে জওয়ানদের পক্ষ থেকে আরও উত্তরে চলে যাবার প্রস্তাব আসে। আমরা একমত হই। তাঁরা নাজিরহাটে যাবে সিদ্ধান্ত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী জওয়ানরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার আবুল বশর ও ডাক্তার আখতারুজ্জামানের চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহত যোদ্ধা ছাড়া তখন আর প্রায় কোন যোদ্ধাই আমাদের হাতে রইলো না। এরপরে শহর থেকে গ্রাম্য পথ ঘুরে যোদ্ধৃবেশে কিছু আওয়ামী লীগ ও নেতা এবং ইউ, ও, টি, সির কিছু প্রশিক্ষণরত ছাত্র ও অফিসার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছান,কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রাখা অসম্ভব দেখে তারাও অন্যত্র চলে যান। এদিকে ক্যাম্পাস থেকে উত্তর চট্টগ্রাম বা রাঙ্গামাটির রাস্তায়ও স্থানীয় জনসাধারণ ব্যারিকেড স্থাপন করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আমরা স্থির করি যে ৩০ শে মার্চ ক্যাম্পাস থেকে সকল শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে স্থানান্তরিত করা হবে। কয়েকটি বাসে করে কিছু পরিবার নাজিরহাটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, অন্যেরা গিয়ে আশ্রয় নেন কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বন্ধ ছিল কারণ হাতে টাকা ছিল না এবং ব্যাংক বন্ধ ছিল। কিছু কর্মচারী ব্যাংকের দরজা ভেঙ্গে টাকা নেয়ার প্রস্তাব করে।  আমি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিই এবং ব্যাংক লুট করা চলবে না বলে দিই। আমার বাসায় যে ব্যক্তিগত টাকা ছিল (উল্লেখ্য, আ,আর ব্যক্তিগত গাড়ী বিক্রয়ের দশ হাজার টাকা ব্যাংক বন্ধ থাকায় বাসায় ছিল) সেখান থেকে চার হাজার টাকা নিয়ে এবং অধ্যাপক আর, আই, চৌধুরীর কাছে যে ২/৩ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের টাকা ছিল তা নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বাড়ী যাবার ভাড়া তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দিই এবং তাদের যার যার বাড়ীতে চলে যেতে বলে তাদের  কাছ থেকে আমি বিদায় নিই। ৩১ শে মার্চ রাতে ক্যাম্পাস  প্রায় খালি হয়ে যায়। ডাক্তার দু'জনের হাতে চিকিৎসাধীন চার পাঁচজন যোদ্ধাকে  রেখে  ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় আমার পরিবার, রেজিস্টারের পরিবার এবং আনিসুজ্জামানকে (তাঁর পরিবার আগেই কুণ্ডেশ্বরীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল) নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম। আমি সপরিবারে রাউজানে আশ্রয় নিলাম।  ক্যাম্পাসে  ভি, সির বাসগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় আমার সেক্রেটারি ইনস্যুরেন্স পলিসি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদির কিছু  কাগজপত্রের ব্যক্তিগত ফাইল আমার পাসপোর্টসহ আমার সামনে এনে হাজির করে সঙ্গে নেবার জন্য। আমি ওই পাসপোর্ট সবার সামনে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম কারণ, তখন আমি আর পাকিস্তানী নই, তাই পাকিস্তানী পরিচয়ে কোন পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে চাইনি। অন্যান্য কাগজপত্রের ফাইলটিও ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততক্ষণ কোন বীমা, কোন শেয়ার  সার্টিফিকেটের দরকার নেই।  পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হবার পর আমার সেক্রেটারি ঐ ছুড়ে ফেলে দেয়া ফাইলটি আমার ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

রাউজানে আমি সপ্তাহখানেক ছিলাম। ইতিমধ্যে  সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। কুণ্ডেশ্বরীতে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়েন। সেখানে আশ্রয় দাতা নূতনচন্দ্র সিংহের পরিবার ও স্থান ত্যাগ করেন। নূতন বাবু শূন্য গৃহে রয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পরে ১৩ ই এপ্রিল হানাদার  বাহিনী তাকে হত্যা করে।

সম্ভবত: ৮ই এপ্রিল আমি রাউজান থেকে নাজিরহাটে চলে যাই। ওখানে তখন আমাদের সহযোগী জওয়ানরা ছিলেন। সেখানে এক রাত তাদের সঙ্গে থেকে রামগড়ের পথে রওয়ানা হই। সপরিবারে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান,  অধ্যাপক রশিদুল হক  ও  ড: মাহমুদ শাহ কোরেশী আমার সঙ্গে আসেন। উল্লেখ্য নাজিরহাট থেকে আমার সঙ্গে যায় মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন, তাদের সঙ্গে কালুরঘাট থেকে সরিয়ে আনা ট্রান্সমিটার সেট ছিল। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধাও ছিল।

১০ ই এপ্রিলে হানাদার  বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। ১১ই থেকে ১৪ ই এপ্রিলের মধ্যে রামগড়ে সপরিবারে এসে পৌঁছান অধ্যাপক শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল; অন্য শিক্ষকদের  মধ্যে ষরিৎকুমার সাহা,  নূরুল ইসলাম খোন্দকার প্রভৃতি  এবং বেশ কিছু ছাত্র। ছাত্রেরা অনেকেই সাবরুম হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ দু'চার দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে শত্রুর মোকাবিলা করে। আমাদের ছাত্র শহীদ ইফতিখার ছিল তেমন একজন।

রামগড়ে  এসে মেজর জিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হয়। সেখান থেকেই তিনি তখন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেজর শামসুদ্দীন (ই পি আর), ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন আফতাব (গোলন্দাজ বাহিনী), ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া প্রমুখ। রাঙ্গামাটি থেকে হাসান তৌফিক ইমাম ও এস, পি বজলুর রহমান আমাদের আগেই এখানে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী তাদের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকা থেকে সাদেক খানও সেখানে এসে পৌঁছান। রামগড়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজে এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য করেন সেখানকার চা বাগানের ম্যানেজার জনাব আব্দুল আউয়াল। রামগড় অবস্থানের শেষ দিন ভোরে ক্যাপ্টেন কাদের আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপর জিয়া কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যান পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি এই অপারেশন নিহত হন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি রামগড় থেকে আগরতলায় গিয়ে পৌছাই। দেশের মাটি ছাড়ার সময় আমরা যারা চলে যাচ্ছিলাম এবং আমাদের যেসব বন্ধু তখনও দেশে রয়ে গেলেন, সকলেরই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আনিসুজ্জামানকে তখন বলেছিলাম, মন খারাপ করো না, এই বছর শেষ হবার আগেই আমরা স্বদেশে ফিরে আসব। আমি জানিনা সেই দুরবস্থার সময়ে এ প্রত্যয় কি করে আমার মনে জন্মেছিল।  তবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতে একথা আমি বহুজনকে বহুবার বলেছিলাম। এমনকি জুন মাসেই সিদ্ধার্থ সঙ্কর রায়কে বড়দিন উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসার পর অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

আগরতলায় একটি পরিত্যক্ত বাসগৃহে আমার ও পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অদূরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের একটি পরিত্যক্ত হোস্টেলে সৈয়দ আলী আহসান, রশিদুল হক ও কোরেশীর স্থান হয়। পরে এই হোষ্টেলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল, চা বাগানের আব্দুল আউয়াল এবং মেজর শামসুদ্দিন, মেজর শওকত ও মেজর শফিউল্লার পরিবার আশ্রয় লাভ করেন। এক-একটি কক্ষে এক-একটি পরিবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলায় আমার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছিলেন জনাব এম, আর, সিদ্দীকি ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে কর্মপন্থা স্থির করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছু করার ছিল না। তখন আমরা সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করছি। স্রোতের মতো  শরণার্থী আসছে। ঢাকা থেকে ও অনেক বন্ধু,  পরিচিত, স্বজন সেখানে এসে পৌঁছচ্ছেন। এখানে একদিনের দুপুরের খাবার এর কথা আমার মনে পড়ে।  অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাবারের আয়োজন ছিল বেশ উন্নতমানের। আমরা খেতে বসেছিলাম। এই কদিন আমাদের সঙ্গে যেসব ছেলে কাজ করছিল তাদের যে দুরবস্থা আমি দেখেছি তা ভেবে আমার বিবেক নাড়া দিল, আমি খেতে পারলাম না। সৈয়দ আলী আহসান ও অন্যান্য সহযোগীদের বলে আমি এলাম এবং একটি সস্তা হোটেলে গিয়ে রুটি ও নিরামিষ খেলাম। প্রতিরোধ যুদ্ধে  পিছু হটলেও সীমান্তের কাছাকাছি তখনও যুদ্ধ চলছে। মেজর খালেদ মোশাররফ এসে ২/৩ রাত আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে নিয়ে যান। অচিরেই তাঁকে সদলে পিছু হটতে হয়। সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর জিয়া আগরতলায় চলে আসেন। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে আমার আগরতলায় পরিচয় হয়। ট্রান্সমিটার সমেত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রও উঠে আসে আগরতলায়। কিন্তু এর প্রচার শক্তি এত সীমাবদ্ধ ছিল যে, কর্মীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছতে পারেনি। পরে ড: ত্রিগুনা সেন যখন আগরতলা সফরে আসেন, তখন তাঁকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাদের বেতারের জন্য শক্তিশালী ট্রান্সমিটার সরবরাহ করতে।

আগরতলায় থাকতে একদিন দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় খবর দেখলাম যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ছিল এই যে, এপ্রিল মে মাসে কাঠমুন্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আমার প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবার কথা ছিল। নেপালি কর্তৃপক্ষ তাই পাকিস্তান সরকারকে আমার বিষয়ে লিখেন।  পাকিস্তান সরকার জানান যে,আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠমুন্ডুর কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে খবরটা ঐভাবে প্রকাশ পায়। পরে পাকিস্তান সরকার অনেক শরণার্থী সম্পর্কে ভারত সরকারকে লিখেছিলেন যে, দুষ্কৃতকারীরা তাদের ধরে ভারতে নিয়ে গেছে, এসব ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে পাকিস্তান সরকারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই তালিকায় অবশ্য আমার নাম ছিল না।

মে মাসের প্রথম দিকে জনাব আব্দুল মালেক উকিল কলকাতা থেকে এক সন্ধ্যায় আগরতলায় আমার বাসায় আসেন। তিনি বললেন,প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন,তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাবার জন্য।  উকিল সাহেব আমার কলকাতা যাবার বিমানের টিকিটও নিয়ে এসেছিলেন। পারিবারিক ব্যবস্থা সাঙ্গ করে কলকাতায় পৌছতে আমার দুই দিন বিলম্ব হয়। তাজউদ্দিন সাহেব দিল্লী চলে গিয়েছিলেন,আমার আর তখন যাওয়া হল না। এখানে উল্লেখ করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থানকালে সপরিবারে আমার ব্যয় নির্বাহের  জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তা আমি গ্রহণ করিনি। দেশের বাইরে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন,ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধুবান্ধবের নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্যসামগ্রী দিয়েই আমি সংগ্রামের দিনগুলি কাটিয়েছি।

কলকাতা পৌঁছে বাংলাদেশ মিশন অফিসে আমাকে নেয়া হয়। হোসেন আলী তখন বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এই মিশনের অস্থায়ী প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন,বিদেশে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে টেলিফোনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজে যোগদানের অনুরোধ জানাতে। কলকাতায় তাঁদের ধারনা ছিল, বিচারপতি চৌধুরী এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন। টেলিফোন বুক করা হল। কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। শেষে তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য আমি ম্যাসেজ রেখে গেলাম যে, আমি এসে গেছি উনি যেন বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ করতে নেমে যান।

কলকাতায় এসে আমার প্রথম কাজ হয় বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টসিয়া  গঠন করা।  দেশের যেসব বুদ্ধিজীবী,শিল্পী ও অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মী ততদিনে কলকাতায় শরণার্থী  হয়েছেন, তাঁদের সংগঠিত করে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে কাজ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। আমি সভাপতি নির্বাচিত হই, জহির রায়হান নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক।  সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ, ব্রজেন দাশ, ফয়েজ আহমদ, কামরুল হাসান প্রমুখ এই কমিটি তে ছিলেন। প্রথম দিকে এই কমিটির কর্মকর্তাদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় আমার প্রাক্তন ছাত্রী, সেসময়ে লরেটো কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ পি সি ঘোষ এর বাসভবনে। তিনি এবং তাঁর স্বামী কমল ঘোষ ব্যক্তিগতভাবেই কমিটির কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন এবং সভার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদির ব্যয়ভার বহন করতেন। এই বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে নেতাজী রিসার্চ ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এখানে আমার দুই মেয়ে এমি ও রানা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধের গতি, শরণার্থীদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়। অরুপ চৌধুরীর অফিসও এই পরিষদের কাজে এবং পরবর্তীতে স্থাপিত শিক্ষক  সমিতির কাজে ব্যবহার করা হয়। পরে বাংলাদেশের শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রচারমূলক  বক্তৃতাদানের ব্যবস্থাও হয় পরিষদের উদ্যোগে। এর কাজে কলকাতার মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ুব, বিচারপতি মাসুদ এবং অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহেদ মাহমুদ খুব সাহায্য করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি করে ও দিলীপ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা এবং বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের নানাভাবে সাহায্য করা। আমি কলকাতা এলে এঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। আলাপক্রমে স্থির হয় যে বাংলাদেশের শিক্ষকদের একটা সংগঠন থাকলে উভয় পক্ষেই কাজের সুবিধা হবে। আমি তখন এই কাজের উদ্যোগ নেই নিই। আনিসুজ্জামানকে আগরতলা থেকে ডেকে পাঠাই এবং কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর দ্বারভাঙ্গা  হলে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের এক সভা আহবান করি। কয়েক হাজার শিক্ষক এই এই সভায় যোগদান করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব কামরুজ্জামানও বক্তৃতা দেন। সভার সভাপতিরুপে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তা পরে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এই সভায় আমাকে সভাপতি ও আনিসুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন  সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ ও জনাব কামরুজ্জামান (এমপি)।

'লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টসিয়া' গঠন করা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কেউ কেউ সরকারকে এমন ধারণা দিয়েছিলেন যে সরকারী যে উদ্যোগের বাইরে যেভাবে আমরা এই পরিষদ গঠন করেছি তাতে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। আমাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন ধারনা করেছিলেন যে সরকার এক ধরনের দলীয় নিয়ন্ত্রণ আমাদের ওপরে আরোপ করতে যাচ্ছেন। শিক্ষক  সমিতি গঠনের পূর্বমুহূর্তেও আবার এ ধরনের একটা ভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমপি ও জনাব কামরুজ্জামান এমপি'র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এক সন্ধ্যায় আমাকে ও আনিসুজ্জামানকে  ডেকে পাঠান। তিনি বলেন যে, আনিসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যুক্ত থাকলে তাঁর কাজে সুবিধা হবে অতএব তাঁকে যেন শিক্ষক সমিতিতে বড় দায়িত্ব না দেয়া হয়। আমিরুল ইসলাম ও একই বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু আমরা আগে থেকে যেভাবে ভেবে এসেছিলাম তার ফলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইনি।  পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল গঠন করলে ডঃ মুজাফফর আহমদ, ডঃ সারোয়ার মুর্শিদ, ডঃ মোশাররফ হোসেন ও ডঃ স্বদেশ বসুর সঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানকে তার সদস্য করা হয় তখন আনিসুজ্জামান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং সেই ভার অর্পিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের  ডঃ অজয় রায়ের ওপরে।

শিক্ষক সমিতির কাজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের সাহায্য করা, শরণার্থী শিবিরে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় চালানো, প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ন করা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন চেয়ে পত্র লেখা ও পুস্তিকা প্রেরণ করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচারাভিযান চালানো।  বহু শিক্ষককে আমরা সহায়ক সমিতির তহবিল থেকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম, শরণার্থী শিবিরে কিছু কিছু বিদ্যালয় খুলে বালক-বালিকাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রাখার ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। কয়েকটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম ইংরেজিতে তার মধ্যে  'পাকিস্তানবাদ ও বাংলাদেশ' সম্পর্কে ওসমান জামালের লেখা একটি পুস্তিকা এবং বাংলাদেশ গণহত্যা সম্পর্কে একটি সচিত্র পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা চিঠি  লিখি এবং আশাব্যঞ্জক ও সমর্থনসূচক উত্তর পাই। অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এল বাসামকে লেখা আমার চিঠি, তিনি আমার অনুমতি নিয়ে সাইক্লোষ্টাইল করে সে দেশের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকলম ফ্রেজারসহ অনেক নেতাকে পাঠান এবং আমাদের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ করেন। আমেরিকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিচিত অধ্যাপকের কাছে লিখা আমার চিঠি মোটামুটি একই ভাবে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে আমরা যে প্রচারাভিযান চালাই, তার প্রথম পর্বের সম্পূর্ণ উদ্যোগ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির। এই সমিতির দিলীপ চক্রবর্তী, সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনিল সরকার (বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্য-সহায়তায় অনিলের গভীর আবেগ নিয়ে জড়িয়ে পড়ার একটি উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এক পর্যায়ে শরণার্থী শিক্ষকরা যখন আর কোথাও আশ্রয়ের স্থান পাচ্ছেন না, তখন তিনি নিজ বাসগৃহ তাঁদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিদিন ভোরে ঐ বাড়িতে এসে রান্নাবান্না ও তাঁদের খাওয়ানোর কাজ সেরে রাত ন’টার পর তাঁর পিতার বাসায় ফিরতেন), ডঃ অনিরুদ্ধ রায় ও বিষ্ণুকান্ত\* শাস্ত্রীকে নিয়ে আমি ও আনিসুজ্জামান এলাহাবাদ, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও দিল্লী সফর করি। এসব শহরের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ছাড়াও আমরা বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ওপর বক্তৃতা দেই। আমাদের সংগে সুবেদ আলী (এম,পি,এ) যোগ দেন। তিনি প্রয়োজনমত উর্দুতে আমার ইংরেজি বক্তৃতার অনুবাদ জনসমাবেশে পেশ করতেন। বিষ্ণুকান্ত বলতেন হিন্দিতে। আনিসও  আমার মতো ইংরেজিতেই  বলতেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আমাকে বক্তৃতা করতে দেয়া হয়। সেখানকার পরিবেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল ছিল না। বক্তৃতা করতে ওঠার আগে সে সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমার বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের অনেকেই কেঁদে ফেলেছিলেন। বক্তৃতা নাকি মর্মস্পর্শী হয়েছিল,  একথা অনেকে বলেছেন।

দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমীর প্রাঙ্গণে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভাষণ দিই এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও দিল্লীতে আমরা বেশ কয়েকটি ঘরোয়া আলোচনায় যোগ দেই।  কলকাতায় আসার পরে ডক্টর বরুণ দের মাধ্যমে  সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমার মনে হয়েছিল, তিনি তখনও আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা অনুভব করতে পারেননি। দিল্লীতে আবার তাঁর সঙ্গে এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসানের সঙ্গে শুধু আমার সাক্ষাৎ হয়। তাছাড়া আমরা অশোক মিত্র ( আই,সি,এস) ,ডঃ আশোক মিত্র  পি, এন, ধর ও পি, এন হাকসারের সঙ্গে আলাপ করি। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করা উচিত, একথা হাকসার বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন।  তাঁর কথা পরে আমরা আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম।।

দিল্লীতে আমরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করি।  তিনি ধৈর্য সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য শোনেন এবং ভারতীয় সরকার ও জনগণের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে আমরা মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারি সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মত বিনিময় করেন। পরে মিসেস গান্ধী ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসানের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। এরপরে প্রতিমন্ত্রী কে, আর গণেশ আমাদের এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। সেখানে ব্রক্ষানন্দ\*রেড্ডী ও নন্দিনী শতপথীর মতো রাজনীতিবিদরা ছিলেন, অনেক সাংবাদিকও ছিলেন। প্রধানত: সাংবাদিকরাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করেন, রাজনীতিবিদেরাও কিছু কিছু প্রশ্ন করেছিলেন।আমার উত্তর দেয়া শেষ হলে আমি কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই।  আমার প্রশ্ন ছিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে, তবে আমি তা সাধারণভাবে উত্থাপন করেছিলাম। ঐ আলোচনা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ছাড়া শরণার্থী সমস্যার সমাধানের যে কোন সম্ভাবনা নেই একথা ভারতীয় নেতারা বোঝেন। তবে তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবছেন। চীন যে পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করবেনা, এ ধারণাও তাঁদের হয়েছে।  মনে হল তবুও তারা ঐ মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে চান না এ বিষয়ে।  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে, এ সম্পর্কে তাঁরা খুবই সন্দিহান।  সুতরাং  ভালো করে আটঘাট না বেঁধে  তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে কিংবা বাংলাদেশের পক্ষে বড় রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চান না।

সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার এবং আমাদের এসব সাক্ষাৎকারের ফলাফল  ও আমার নিজের ধারণা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন কে কলকাতায় এসে জানাই। এরপর আমি পাটনা, বোম্বাই, নাসিক, পুনা, কেরালা, জয়পুর, আজমীর ও হায়দারাবাদে জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাই। পাটনায় যে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাই সে সভায় সভাপতিত্ব করেন জয় প্রকাশ নারায়ণ এবং অন্যান্যর মধ্যে বক্তৃতা দেন বিহার প্রদেশের গভর্নর ডঃ বড়ুয়া।

বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও আমি ছাত্র শিক্ষকদের সমাবেশে বক্তৃতা দিই। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। এখানে বাংলাদেশের দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্যে আনুমানিক ষাট/সত্তর হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। এই সাহায্য  এবং একইভাবে ভারতের বিভিন্ন জনসভায় সংগৃহীত অর্থ আমরা দাতাদের পক্ষ থেকে সরাসরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির তহবিলে জমা দেবার ব্যবস্থা করি। কোন অর্থ আমরা নিজ হাতে গ্রহণ করিনি।  বিহারে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনসমর্থন যোগানোর ব্যাপারে তৎকালীন বিহার সরকারের বিরোধীদলের নেতা কর্পোরী ঠাকুর (পরবর্তীকালে ইনি মূখ্যমন্ত্রী হন) আমাদের সংগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সকল রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের  সঙ্গে ও তাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রী সবচে' কট্টর বিরোধী নেতা রাজ নারায়ণও আমাদের সমর্থনে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার এলাহাবাদ সফরকালে তিনি তার রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেন এবং সমাবেশের তোরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরাট এক প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। দলের কর্মকর্তা আর কর্মীদের আগ্রহে আমি ঐ সমাবেশে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেই। সে সময় ভারতে বাংলাদেশের সমর্থনে এমন একটি জোয়ার এসেছিল যাতে করে সব জায়গায়, এমনকি দুর্গাপূজা মণ্ডপের প্রবেশদ্বারেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টানানো দেখেছি।

বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই)অবস্থান কালে মহারাষ্ট্রের গভর্নর নবাব ইয়ার আলী জংগ এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বাংলাদেশের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশে তিনি উপস্থিত হন এবং আমার বক্তৃতা শোনেন। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তিনি  বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থ, গেরিলাদের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর আমি যখন দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলাম তখন প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে একদিন হঠাৎ নবাব ইয়ার আলী জংগ আমার বাসায় এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে,“বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যের জন্য আমি যে তহবিল খুলেছিলাম তাতে প্রচুর টাকা জমা হয়েছে। যেহেতু এই টাকা আমাদের জনসাধারণ কর্তৃত্ব বাংলাদেশকে দেয়া তাই এটি আপনাকে নিতে হবে”। মহারাষ্ট্রে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। সুতরাং এই বিষয়ে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলি। মহারাষ্ট্রের গভর্নর আমাকে তহবিলের যে চেক প্রদান করেন তা আমি বঙ্গবন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়ে সমপরিমাণ টাকা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতীকী সাহায্য হিসেবে মহারাষ্ট্রের জনগণকে দেবার জন্য পরামর্শ দেই। অতঃপর তাই করা হয়।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সৈয়দ আলী আহসান কে একবার বাঙ্গালোরে এবং মাজহারুল ইসলাম কে কেরালাতে বক্তৃতা দিতে পাঠানো হয়। সৈয়দ আলী আহসান, মাজহারুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান মাঝে মাঝে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। আমিও দুবার অংশ নিয়েছিলাম।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৮ থেকে ২০ তারিখ) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। “ওয়ার্ল্ড মিট অন বাংলাদেশ” নামে এটি পরিচিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জয়প্রকাশ নারয়ণ। সেখানে ২৪ টি দেশের ১৫০ জন প্রতিনিধি সমবেত হন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতারূপে আমি এই সম্মেলনে যোগ দেই। অন্যান্যদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান, মওদুদ আহমদ ও আজিজুর রহমান প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীও এই উপলক্ষে আয়োজিত হয়। আমি তা উদ্বোধন করি। এই সম্মেলন খুব সফল হয় এবং বিশ্ব জনমত গঠনে আনুকূল্যও সৃষ্টি হয়। এই সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে গান্ধী ফাউন্ডেশনের বেশ অবদান আছে। এখানে অমরেশ সেন এর ভূমিকা ও তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। এখানে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালা, অমরেশ সেন এর বাসায় গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে গুর্খাদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেন। সেসময় তিনি ভারতে আশ্রিত ছিলেন বলে তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, একথা তাকে জানাই। তবে তার এই আগ্রহের কথা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ কে জানানোর আশ্বাস দেই। পরবর্তীকালে এই কথা তাজউদ্দীন আহমেদকে জানালে তিনি এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে আশ্রিত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহায়তা নেয়া আমাদের উচিত হবে না।

দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ করেই আমি নিউ ইয়র্ক  এর পথে রওনা হয়ে যাই। বাংলাদেশের জাতিসংঘ  সদর দপ্তরে প্রচারকার্য চালানো ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার তখন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। আমি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। শিক্ষকদের মধ্যে রেহমান সোবহানও ছিলেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে আবদুস সামাদ আজাদ, এ আর সিদ্দিকী, ফণি মজুমদার, সিরাজুল হক আর ছিলেন সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ আসহাবুল হক এবং ফকির সাহবুদ্দীনের মত সংসদ সদস্য। এস এ করিম, আবুল ফাতাহ ও এ, এম, এ মুহিতের মতো বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রাক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ। আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই অবহিত আছেন।

জাতিসংঘের অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি পর্তুগালের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় ও  আমার কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদিন আমি জাতিসংঘ ভবনে পর্তুগীজ দূতের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলাপ করছি,  তাঁকে আমাদের সংগ্রামের পটভূমি বিশদভাবে বুঝাচ্ছি ঠিক সে সময় আমাদের সামনে দিয়ে হলের ভিতরে যাচ্ছেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান, মাহমুদ আলী, রাজিয়া ফয়েজ প্রমুখ। এঁরা যাবার সময় পর্তুগীজ দূত আমাকে আঙ্গুলের ইশারায় বললেন, ঐ দেখুন, আপনাদের প্রতিপক্ষরাও যাচ্ছেন। রাজিয়া ফয়েজ আমার পূর্বপরিচিতা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে আমার কাছে এসে হোটেলে আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন এবং রাত দশটার পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন, বললেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আপনার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ যাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের নেতা হলেন তাজউদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তি। আমি বললাম তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। গণপ্রতিনিধিরা আমার চাইতে বেশী সম্মানের দাবিদার। সব দেশে তাঁরাই সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের বেলায়ও তাই হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা লিপ্ত আছি। কে বেশী সম্মানিত কে কম সম্মানিত এ প্রশ্ন এখানে ওঠে না। তাঁকে আমি বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হবে এবং তা আর বেশীদিন বাকী নেই। বাংলাদেশের গেরিলাদের হাতে প্রতিদিন যত পাক সৈন্য মারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যা পাকিস্তান সরকার গোপন করতে চাইলেও বিদেশী সাংবাদিকরা তাদের হতাহতের যে সংবাদ দিচ্ছেন তাতে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তখন তিনি ও অধিক হারে পাক সৈন্য ক্ষয়ের কথা স্বীকার করলেন। আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করি, আপনার এই শারীরিক অবস্থায় আপনি কিভাবে এসেছেন ? উল্লেখ্য যে তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তিনি জানান, ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের চাপে আমাকে অনিচ্ছা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আসতে হয়েছে। সন্তান ধারণের ৭ মাস অতিবাহনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট  প্রদান করা সত্ত্বেও আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্যদের সঙ্গে যখন তাঁকেও বাংলাদেশের বিরোধিতা করার কারণে জেলে পাঠানো হয়েছিল তখন তাঁর স্বামী ও তাঁর বোন আমার কাছে আসেন তাঁর মুক্তির ব্যাপারে বলার জন্য। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর সম্পর্কে একথার ওপর জোর দিয়ে বলি যে, তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন, অতঃপর অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও জেল থেকে মুক্তি পান।

জাতিসংঘে দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষক, ছাত্রদের সমাবেশ ও জনসভায় বক্তৃতা করি। প্রসংগতঃ উল্লেখ যে,এ সময়ের ১০ বৎসর পূর্বে আমেরিকার এক বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলাম (পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষীণ এশীয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর) এবং তার আগে ও পরে আমেরিকাতে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। এর ফলে ঐ দেশের বহু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ আমার পরিচিত ছিলেন। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে আমার জন্য এ রকম বিশেষ প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।  তবে আই, আর, সি নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও এখানে কিছুটা সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আমার প্রাক্তন ছাত্র জে, আর খান এ- সময়ে আমার সচিবের কাজ করেন। আমি বক্তৃতা দিই নিউইয়র্ক, কলাম্বিয়া, পেনসিলভানিয়া, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে লংবীচ, শিকাগো, বাফেলা, প্রিন্সটন, মিশিগান, নর্থ  ক্যারোলাইন, হার্ভার্ড, বষ্টন, ইয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে আমার কর্মসূচি হতো স্থানীয় রেডিও টিভি সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদান, মধ্যাহ্নের ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সমাবেশে বক্তৃতা দেয়া এবং অপরাহ্নে উন্মুক্ত স্থানে ছাত্র সমাবেশে  বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দিয়ে সমর্থনের আহবান জানানো। উল্লেখ্য যে, এরূপ অনেক ক্ষেত্রে আমার বক্তৃতার পর শ্রোতারা মার্কিন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। সেটি আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি বলে বিবেচিত হতো। আমার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন ডাঃ আসহাবুল হক। তাছাড়া আমার অনুরোধে ও প্রয়োজনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ আসহাবুল হক, সিরাজুল হক প্রত্যেকে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। সংসদ সদস্য সিরাজুল হককে আমি পাঠিয়েছিলাম টেক্সাসে। তিনি বক্তৃতা দিয়ে আসার পরপরই সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা দিতে যান ডক্টর ফাতেমা সাদেক। তারপর সেখানকার বাঙালিরা আমাকে সত্বর টেক্সাসে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতা করার জন্য তাগাদা দেন। আমি ছোট্ট একটি প্রাইভেট বিমানে টেক্সাসে যাই এবং এক ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা দেই। এখানে অনেক পাকিস্তানী ছিলেন যাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরতার নজীরগুলি একের পর এক উল্লেখ করতে থাকি তখনই প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায়। এই সভায় ২/৩  জন আমেরিকানও আমাদের সপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়েছে।

ফিলাডেফিয়াতে গভীর ঔৎসুক্য ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। তার প্রধান কারণ পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকাকালীন আমার যারা ছাত্র বা গুণগ্রাহী ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ এলাকার বিভিন্ন কলেজ শিক্ষক ছিলেন। আমার সময়কার অনেক অধ্যাপকও সেখানে তখন কর্মরত ছিলেন। এসব কারনে বাংলাদেশ লবি ওখানে খুবই শক্তিশালী ছিল। ফলে পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ সেখানে প্রতিবাদকারীরা ঘেরাও করেছিলেন ছোট ছোট স্পীড বোট নিয়ে। এখানে আমার অনেক প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপকদের সংগে দেখা হয় এবং যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যেমন অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন,  অধ্যাপক  হোলডেন ফারভার, রিচার্ড ল্যামবার্ট প্রমুখ। হার্ভার্ড ডক্টর কিসিঞ্জারের এক সহকারী আমার বক্তৃতার পর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে খুব তর্ক করেছিলেন, কিন্তু শ্রোতাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। মার্কিন জনমত তখন বাংলাদেশের অনুকূলেই ছিল, যদিও মার্কিন সরকারের মনোভাব ছিল এর উল্টো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতায় ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লোক উপস্থিত থাকতেন এবং বেতার-টেলিভিশনে তা প্রচারিত হত। তাছাড়া বিভিন্ন শহরে স্থানীয় রেডিও-টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের লোকজন আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কয়েকটি কলেজেও আমি বাংলাদেশ ওপর বক্তৃতা দেই।  
  
সময়সংক্ষেপ করার জন্য আমার যাতায়াত ব্যবস্থা হয় প্রধানত: উড়োজাহাজে।  প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি প্রথমে ফ্যাকাল্টি ক্লাব এবং পরে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে ভাষণ দিই। উড়োজাহাজে ভ্রমণ সূচী এমনভাবে প্রণীত হয় যে,আমি প্রায়  প্রত্যেক দিনই একটা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হতে পেরেছি। এ কর্মসূচী প্রণয়নে জে, আর, খান অত্যন্ত পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন।  এসব অনেক প্রোগ্রামে কুষ্টিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারী ডা: আসহাবুল হক আমার সঙ্গে ছিলেন।

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে কয়েকজন আইনজ্ঞ ও অস্ত্র ব্যবসায়ী গোপনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য পরে পরিশোধ করলেও চলবে বলে তাঁরা আমাকে জানান। তাঁরা আরো প্রস্তাব দেন যে, অনুমতি দেয়া হলে, তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী কারাগার হতে কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। আমার সংশয় ছিল এটি পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের কোন অংশ হতে পারে। যদি তারা তাদের কথায় খাঁটি হয় তাহলেও গোপনভাবে অস্ত্র সরবরাহের সময় অস্ত্র শত্রুর হাতে পড়তে পারে। আর কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে গেলে তাঁর জীবনের ওপরে ঝুঁকি আসার আশংকা অধিক। এসব ভেবে আমি তাদের জানালাম এটি আমার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম দরকার হলে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেবে। এরপর অল্পকালের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এ ব্যাপারে আর অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়নি।

যেসব মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতেন, আমি তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। সিনেটর কেনেডির সঙ্গে আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়েছিল, তবু আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সিনেটর স্যক্সবী ও সিনেটর চার্চের সঙ্গেও বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। স্যাক্সবীর এক ছেলে (স্যাক্সবী জুনিয়র)  আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সফররত অবস্থায় আমার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি ড: ফজলুর রহমান খানেরও শিকাগোতে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে এক বলিষ্ঠ লবির সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের  প্রচার কার্যে তার আর্থিক অবদান ও ছিল বিরাট।  আমি এক রাতের জন্য তাঁর অতিথি ছিলাম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক বন্ধু অধ্যাপক ডিমকও বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রচুর কাজ করেছিলেন।

লংবীচে আমার মনে পরে, একটি সমাবেশে ভাষণ দেবার পর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার বাদক রবি শঙ্কর-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং যে যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন তার একটি রেকর্ড আমাকে উপহার দেন।

বস্টন ও হার্ভার্ডে বিমানবন্দরে আমাকে রিসীভ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন আমাদের কয়েকজন সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তাঁরা আমার সঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ  পরিচিত জনাব খুরশিদ আলম একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ডঃ মহিউদ্দীন আলমগীরও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে জনসমর্থনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানের একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। আমার জন্য তার সযত্ন আতিথ্যের কথাও আমার মনে আছে।

নভেম্বরের শেষের দিকে নিউইয়র্ক থেকে কলকাতায় ফেরার পথে লন্ডনে বাংলাদেশীদের সমাবেশেও আমি বক্তৃতা দেই। সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার  সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেখানে বাঙালিরা যথেষ্ট মনোবল নিয়ে কাজ করছিলেন।  বস্তুত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবং লন্ডনে বাঙালি সমাজের মধ্যে ঐক্যের যে বোধ, সংগ্রামের যে সংকল্প এবং ত্যাগ স্বীকারের যে মনোভাব আমি লক্ষ্য করি, তাতে মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশার সঞ্চার হয়। লন্ডন ছাড়া ব্রিটেনের লিভারপুল,  অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ ইত্যাদি স্থানে এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল।  কিন্তু এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আমরা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবং বাংলাদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাকিস্তান শীঘ্রই ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। পাকিস্তানের পক্ষে এর একটি কৌশলগত ধারণা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিপন্ন করতে পারলে বাংলাদেশ প্রশ্ন চাপা পড়ে যাবে। পরবর্তীকালে নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টোর বক্তৃতা (হাজার বছর ধরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের অঙ্গীকার)  আমার এই ধারনা যে ঠিক ছিল তার প্রমাণ বহন করে। যাহোক, উপমহাদেশে সর্বাত্মক যুদ্ধ  শুরু হয়ে যাবার আসন্ন অবস্থার দরুন আমার উক্ত সফরসূচী বাতিল করে দিল্লী হয়ে আমি কলকাতা ফিরে আসি।

কলকাতায় ফেরার অল্পকাল  মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায় শুরু হয়ে যায়। ঐ সংকট মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার জনসভায় যে বক্তৃতা করেন,তা আমি বেতারে শুনি ঘরে বসে। সত্যি বলতে কি, সে বক্তৃতা শুনে আমি আশাহত হয়েছিলাম। কেননা আমার আশা হয়েছিল যে, ঐ সময় হয়তো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন। তারপর সেই রাতেই আকস্মিকভাবে  ভারতের ওপর পাকিস্তানী হামলার সংবাদ শোনা গেল। এর পরপরই ভারতীয় সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আরো তাড়াতাড়ি এরা ঢাকায় এসে পৌঁছাতে পারছে না কেন। তারপর যেদিন পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের সংবাদ হলো সেদিন দেখলাম বড়দিনের আরো কিছু দেরী আছে। উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ সংকর রায়কে আমি খ্রীষ্টমাসে স্বাধীন বাংলাদেশে আসার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম গত জুন মাসে।

মুক্তিলাভের এই আনন্দ দ্রুত ম্লান হয়ে গেল ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার সংবাদে। আমার কত আপনজনই না দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে অকালে শহীদ হয়েছেন। তবু বারবার নিজেকে বলেছি, এত শহীদ, এত আত্মত্যাগীর মর্যাদা যেন আমরা রক্ষা করতে শিখি স্বাধীন বাংলাদেশে।

দখলদার বাহিনীর আত্নসমর্পনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আমাকে বলেন যে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, ছাত্র-যুবক, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই আপনার প্রত্যক্ষ ছাত্র। তারা আপনার কথা শুনবে। বিজয়ের পর প্রত্যেকে যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেজন্য স্বাধীন বাংলা বেতারে আপনি একটা বক্তৃতা দিন। দালাল, রাজাকার এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণ যারা করেছে বাংলাদেশ সরকার তাদের শাস্তি প্রদান করবে বিশেষ আদালতে। তাজউদ্দিন সাহেবের এই পরামর্শে উপরোক্ত আহবান জানিয়ে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে বক্তৃতা দেই। এরপর আমি যশোরে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভূখণ্ড পরিদর্শন করি। অবশেষে '৭২- এর ৪ ঠা জানুয়ারি আমি সপরিবারে দেশে ফিরে আসি।

-   আজিজুর রহমান মল্লিক  
এপ্রিল, ১৯৮৪



[মেহজাবীন মোস্তফা](https://www.facebook.com/mehjabeen.mostafa?fref=ts)

<**১৫,২,১৪**>

# [আফসার আলী আহমেদ]

-মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেমব্লি-১২, রংপুর-১২

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই। ২৫ শে মার্চের পর আমি ঐক্যবদ্ধভাবে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। আমি নিজ এলাকায় আত্মগোপন করে যুদ্ধ পরিচালনা করি এবং ভারতে যাওয়ার আগে ইপিআর ও পুলিশদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। যুদ্ধে বহু পাক-সেনা নিহত হয়।  
  
২৮শে মার্চ আমি ভারতে চলে যাই এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থান করতে থাকি। তখন জলপাইগুড়ির ডি.সি. আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রেফতার করেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আমাকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তারপর ২৯ শে মার্চ স্কর্ট করে আমাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকার গ্রেফতারকৃত অবস্থায়ই আমাকে দিল্লী পাঠান। সেখানে আমাকে মুক্তভাবে রাখা হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর সাথে দিল্লীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরপর আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং ভারতের দেওয়ানগঞ্জ ক্যাম্পের দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করা হয়।  
  
এপ্রিল-মে মাসের দিকে আমি আনসার এবং পুলিশদের আমার এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি। ই, পি, আর, আনসার এবং পুলিসদের সংগঠিত করে বাংলাদেশের ভেতরে অপারেশনের জন্য পাঠাই। এরূপ বিভিন্ন অভিযানে তাঁরা কৃতকার্য হন এবং বহু দালাল হত্যা করেন।

আমাদের এলাকায় দীর্ঘ নয় মাস অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে পাক-সেনাদের সাথে। প্রায় এক লক্ষ টাকা আমার এলাকা থেকে সংগ্রহ করে আমি বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা দিই।  
  
আমার এলাকায় আনুমানিক দেড় হাজার লোক পাক সেনাদের দ্বারা নিহত হয়। এই হত্যাযজ্ঞে সৈয়দপুরের বিহারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই এলাকায় প্রায় এক হাজার নারীকে নির্যাতন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ২২শে মার্চ তারিখে এই অত্যাচারের হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। পরে বিহারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু লোককে হত্যা করে। সৈয়দপুরে শতকরা ৯৯ ভাগ ঘরবাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুটপাট হয়। উল্লেখ্য যে ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা ও পুড়িয়ে দেয়া এবং লুটপাট করা হয়। সীমান্তে সৈয়দপুরের বিহারীরা ভারতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ট্রেনের মধ্যে আটকিয়ে প্রায় চার শত লোককে হত্যা করে। এই ঘটনাটি ঘটে সৈয়দপুর থেকে এক মাইল দূরে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রজেন্দ্রলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ও তার দুই ছেলেকে আলবদররা হত্যা করে এবং তাঁর দুই মেয়েকেও অপহরণ করে। প্রতিবেশী সালাউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। মাহফুজুর রহমান চৌধুরী নামক একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাকেও তাঁরা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-

আফসার আলী আহমেদ

২৬-১০-৭২দ



[তায়িন উল হক](https://www.facebook.com/taeen)

<**১৫,৩,১৪-১৭**>

# [আব্দুর রাজ্জাক (মুকুল মিয়া)]

১৯৭১ সালের অসযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় হই। ১০-১৫ ই মার্চ থেকে বকুল সাহেবের নেতৃত্বে গোপালপুর জেলা স্কুল মাঠে ছাত্রজনতাকে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং নিজে প্রায় ২০০ জন ছেলের হাতে বাঁশের লাঠি ও ডামি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।  আমি আরোও ৫/৭ জন ছেলে সহ স্থানীয় পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট এর ওয়ার্কশপ থেকে কাঠের বন্দুক তৈরী করে আমাদের ক্যাম্পে সরবারহ করি। বকুল ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব মরহুম বগা মিয়ার (আব্দুর রব) নেতৃত্বে পাবনা শহরে বেশ কয়েকটি জনসভা হয়। হাজার হাজার সরকারি বেসরকারি কর্মচারী ও জনতা উক্ত জনসভায় যোগদান করেন।

২০শে মার্চ জনাব বকুলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং চারজন ছাত্রনেতার উপর চারটা দলের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে বকুল সাহেবের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে পাকবাহিনী পাবনা শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

একটা দলের ভার শহীদ ছিদ্দিকের উপর অর্পণ করা হয় এবং তার দলকে পাঠানো হয় নগরবাড়ি-পাবনা রোডে। একটি দলের ভার আমি নিজে নিয়ে পাবনা-রাজশাহী রোডে থাকি। একটি দলের ভার ইকবালের উপর দেয়া হয় এবং তার দল পাঠানো হয় শালগাড়িয়া রোডে। আর একটি দলের ভার দেয়া হয় বাবুর উপর এবং তাকে পাঠানো হয় পাকশী-পাবনা রোডে। বকুল সাহেব কিছু যোদ্ধা নিয়ে শহরের কন্ট্রোল রুমে থাকেন।   
  
২৩শে মার্চ আমরা সমগ্র পাবনা শহরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। ঐদিন নকশালদের সাথে আমাদের নুরুল খন্দকারের বাড়িতে সংঘর্ষ হয় এবং নকশালেরা পালিয়ে যায়।

২৪শে মার্চ পাকবাহিনী নগরবাড়ী হয়ে পাবনা শহরে প্রবেশ করে। তাদের ভারি হাতিয়ারের সামনে টিকতে পারবেনা বলে আমাদের বাহিনী বাঁধা সৃষ্টি করেনি। পাকবাহিনী পাবনা শহরের প্রতিটি অফিস আদালতে বাংলাদেশের পতাকা দেখে শহরে কার্ফু দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এবং রাতের বেলা অনেক মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এদিকে আমরা কয়েকটি দল যোগাযোগ করে একত্রিত হই এবং ডিসি ও এসপি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে পাক সেনাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমরা শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে জানিয়ে দেই যে আগামীকাল আমরা পাকবাহিনীকে আক্রমণ করব এবং তারা যেন তাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়। ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা ঢাল, সড়কী, ফলা, তীর, ধনুক, রামদা বর্ষা ইত্যাদি নিয়ে ঢোল থালা পিটিয়ে “জয় বাংলা” স্লোগান দিতে দিতে চর আশুতোষপুর এ এসে জমায়েত হয়।

*২৪শে মার্চ* ভোর চার টার সময় পাকবাহিনী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশ বাহিনী পূর্ব হতেই ডিফেন্সে ছিল। পাকনাহিনী আক্রমণ করার সাথে সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

*-(আমাদের হিসেবে এটা ২৫ মার্চ ভোর হবে।)*

২৫শে মার্চ সকাল ৭টার সময় আমরা বকুলের নেতৃত্বে হাজার হাজার জনতাকে নিয়ে “জয় বাংলা” স্লোগান দিতে দিতে শহরে ঢুলে পড়ি এবং পাকবাহিনীকে আক্রমণ করি। তুমুল যুদ্ধ চলছে এর মধ্য দিয়ে হাজার হাজার জনতা রুটি, ডাব, ভাত ইত্যাদি দিয়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্য যোগান দিচ্ছে। “জয় বাংলা” স্লোগান শোনার সাথে সাথে পাকবাহিনী ৪/৫ টি দলে ভাগ হয়ে যায়। পরে একত্রিত হয়ে সিনেমা হলের নিকতে এসে জমায়েত হয়। এদিকে পুলিশ লাইনে পাক সেনাদের একটি দলের ৮/১০ জন নিহত হয়। “বাণী” সিনেমা হলের কাছে আমরা পাকবাহিনীর সদস্যদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে তারা উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করে। সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা এসে তাদের পিটিয়ে হত্যা করে।

পাকসেনাদের ১০/১৫ জনের একটি দল শিল্প এলাকাতে ছিল। তারা উক্ত সংবাদ শোনার সাথে সাথে হাতিয়ার ফেলে রেখে পাবনা থেকে বের হয়ে আরিফপুর গোরস্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জনতা এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে উক্ত গোরস্থান গিয়ে ঘেরাও করে। আতারপর অনেক খোজাখুজির পর কয়েকটি কবর থেকে ৫/৭ জন পাকসেনাকে টেনে বের করে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ৪/৫ জন পাকসেনা গোপালপুর মিলের কাছে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। অতঃপর পাবনা শহর সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এবং আমরা সেখানে আবার বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। সেখানকার অফিস আদালত আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলতে থাকে।  
  
২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশে পাকবাহিনী গণহত্যা শুরু করে। পাবনাতে পাকবাহিনী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আমরা রাজশাহী-পাবনা রোড, পাবনা-ঈশ্বরদী রোড, পাকশী-পাবনা রোডে ১৫/২০ জনের এক একটি দল প্রতিরোধ করার জন্য পাঠাই। আর আমরা বকুলের নেতৃত্বে নগরবাড়ী ঘাটে গিয়ে অবস্থান নেই। আমরা সেখানে দেখতে পাই বগুড়া থেকে ক্যাপ্টেন হুদা ৫০/৬০ জনের একটি ইপিআর ও আর্মি বাহিনী নিয়ে নগরবাড়ীতে পৌঁছেছেন। আমরা তাঁর বাহিনীর সাথে যোগ দেই।

১২ই এপ্রিল পাকবাহিনী বিমান থেকে নগরবাড়ীতে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। ঐ দিন ১০টার সময় ২/৩ টি ফেরি ভর্তি পাকসেনা আরিচা থেকে নগরবাড়ী চলে আসে। এসেই তারা শেলিং করে এবং মেশিনগান থেকে আমাদের দিকে এলোপাথারি গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ২/৩ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর আমরা তাদের ভারী অস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন হুদার নির্দেশে দল তুলে নিয়ে পাবনার দিকে চলে যাই।

পাকবাহিনী নগরবাড়ী প্রবেশ করে। তাদের এক কোম্পানী শাহজাদপুরে চলে আসে আর এক কোম্পানী পাবনার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। পথে কাশিনাথপুরে পাকবাহিনী আমাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে ২/৩ ঘন্টা সংঘর্ষের পর আমরা পাবনা হয়ে মুলাডুলি গিয়ে ডিফেন্স গ্রহণ করি। সেখানে ৩/৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর ৬/৭ জন ইপিআর ও ১০/১৫ জন লোক নিহত হয়।

১৫/১৬ই এপ্রিল আমরা বোনপাড়া যাই। সেখানে পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধে আমাদের ৫/৭ জন ইপিআর শহীদ হন। সেখান থেকে আমরা রাজশাহী জেলার সারদাতে পৌঁছি এবং সেখানকার পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে আমাদের দুই জন মেশিনগান চালক পাকসেনাদের গুলিতে আহত হন। আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে গেলে পাকসেনাদের একটি শেলের কণা এসে আমার বুকের বামপাশে লাগলে আমি আহত হই। তারপর তাদেরকে রেখে কোনরকমে আমার বাহিনীর সাথে রাজশাহী জেলার নওগাঁ গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। প্রায় দেড় মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর কলকাতা চলে যাই। সেখানে গিয়ে বকুল সহ পাবনা জেলার অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হয়। তাদের কে নিয়ে বকুলের নেতৃত্বে আমরা প্রথমে শিকারপুর ক্যাম্প করি। সেখানে ১০/১৫ দিন থাকার পর আমরা কেচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প করি।

সেখানে প্রায় ১৫০ জন ছেলে বকুলের নেতৃত্বে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জুন মাসে ৪৪ জন ছেলেকে নিয়ে মুজিব বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষনের জন্য দেরাদুন যাই। দেরাদুনে সাপ-বিচ্ছুর ব্যাপক প্রকোপ ও নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমরা চাকার্তা চলে যাই। সেখানে আমরা মোট ৪৫ দিন বিভিন্ন প্রকার অশ্ত্রশস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

আগস্ট মাসে ২/৩ তারিখে আমরা জলপাইগুড়ি চলে আসি। সেখানে ৮/১০ দিন থাকার পর জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করি এবং পাবনা পাকশী ব্রিজের নিকটে এসে পাকসেনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে আমরা ভারতে চলে যাই।

১৭ই অগাস্ট আমরা কুষ্টিয়ার বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং সাথিয়া থানার সোনাদহ ব্রীজে রাজাকারদের আক্রমণ করি। এতে ৩ জন রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকারকে জীবিত ধরে নিয়ে আসি। অতঃপর আমরা পাবনা জেলার বোনাইনগর, ফরিদপুর থানায় প্রবেশ করি।   
  
সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সাথিয়া থানা ও রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। সেখানে ১২ জন রাজাকার নিহত হয়। ১১ জনকে ধরে নিয়ে আসি এবং অনেক গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

অক্টোবর মাসে পাকসেনারা দিঘলিয়া, রতনপুরে আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। ৩/৪ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে যে আমাদের আরোও দুটি বাহিনী ছিল তাদেরকে খবর দেয়া হয়। সাথে সাথে তারা এসে তিন দিক থেকে ঘিরে পাকবাহিনী কে আক্রমণ করে। এতে ২৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে আমরা ফরিদপুর চলে যাই।

নভেম্বর মাসে আমরা গাঙ্গাহাটি ব্রিজে রাজাকারদের আক্রমণ করি। সেখানে আমাদের দু’জন যোদ্ধা আহত হয় এবং ছয়জন রাজাকার নিহত হয়। এরপর আমরা বোনাইনগর ফরিদপুর এলাকাতে পোষ্টার লাগিয়ে দেই। তাতে লেখা থাকে, উক্ত মাসের মধ্যে যদি রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে কিছু বলা হবে না। এবং যারা আত্মসমর্পণ করবেন না তাদের ক্ষমা করা হবে না।

এই সংবাদ রাজাকারদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে নভেম্বর মাসের মধ্যে ফরিদপুর থানার সমস্ত রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

১০/১২ ডিসেম্বর আমরা বাঘাবাড়ি ঘাটে পাকসেনাদের আক্রমণ করি এবং আমাদের বিমান বাহিনী বিমান হতে তাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। সেখানে পাকসেনাদের সাথে আমাদের ৪/৫ ঘন্টা যুদ্ধ হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয়।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেই। পার্শ্ববর্তী আরও মুক্তিযোদ্ধারা এসে দেখে যায়। পরদিন সকালে আমরা পাকসেনাদের আক্রমণ করার জন্য বাঘাবাড়ি ঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পাইনি। জানা গেল তারা রাতে তাদের গাড়ি ও হাতিয়ারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাবনার দিকে চলে গেছে। আমরা বাঘাবাড়ি ঘাটে গিয়ে দেখতে পাই ১৫/২০ টি গাড়ি পড়ে আছে এবং অস্ত্রশস্ত্রে আগুন জ্বলছে।   
  
আমরা শাজহাদপুরে ফিরে এসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি এবং বেসরকারি শাসন ব্যবস্থা চালু করি।

স্বাক্ষর/-

মুকুল মিয়া

১৮-১১-৭৩



[তাজমুল আখতার](https://www.facebook.com/tajmul42?fref=ts)

<**১৫,৪,১৭-২৪**>

# [এ, কে খন্দকার]

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জেনারেল ইয়াহিয়া এক পর্যায়ে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলেও অবিহিত করেন। সেই পরিস্থিতিতে ২৩শে মার্চ মহাসমারোহে ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তখন আমি ঢাকায় কর্মরত পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। সুতরাং সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর প্যারেড অধিনায়কত্ব করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিন জোনাল আর্মী হেডকোয়ার্টারস (বর্তমান এয়ার হেডকোয়ার্টার) থেকে জনৈক কর্নেল আমাকে ফোন করে জানালেন যে, ২৩শে মার্চের পরিকল্পিত প্যারেড বাতিল করা হয়েছে। প্যারেড বাতিলের সিদ্ধান্তের আকস্মিকতায় বিস্মিত হলাম। প্রায় সাথে সাথেই বিগ্রেড হেডকোয়ার্টার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দেখি ডজনখানেক পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার আলোচনারত। আমার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে একটা অপ্রস্তুত ও কিছুটা বিরুপ ভাবের সঞ্চার করলো। তাঁদের এ মনোভাব বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমি বিশেষ আর কোন আলোচনা না করে ফিরে এলাম।

১লা মার্চ। শাহীন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমডোর মাসুদের সভাপতিত্ব করার কথা। আগে দেখেছি এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি সবসময় ছিলো সাগ্রহ। কিন্তু সেদিন দেখলাম ব্যাতিক্রম। এয়ার কমোডোর আমাকে বললেন, আমি যেন তাঁর পরিবর্তে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি। দুপুর একটায় জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী ৩রা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলেন। বিদ্যুৎ গতিতে ঢাকার চেহারা পাল্টে গেলো। চারিদিকে বিক্ষোভ। শাহীন স্কুল প্রাঙ্গন থেকেই দেখলাম বিক্ষব্ধ জনতার এক বিশাল মিছিল অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে শ্লোগান দিতে দিতে মহাখালী থেকে শহরাভিমুখে ধাবমান।

ঘটনা দুটো উল্লেখ করলাম এজন্য যে এগুলো থেকে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, ১লা মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়ার পরিষদ অধিবেশন স্থগিত কোন আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঘোষণার প্রস্তুতি আগে থেকেই চলছিল এবং একারনেই এয়ার কমডোর মাসুদ আমাকে পুরস্কার বিতরণী সভার দায়িত্ব দিয়ে নিজে ইয়াহিয়ার ঘোষনা পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই লক্ষ্য করলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান বোয়িং ভর্তি সৈন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে। তাদের সাথে আর্মীর স্পেশাল কমান্ডো সেনারাও আসছে এবং তাঁদের ব্যাগ ব্যাগেজ নামছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা দেশের দু’অংশের মধ্যে সৈণ্য বদলী ও যাতায়াতের একটা সাধারণ ঘটনা না।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই পরিস্কারভাবে অনুভব করলাম যে আমাকে গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। উপরমহল থেকে এ ধরনের আচরণ অপ্রত্যাশিত হলেও এর কারন আমার নিকট অবোধগম্য ছিল না।

সারা পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রতিবাদমূখর। মানুষ তাঁদের নিজ নিজ পন্থায় এ অন্যায়ের মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখলাম ইকবাল হলের ছাত্ররা কয়েকটি মাত্র ৩০৩ রাইফেল নিয়ে নিজেদের তৈরি করছে শত্রুর মোকাবেলার জন্য। এঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁদের প্রস্তুতির ধরন দেখে মনে হলো, কত বড় শত্রুর মোকাবেলা তাঁরা করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারনা পর্যন্ত তাঁদের নেই। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা নিয়মিত বাহিনীর মোকাবেলায় ৩০৩ রাইফেল নিয়ে বেসামরিক লোকেদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব! কিন্তু তবু সেদিন আমি ওদের প্রানের আবেগ আর চিত্তের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের কথা সে সময় আমি ভেবেছি। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ নেবার আগে রাজনৈতিক অনুমোদন সমীচীন মনে হওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একটা কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। এই সূত্রে দু’জন আওয়ামী লীগ এমপি আমার বাসায় আসেন। আমি তাদেরকে বললাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈণ্যদের তৎপরতা ও প্রস্তুতি দেখে আমার ধারনা হচ্ছে, তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এ অবস্থায় কি করনীয় জানতে চাইলাম এবং তাঁদের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে পার্টির নেতাদের মনোভাব জানবার ইচ্ছাও তাঁদের নিকট ব্যক্ত করলাম। সে মূহুর্তে তাঁরা আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছুই বলতে পারেননি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে এয়ারপোর্টে যাই। দেখলাম অতিগোপনে সতর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি বিমানে মাত্র একজন কিংবা দুজন যাত্রীসহ জেনারেল ইয়াহিয়া করাচীর উদ্দ্যেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। আমি এই সংবাদ টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে জানিয়ে দেই। আমার মনে আছে,এয়ারপোর্ট থেকেই আমি ক্যান্টনমেন্ট এয়ারফোর্সের সব বাঙালি অফিসারদের খবর দেয়ার চেষ্টা করেছি। পরে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁদের আবার খবরটা বিস্তারিত দিই। বলেছি, পরিস্থিত গুরুতর, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি তাঁদের সবাইকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে বলি এবং আমার পরিবারকে ক্যান্টনমেন্টে বাহিরে পাঠিয়ে দিই।

রাত এগারোটার দিকে কানে আসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের আওয়াজ । পায়ের আওয়াজের পরপরই ট্যাঙ্ক চোলাড় শব্দ । বুঝতে পারলাম যা একদিন আশঙ্কা করেছিলাম তা বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে । রাতভর সারা শহরজুরে যে তান্ডব চলছিল, আগুনের আলোতে এবং গুলির আওয়াজে ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা মোটামোটি ধারণা হচ্ছিল । কিন্তু তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর রূপটা যে কল্পনার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে , না দেখা পর্যন্ত সেটা সঠিক বোঝা যায় নি। ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাতের ভেতরেই জনসাধারণ জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে এসব ব্যারিকেড কোন বাধাই ছিল না।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এয়ারফোর্স মেসে গেলাম। মেসের যে পাশে পুকুরপাড় তা পূর্ব দিক থেকেই নাখালপাড়া এলাকা শুরু।এটা অত্যন্ত গরীব ও নিম্নবিত্তদের এলাকা। কিছুক্ষনের মধ্যেই দেখলাম পাক-বাহিনীর লোকেরা অগ্নিসংযোগকারী যন্ত্র দিয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলছে এবং তাঁদের সাথে মেশিনধারী সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে।

অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম সারা এলাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আতঙ্কগ্রস্থ অসহায় মানুষ প্রানের ভয়ে আর্তচিৎকার করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। সারা শহরে তখন কার্ফু। এরা কার্ফু ভঙ্গ করেছে এই অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনধারী সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালাল।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের মাঝে একটা ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে এই সব গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকেরাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি- সুতরাং এদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। মেসে জনৈক পাকিস্তানী লেফটেন্যান্ট যিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং জানতেন যে, আমি একজন বাঙালি গ্রুপ ক্যাপ্টেন, আমার সামনে মন্তব্য করলেন, “এটাই জারজদের সাথে সঠিক ব্যবহার”

এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীতে কিভাবে যোগদান করা যায় সে কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু কিভাবে যাবো? আমার বাসায় কয়েকজন গার্ড নিয়োগ করা হয়েছিলো নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল আমার গতিবিধির উপর নজর রাখা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ ত্যাগের ব্যাপারে আমি অন্যান্য বাঙালি অফিসার, বিশেষ করে বৈমানিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি। তখনকার উইং কমান্ডার বাশারের সাথেও আমি যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি।

আলাপ-আলোচনার পর আমরা এয়ারফোর্সের কতিপয় অফিসার চুড়ান্ত স্বিদ্ধান্ত নিই যে যেমন করেই হোক পাক বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে। আমাদের এই স্বিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে আলোচনায় বসতাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে একদিন একযোগে সবাই পাক বাহিনী ত্যাগ করবো না। করলে তাতে ধরা পড়লে সবারই একসাথে ধরা পড়ার সম্ভবনা। সিদ্ধান্ত হল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের প্রথমে সীমান্ত অতিক্রমের বিভিন্ন পথ আগে সরেজমিনে জরিপ করে আসবেন এবং তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে সীমান্ত অতিক্রম করবো । কথামতো নুরুল কাদের খবর নিতে যান। কিন্তু কাজ শেষে ফিরে আসার সময় তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে অবশ্য নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি মুক্তি পেয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং আমাদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্যান্য অফিসারদের সাথে মিলে দেশ ত্যাগের এই চুড়ান্ত স্বিদ্ধান্ত নেবার আগে ২৮শে মার্চ আমি এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেই। বেড়াতে যাবার কথা বলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ নিজের গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ডেমরা ঘাট পর্যন্ত গিয়ে গাড়িটি চাবিসহ ফেলে রেখে অনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে বের হই। ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট মারগুব পরে (বাংলাদেশ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান) আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিই পথ দেখিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ।

কিন্তু আমাদের প্রথম প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। ভাড়া করা লঞ্চ নিয়ে কিছুদূর যাবার পর নদীতে অল্প পানিতে আটকে পড়ি এবং শেষ পর্যন্ত ভৈরব বাজারের কাছ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হই।

এপ্রিল মাসের ১০ কি ১১ তারিখে রাজশাহী সীমান্ত অতিক্রমে লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন মিলে আবার ঢাকা ত্যাগ করি কিন্তু আরিচা এসে পাক বাহিনীর সমাবেশ দেখে আবার ঢাকা ফিরে আসি।

সীমান্ত অতিক্রমের পরবর্তী চেষ্টা চালাই ১০ই মে। এবার লক্ষ্য ছিলো কুমিল্লার পথে সীমান্ত অতিক্রম করা। নবীনগর পর্যন্ত গিয়ে পাক বাহিনীর সমাবেশ দেখে ফিরে আসি এবং নরসিংদীর কাছে এক জুট মিলের রেস্ট হাউজে আশ্রয় নেই। মিলের ম্যানেজার ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা এবং তিনিও আমাদের সাথে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের একজন ছিলেন।

১২ই মে রাতে কুমিল্লার কালির বাজারে জনৈক কৃষকের বাড়ীতে রাত কাটানোর স্মৃতি আমার স্মরণে এখনো অম্লান। কৃষকটির বাড়িতে আমরা বেশ কয়েকটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলাম। রাত ২/৩ টার দিকে হঠাৎ দরজায় করাঘাত। পাক সেনা হবে ভেবে কেউ কেউ দরজা খুলতে দ্বিধা করছিলেন। বললাম, পাক সেনারা এসে থাকলে দরজা না খুললেও তারা ভেঙ্গে ঢুকবে। যারা দ্বিধা করছিলেন তারাও একমত হলেন যে, দরজা খোলাই সংগত। দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী স্বয়ং। তিনি আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের খাবারের দাওয়াত দিতে এসেছেন। দরিদ্র কৃষকের বাড়ী। এতো রাতে এতো গুলো লোকের জন্য এত ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত। একদিকে আমরা যেমন বিব্রতবোধ করছিলাম অন্যদিকে তেমনি এই গ্রাম্য কৃষকের আন্তরিকতায় অভিভূত হই। পরে জেনেছিলাম যে আমাদের আশ্রয়দানের অপরাধে আমরা চলে যাবার পর পাকসেনারা উক্ত কৃষকের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

আমাদের আশ্রয়দাতা উক্ত কৃষক ও স্থানীয় অন্যান্য কতিপয় লোকের সহায়তায় পরদিন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে মতিনগর বিএসঅএফ ক্যাম্পে উপস্থিত হই। এখানে ক্যাপ্টেন আবুর সাথে আমার প্রথম দেখা । তিনি পরে মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হন ।

আমাদের প্রায় সাথে সাথে বিমান বাহিনীর প্রায় তিনশত জুনিয়র টেকনিশিয়ান ভারতে যায়। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিমান বাহিনীর যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলো তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য তা করেছিলেন। তাঁদের বেশীরভাগের সামনেই দেশে তেমন কোন বিপদ ছিল না। বিমান বাহিনীর যারা ভারতে গিয়েছিলেন একাত্তরে তাঁদের সামনে অন্যান্য পথ খোলা ছিল। তাঁদের ভারতে যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তাহলো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

আগরতলা পৌছেই আমি মেজর খালেদ মোশররফ, মেজর শওকত আলী প্রমূখের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরদিন জেনারেল কলকাত সিং এবং আমি মেজর শাফায়েত জামিলসহ কোলকাতায় যাই। ওখানে পৌঁছে আমি কর্নেল ওসমানীর (পরে জেনারেল) সঙ্গে সাক্ষাত করি। কোলকাতায় তাঁর সঙ্গে দুইদিন থাকার পর তিনি আমাকে উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমি তখন ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনৈক পদস্থ কর্মকর্তার সাথে দিল্লি যাই। ইতিমধ্যে আমার সাথে যেসব অফিসার সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন তাঁরাও দিল্লী এসে পৌঁছান।

দিল্লী থেকে কোলকাতা ফেরার পর কর্নেল ওসমানী আমাকে জানালেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে সরকারের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেছেন। সংসদ সদস্য কর্নেল(অবসরপ্রাপ্ত) রবকে রাজনৈতিক কারনে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। একজন এমপি হিসেবে কর্নেল রব আগরতলায় মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। ফলে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বেশীরভাগ দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়। হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কোণ শক্তিশালী মাধ্যম না থাকায় আমরা ভারতীয় সেক্টরগুলোর সহায়তায় যোগাযোগ রক্ষা করতাম। কমান্ডার ইন চীফ এর তরফ থেকে সেক্টর কমান্ডার দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। পরে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেক্টর কমান্ডারই নির্ধারণ করতেন কোন দায়িত্ব তিনি কেমন করে সম্পন্ন করবেন। সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করার ফলে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা অধিকতর সমন্বয় সাধনে সক্ষম হই।

ডেপুটি চীফ অব স্টাফ হিসেবে ট্রেনিং ও অপারেশনের দায়িত্ব ছিল আমার। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যে সব যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতো তাঁদের জন্য বর্ডার এলাকাতেই ক্যাম্প খোলা হয়েছিলো। এইসব যুবক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করা হত। এই রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সাংসদদের ভূমিকাই ছিলো অগ্রণী এবং মূলত তারাই নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করতেন।

আমি বিশ্বাস করতাম যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে সকলের সমান অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারটিকে সকল প্রকার দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা প্রয়োজন। এ জন্যই দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষের মধ্য থেকে আমি মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের চেষ্টা করেছি।

মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের ব্যাপারে পেশাদারী মনোভাবের প্রয়োজন ছিল। যুবকদের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা, মনোবল, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলী নিয়োগ লাভের মানদন্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নতর নীতি অনুসৃত হওয়ায় কিছু কিছু অনভিপ্রেত ফল পরিলক্ষিত হয়। আমি ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি জনমতের সদস্যদের সাথে বহুবার আলোচনায় মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সকল প্রকার কোন্দলের উর্ধ্বে রেখে সবাইকে মিলেমিশে একাত্ব হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছি। রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আমি কর্নেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করতাম এসব বিষয় নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর ‘মুজিব বাহিনী’’ নামে একটা আলাদা সশস্ত্র গ্রুপ গঠনের কথা আমি জানতে পারি। কর্নেল ওসমানি আলাদা নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই বাহিনী গঠনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর আমিও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে সকল শক্তি ও সম্পদ একই লক্ষ্যে এবং একই কমান্ডে সমন্বিত হওয়া উচিৎ এবং এটাই আমরা চেয়েছিলাম। একজন রাজনীতি নিরেপক্ষ ব্যাক্তি হিসেবে আমি অনুভব করতাম যে মুক্তিযুদ্ধ কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম নয়- এটা একটা জাতীয় জনযুদ্ধ।

একাত্তরের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়- এগুলোকে ‘জেড ফোর্স, এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’ নামে অভিহিত করা হয়। এগুলো গঠন করার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণের ফলে পাক বাহিনী যখন দুর্বল ও হতোদ্যম হয়ে পড়বে তখন এই ব্যাটালিয়নগুলোর দ্বারা চূড়ান্ত আঘাত হেনে বাংলাদেশের একটা উল্ল্যেখযোগ্য পরিমান এলাকা সম্পূর্নরূপে শত্রুমুক্ত করা হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐ এলাকা থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও যুদ্ধ দুই-ই চালিয়ে যাওয়া হবে।

এই ব্যাটালিয়নগুলো সেনাবাহিনী, বিডিয়ার এবং পুলিশ বাহিনীর যে সব নিয়মিত সৈনিক মুক্তিবাহিনীতে ছিলো তাঁদের ভেতর থেকে গুণাগুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নে নেয়ার পর নিয়মিত বাহিনীর বাদবাকী সদস্যদের নিয়ে সেক্টর ট্রুপস গঠন করা হয়। ব্যাটালিয়ন ও সেক্টর ট্রুপসের সদস্যরাই সাধারণভাবে ‘ ‘মুক্তিফৌজ’ নামে অভিহিত হত। বাকী সকল নিয়মিত ও অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধাদের ‘মুক্তিযোদ্ধা’ বা ‘ফ্রিডম ফাইটার’ নামে অভিহিত করা হয়।

ব্যাটালিয়ন ও সেক্টর ট্রুপস গঠন করার ফলে এই বাহিনীর বাইরে একান্তভাবে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাবার জন্য যারা রয়ে গেলেন তাদের বেশীরভাগই ছিলেন অপেশাদার, অনভিজ্ঞ ও অতি সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে গেরিলাদের ছোট ছোট গ্রুপগুলিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের অসুবিধা হয়ে পড়ে। এছাড়া ভারতীয় বাহিনী যে পরিমান অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতো, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল একান্তই অপ্রতুল। ফলে সাময়িকভাবে গেরিলা বাহিনীর কার্যকারিতা বেশ কিছুটা হ্রাস পায়।

গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব এবং পরে উদ্ভুত এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একটা কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কর্নেল ওসমানীর অনুমতি নিয়ে আমি যে প্লান তৈরী করি তাতে যুদ্ধ পরিচালনায় একটা দক্ষ কমান্ড গঠন, মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ নীতি অবলম্বন প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের উন্নতি এবং সমন্বয় ও যোগাযোগের ব্যপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যপারে সুপারিশ করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারে এক কেবিনেট মিটিং এ জেনারেল অরোরা ও ডিপি ধরসহ বহু শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের দাবী জানানো হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগীতা দানের পূর্বশর্ত হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় চরিত্র আরোপ এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরার পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিণীর তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। একটা স্বাধীন দেশের পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আমরা তখন বাংলাদেশের বিমান বাহিনী গড়ে তোলার কথাও চিন্তা করি। বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হচ্ছিল। আমি বিমানবাহিনী গঠনের ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ও কর্নেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করি। এই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে পরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের উপস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব মি কে বি লাল এবং বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল দেওয়ানের সাথে আমার আলোচনা হয়। তাঁরা বললেন যে, আমাদের বৈমানিকদের ভারতীয় স্কোয়াড্রনের সাথেই অপারেট করতে হবে এবং স্বভাবতই ভারতীয় নিয়মকানুন আমাদের ওপর প্রযোজ্য হবে। আমি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বিকল্প হিসেবে আমাদেরকে বিমান এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানে অনুরোধ জানাই যাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, তাঁর নিজস্ব পৃথক সত্ত্বা নিয়ে অপারেট করতে পারে কারন আমাদের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বৈমানিক ও টেকনিশিয়ানের কোন অভাব ছিল না।

এর কিছুদিন পর ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল পি সি লালের সাথে আবার আমার এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় বিমান থেকে অটার এয়ারক্রাফট , হেলিকপ্টার এবং ডাকোটা বিমান পাই। এই বিমানগুলো নিয়েই সম্পূর্নভাবে আমাদের নিজস্ব পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর বিমান ঘাঁটিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। সে সময় উইং কমান্ডার ৬ নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের ৪ এবং ৫ নং সেক্টরে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিলেন। এরা ছাড়া বাকি সকল বৈমানিক বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত থাকে।

স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ (বর্তমান বিমান বাহিনীর প্রধান) তখন ১ নং সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে সেখান থেকে ডিমাপুর নিয়ে আসি এবং বিমান বাহিনীর প্রশাসনিক ও ‘অপারেশন’ এর দায়িত্ব তাঁর ওপর দিই।

-এখানে বর্তমান বলতে ১৯৮৪ সালের কথা বুঝানো হচ্ছে। এ, কে খোন্দকার সে সময়েই সাক্ষাৎকারটা দিয়েছিলেন।

৬) যেহেতু আমাদের সম্পদ ও জনবল খুবই সীমিত ছিল সেহেতু বিমান যুদ্ধের কৌশল হিসেবে আমরা দুটো পন্থা অবলম্বন । প্রথমত কেবলমাত্র রাতের বেলায় অপারেশন পরিচালন করা এবং দ্বিতীয়ত আমরা যাতে পাকবাহিনীর রাডারে ধরা না পড়ি, সেজন্য খুব নীচু দিয়ে উড্ডয়ন করা।

নাগাল্যান্ড এক বিস্তীর্ন জংগলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকা। সুতরাং লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে আমাদের নিয়মিত অনুশীলন করা খুবই অসুবিধাজনক ছিলো। তাই একটা পাহাড়ের উপর সাদা প্যারাসুট ফেলে সেটাকে লক্ষ্যবস্তু ধরে আমরা অনুশীলনের ব্যবস্থা করি যাতে রাতের বেলায়ও দেখা যায়।

৩রা ডিসেম্বর সর্বাত্বক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী চট্টগ্রামো গোদানাইলে প্রথম আঘাত হানে এবং পাক বাহিনীর মারাত্বক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটই চিফ অব স্টাফ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । আমরা তরুণেরা প্রায় বিনা অস্ত্রে অথবা অতি সাধারন অস্ত্র নিয়ে কেমন করে অতি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনীর সাথে অসীম সাহস নিয়ে মোকাবেলা করেছিল এবং কেমন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তার বহু ছোট ছোট ঘটনা আজো আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে এখানে আমি বহু ঘটনা থেকে একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি ।

যুদ্ধ চলাকালে পাক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রসামগ্রী বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা চট্রগ্রাম ও চালনা বন্দরকে অকেজো করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা নিই । আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে , যদি নৌ-কমান্ডো পাঠিয়ে পাকিস্তানী বা তাদের মিত্রদের কিছুসংখ্যক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারি তবে এতে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে । ডুবে যাওয়া জাহাজ একদিকে বন্দরের প্রবেশপথকে বন্ধ করে দেবে এবং মানসিক দিক থেকেও অন্য কোন জাহাজ সে পথে যেতে সাহসী হবে না ।

একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জুন মাস থেকে প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে নৌ-কমাণ্ডোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । এই পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৩/১৪ বছর বয়সের একটি কিশোর ডুব-সাঁতার দিয়ে চালনা বন্দরের একটি পাকিস্তানী জাহাজে মাইন ফিট করতে যায় কিন্তু ভ্রান্তিবশত সে একটি চায়নিজ জাহাজের কাছে চলে যায় এবং ওদের হাতে ধরা পড়ে । পরে বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা তাকে মুক্তি দেয় । ফিরে এসে অবলীলায় সে তার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার বর্ণ্না দিয়েছিল সবার কাছে । মুক্তিপাগল এই কিশোরের সাহস, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত সেদিন আমরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম ।এই ঘটনা একটা একক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়-এ রকম হাজার হাজার নজীর সেদিন আমাদের ছেলেরা স্থাপন করেছে ।

মে মাসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর আমার একটা পরিষ্কার ধারনা হয়েছিলো যে, ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দেশ পুরোপুরি শত্রু মুক্ত হবে। আমার এই ধারনার পেছনে প্রধানতঃ তিনটি কারন ছিল।

প্রথমতঃ যে বিপুল পরিমান শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো তাঁরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যত শীঘ্র এর একটা সমাধানের পথ বের করার জন্য ভারত উদগ্রীব হবে।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করে দেয়ার যে কামনা ভারতের ছিলো তাঁকে সফল করে তোলার এটাই ছিলো সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সুতরাং ভারত এ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করবে।

তৃতীয়তঃ ভারত এটা বুঝতে পেরেছিল যে, বাইরের বিশেষ করে চীনের তরফ থেকে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং যুদ্ধে যদি ভারতকে নামতেই হয় তাহলে এমন একটা সময় বেছে নিতে হবে যাতে চীনের পক্ষে যুদ্ধে অসম্ভব হয়ে পড়ে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারত-চীন এলাকায় প্রচন্ড শীত ও তুষারপাতের ফলে চীনা সৈন্যদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেয়ার ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

কেবল ভারতীয় সাহায্যের কথা চিন্তা করেই আমি এ ধারনা পোষন করিনি। ইতিমধ্যে দেশের জনসাধারণের অকুন্ঠ সমর্থন ও সহযোগীতা পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি শত্রুকে চরম আঘাত হানার শক্তিও তাঁদের দিন দিন বৃদ

অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণে এবং দেশের ভেতরে কোটি কোটি বৈরীভাবাপন্ন মানুষের সহযোগিতা ও প্রতিরোধ পাকবাহিনীকে সম্পূর্নরূপে হতোদ্যম ও পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল । অবশেষে আমাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত সময়, শত্রুর পূর্ন আত্নসমর্পণের সময় ঘনিয়ে এল । ১৬ ই ডিসেম্বরের সকাল বেলা । পাক-বাহিনীর আত্নসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে এসে গেছে । এমন সময় খবর পেলাম বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ কেবিনেটের বসেছে এবং আমাকে ওখানে জরুরী কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য খোঁজ করা হচ্ছে । কর্নেল ওসমানী তখন সীমান্তের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনের জন্য সিলেটে ছিলেন । সুতরাং সেই অল্প সময়ে তার সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ।

আমাকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন জানালেন , যে বিকেলে ঢাকায় পাকবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্নসমর্পণ করবে এবং কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হওয়ায় উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে । তদনুসারে জেনারেল অরোরার সঙ্গে বিমানে আগরতলা , এবং ওখান থেকে হেলিকাপ্টারে ঢাকা এসে পৌঁছালাম । জেনারেল অরোরা ছিলেন সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডার।

আত্নসমর্পণের দলিলে কেবলমাত্র দুই জনের স্বাক্ষর দানের ব্যবস্থা ছিল- একজন পাক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান এবং অন্যজন ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক।

অনুষ্ঠানে পাক-বাহিনী প্রধান বিষন্ন, ভগ্নপ্রায় ও অশ্রুসিক্ত জেনারেল নিয়াজীকে দেখলাম। যথাসময়ে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে গেল । চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের।

আব্দুল করিম খন্দকার (এয়ার ভাইস মার্শাল, অবসরপ্রাপ্ত ) আগষ্ট, ১৯৮৪



[মেহজাবিন মোস্তফা](https://www.facebook.com/mehjabeen.mostafa?fref=ts) ও [সামিউল হাসান প্রান্ত](https://www.facebook.com/samiulhasan.pranto?fref=ts)

<**১৫,৫,২৫-৩৫**>

# [আবদুল খালেক]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ পঞ্চম খন্ড

আবদুল খালেক

ঊনিশশত সত্তুরের মার্চ মাসে আমি সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল ছিলাম। অনেক আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তানকে কোনঠাসা করে রাখার ঘটনাবলী আমার চেতনায় আঘাত দিয়েছিল। লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা আমি মেনে নিতে পারিনি। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও খাজা নাজিম উদ্দিন যে সকল কথা বলেছেন, তাতে উর্দুভাষার প্রতি আমার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেও আমার মনোভঙ্গির কোন পরিবর্ত ঘটাইনি, উর্দুভাষা শেখার চেষ্টা করিনি যদিও পুলিশ বিভাগের উর্দুভাষার প্রচলন উর্দুভাষা শেখার চেষ্টা করিনি যদিও পুলিশ বিভাগের উর্দুভাষার প্রচলন ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংখ্যাসাম্য নীতি এবং ১৯৫৮ সালের সামরিকবাদকে আমি মোটেও সমর্থন করিনি। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করাকে আমি নিছক বর্বরতা বলে গণ্য করেছি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি, ২১শে ফেব্রুয়ারী-রক্তস্নাত পূর্ববঙ্গে যারা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, তারা আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ।

১৯৬৯ সালের সামরিক কর্তাদের আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে পুলিশি তল্রাশি চালানো হয়। উক্ত তল্লাশির বিরোধিতা করে কিছু কথা বলার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ আমার উপর ক্ষেপে যায়। ঐ বছর ঢাকা বিভাগের ডিআইজি থাকাকালে প্রায় সময় সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটতো। প্রশাসনের সঙ্গে মতবিরোধ অনেক আগেও হয়েছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আমি নিরপেক্ষ থেকে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সে সময় আমার উপর কড়া নজর রাখা হতো। ১৯৬৯-এরশেষ ভাগে ঢাকার জনসাধারণ মওলানা মওদুদীকে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিতে দেয়নি। গোলমালের দায়ে ঢাকার পুলিশ সুপার মামুন মাহমুদ (শহীদ) কে ময়মনসিংহে বদলি করা হয় এবং তার পদোন্নতি ছয় মাস পিছিয়ে দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ঘোরতর আপত্তি জানালে মাস তিনেক পরে আমাকে ঢাকা থেকে সারদায় বদলি করা হয়। কিন্ত ঢাকার ঝামেলা থেকে সরে গিয়ে আমি খুব খুশী হই।

১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল আমি লন্ডনে বসে শুনতে পাই। পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তারা হতবাক। দু’চার জনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি যে, ফলাফল কার্যকর হতে দেয়া হবে না। দেশে ফিরে মুজিবুর রহমান সাহেবকে এ কথা বলতে তিনি তা হেসে উড়িয়ে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ১৯৭১-‌এর জানুয়ারী মাস থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করতে শুরু করেছিল। ৭ ই মার্চের ঘোষণা ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আসন্ন সামরিক আঘাতের মোকাবেলা করার কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি আমাদের ছিল কি না জানি না। আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সংলাপের রাজনীতিতে উঠেপড়ে লেগেছিল। সামরিক কর্মকর্তারা বহু দেশে সংলাপের নামে রাজনীতিবিদদেরকে বোকা সাজিয়েছে এ খবর হয়ত বা তাদের জানা ছিল না। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সারদা একাডেমিতে কর্মরত ও প্রশিক্ষণরত কয়েকশত পুলিশ খুব অস্থির হয়ে উঠে। দেশে আসন্ন সামরিক পরিস্থিতে তারা জীবন দিবে-এই প্রতিশ্রুতি রেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ দল নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। একাডেমির স্টাফকে সে সময় স্থানীয় লোকজনদেরকে গুলিবন্দুক বিষয়ক প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা হয়। সারদা একাডেমির খবর পেয়ে রাজশাহীতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মামুন মাহমুদ (শহীদ)-এর কথা আগেই বলেছি তিনি তখন ময়মনসিংহ থেকে বদলী হয়ে রাজশাহীর ডিআইজি। পুলিশ সুপার শাহ আবদুল মজিদ (শহীদ) মাত্র মাস দু’এক আগে সারদা থেকে রাজশাহীতে বদলী হন। সারদা ও রাজশাহী পুলিশ লাইনে তখন পরিখা তৈরী করা হয় এবং পুলিশের নেতৃত্বে বিবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। রাস্তাঘাট কেটে সামরিক যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

২৩শে মার্চ সারদা একাডেমীতে পাকিস্তানের পতাকা ওঠানো হয় নি। এ খবর পেয়ে রাজশাহী গ্যারিসনের লোকজন এমনকি জেলা প্রশাসনের কেউ কেউ সারদা এসেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে সারদায় কালো পতাকা ওঠানো হয় এবং পাকিস্তানি পতাকা নিশ্চিহ্ন করা হয়। গ্যারিসনের ধারেকাছেই আমরা এতোকিছু করে যাচ্ছি অথচ তখন আমাদের কোনো ভয়ভীতি ছিল না।

২৬শে মার্চের সকালে খবর পেলাম যে ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযানে রাজারবাগ পুলিশলাইন, পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ ও ইপিআর লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। এসব খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্ত্রাগারের তালা খুলে দেওয়া হয়। সারদা একাডেমীর পুলিশ পরিবারগুলো কোনো দিকে সরে যেতে পারে নি। কেননা স্থানীয় লোকজন কাউকে সেই অঞ্চল ছেড়ে যেতে দিচ্ছিলো না। সামরিক যানবাহন চলাচলের প্রতিবন্ধকতা আগে থেকে তৈরি করা হয়েছিলো। সরকারি আদেশে পদ্মায় নৌকা চলাচল বন্ধ। কাজেই সারদায় বসেই প্রতিরক্ষা/প্রতিরোধের জন্য তৈরি হওয়াই ছিল আমাদের একমাত্র উপায় ও লক্ষ্য।

৩১ মার্চের শেষ রাতে খবর পেলাম যে একাডেমীর পাশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছুসংখ্যক সৈন্য চলাচল করেছে। মিনিটকাল বিলম্ব না করে পরিবারসহ সেই অন্ধকারে আমার নিজস্ব গাড়িতে করে একাডেমীর বাইরে চলে আসি। সঙ্গে ব্যবহারের জন্য কাপড়-চোড় ও টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে আসার সময় পাই নি। একাডেমীতে এই নির্দেশ রেখে আসি যে এবার যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ নিরাপত্তার পথ বেছে নিতে বিলম্ব না করে। বেলা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুটিয়া থানায় এসেও সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর পেলাম। থানার প্রাঙ্গণে আমার গাড়িটি ফেলে টমটম নিয়ে নওগাঁ-র দিকে এগুতে থাকি। আমার স্ত্রী (সেলিনা), মেয়ে (সামিনা) এবং ছেলে (ইনান) আর বাবুর্চি রহিমুদ্দিনকে টমটমে দেখে কে বা কারা গুজব রটিয়ে দেয় যে, সারদার একজন পাঞ্জাবী অফিসার পালিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি স্কুলের পাশে উপস্থিত হই এবং স্থানীয় একজন প্রিন্সিপালের বাসায় উঠি। সেখানে হাজার হাজার লোক এসে উপস্থিত। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি বাঙালী। প্রিন্সিপাল আমাদের স্কুলের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। এমন সময় পার্লামেন্ট সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন সেই পথে যাচ্ছিলেন। আমাদের বিপদের কথা শুনে তিনি লোকজনকে বুঝালেন যে আমি বাঙালী। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক দাবি করে যে, আমাকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমি বাঙালী। আমজাদ হোসেনের পরামর্শে অগত্যা বক্তৃতা দিয়ে রেহাই পেলাম। কিন্তু সেখানে রাত কাটাতে সাহস হলো না। অন্ধকারে গরুর গাড়িতে নওগাঁর দিকে এগুতে শুরু করি। রাত এগারোটায় পথিমধ্যে বাগমারা থানাঘরে উঠে দেখি সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর একজন সিপাহীর দেখা পেলাম। ওসি ও অন্যান্য পুলিশ কোথায় সে জানে না। ওসির পরিবারের কাছে পরিচয় দিয়ে বৈঠকখানায় বসি। গভীর রাতে তিনি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সিপাহীটি খবর দিলো যে, ওই জায়গায় আমাদের থাকা নিরাপদ হবে না। সিপাহী বহু কষ্টে একটি গরুর গাড়ির বন্দোবস্ত করে দেন এবং আমরা এ রাতেই নওগাঁর দিকে এগিয়ে চলি। ভোর হতে না হতেই দা,লাঠি,বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ার সজ্জিত হাজার হাজার লোকের বেড়াজাল ভেদ করে চলতে হয়। বেলা নয়টার দিকে একটি বাজারে এসে পৌঁছি। সেখানেও আমাকে পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং আমার বাঙালিত্বের পরিচয় দিতে হয়। পরিবারসহ আমাদের আত্মীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর লোদীর বাসায় যাচ্ছিলাম। লোদীকে ডেকে আনার জন্য তিনি লোক পাঠালেন এবং আমাদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। ঘণ্টা চারেক পর লোদী সাহেব এসে আমাদের নওগাঁয় নিয়ে গেলেন। কোত্থেকে কীভাবে এখানে এসেছি এ খবর শুনে লোদী পরিবার মর্মাহত। কিন্তু আমরা এতোদিন পর নিরাপত্তাবোধ ফিরে পেলাম।

এই সময় সান্তাহারে বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার কাজে লোদী ব্যতিব্যস্ত। ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুর রহমান ও মেজর নাজমুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। রাজশাহী জেলার জন্য প্ল্যান বানানো হলো। আমি সারদা অঞ্চলের ভার নেই। সঙ্গে থাকেন সারদা ক্যাডেট কলেজের ক্যাপ্টেন রশীদ এবং অধ্যাপক আজিমদ্দিন। ব্যবস্থা করা হলো যে, পাক-সেনাবাহিনীর আক্রমণে নওগাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হলে ইন্সপেকটর লোদীর পরিবার আমার স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে ধামুরহাট বর্ডার দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেবে। ১২ই এপ্রিল আমি সারদায় ফিরে আসি। তখন একাডেমী প্রায় জনশূন্য। ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন বলে নিরুপায় হয়ে তারা সারদায় রয়ে গেছেন। পিএসপি ট্রেইনি অফিসারদের মধ্যে মধ্যে বাঙালিরা নিজ নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার আশায় বের হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের পদ্মার অপর পাড়ে ভারতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে। আরো জানতে পারলাম যে, তারা ভারতীয় বর্ডার নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে রিপোর্ট করেছে। জনশূন্য একাডেমীতে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই দেখে রশীদ ও আমি ঠিক করি যে, ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় চারঘাট হয়ে কুষ্টিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করবো। এদিকে ঢাকা থেকে মাঠঘাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাক বাহিনী নাটোরে এসে পৌঁছেছে। গুপ্তচরেরা আমাদের অবস্থান ওদের জানিয়ে দেবে এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। দুটি রাত সারদার বাইরে চারঘাট থানাঘরে কাটাই। থানায় কেউ ছিল না। শুধু আমি এবং সারদার একজন বাঙালি সিপাহী। ১৪ই এপ্রিল বিকাল চারটায়, সঙ্গে কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে সারদা থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছি ঠিক এমন সময় মেশিনগানের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে খবর পেলাম যে পাকবাহিনী তিন দিক থেকে একাডেমী ঘেরাও করেছে এবং অফিসার্স মেসে পৌঁছেছে। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সবকিছু ফেলে পদ্মার দিকে দৌঁড়ে পালাই। পানির ধারে কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক সামরিক বাহিনীর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে আছে। নদী পার হবার কোনো যানবাহন অনেকদিন আগে থেকেই সেখানে নেই। সাঁতরিয়ে পার হবার জন্য পানিতে নেমেছি, পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাই নিকটবর্তী চরের নালায় একটি ছোট ঘাসের নৌকায় কয়েকজন লোক উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই সময় নদীতে এগোলেই মাঝি গুলি খেয়ে মরবে এই ভয়ে বুড়ো মাঝি কাউকে নৌকায় উঠতে দিচ্ছে না। ঘাস ভর্তি ছোট নৌকাটিতে বড়জোর দুজন উঠতে পারে। আমি চরে ফিরে আসি এবং নৌকার কাছে গিয়ে মাঝিকে অনুরোধ জানাই আমাকে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে চরের ধার বেয়ে কিছুদূর নিয়ে যাবার জন্য। সৈন্যদের চোখে ধুলি দিয়ে পালাবার আর কোনো বুদ্ধি সেসময় মাথায় আসে নি। আমাকে ঘাসের নিচে লুকিয়ে নৌকাটি ধীর গতিতে নদীর চরের ধার বেয়ে চলেছে তাতে কারো সন্দেহ হয় নি যে নৌকাটিতে আমি পালাচ্ছি। এভাবে একাডেমীর গণ্ডির বাইরে এসে নৌকাটি সরাসরি নদী পার হবার পথে এগিয়ে চলে এবং দ্রুত বেগে অনেক দূরে এসে পৌঁছে। এসময় সামরিক হেলিকপ্টার থেকে আগুন ছেড়ে গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দিশেহারা হাজার হাজার লোক পালিয়ে পদ্মা নদীর চরে এসেছে কিন্তু নদী পার হতে পারছে না। এদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার লোককে নদীর ধারে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র চার/পাঁচ শত গজ দূরে উক্ত ঘাসের নৌকা ও আমি। সৈন্যরা ভাবতে পারে নি যে, আমি সেই নৌকায় লুকিয়ে আছি। ঘণ্টাখানেক পর পদ্মার অপর পাড়ে পৌঁছি। সঙ্গে কিছু নেই। ভেজা প্যান্ট ও শার্ট। নওগাঁয় ফেলে আসা পরিবারের কী অবস্থা ভাবতেই পারছিলাম না। হাজারো দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙে পড়ি। অত্যন্ত দুঃখের সাথে আজো স্মরণ করছি যে, সারদায় গিয়ে আমি একটি ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম। এই পাণ্ডুলিপি সারদা একাডেমীর স্টেনোগ্রাফার শহীদ মোস্তফার হাতেই তৈরি হয়। আমি যেদিন সারদা ছেড়ে পালিয়ে যাই সেদিনই মোস্তফাকে পাক সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। আমার বাড়িঘর, পাণ্ডুলিপি সবকিছু লুণ্ঠিত হয়।

১৪ই এপ্রিল সকালবেলা সারদা একাডেমীর ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীকে পরিবারসহ পদ্মার ওপারে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক অনুরোধের পর স্থানীয় লোকজন তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর প্রতি সদয় হয়ে কোনোক্রমে একটি নৌকা জোগাড় করে দেয়। নদীর ওপারে পৌঁছে চৌধুরী চরেই পরিবারসহ বসে থাকে। তার স্ত্রীকে নিয়ে এগোতে সাহস পায় না। সন্ধ্যার পরক্ষণেই আমরা ভারত সীমান্তে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে আশ্রয় নেই। সেই বাড়িতে কয়েকশত লোক ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো। ডাক্তার আমাদেরকে যথাসম্ভব যত্নসহকারে রাখেন। পরের দিন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার আমাকে বহরমপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমার পরিবারের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাকে জানাই। তিনি আমার বালুরঘাট যাবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে নাটোরের এসডিও কামালউদ্দিনের সাথে দেখা হয়। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে পালিয়ে আসেন।

বহরমপুরে সারদা একাডেমীর পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তাকে সঙ্গে করে বালুরঘাট নিয়ে যাই। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। বালুরঘাট বাস টার্মিনালে কংগ্রেস কর্মী উৎপল আমাকে খুঁজে বের করে এবং তাদের বাসায় নিয়ে যায়। জানতে পারলাম বহরমপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার খবর বালুরঘাটে পাঠিয়েছেন। উৎপলদের পরিবার দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা শহরের বাসিন্দা ছিল। উৎপলদের সঙ্গে পরামর্শ করে পর দিন ভোরে ক্ষিতিশ ও আরো কয়েকজনকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে আমার পরিবারের তল্লাশে সীমান্তের এপারে পাঠানো হয়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে আমার হাতে লেখা একটি চিঠি আমার পরিবারের জন্য দিয়ে দেই। নওগাঁয়ে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে সেখানকার লোকজন ভারত সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নেয় - এ খবর বালুরঘাটে পৌঁছে। বর্ডারের মেইল পাঁচেক ভিতরে ধামুরহাট থানা অঞ্চলে এক হাজীর বাড়িতে অনেক লোকে আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদের সঙ্গে লোদী পরিবার ও আমার পরিবার সে বাড়িতে পৌঁছে। কিন্তু তারা নিরুপায়। সীমান্তের অপর পাড়েই বা কোথায় যাবে। এদিকে আমার কোনো খোঁজ-খবর তাদের জানা নেই। ক্ষিতিশ কয়েকটি আশ্রয়স্থল খুঁজে হাজী বাড়িতে গিয়ে তাদের সন্ধান পায়। অতঃপর আমার পরিবার জীবনের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার পথ বেছে নিয়ে ক্ষিতিশদের সঙ্গে উৎপলদের বাড়িতে এসে পৌঁছে। এখানেই আমার পরিবার জীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা। উৎপলের বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আমাদেরকে আপন বলে গ্রহণ করে। পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিশ সুপার ঢাকা জেলার দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। আমার শ্বশুরালয়ের এলাকায় খ্রিস্টান পরিবারের এই অফিসার ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য। তিনি অভাবনীয় সৌজন্য দেখিয়ে আমাদেরকে একটি জীপে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এবং পথে আমাদের সকলের খরচ বাবদ একশত টাকা হাতে তুলে দেন।

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতায় কীড স্ট্রিটের এমপি হোস্টেলে কলকাতার কংগ্রেস দলীয় এমপি জয়নাল আবেদীনের অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিই। খাওয়াদাওয়ার খরচ আমাদের নিজেদেরকে বহন করতে হয়েছিলো। আমার বা আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা ছিল না। সামান্য গহনা ছিল মাত্র। আমাদের ছোট ছেলে ইনান তার জন্মদিনে পাওয়া চারশত টাকা সঙ্গে নিয়েই সারদা থেকে বেরিয়েছিলো। পালাবার দিন রাতে ওই টাকা তার সঙ্গে ছিল। এখন তার টাকা খরচ করতে চায় না। তার হিসাব হলো এতজন লোক মিলে এই টাকা খেয়ে শেষ করার পর আমাদের অবস্থা কী হবে। এমপি হোস্টেলের কোণে পান-বিড়ির দোকানের বেচাকেনা দেখে সে নিজে একটি পান বিড়ির দোকান করতে চায়। তার হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ৭/৮ টাকা লাভ হবে এবং তাতে আমাদের খাওয়ার খরচ কোনোক্রমে হয়ে যাবে। ঐ সময় আমাদের পাঁচজনের (বাবুর্চিসহ) জন্য দৈনিক ৫/৬ টাকার বেশি খাওয়া খরচ করতে পারি নি।

কীড স্ট্রিটে ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ পাঠের কথা শুনতে পাই। সোহরাব হোসেন, মমিনউদ্দিন প্রমুখ কয়েকজন কলকাতার এমপি হোস্টেলেই ছিলেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গে দুমিনিটের জন্য দেখা হলো। আমাদের বড় বড় নেতারা কে কোথায় আছেন জানতে চাইলে তিনি কানে কানে বললেন যে, আগামী দিন সে খবর আমাকে দেওয়া হবে। সে মুহূর্তে আমাদের নেতাদের অবস্থান সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চায় নি।

পরদিন হাইকমিশনে গিয়ে ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী ও পদস্থ অফিসার রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রফিকের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী তখন ঢাকায়। তাদের জন্য দুশ্চিন্তায় এবং কিছু পেশাগত দুর্বিপাকে রফিক দিশেহারা। হাইকমিশনে খন্দকার আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের খান ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের কাছে শুনতে পেলাম যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, আবদুল মান্নান ও কর্নেল ওসমানীকে বালিগঞ্জের একটি বাসায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় তাদের দেখাশোনা করছেন। কামরুজ্জামান অন্যত্র থাকেন। তাদের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা জানতে চেয়েছি। সকলের মুখে একই কথা যে, তারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তে ভিন্ন ভিন্ন পথে কলকাতায় এসেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেখতে চেয়েছি। কিন্তু কেউ দেখান নি। বালিগঞ্জের সেই বাসস্থানে তাদের আর্থিক অনটন ও দুরবস্থা দেখে খুবই খারাপ লেগেছে। পাশেই মহিষের বাথান, দুর্গন্ধে টিকা যায় না। নিরাপত্তার অভাবে তারা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না। শুধু কামরুজ্জামান ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে তার জানাশোনা অনেক লোক ছিল। নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলীর পরিবারের কোনো খবর নেই। পরিবার উদ্ধারের চিন্তায় তারা দিশেহারা। সারদার ইন্সপেক্টর গাজী গোলাম রহমানকে মনসুর আলীর পরিবার পাবনা জেলার কাজীপুর অঞ্চলে খুঁজে বের করে কলকাতায় আনার জন্য ঠিক করা হলো। পথের খরচ বাবদ একশত টাকা চাওয়া হলো। কিন্তু সে টাকা ১০/১২ দিনেও জোগাড় হয় নি।

খন্দকার আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের ও আমি একসঙ্গে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে প্রবাসী প্রশাসন গড়ে তোলার উপদেশ দেই। আমাদের মতে স্বাধীনতার ঘোষণা করে ঘরে বসে দিশেহারা হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সে জন্য চাই একটি প্রশাসন যন্ত্র। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমাদেরকেই যথোচিত বিধিব্যবস্থা তৈরি করার ভার দেওয়া হলো। ইতিপূর্বে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী পদে মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র ও রিলিফ মন্ত্রী পদে কামরুজ্জামান অধিষ্ঠিত হন। ১৭ই এপ্রিলের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকারের কোনো প্রশাসনিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শুধু কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিলো। মুজিব নগর সরকারের খসড়া প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তলার ভার আমাদেরকে দেওয়া হয়। পাবনার ডেপুটি কমিশনার নূরুল কাদের খান এককালে বিমান বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া পাবনায় তিনি পাকবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। প্রশাসনিক খসড়া তৈরিতে নূরুল কাদেরের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের ও আমি অফিসার ইনচার্জ পদবীতে প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আমাদের কোনো সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ছিল না। কয়েকটি চেয়ার-টেবিলেই আমরা সকলে মিলেমিশে বসে কাজ করেছি। আর আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তারাও একই সঙ্গে বসেছেন। কয়েক মাস পর যখন অন্যান্য অফিসার এসে যোগ দেন তখন আমরা সচিব, উপসচিব ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করি। আমি স্বরাষ্ট্র সচিব এবং উপরন্তু আইজি পুলিশের দায়িত্বে ছিলাম। নূরুল কাদের খান পাবনা ট্রেজারির যে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে এসেছিলেন সেই টাকাই ছিল মূলত মুজিবনগর সরকারের আর্থিক সম্বল। আগরতলা অঞ্চলেও আমাদের কিছু টাকাপয়সার কড়াক্রান্তি হিসাব-নিকাশ দেওয়া হয়। আসাদুজ্জামান অর্থ সচিব, নূরুল কাদের খান সংস্থাপন সচিবের কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নূরুল কাদের খান অভাবনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। সেক্টর, সাব-সেক্টর ইত্যাদি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান মুখ্যত তারই ধ্যান-ধারণা। ১৭০০ মেইল বর্ডারে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ কীরূপ কঠিন হতে পারে তা হয়তো অনেকের ধারণায় আসবে না।

বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিযান পরিচালনা করেছেন আমাদের সেক্টর কমান্ডারগণ। তাদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র। কমান্ডারদের অধীন অফিসার, জোয়ান, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সমস্ত পেশার বাঙালী বীর সন্তানেরা কাজ করেছেন। তাঁরা পাকবাহিনীর ওপর হানা চালিয়েছেন। তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন। ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। ১৭০০ মাইল স্থল সীমান্তে এই অভিযান একাধারে চালানো হয়। তাতে পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থাপনা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে অগণিত মুক্তিবাহিনী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ ও আক্রমণে পাকবাহিনী কোথাও দাঁড়াতে পারে নি বলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। পলায়নরত পাকবাহিনীকে ধাওয়া করেছে বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক সবাই মিলে। এই দৃশ্য সবাই দেখেছে। প্রচার মাধ্যমের অভাবে তা অধিকাংশ সময় প্রচার করা সম্ভবপর হয় নি।

২৫শে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যাবে কোথায়? যারা সামরিক সরকারের চিহ্নিত শত্রু তাদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই সাধারণ বিষয়টি অনেকে চিন্তা করতে পারেনি। বাংলাদেশের লোকালয়ে আমার পক্ষে পালিয়ে থাকা সম্ভবপর ছিল না সারদার এতো সব কর্মকাণ্ডের পর আমি দেশত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই। ভারতীয় ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাশা ও দুর্দশা বোঝা নিয়ে প্রতিদিন এসেছে। তাদের মধ্যে প্রথম দিকে অমুসলমান বাঙালির সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি হয়েছে ভিন্নতর। ক্যাম্পে সকলেই মিলে দিন কাটিয়েছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ আমাদের নজরে পড়েনি।

পাকিস্তানের বর্বর অভিযানের মোকাবেলা করার মতো অস্ত্রবল আমাদের ছিল না। এপ্রিল-মে-জুন মাসগুলোয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় মনোভাব আশাব্যঞ্জক ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আমাদেরকে সামরিক সাহায্য দেবে এ কথা আমরা ভাবতে পারি নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মনোভাব যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে - যদিও এটা ছিল স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের কাছে সেটা ছিল বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতে যেভাবে আশ্রয় নিয়েছিলো তাতে ভারতবাসীরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলাম বৈকি।

ওই দুর্দিনে আমরা ছিলাম নকশালপন্থীদের ভয়ে ভীত। চলাফেরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না। বিশেষ করে আমাদের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুব বিব্রত ছিলাম। সেজন্য তাঁদের আবাসস্থলে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সিআইটি রোডে একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে এক রুমে আমাদের মন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে পরিবারসহ বসবাস করতে হয়েছে। এই হোটেলকে নিয়েই আমাদের শত্রুরা অপপ্রচারের ডামাডোল বাজিয়েছিলো। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দু'চারজন আত্মীয়স্বজন ছিলেন। তাঁদের কাছে আশ্রয় চেয়ে হতাশ হয়েছি। তারা বড়জোর একদিন দুদিন থাকতে দেবার পর অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা মনেপ্রাণে চান নি যে পাকিস্তান দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাক। হাইকমিশনের পদস্থ কর্মচারী রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমাদেরকে তাঁর বাসায় রাখেন। তাঁর বাসায় আরো তিরিশজন লোক ছিলেন। এতোজনকে প্রায় তিন মাস খাইয়ে-দাইয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু তিনি ও তার স্ত্রী আমাদের বাড়ি ছাড়তে দিবেন না। বহু বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে রাজি করেছি। অতঃপর গোবরা কবরখানার নিকটবর্তী একটি বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেঘালয়, মিজোরাম এবং আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে আমাদের লোকজন যখনই প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি স্থানবিশেষে বন্দী জীবন কাটিয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিছুসংখ্যক লোককে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও উদ্ধার করতে হয়েছে। কংগ্রেসবিরোধী ভারতীয় রাজনৈতিক মহল আমাদের সহায়তায় খুব বেশি আগ্রহ দেখায় নি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সালের পর থেকে বহু পূর্ববঙ্গবাসী বসবাস করছে বলে সেখানে স্বভাবত আমরা এককালীন প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার পেয়েছি।

পাকিস্তান সরকার রাজাকার, আল-বদর ,আল-শামস ইত্যাদি বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলো তার কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা ভারত থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। এই বাহিনীগুলোর সহায়তায় গণহত্যা, নারী নির্যাতন অভিযান চালানো হয়েছে। এই বর্বরতার খবরাখবর আমাদেরকে মরিয়া হয়ে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের মতো যারা দেশের বাইরে যেতে পারেননি তারাই সবচেয়ে বেশি ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছেন - এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। যুদ্ধের সেই ভয়াল মাসগুলোয় অহরহ খবর পেয়েছি যে যশোর, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আরো কোন কোন অঞ্চলে আমাদের বিপ্লবধর্মী সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক জোতদার শ্রেনীর মানুষকে হত্যা করেছে । সে সময় খবর পেতাম যে, যেহেতু রাশিয়া জাতিসংঘে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছে সেহেতু রাশিয়াবিরোধী রাজনৈতিক মহল মুক্তি সংগ্রামকে রাশিয়ার চক্রান্ত বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি । অভ্যন্তরে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধারা মাদের এই অভ্যন্তরিন চক্রকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো । নিয়মিত , অনিয়মিত এবং নিয়মবহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার আপামর জনসাধারণকে সংগে নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে রুখে দিয়েছিলো বলেই ভারতীয় সাহায্য সহানুভূতিকে সম্বল করে আমরা এত অল্প সময়ে এত বড় বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছি । কাজেই চিহ্নিত শত্রুদেরকে বাদ দিতে বাকী প্রতিটি বাঙালি ছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং বিজয় গৌরবের অংশীদার । এত অগণিত মানুষের ‘লিস্ট’ বানাবে আজ কে বা কারা ?

মুক্তিযুদ্ধের কতক দিক রয়েছে যে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য রাখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না । একাত্তরের ৭ই মার্চের ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার শর্তসম্পৃক্ত মর্মবানী খুঁজে পেয়েছি কিন্তু ঘোষণাটি স্বাধীনতার ভাষায় লিপিবদ্ধ বলে মেনে নিতে পারিনি । অসহযোগ আন্দোলোন ও আওয়ামি লীগের নির্দেশে প্রশাসনিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসেছিল তাতে আমি ভাবতে পারিনি যে সামরিক পরাজয় ছাড়া পাকিস্তান বাংলাদেশ কে স্বাধীন হতে দেবে। বেসামরিক জনগোষ্ঠিকে একটি সুস্পষ্ট আসন্ন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সংঘবদ্ধ করার কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় ২৫শে মার্চের হত্যাকান্ডের পর দিশেহারা ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক্‌, শ্রমিক,পুলিশ, ইপিয়ার ও বাঙালি কারো আদেশ ছাড়াই পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পরেই আমাদের প্রতিটা গ্রামগঞ্জের শহরে বন্দরে ‘পশ্চিমা হটাও’ অভি্যান গড়ে উঠে । ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পর থেকেই আওয়ামি লীগ কেন্দ্রিয় সরকার মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আইয়ুব আমলের মাঝামাঝি সময়ে নেতৃত্বের অভাবে তা প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে এসেছিল। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, আগরতলা ষরযন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান শেখ সাহেবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শীর্ষমণি হিসেবে চিহ্নিত করে । তার অসাধারণ ত্যাগ,তিতিক্ষা ও জনদরদী মানসিকতার জন্য ১৯৭০ সালের ইলেকশানে আওয়ামি লীগের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তাতে আওয়ামি লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কথা কেউ ভাবতে পারেনি । এ কারণেই স্বাধীনতা যুদ্ধের শীর্ষমণি হিসেবে রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামি লীগ কেই মেনে নিতে হবে ।

আওয়ামি লীগের নেতৃ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ এবং আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কোন কেন্দ্রীয় আদেশে দেশ ত্যাগ করেছেন বলে জানা নাই। ২৫শে মার্চের পর তারা যখন কলকাতা বা আগরতলায় সমবেত হন তখন তাদের মধ্যে যে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয় তাতে বুঝা গিয়েছে যে কোন পরিকল্পনা মোতাবেক তারা দেশ ত্যাগ করেছেন। কর্নেল ওসমানিও তাই করেছেন। এই পূর্ব পরিকল্পনাহীনতার জন্য আমরাও বুঝতে পারিনি যে, আমাদেরকে কখন কী করতে হবে । এমনকি আগরতলায় যাঁরা পৌঁছেছিলেন তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে কলকাতায় অবস্থানরত নেতৃবর্গের কোন সংযোগ ছিল না অনেক দিন । এজন্য ভিনদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের দুটি ধারা সূচিত হয়েছিল । মুজিব নগরে সরকারের প্রশাসন সংগঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকে একটি কেন্দ্রিয় প্রশাসনের আওতায় না হয় এবং যথারীতি প্রশাসনিক বিধি নিষেধের অন্তর্ভূক্ত করা হয় । এসকল জটিল কাজ আমরা গুটিকতক কর্মচারীরা সম্পন্ন করেছি , মাহবুব আলম চাষী (মরহুম), হাসান তৌফিক ইমাম, জহুর আহমদ চৌধুরী (মরহুম), মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশাসনিক কাঠামো বানাবার সূচনা করেন । পরে তারা কলকাতা কেন্দ্রিয় প্রশাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েন ।

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবিন্দের মধ্যে পাস্পরিক সমঝোতার কিছুটা অভাব ছিল । কিন্তু এই অভাব কে কোনক্রমে ঢেকে রাখার চেষ্টা প্রশাসন থেকে অতি সতর্কতার সাথে করা হয় । আপামর মুক্তিযোদ্ধারা যে অসীম সাহসিকতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে কোন মহলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠাঁই পায়নি । পার্লামেন্টের প্রায় সকল সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন । দেশবাসীর তাঁদের দায় দায়িত্ব পালনে তারা সবসময় সতর্ক ছিলেন । কিন্তু এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হয়েছিলো যে শুধু তাঁদের প্রজ্ঞার ওপর সব ছেড়ে দেয়ে সম্ভবপর ছিলো না । সে জন্য্য আমাদের সামরিক অফিসারদের প্রজ্ঞাকেই সম্বল করে আমাদের এগুতে হয়েছে । আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর পক্ষে এত বিশাল এবং বিস্তৃত মুক্তিবাহিনীর সব কিছু দেখাশোনা করা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই সেক্টর কমান্ডারদেরকে নিজ নিজ পরিকল্পনানুসারে অনেকাংশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে । পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ প্রশাসনে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন । কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁদেরকে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে এগুতে হয়েছে । তাতে কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করেছেন। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বেসামরিক কমান্ড কাউন্সিল গঠন করেছিলাম। কার্যতঃ এই সকল কাউন্সিল যুদ্ধ চালানোর কাজে উল্লেখযোগ্য ভাবে জড়িত ছিল না। যুদ্ধ সেক্টর কমান্ডারদের কলাকৌশল ও পরিকল্পনানুসারে পরিচালিত হয়েছে।

জুলাই মাসের দিকে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দকে একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । পারষ্পারক সমালোচনা , অভিযোগ ইত্যাদি যেন দাঁনা বেঁধে উঠতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্রপতির কাছে এক প্রস্তাব পেশ করি । তিনি তাতে সম্মতি দেন । কিন্তু কোথায় কিভাবে এই সমাবেশ ঘটানো সম্ভবপর হবে তা ছিলো ভাবনার বিষয় । ভারতীয় সরকারের সহায়তায় ও সৌজন্যে মেঘালয় ও দার্জিলিং-এর মধ্যবর্তী বাগডোগড়া নামক এক নির্জন স্থানে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয় । সমাবেশে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও মন্ত্রী মহোদয়গণ দু’দিন বহু তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হন। ফলে তাঁদের মধ্যে পারষ্পারিক বোঝাপড়ার পথ সুগম হয় । বাগডোগরা সমাবেশকে মুজিবনগর পার্লামেন্টারী অধিবেশন বলা যেতে পারে । এই সমাবেশের খবর আমরা প্রচার করি নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোয় আমরা যখন আমাদের লোকজনদের সাথে কথা বলেছি তখন তাঁদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যে অন্যায়, অবিচার ও শোষণকে মুক্তিকামী বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবর্তীন হয়েছিল তার অবসান ঘটাতে হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে আদর্শস্থানীয় তার ব্যতিক্রমকিছু বলার ছিল না । ধনতন্ত্রের কাঠামো ও ভিতকে দূর্বল করতে হলে জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে হবে-এই ছিল আমাদের বাণী । এই দুর্গম পথের পাথেয় যে ত্যাগতিতিক্ষা তার নাম ছিলো স্বাধীনতাযুদ্ধ । ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন দান আর মা-বোনদের ইজ্জত হানি-এই আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা। ফসল হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন করব এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। ’৭১-এর নভেম্বর মাসে আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বা নীতিমালা এখান এখান থেকেই তৈরী করে নিতে হবে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের ওপর বিজয়ের গৌরব নিয়ে প্রশাসন চালাতে হলে যে প্রজ্ঞা,ধৈর্য, ও দূরদর্শিতার তা হয়তো রাজনৈতিক মহলে একক ভাবে আশা করা সম্ভবপর হবে না এই ভেবে আমাদের উদ্যোগেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক মৌল কাঠামো তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সরকারী,আধাসরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ এবং কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপারে এটা ধরে নিতে হবে যে তারাও ছিলেন আমাদের মতো মুক্তিযোদ্ধা। এই ছিল আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত ।

শুধু ব্যাতিক্রম ছিলো এটুকু যে, যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা দেশবাসির কাছে জঘন্য শত্রুবলে চিহ্নিত হয়েছেন তাদের জন্য একটি স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করা হয়। একজন বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য এবং সরকারের একজন সচিবকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । এই কমিটির রায় কে সরকার চুড়ান্ত বলে মেনে নেবে। তারপর আরো কিছুসংখ্যক চিহ্নিত কর্মচারীর কাছ থেকে আনুগত্যের একতা শপথ নেয়া হবে। এর বেশী কিছু নয়। আমাদের মতে এতেই দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকবেন এবং প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তেমন কোন ওলট পালট হবে না ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য বিবরণীর অভাবে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা সুবিবেচিত না হলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটা ধারা প্রবাহ আমরা নির্ধারণ করেছিলাম। অবাঙালি মালিকানা শিল্প বা ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এই ভেবে পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করা হবে। দেশি মালিকানায় শিল্প বা ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান যেগুলো দীর্ঘদিন যাবত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তাদেরকে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে চাঙ্গা ও তেজী করে তুলতে হবে। এই ছিলো আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ ছাড়া বিরাট মুক্তিবাহিনীকে যথাশীঘ্র কি করে কৃষি বা অনযান্য ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেয়া যায় তারও ব্যবস্থা করা হবে । অগণিত ছাত্র শিক্ষক যারা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে শান্তিময় জীবনের অভিষ্ঠ মন-মানসিকতায় কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় সে দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হবে। স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ হিসেবে ছাত্র-জীবন থেকে একটি বছর দেবার কথাও চিন্তা করা হয়েছিল যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা কোন মহা সংকটের উদ্ভব না ঘটে।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলার বিধানকল্পে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আইন সংগত উপায়ে গৃহীত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিককোন নতুন সংস্কারে সঙ্গে সঙ্গে হাত দেয়া যাবে না। মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ও তাদের নির্বাচিত আরো কয়েকজন। যতটুকু মনে পড়ে একটা যুদ্ধোত্তর গরীব দেশের জনসাধারণের খাদ্য-গৃহ ও বস্ত্রসংস্থান ছিল এই পরিকল্পনার মৌল বিষয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাসগুলোয় পাকিস্তানী একশত টাকার বিনিময়ে একশত চুয়াল্লিশ ভারতীয় টাকা পাওয়া যায় নি । সমান সমান মূল্যে মুদ্রা বিনিময় হতো । মুজিব নগর সরকারের কর্মকর্তাদের সর্বচ্চ বেতন ছিলো চারশত পাকিস্তানী টাকা। এই টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া, খাওয়া, অফিসে সাতায়াত,ঔষধ ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় খরচ মেটানো হতো। অর্থ ছিল না বলে ব্যায়বহুল নিয়মিত বাহিনী বড় আকারে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রিফিউজি ক্যাম্পে খেয়ে দেয়ে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সেক্টরে অভিযান চালিয়েছে। কি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দিন কাটিয়েছি তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ঢাকা থেকে লোক মারফত কিছু টকা পয়সা নেবার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত করতে হয়েছে । আমার শশুর মরহুম হাফিজুদ্দিন সাহেব এই টাকা দেন। আমার বন্ধু অধ্যাপক মোস্তফা নুরুল ইসলাম বিলেতে ছিলেন তিনিও কিছু পাউন্ড দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁদেরকে এই টাকা ফেরত দিতে হয়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ কি অভাবনীয় কষ্টে দিন কাটিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র ও রিলিফের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সীমান্তের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রস্নত ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। ভারতীয় প্রশাসনের কাছে ক্যাম্পের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছি। মুক্তিযোদ্ধা বেশে পাকিস্তানি চরদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার কাজে আমাদের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদের স্থানে স্থানে খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে । মুক্তিযুদ্ধের বিশাল আবর্তে আমার কাজের কোন ধরাবাঁধা পরিধি ছিল না বলা চলে। স্থানে স্থানে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছি। সমাজতন্ত্রের মর্মবানী ব্যাখ্যা করে মুক্তিবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দিন ছিলেন সেচ্চার। স্বদেশী গান গেয়ে দেশপ্রেমিক শিল্পীরা স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেশ-বিদেশে প্রচার করেছেন। মাত্র কয়েকজন শিল্পী,সাহিত্যিক,সাংবাদিক,বেতারকর্মী যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন তা অভাবনীয়। মুকুলের ‘’’ঠেটা মালিক্কা’’’ (গভর্নর ডঃ আব্দুল মোতাল্লিব মালিক) নামক প্রোগ্রাম ও ‘’’চরম পত্র’’’ ছিল সে সময়ের বেতার জগতের অবিস্মরনীয় আলেখ্য। কামরুল হাসান, জহীর রায়হান, হসান ইমাম, আব্দুল জব্বার, মুকুল এবং আরো অনেককে আমি আগে থেকে খুব ভালভাবে জানতাম। তাঁদেরকে অনেক খবর দিয়েছি যা নিজনিজ পদ্ধতিতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন অঙ্গনের দৈনিক খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমাদের লোকজন ঢাকা প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেক্রেটারিয়েট থেকে সংগ্রহ করে কলকাতায় আমাদের কাছে পৌঁছে দিত। রিলে সিস্টেমে এইসব খবর পাঠানো হত। সপ্তাহকালের মধ্যে কলকাতা থেকে আমাদের গোয়েন্দারা ঢাকা ও অন্যান্য শহরের অফিসের গোপনীয় কাগজপত্র, পাকিস্তান সরকারের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে আসতো। অফিসের লোকজন গোপনে গুরুত্বপূর্ণ খবর সরবরাহ করে আমাদের সাহায্য করেছে। মুক্তিকামী ছিল বলেই তারা একাজ করেছে। আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে দেশপ্রেমিক মানুষের বাড়িতে লুকিয়ে পালিয়ে রাত কাটিয়েছে। যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল তারাও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আর যারা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে খবর দিয়ে সাহায্য করেছিল তাদেরকে কি আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বলবো না ? স্টেট ব্যাংকের যেসব সিরিজের নোট খোয়া গিয়েছিল সেসব সিরিজের তালিকাও আমাদের লোকজন সংগ্রহ করেছিল। এই সুদক্ষ গোয়েন্দাদের কাজে প্রধাণতঃ পুলিশ, ছাত্র ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা নিয়োজিত ছিল।

দেশত্যাগী প্রায় সাত হাজার পুলিশ, এবং পাঁচ হাজার ই পি আর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছে। পুলিশদেরকে ১৭০০ মাইল সীমান্তের আশ্রয় ক্যাম্প ও অন্যান্য জায়গা থেকে খুঁজে বের করে সংঘবদ্ধ করার কাজ আমাকে করতে হয়েছে। ই পি আর-এর প্রায় সকলেই নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। পুলিশের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। সীমান্তের সংগে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল বলে ই পি আর ছিল আমাদের অভিযানের সেরা সৈনিক। ই পি আর ও পুলিশ অকাতারে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে। প্রায় ষোলশত পুলিশ এবং এক হাজার ই পি আর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। পংঙ্গু হয়েছে অনেকে। পরিবারের ওপর বহু রকম নির্যাতন চালিয়েছে পাকবাহিনী। বাংগালী সৈনিক ও অফিসারদের অনেককেই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল বলে মুক্তি্যুদ্ধে পেশাগত সৈনিকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না । পশ্চিম পাকিস্তানে যারা আটক ছিলেন বন্দি শিবির থেকে কেউ কেউ পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় ভূমিকা কারো কার কাছে ছিল বিতর্কিত। নিজস্ব শক্তিতে শুধু ত্যাগ, দঢ়প্রতিজ্ঞা ও মনোবলকে সম্বল করে সুদক্ষ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে কিনা এই প্রশ্নে আমাদের সামরিক মহলে মতভেদ ছিল। কর্নেল ওসমানীর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমাদের তরুন সামরিক অফিসারদের কিছুটা গরমিল ছিল। বাইরের কারো নেতৃত্বের গুরুভারে মুক্তিবাহিনীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে এ ধারণা অনস্বীকার্য হলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘকালীন করার বিপক্ষে প্রশাসনিক মতামত ছিল সুস্পষ্ট। পাক বাহিনীর দীর্ঘকালীন নির্যাতনে দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ভয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার বিপদকে দেখা হয়েছে বাস্তবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকে আমরা ভয় করেছি। মুজিব বাহিনীর সৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ দানা গড়ে উঠেছিল প্রায়। ছাত্র নেতারাও ইতিমধ্যে মতবিরোধের শিকার হয়েছিল। তাই সংক্ষিপ্ত তম সময়ের মধ্যে বিজয় অর্জন করতে হবে এই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছে। মুক্তিবাহিনীকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত অভি্যান চালানো হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনের পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের তেমন আকর্ষণ ছিল না । পাকিস্তান পরাজিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের রণাংঙ্গনে কত শীঘ্র পাকিস্তানকে পরাজিত করা যাবে এটাই ছিল আমাদের কাম্য।

ভারতীয় যুদ্ধবিশারদরা ‘বাইপাস’ সিস্টেম-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব ন্যূন্যতম সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ‘বাইপাস’ সিস্টেম-এ পাকবাহিনীকে কোন সম্মুখযুদ্ধের সুযোগ দেয়া হয়নি। লক্ষ লক্ষ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় নেতৃত্বে পাকবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। দিশেহারা পাকবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র যেখানে-সেখানে ফেলে ঢাকায় এসে আত্মসমর্পনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। বাংলাদেশের কোথাও লুকিয়ে জীবন বাঁচাবার পরিস্থিতি তাদের ছিল না । সপ্তম নৌ-বহরের পাঁয়তারা সত্বেও প্রায় এক লক্ষ পাক বাহিনীর এত নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ !

বিজয় যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট,তখন আত্মসমর্পণ উৎসবে আমাদের যোগদান সম্পর্কে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে স্থির করা হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর কর্নেল ওসমানী, রুহুল কুদ্দুস ও আমি হেলিকপ্টারে ভারতীয় কমান্ডারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছুব। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার জন্য আমাদের যে সময় দেয়া হয়েছিল তার ঘন্টাখানেক পূর্বে আমাদের প্রশাসনে কি যেন একটা হাস হাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি তার কিছুই আঁচ করতে পারিনি।

করতে পারিনি। রুহুল কুদ্দুস শুধু জানালেন যে, কর্নেল ওসমানীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই ডেপুটি কমান্ডার ইন-চীফ এ.কে. খন্দকারকে খুঁজে বের করা হয়েছে। শুধু তিনি ঢাকায় যাবেন। আমরা দুজন যাবো না। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কার কী মতভেদ ঘটেছিলো তা আর জানতে পারিনি। ঠিক করা হলো ১৭ই ডিসেম্বর শেখ সাহেবের ছেলে জামালকে ঢাকা রেডিও চালাবার মতো যন্ত্রপাতি দিয়ে পাঠানো হবে। ১৮ তারিখ রুহুল কুদ্দুস, নূরুল কাদের, আসাদুজ্জামান ও আমি ঢাকায় আসবো। পরিবারকে সঙ্গে আনা যাবে না। কাজেই আমার পরিবার ও ছেলেমেয়েকে কলকাতায় রেখে আসি। প্রায় ১২ দিন পর তাদের ঢাকায় নিয়ে আসি। ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে সেদিন জীবনের সবকিছু পেলাম। হেলিকপ্টার থেকে নামার আগে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। এয়ারপোর্টে হাজার হাজার লোকের ভীড়ে কারো সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি নি। জানি না তারা কী ভেবেছিলো। শুধু হাত উঠিয়ে সালাম জানিয়েছি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কে কোথায় কীভাবে আছেন - জীবিত কি শহীদ, এ চিন্তায় সে মুহূর্তে এতোই অভিভূত হয়েছিলাম যে, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার আনন্দে যুগপৎ নেমে আসে অব্যক্ত বিষাদের ছায়া। এই বিষাদ থেকে আজো মুক্ত হতে পারি নি।

- আব্দুল খালেক,

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

**<১৫,৬,৩৫>**

# [আবদুল বাসিত সিদ্দিকী]

*-পি ই-১৩২, টাঙ্গাইল-৩*

২৬শে মার্চ আমরা টাঙ্গাইল সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। পুলিশ এবং আনসারের সহযোগীতায় কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করি এবং টাঙ্গাইলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। তারপর টাঙ্গাইল, কালিহাতী, নাটিয়াপাড়াতে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করি।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি ও হুমায়ূন খালিদ কালিহাতীতে অবস্থান করি। সেখান থেকে আমরা নাটিয়াপাড়া আক্রান্ত হওয়ার খবর পাই। এই সংবাদ পেয়ে আমরা কালিহাতি থেকে ঘাটাইল চলে যাই এবং সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করি। ইপিআর এবং বিডিআর বাহিনী মধুপুরে ঘাঁটি স্থাপন করতে চলে যায়। ঘাটাইল থেকে আমরা ময়মনসিংহ যাই। এখানে সিটি স্কুলে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিলো এবং রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সাহেবের বাসায় ছিলো মুক্তিবাহিনীর অফিস। সেখান থেকে ঘাটাইল পাহাড়ি অঞ্চলের ধলাপাড়া গ্রামে চলে যাই। এখান থেকে মধুপুর পতনের সংবাদ জানতে পারি। ধলাপাড়া হাসপাতালে আমরা রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করি। কাদের সিদ্দিকীর সহযোগীতায় সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করি। সখীপুরে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করি। চারান, বাসাইল, কাউলাজানি, কাসুটিয়া, বল্লা, দেওপাড়া, ভুঁইয়াপুর, গোপালপুর, বৈলারপুর প্রভৃতি স্থানে আমরা পাক বাহিনীর মোকাবেলা করি।

অতঃপর আমি, নুরুন্নবী ও নূরুল হক প্রমুখ ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য গমন করি। মেঘালয় থেকে বেশ কিছুসংখ্যক অস্র সংগ্রহ করে আমরা আবার ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমরা টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। এর প্রধান কেন্দ্র ছিলো সখীপুর। আমি ছিলাম বিচার বিভাগের প্রধান। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এসময় ধলাপাড়ায় যে যুদ্ধ হয় তাতে কাদের সিদ্দিকী আহত হয়।

লাউহাটি, নাগরপুর, বৈখোলা, দেওপাড়া, ধলাপাড়া, মাকরাই প্রভৃতি স্থানে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে পাক বাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করি। এসময় টাঙ্গাইল মূল শহর ও আশেপাশের কতগুলো এলাকা ছাড়া মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। ১১ ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মূল শহর দখলদার মুক্ত হয়।

আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী

২৫ জুলাই ১৯৭৩ইং

(\*\* পি ই-১৩২ টাঙ্গাইল-৩)"



[মাঈমুনা তাসনিম](https://www.facebook.com/hiddenbirdmm?fref=ts)

<১৫,৭,৩৬-৪২>

# [আবদুল মালেক উকিল]

১৯৭১ সালে আমি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের (লক্ষীপুর ও ফেনী জেলাসহ) সভাপতি ছিলাম। একজন এম.এন.এ. হিসেবে আমিই ’৭১ সালে জেলা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হই। ইতিপূর্বে আমি ১৯৫৬, ৬২ এবং ৬৫ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি ও সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কাজ করেছি। নিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিল-এর নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য হিসেবে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোরের গুলবাগে নিখিল পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিত্ব করি এবং ঐ অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন।   
  
ঐ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ছয়জন প্রতিনিধি ছিলাম। তার পরের ইতিহাস খুবই করুণ হলেও বাঙালী জাতির মুক্তিসনদ হিসেবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জি. এম. সৈয়দ হারিনেতা, কাজী ফয়জুল্লাহ, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান প্রদেশের আরবাব সেকান্দার হায়াত খান, মানকি শরিফের পীর আতাউল্লাহ খান মঙ্গল, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, রেয়াছানী, শেখ মঞ্জুরুল হক, খলিল তিরমিজিসহ সকলেই প্রকাশ্যে ছয় দফা সমর্থন দিয়েছিলেন।  
  
১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকেই আমরা একই সাথে ঢাকায় দিনের পর দিন আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ও ৬ দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে নিয়োজিত ছিলাম।  
  
১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান আসার পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জরুরি অধিবেশন কখনও কখনও সারা রাত্রী ধরে চলতো। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং সংলাপের সময় আমরা দৈনন্দিন অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করতাম। কিন্তু ২৪শে মার্চ বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাদেরকে অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী আমি ২৪শে মার্চ নোয়াখালীতে (মাইজদি) চলে যাই। স্মরণ করা যেতে পারে, ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার ও ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার’ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে এবং নির্দেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।   
  
২৫ মার্চ রাত ১১টা আমার মাইজদিস্থ বাসভবনে আমার নিজস্ব টেলিফোনে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ৩২ নম্বর বাড়ির বিখ্যাত ৪২৫১ টেলিফোনে যোগাযোগ করি। একবার ঐ বাড়িতে অবস্থানরত হাজি গোলাম মোর্শেদ (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী) টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনি সতর্ক করে দেন যে, “যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে”। বঙ্গবন্ধু শুধু চিৎকার করে বলেছিলেন, “এখনও বসে আছ? সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে”।  
  
২৬শে মার্চ সকালেও আমরা বিভিন্ন সূত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা এবং হানাদার বাহিনীর গণহত্যার কথা অবহিত হই। এ সময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব মনযুর উল করীম (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)। আমি তাঁর মারফতে জেলা ও দায়রা জজ গাজী শামসুর রহমান (বর্তমানে প্রেস কাউন্সিলের সভাপতি) এবং পুলিশ সুপার শহীদ আব্দুল হাকিম সহ মহকুমা প্রশাসক ও সকল সরকারী কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারকে নোয়াখালী সার্কিট হাউসে ২৬ তারিখে ১০টার মধ্যে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাই। আওয়ামী লীগের সমস্ত এমপি এ, এম এন এ ও বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও ঐ সমাবেশে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করি। নির্ধারিত সময়ে পূর্বেই সমস্ত সার্কিট হাউস এবং সম্মুখের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানাই। উপস্থিত সর্বস্তরের জনগণ এবং জেলা ও দায়রা জজসহ সকল স্তরের কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বাধীন বাংলার পক্ষে সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে ডেপুটি কমিশনার জনাব মনযুর উল করীম বঙ্গবন্ধু মুজিব কর্তৃক ঘোষিত একটি ইংরেজিতে টাইপ করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দেন। সেটি ছিলঃ   
  
To the people of Bangladesh and also the world:   
Pakistan Armed Forces suddenly attacked the EPR Base at Peelkhana and Police Line at Rajarbag at .00 hrs. of 26-3-71, Killing lots of people, Fierce fighting is going on with the EPR and police forces in the streets of Dacca. People are fighting gallantly with the enemy forces for the cause of Freedom of Bangladesh. Every sector of Bangladesh is asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh.  
  
May Allah bless you and help you in your struggle for freedom.  
  
Joy Bangla   
Sk. Mujibur Rahman

(অনুবাদ)

বাংলাদেশ ও বিশ্ববাসীর প্রতিঃ

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ২৬-৩-৭১ তারিখ রাত ১২টার সময় হঠাৎ পিলখানার ইপিআর ব্যারাকে এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা করেছে, অনেক মানুষ হত্যা করেছে। ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে ঢাকার রাস্তায় ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষ বীরত্বের সাথে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরকে যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সকল প্রান্তে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত করুণ এবং সহায় হোন।

জয় বাংলা

শেখ মুজিবুর রহমান

এটি হুবহু বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের রাতে ওয়্যারলেস মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমবেত জনতা সর্বোচ্চ কণ্ঠে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং আমার নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে। ঐ মিছিলের শ্লোগান ছিল ‘ইয়াহিয়ার ঘোষণা মানি না’, ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বস্তরের নাগরিক ও কর্মচারীগণ শুধু শপথ করেই ক্ষান্ত হননি তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং আমার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এমনকি রিজার্ভ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মি. খান অস্ত্রাগারের চাবি আমার হাতে অর্পণ করে বলেন যে, আজ থেকে আমরা আপনাদের হুকুমে পরিচালিত হবো এবং বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবো। (From now onwards we are under your command ) ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আমার নিকট কয়েকটি জরুরি টেলিগ্রাম আসে। জনাব মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে জেলা, দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি) টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে নিশ্চয়তার জন্য। যেহেতু আমি ই.পি.আর-এর ওয়্যারলেস-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার কপি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি আলোচনা করেছি এবং যেহেতু সে সময় ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ও অন্যান্য জরুরি টেলিফোন যোগাযোগ চট্টগ্রামের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল, সে জন্য আমাকে টেলিফোনে বারবার নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল। সকল সরকারী ও আধা সরকারী কর্মচারী সেদিনই আমাকে তাদের এক দিনের বেতন দিয়ে যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। নোয়াখালী টাউন হলে আমরা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করি এবং মাইজদির রৌশন বাণী সিনেমা হলে আমাদের খাদ্য ও সাহায্য সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করি। পুলিশ লাইন ও জেলা স্কুলে তৎক্ষণাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।  
  
নোয়াখালীর সর্বস্তরের জনগণ পুলিশ, ই.পি.আর., আনসারসহ ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলা হানাদারমুক্ত রাখে। এ সময়ে আমরা সামরিক পোশাকে বেলুনিয়া ও নোয়াখালী সীমান্তে অবস্থিত পাক বি.ও.পি. হতে আগত অস্ত্রশস্ত্রসহ হাজার হাজার ই.পি.আর. ও আনসারকে সংগঠিত করি। ৪০/৫০ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে বন্দি অবস্থায় রাখি, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল, শিক্ষাকেন্দ্র ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করি। বেলুনিয়া বর্ডারে অবস্থিত পাক বি.ও.পি থেকে উদ্ধারকৃত মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় যা আমরা পরে ২ নম্বর সেক্টরে এবং নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর ও বিশেষ করে শুভপুরের যুদ্ধে কাজে লাগাই।  
  
২রা এপ্রিল চাঁদপুর থেকে মিজান চৌধুরী রায়পুর হয়ে নোয়াখালী আসেন। আমি মিজান চৌধুরী এবং ফেনীর এম.এন.এ. মরহুম খাজা আহমেদ সহ ছোতাখোলা হয়ে ভারতীয় বি.এস.এফ. এর মেজর প্রধান এর সহায়তায় প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করি। প্রথমে রামগড় ও পরে উদয়পুর হয়ে আগরতলায় যাই। উল্লেখ্য যে, রামগড়ে আমরা মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিকসহ কয়েকজন সামরিক অফিসার ও তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডি.সি. জনাব তৌফিক ইমামের সঙ্গে আলোচনা করি।   
  
ঐ দিনই সন্ধ্যায় আগরতলা পৌঁছার পরপরই অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রী অনিল বিশ্বাসের বাসভবনে বিবিসি ও ভয়েস অভ আমেরিকার প্রতিনিধিসহ অনেক সাংবাদিক আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং আমাদের কথা টেপ করেন। সম্ভবত বাংলাদেশে গণহত্যা ও সর্বাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে এটাই বহির্বিশ্বের প্রথম প্রচারিত বাণী। কারণ আমরা (আমি এবং মিজান চৌধুরী) যে সাক্ষাৎকার প্রদান করি তা শুনেই আমেরিকায় নিযুক্ত তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত (মিনিস্টার ও পরে পররাষ্ট্র সচিব) জনাব এনায়েত করিম, তাঁর এক ভাগ্নে ও অন্য একজনকে কলকাতায় কিড স্ট্রিটে সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে অন্তত বাংলাদেশের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আগরতলা বা কলকাতায় পাওয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নোয়াখালী বোধহয় একক ও অনন্যভাবে সরকারী কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে *একক নেতৃত্বের* মাধ্যমে প্রায় এক মাস যুদ্ধে করে সমগ্র এলাকা হানাদারমুক্ত রেখেছিল। তারপর আমরা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল ও ফরিদপুরের বেশকিছুসংখ্যক নির্বাচিত এম.পি ও এম.এন.এ. আগরতলায় একত্রিত হই। এ সময় আমাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান লিয়াজোঁ নির্বাচিত করা হয়। সে সময় কর্নেল ওসমানী, লে. কর্নেল আব্দুর রব এম.এন.এ. সহ কয়েকজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমরা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত হই। ত্রিপুরা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন বাবু এবং বিখ্যাত স্বদেশী নেতা কলকাতার ১৪ নং ক্ষুদিরাম বোস লেনের শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত আমাদের এই কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।   
  
অতঃপর ১০ই এপ্রিল জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি এবং মেজর জেনারেল আব্দুর রবকে ডেপুটি করে, বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি এবং নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি অস্থায়ী মন্ত্রীসভা ও সরকার গঠন করা হয়। অতঃপর শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত আমাকে ও কয়েকজন এম.এন.এ. ও এম.পি.কে তাঁর কর্মস্থল ও পত্রিকা অফিস কলকাতার ১৪ নং ক্ষুদিরাম বোস লেনে নিয়ে যান। ওখান থেকে আমরা বি.এস.এফ-এর হেড কোয়ার্টার ২/এ, লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে জনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলীসহ বিপ্লবী সরকারের সব মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাই। পরবর্তীকালে আমরা ‘তালা’য় অবস্থিত আন্দামান ফেরত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ শ্রী অমর গাঙ্গুলী ও মণি গাঙ্গুলীর বাড়িতে অবস্থান করে মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময় করি। কিছুদিন পর ওখান থেকে আমরা উত্তর কলকাতায় অবস্থিত ৩০নং মদন মোহন তালা স্ট্রিটে শ্রী শ্যামাপদ সাহা, শ্রী বাদল সেন, শ্রী অমল সেন, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীতে তাদের প্রেরণা ও সহায়তায় আমরা শিয়ালদহ, সল্ট লেকসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ অসহায় বাস্তুহারাকে দেখাশুনা করি। অতঃপর আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নড়াইলের তৎকালীন এম.পি.এ. মি. শহীদ ও তদানীন্তন পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর বিশেষ সহকারী মি. জাকির আহমেদ-এর সহায়তায় আমি হাইকমিশনারকে বাংলাদেশের পক্ষে Defect করার প্রস্তাব করি। তিনি প্রায় সব বাঙালী কর্মচারীসহ Defect করতে রাজি হন। তবে তিনি সমস্ত কর্মচারীর নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সরাসরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য একটি প্রস্তাব করেন।   
  
সে মতে আমি তাঁর পক্ষে এই প্রস্তাব নিয়ে ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে একটি তৃতীয় স্থানে বৈঠকের ব্যবস্থা করি। ঐমতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে পার্ক সার্কাসের ৯ নং এভিন্যুতে অবস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস বাংলাদেশ মিশন হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।   
  
ইতিমধ্যে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় দেশি-বিদেশি প্রায় শতাধিক সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য তিনজনকে মন্ত্রী, জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ও নয়জনকে সেক্টর কমান্ডার করে বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ঐ দিন রাতেই আমরা কলকাতায় ফিরি। তার পূর্ব থেকেই আমাকে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের এম.এন.এ. ইনচার্জ করে বিধান রায়ের বাড়ি ৪৭ প্রিন্সেপ স্ট্রিটে দফতরের ভার দেয়া হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীকেও পরে যুক্তভাবে এই পদে একই জায়গায় নিয়োগ করা হয়। পরে পরিচয়পত্র প্রদান, ইত্যাদি ব্যাপারে কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান তাঁর মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে নেন। সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের আরো দুইটি অতিরিক্ত অফিস নেয়া হয়। একটি ৩/১, কামাক স্ট্রিটে এবং অন্যটি ১নং বালিগঞ্জে। শ্রী জি. এস. ভৌমিক Defected জেলা দায়রা জজকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। জনাব কাওসার আলী সহ অনেকে যুক্তভাবে আমাকে সহায়তা করেন। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ৯ মাস যুদ্ধকালে আর কোনো মন্ত্রী নিয়োগ করেননি। আমাদের এম.এন.এ. ইনচার্জদের মন্ত্রীর স্ট্যাটাস দেয়া হয়। ৩/১, কামাক স্ট্রিটে বিদেশ হতে প্রাপ্ত টাকা, চেক, ইত্যাদি গ্রহণ করা হতো। এখানে জনাব কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী এবং আমি ছাড়া আর কোনো লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না।  
  
পরে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি (Personal envoy) হিসেবে মনোনীত করেন এবং জুন মাসে বিভিন্ন রণাঙ্গনে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও নেপালে সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। পালাটোনায় ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, এম.এন.এ. ও ভারতীয় ক্যাপ্টেন ধর আমাকে নিয়ে প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মেলাঘরে প্রায় চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার হাতে শপথ গ্রহণ করে। মেজর খালেদ মোশারফ, ক্যাপ্টেন হুদা, মেজর হায়দার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপভাবে আমি রাজনগর, ধর্মনগর, ছোতাখোলা, বিলোনিয়া, বেগুলা, মাঝদিয়া, চরিলাম, সাবরুম, পূর্বাঞ্চলীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও করিমপুর, শিকারপুর, ইছামতি, ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বহু ক্যাম্পে গমন করি এবং বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করি। উল্লেখ্য যে, আমাদের বহু খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা দেশের অভ্যন্তরে থেকেই সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জনাব রুহুল আমিন ভুঞা, খালেদ মোহাম্মদ আলী এম.এন.এ., মাহমুদুর রহমান, বেলায়েত ও আমার দুই ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন ও বাহার উদ্দিনসহ এরা প্রায় ৯ মাস দেশের অভ্যন্তরেই ছিলেন।  
  
১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করার পরই আমি কিছু নগদ টাকা ও দুই ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী যথা রেইন কোট, কিটস, ইত্যাদি নিয়ে আগরতলায় এসে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিতরণ করি। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬৩ জন এম.পি.এ., এম.এন.এ.-এর উপস্থিতিতে আমার সভাপতিত্বে পূর্বাঞ্চলীয় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ইতিপূর্বে এ পদ নিয়ে খুব দলাদলি ও দ্বন্দ ছিল। ইতিমধ্যে আমি নিজের কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়ন ও পরিবারের স্ত্রী, মাতা, পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে, সকলের খোঁজ-খবর নেয়া এবং নোয়াখালী জেলার সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ২৪শে এপ্রিল বেলুনিয়া হয়ে নোয়াখালী প্রবেশ করি। মাইজদি গিয়ে দেখি বাসা ফাঁকা, সব মালপত্র আছে কিন্তু বাড়িতে কোনো মানুষ নেই। অনুরূপভাবে জেলা প্রশাসক, জজ, পুলিশ সুপার সকলেই নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ হানাদার বাহিনী লাকসাম হয়ে রেল লাইন ধরে দ্রুত নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গভীর রাতে আমি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে শুধু ঘন্টাখানেকের জন্য আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সাথে দেখা করি। সঙ্গে সঙ্গেই একটি জিপ ঐ বাড়িতে আসে এবং রিজার্ভ পুলিশের ইন্সপেক্টর মি. খান এসে বলেন, স্যার, এখনই আপনাকে চলে যেতে হবে, কাল আর বর্ডার ক্রস করতে পারবেন না। হানাদার বাহিনী মাইজদি টাউন হতে মাত্র ১০/১৫ মেইল দূরে চৌমুহনীর উত্তরে অবস্থান নিয়েছে। কাজেই ঐ মুহূর্তে হতভম্বের মত আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। সঙ্গে ছিল আমার ল্যান্ড রোভার জিপ আর ড্রাইভার মাহমুদ, চৌমুহনী বিদ্যামন্দিরের হেডমাস্টার সালাউদ্দিন এবং সোনাইমুড়ির গোলাম মোস্তফা। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে ২৫শে এপ্রিল বর্ডার ক্রস করে বেলুনিয়া পৌঁছি। আসার সময় স্ত্রীকে বলে আসি, “খোদা হাফেজ, চরাঞ্চলে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চেষ্টা করো।” বর্ডারের কাছে এসে এক নিরাপদ স্থানে জনাব সালাউদ্দিন ও গোলাম মোস্তফাকে নামিয়ে দেই। এস্কর্ট পার্টি হিসেবে মি. খানের জিপ ৩/৪ জন পুলিশ বর্ডার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বস্ত ড্রাইভার মাহমুদ বাবা-মা ছেড়ে আমার সঙ্গে ছিল।   
  
২৬ এপ্রিল তারিখে নোয়াখালীর পতন হয়। সমগ্র শহর হানাদার বাহিনী দখল করে নেয়। আগরতলায় এসে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং অন্যান্যের সঙ্গে বিশেষ করে ২নং সেক্টরের মেজর খালেদ মোশারফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রেরণের ব্যবস্থা করি।  
  
ইতিমধ্যে মুজিবনগর থেকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা গমনের জন্য আমার ডাক আসে। আমি পূর্বেই সব কিছু জহুর আহমদ চৌধুরীকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাই। ৯নং সার্কাস এভিনিউ অর্থাৎ ‘বাংলাদেশ মিশন’-এ দেশি-বিদেশি অনেক ব্যক্তি, বিশেষ করে পিটার হেজেল হার্স্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের প্রতিনিধি হেনরি হাওয়ার্ড গেস মার্ক গায়েন এর সঙ্গে আমি বাংলাদেশের গণহত্যা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করি। এখানে প্রয়াত ড. মুজাফফর আহমদও উপস্থিত ছিলেন। কখনও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদও উপস্থিত থাকতেন।  
  
ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমার গ্রামের বাড়ি(রাজাপুর), শ্বশুরবাড়ি(আবদুল্লাহপুর) এবং দুই বোনের বাড়ি (যথাক্রমে করিমপুর ও বারইপুর) হানাদাররা আক্রমণ করেছে। আমার মাইজদির পাকা দ্বিতল বাড়ি অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার শ্বশুরবাড়িতে সৌভাগ্যবশতঃ স্ত্রী ও বড় দুই মেয়ে সেদিন উপস্থিত ছিল না। ঐ দিনই সন্ধ্যায় রাতে তারা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। ছোট দুই মেয়ে লিলি ও মায়া (১০ বৎসর, ৭ বৎসর)সহ বাড়ির সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে বন্দি করে বাহির বাড়িতে উঠিয়ে নেয় এবং সমস্ত পুরুষকে ট্রাকে করে মাইজদি ক্যাম্পে নিয়ে আসে। দীর্ঘ ৪ মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখে তাদের উপর নির্যাতন করে, এবং গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়। ৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে। পরে অবশ্য তারা বাড়ির সমস্ত মহিলা ও শিশুকে এক বালুচ ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে আমার বড় ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন (লাতু) পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে কচুরীপানার নিচে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হানাদাররা দুই বোনের সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। ছোট বোনটির মৃত্যু এর পূর্বেই হয়েছিল এবং তার স্বামীও জীবিত ছিল না। একমাত্র ভাগ্নে মফিজ তখন সামরিক বিভাগের চাকুরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোহাটে আটক। ভাগ্নী জামাই মমিনউল্লাহ এবং তার বড় ভাইয়ের কলেজে পড়ুয়া দুই ছেলে নূরউদ্দিন, শাহাবুদ্দিনসহ নয়জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হানাদার বাহিনী ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক খবর আমাকে জানানো হয়নি। যেমন জহুর আহমদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ছেলের মৃত্যু সংবাদও তাঁর নিকট গোপন রাখা হয়েছিল। আ স ম আব্দুর রব ও অন্যান্যের চেষ্টায় আমার স্ত্রী, কন্যা ও মৃত ভগ্নীর ছেলে মনজু এবং আমার ছোট ভাই এনায়েত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেলোনিয়ায় পৌঁছে। এ সময় মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। স্মর্তব্য, কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ এবং আলীগড়সহ ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান যুদ্ধের প্রথম দিকে তীব্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে। তাদের ধারণা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাদের ভ্রমাত্মক ধারণা দূর করার জন্য মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী আমাকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসেবে নদীয়া, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। এ সময় ফরিদপুর থেকে লক্ষাধিক তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক উপরিউক্ত এলাকাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে বহরমপুর সীমান্তে একদিনেই প্রায় ১০ হাজার নমশুদ্র ঢাল সড়কি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আল্লাহর রহমতে আমি, মরহুম গোলাম কিবরিয়া এম.এন.এ., আজিজুর রহমান আক্কাছ এম.এন.এ. ও অন্যান্য এমপি এবং বহরমপুরের তরুণ আই এ এস অফিসার মি. ডি কে ঘোষ-এর সহযোগিতায় প্রত্যেক মুসলমানের বহিঃ বাড়ির ঘর, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সমস্তই বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের জন্য ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সফলকাম হই। এমনকি সরকারী নির্দেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মারওয়ারীদের বিরাট বিরাট পাটের খালি গুদাম বাস্তুহারাদের জন্য খালি করে দেয়া হয়। মিসেস সুভদ্রা এমপি ও তদানীন্তন কংগ্রেসের মহাসচিব হেনরি অস্টিন সহ আমরা উত্তরাঞ্চলের আলীগড়, মীরাট ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কাজে বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও গণসংযোগ করি। এ সময় আমার নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদলকে নেপালে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি সরকারী নির্দেশ দেন । অপর দুই সদস্য ছিলেন শ্রী সুবোধ মিত্র ও আব্দুল মমিন তালুকদার এম, এন, এ । আমার নেপাল যাওয়ার পূর্বে দিল্লীস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন হতে যে দুইজন ডিপ্লোম্যাট কে , এম সাহাবুদ্দিন এবং জনাব আমজাদুল হক ডিফেক্ট করেছিলেন তাঁদের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রায় দুসপ্তাহ দিল্লীতে অবস্থান করি। এ সময় আমার আমরা সর্বভারতীয় সংগ্রামী নেতা শ্রী আচার্য কৃপালনি ( যিনি কলকাতার কনভোকেশনে গভর্নরকে গুলি ছুড়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামান হতে ফিরেছিলেন ) , শ্রী পান্নাপাল দাসগুপ্ত ও শ্রী অমর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে অনেক তথ্য ও মূল্যবান উপদেশ লাভ করি ।

এরপর আমরা নেপাল যাই । নেপাল তখন ছিল পাকিস্তানের খুব ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী রাষ্ট্র। সৌভাগ্যের বিষয় এই সময় কাঠমুন্ডুতে তিনজন পাকিস্তানী কূটনীতিকের মধ্যে দুইজন বাঙালি । জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সি,এস,পি, এবং জনাব মোখলেছউদ্দিন সি,এস,পি ছিলেন । সচিবালয়ের একজন প্রবীন লোক ছিলেন তিনিও ছিলেন ভোলার অধিবাসী । এঈ সফরে আমরা নেপালের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ সাহা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী থাপা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ , সাংবাদিক , সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করি । তাঁরা সকলেই "বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি" নাম দিয়ে বাস্তুহারাদের সাহায্য এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেন। তাঁরা কয়েকটি ছাত্র-যুবসমাবেশের এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান নেপালের রাজার পিতা শ্রী বীরেন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন। বর্তমান রাজার আপন মামা ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতিসংঘে নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ঋষিকেশ সাহা। তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজদরবারে মুজিবনগর সরকারের ছবি ও কাগজপত্র প্রদান করি।

নেপাল হতে প্রত্যাবর্তন করে আবার ১ নং বালিগঞ্জে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে যোগদান করি । ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত কাজেই নিয়োজিত ছিলাম । ১৬ই ডিসেম্বর এর পরে আমি আগরতলা হয়ে নোয়াখালী চলে যাই । ইতিপূর্বে ৬ই ডিসেম্বর হতেই নোয়াখালী হানাদার মুক্ত হতে থাকে । কাজেই আগরতলা ,উদয়পুর এবং বেলোনিয়ায় অবস্থানরত হাজার হাজার শরণার্থী ও প্রায় অধিকাংশ বাস্তুহারা এবং এম পি এ, এম এন এ ও অন্যান্য প্রায় সব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের পরিবার-পরিবর্গ নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন করেন । এমনকি আমার দুই ছেলে ও তখন নোয়াখালীতে । কাজেই আমার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা শুধু আমার অপেক্ষায় উদয়পুরে অধীর আগ্রহে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল ।

ইতিপূর্বে পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান আমাকে সমগ্র নোয়াখালী (ফেনী ও লক্ষীপুরসহ) জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আমার মন্ত্রীসভার যোগদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম।  
  
এখানে অত্যন্ত গর্বের সাথে উল্লেখ করতে পারি যে নোয়াখালী জেলা হানাদারমুক্ত হবার ও আমাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেয়ার পরে কোনো স্থানে কোনো হত্যাকাণ্ড বা লুটতরাজ অথবা রাহাজানি হয়নি। এমনকি ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও মুক্তিযোদ্ধারা যাদের হত্যা করেছিল তাদেরও কোনো মালামাল বা ঘরবাড়ি লুটপাট করেনি। আমি মুজিব বাহিনী, মুক্তিবাহিনী এবং শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন বাহিনীকে নোয়াখালী জেলা স্কুল, হরিনারায়ণপুর স্কুল ও অন্যান্য স্থানে অস্ত্রশস্ত্রসহ শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের নির্দেশ দেই। ফেনী, লক্ষীপুর, রামগতি, কোম্পানীগঞ্জসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে ৪/৫ হাজার নগদ টাকা এবং নোয়াখালী সেন্ট্রাল স্টোরে রক্ষিত কাপড়, কম্বল, চাউল-গম-ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করি। বিশেষ করে ডেলটা জুট মিলের ও দোস্ত মোহাম্মদ টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করি। সৌভাগ্যের বিষয় রাজাকার তহবিলে গচ্ছিত প্রায় ৮০ লাখ টাকা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং ছাত্র শ্রমিক ও বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বিলি বণ্টন করি। পরে তদানীন্তন কুমিল্লা গ্যারিসনের কমান্ডার মেজর জিয়াকে মাইজদিতে নিয়ে ১০ই জানুয়ারির পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের নিকট প্রত্যার্পণ করার আহ্বান জানাই এবং জমা নেই।  
  
-আব্দুল মালেক উকিল   
১ জুলাই, ১৯৮৪।



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

**<১৫,৮,৪২-৫১>**

# [আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি]

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি জেনেভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থার সদস্য। এই সম্মেলন চলাকালে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বিবিসি'র মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, বাংলাদেশের অবস্থা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ঢাকায় সাংঘাতিক কিছু হয়েছে কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে সঠিক কিছু জানা যাচ্ছে না। এই খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত, চিন্তিত এবং ব্যাকুল হয়ে উঠি। অধিবেশন চলা অবস্থায় মানবাধিকার সংস্থারতৎকালীন সভাপতি আঁদ্রে আগিলাকে আমি জানাই যে আমার দেশ সংক্রান্ত গভীর দুঃখজনক সংবাদ আমি জানতে পেরেছি এবং এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে অধিবেশনে অংশগ্রহণ আর সম্ভব নয়। আমি মধ্যাহ্নে জেনেভা ত্যাগ করি এবং বিকেলের দিকে লন্ডন এসে পৌঁছি।

আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দুজন কর্মকর্তাকে চিনতাম। একজন হচ্ছেন ইয়ান সাদারল্যান্ড, তিনি ছিলেন দঃ এশিয়া বিভাগের প্রধান এবং অপরজন হচ্ছেন এন, জে, ব্যারিংটন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরের দিন যদিও ছুটির দিন ছিলো তবুও আমি উভয়কে তাদের অফিসে আসতে অনুরোধ জানাই। এবং দুজনেই তা রক্ষা করেন। পররাষ্ট্র ভবনে উপস্থিত হলে তারা আমাকে জানান, ঢাকা থেকে এখনো সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করা হয়। আমরা কফি খাচ্ছি এমন সময় মিঃ সাদারল্যান্ডের একান্ত সচিব খবর দেন যে ঢাকা থেকে একটি টেলেক্স এসেছে। মিঃ সাদারল্যান্ড তথ্য সম্পূর্ণ হলে সেটি নিয়ে আসতে বলেন। সচিব একটি বিশাল টেলেক্স নিয়ে আসেন এবং সাদারল্যান্ড গোটা জিনিসটা পাওয়ার পর আমাকে বলেন জাষ্টিস চৌধুরী, আমি অত্যান্ত দুঃখিত, ঢাকার সংবাদ খুবই খারাপ। বহু ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমরা ভীত যে, শিক্ষকরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বাদ পড়েনি। নগরে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেশী।

আমি আরো জানতে পারি যে, বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার জানিয়েছেন তার পক্ষে আর টেলেক্স করা সম্ভব নয় এবং তিনি বৃটিশ নাগরিকদের ফেরত নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই মুহুর্তে আমার মনে হলো যে, গোটা বাংলাদেশ একটি বধ্যভুমিতে পরিনত হয়েছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে পাকিস্তান সরকারের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা অপমানজনক। যারা আমার ছাত্রদের মেরে ফেলেছে আমি কিভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারি। আমার মনে পড়ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের কথা। আমি তখনই লর্ড হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় তিনি স্কটল্যান্ডে তার দেশের বাড়ীতে ছিলেন। আমি অবিলম্বে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সাধারণ সম্পাদক আর্নল্ড স্মিথের সঙ্গে দেখা করি এবং ঢাকায় হত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির চেষ্টা করতে বলি। এখানে একজনের নাম বিশেষ করে বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম পিটার'স। এই ভদ্রলোক একাত্তর সালে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদের আশা আকাংখার প্রতি অত্যন্ত সহানুভুতিশীল ছিলেন। এবং তার সাথে আমি সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করি।

জেনেভা থেকে লন্ডনে আসার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেখানে বসবাসরত বাঙালিদের সাথে আমার দেখা হয় এবং মিঃ সাদারল্যান্ডের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। আমি আগেই বলেছি, পরের দিন তার সাথে দেখা করি এবং ঢাকা থেকে পাঠানো টেলেক্স-এ খবর পাই। হাবিবুর রহমান, সুলতান শরিফ এবং অন্য কয়েকজন আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মিঃ হাবিবুর রহমান আমাকে পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়ে যান। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। সে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে বহু বাঙালি জড় হতে থাকে। সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে বিশেষভাবে আমি কয়েকজন ডাক্তারের কথা বলতে চাই যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন। নয় মাস ধরে যে আন্দোলন চলেতাতে কিছু কিছু কর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু ডাক্তার কর্মীরা কোনোদিন কোনো অসুবিধা করেননি বরং তাদের ত্যাগ কর্মনিষ্ঠা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রজ্বলিত ছিলো। ডাঃ আব্দুল হাকিম, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং মোশারফ হোসেন জোয়ারদার সারাক্ষন পরিশ্রম করতেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র বৃটেনে বাঙালিদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি বাঙালি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় কমিটি গঠন করে। কিন্তু একটি সংগঠনের সাথে আরেকটি সংগঠনের যোগাযোগ ছিলো কম যার ফলে নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়, এবং নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই আমাকে তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য চাপ দেয় কিন্তু আমি একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হলে কোনো দলেই যোগ দেব না বলে জানাই।

লর্ড হিউমের সাথে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই মধ্যবর্তী সময়ে আমি বিভিন্ন একাডেমিসীয়ান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকি। এ ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ্যালেন বুলক এবং ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লর্ড জেমসের সঙ্গে দেখা করি। তারা আমাকে স্যার হিউ স্প্রিংগারের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি ছিলেন কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মুখপাত্র।

ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড জেমস একটি মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় বিশজন বিভাগীয় প্রধানকে ঐ ভোজে দাওয়াত করেন। আমি তাদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি এবং তারা গভীর সহানুভুতির সঙ্গে তা শোনেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালে লর্ড জেমস ঢাকায় গিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতবাণী করেন যে, ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনী হিসেবে ব্যবহার করা আর সম্ভব হবে না। এরপর আমি স্যার হিউ স্প্রিং-এর সাথে দেখা করি। তিনি বলেন, "হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা আমার নৈতিক দ্বায়িত্ব" । তিনি আরো বলেন, তিনি তখনি ইয়াহিয়া খানকে একটি টেলিগ্রাম করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য।

তারপর আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশনের সাধারণ সম্পাদককে টেলিফোন করে সমস্ত ব্যাপার জানাই। তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তাতে তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ আন্দোলনে তৎপর বিভিন্ন সংগঠন একত্রীকরণ করার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করি। এই কাজটি ছিলও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত মিটিং চলতো এবং বাড়ী ফিরে নিজের কাছে শপথ করতাম যে পরদিন আর যাবো না। কে কোন দলের নেতা হবেন তা নিয়ে মতবিরোধ ছিলো। কিন্তু পরদিন আবার ঠিকই যেতাম।

১০ই এপ্রিল লর্ড হিউমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সাদারল্যান্ড এবং ব্যারিংটন আমাকে তার কাছে নিয়ে যান। লর্ড হিউম আমাকে দেখার সাথে সাথেই বলেন যে তিনি পাকিস্তানের হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অবস্থা ঠিকই আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি বলি শুধুমাত্র একজনের কথাতেই প্রমাণ হয় না যে অবস্থা ঠিক আছে। আমি আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য পেশ করি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাঁচানোর জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট খবর আছে শেখ মুজিব ভালোই আছেন। এই সাক্ষাৎকারে লর্ড হিউমকে আমি জানাই, আমরা শান্তি এ শৃঙ্খলার সাথে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। সেদিনই আমি চারটার সময় বিবিসি'তে যাই। মিঃ ট্রার গিল সেখানে আমার একটা একক সাক্ষাৎকার গ্রহন করেন। এই সাক্ষাৎকারে আমি পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষনা করি। বিবিসিতে কর্মরত দুজন বাঙালি সিরাজুর রহমান ও শ্যামল লোধ আমার বিবৃতি নেন এবং প্রচার করেন।

আমি বিবিসি'তে বিবৃতি দিয়ে বের হবার সময় পাকিস্তানী হাই কমিশনের মিঃ মহিউদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কি করবেন। আমি তাকে বলি যথাসময়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। কেননা তখনো মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়নি। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এক সরকারী কর্মচারীকে সেই মুহুর্তে পদত্যাগ করতে বলা উচিত হত না। পরে অবশ্য আমরা মিঃ মহিউদ্দিনকে পদত্যাগ করতে বলি এবং তিনি তা করেন।

আমি যে জায়গায় থাকতাম সেখানে পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে বার বার টেলিফোন করে আমাকে হাইকমিশনারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি তা প্রত্যাখান করি। অতঃপর আমি বাসা পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নেই। কয়েকদিন পরে গোছগাছ করে যখন আমি রওয়ানা হচ্ছি তখনই একটা টেলিফোন আসে। জানতে পারি টেলিফোনটি কলকাতা থেকে করা হয়েছে এবং অপরাপর কথা বলেছেন টাংগাইল থেকে সাংসদ জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম। এই টেলিফোন সরকার গঠনের কয়েকদিন আগে আসে। তারা আমাকে জানান যে, তারা আমার সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং তারা চান যে, সরকার গঠনের পর আমি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করি।

অস্থায়ী বাসস্থানে যাবার পর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে একটি ফোন পাই। কিভাবে তারা আমার নতুন ঠিকানার খবর জানলো ঠিক বুঝতে পারিনি। তারা আমার সঙ্গে দেখা করে জানান যে, পাকিস্তান সরকার আমাকে অপহরণ করার জন্য কিছু পাকিস্তানী লোক নিয়োগ করেছে এবং আমাকে অনুরোধ করেন অত্যন্ত সতর্কভাবে চলাফেরা করতে। তারা আরো জানান সরকারী পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যুক্তরাজ্যে থাকাকালে আমার জন্য ছদ্মবেশী কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। তারা বিশেষভাবে চলাফেরার ব্যপারে আমাকে সতর্ক করে দেন এবং ভূগর্ভস্থ রেলে ভ্রমন করতে বারণ করেন। কেননা এগুলি বিদ্যুৎচালিত এবং ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করার সম্ভাবনা বেশী, বাসে চলা অধিক নিরাপদ এবং পায়ে হেটে চলা আরো নিরাপদ। কারন এতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পক্ষে চোখ রাখা সহজ। তারা বলেন যে, যদিও সময় আমার উপর তাদের নজর থাকবে তবু যে কোনো বিপদে একটি বিশেষ টেলিফোন নাম্বারে যেন যোগাযোগ করি। সবশেষে তারা বলেন যে, এইসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থন হিসেবে নয়। তারা চান যে, যুক্তরাজ্যের মাটিতে এমন কিছু না ঘটুক যাতে যুক্তরাজ্য সরকারের সম্মান ক্ষুন্ন হয়। এই ঘটনার কিছু পরে বৃটেনে বসবাসরত বাঙালিরা কাভেন্ট্রিতে একটি সভার আয়োজন করে। প্রকৃতপক্ষে এই অনুষ্ঠানে যাবার আমার খুব একটা উৎসাহ ছিলো না। কারণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ এতো বেশী হত যে আমি খুবই বিমর্ষ বোধ করতাম। এছাড়া আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও ছিলো না। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তেই জনাব রকিবউদ্দিন আমাকে মুজিবনগর সরকারের নিয়োগপত্রটি দেন এবং আমি কাভেনট্রিতে উপস্থিত হই। সভায় তুমুল হট্টগোল চলছিলো। আমরা বেগম লুলু বিলকিস বানুকে অনুষ্ঠানের সভাপতি করে কাজ শুরু করি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই সভা পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালে জনাব রকিব আমার নিয়োগপত্রটি পড়ে শোনান। কিন্তু আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল থাকায় আমি মর্মাহত অবস্থায় হল ত্যাগ করতে উদ্যত হই। এ সময় জনাব মিনহাজ উদ্দিন নামে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে বহু কলহ হয়েছে, এই কলহে আমাদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে। আমরা আর কলহ চাই না। আপনি যাবেন না। এরপর আরো আধঘন্টা ধরে আলাপ আলোচনা হয়। এবং গউস খান প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হোক। এর নামকরণ করা হয় 'ষ্টিয়ারিং কমিটি অব পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'। আমি সভাপতির পদ গ্রহন করতে দ্বিধাবোধ করি। কারন আমার ভয় ছিলো এই সংগঠন আবার ভেঙ্গে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আমি ভাবছিলাম, আমার মূল দ্বায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ব জনমত গঠন করা এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। যাহোক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ষ্টিয়ারিং কমিটি তার কর্মকান্ড চালাবে আমার উপদেশ মতো।

১১ নম্বর গোরিং ষ্ট্রীটে এই কমিটির জন্য অফিস নেওয়া হয়। অফিস ঘরটি ছিলো জনাব হারুনুর রশীদের। তার পাটের ব্যবসা ছিলো। কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ আব্দুল মান্নান, শামসুর রহমান, মিঃ কবীর চৌধুরী। আর মিঃ আজিজুল হক ভুইয়া ছিলেন আহবায়ক। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করা এবং অস্র সরবরাহ ও সাংগঠনিক কাজের জন্য মূলতঃ বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ। পরে যখন দেখা গেল অস্র সরবরাহে নানা বাঁধা তখন আর অর্থ সংগ্রহের জন্য তেমন প্রচারণা চালানো হয়নি।

মুজিবনগর সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন মিঃ ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ, প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ ষ্টোন হাউস এবং আমি। এ কমিটিতে কয়েকজন বাঙালির সদস্য হবার কথা ছিলো। কিন্তু কোন কোন বাঙালি নিয়ে ফান্ড হবে তা ঠিক করতে না পারায় আপাতত এই তিনজনকে নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। পরে আরো নেবার কথা ছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় সংগৃহিত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষনা করা হয়।

পাকিস্তানি দূতাবাস এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে এবং বহুলাংশে সফল হয়। কোনো ব্যাংকই একাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত হ্যামব্রোজ ব্যাংক রাজী হয় এবং সেখানে একাউন্ট খোলা হয়।

কিন্তু পাকিস্তান হাই কমিশন চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে যার ফলে হঠাৎ করে একদিন হ্যামব্রোজ ব্যাংক আমাদের জানায় তারা এই একাউন্ট চালাতে দেবে না এবং আমাদের সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশ বলে কোনো দেশ নেই। অথচ ফান্ডের নাম বাংলাদেশ ফান্ড। এই ঘটনাটি ঘটে জুন মাসে। তখন আমাদের একাউন্টে এক লক্ষ পাউন্ড সংগৃহিত হয়েছিলো। ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হই এবং বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন জন ষ্টোন হাউস(এমপি) এবং তিনি ন্যাশনাল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে দেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই ব্যাংক পূর্বে আমাদের একাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হয়নি। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে করে সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া যায়। ইংল্যান্ডের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ব্যক্তি সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারেন। অর্থ সংগ্রহ এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য নানা প্রান্তে একশটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই আমি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকি এবং কনসারভেটিভ পার্টির প্রফেসর জিনকিন'স এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি একজন প্রাক্তন আই, সি, এসঅফিসার ছিলেন। কনসারভেটিভ পার্টির অফিসে একটি সভার আয়োজন করি এবং তাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারন তুলে ধরি।

লেবার পার্টির সদস্যদের সাথেও আমার যোগাযোগ হয়। তারা আমাদের এই আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভুতিশীল ছিলেন। তারা একটি সভার ব্যবস্থা করেন। এ সভা পার্লামেন্ট ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে এটি ছিলো আমাদের আন্দোলনের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতির ইঙ্গিত। মে মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমার আনুষ্ঠানিক কর্মের অংশ হিসেবে মে মাসে নিউইয়র্ক যাই। ওখানকার বাঙালি কুটনীতিক জনাব মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে প্রায় দুশো বাঙালি আমার সাথে বিমানবন্দরে মিলিত হয়। এই দৃশ্য অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলো। কারন এতে করে আমাদের আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের লক্ষণ দেখা যায়। যেদিন আমি নিউইয়র্কে পৌঁছি আরো কয়েকজন বাঙালি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যথা- জনাব এ, এম, এ মুহিত, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব হারুন রশীদ এবং আরো অনেকে আমার সাথে দেখা করেন। এবং আমি তাদের সাথে মিলিত হই এবং প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরি। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত জনাব বারুদী যিনি খৃষ্টান ছিলেন, রোকেয়া হলের ঘটনা শুনে তিনি এতো বেশী আলোড়িত ছিলেন যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন যে, তিনি সৌদী বাদশাহকে সমস্ত কথা জানাবেন এবং সর্বতোভাবে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কুটনৈতিক সদস্যের সঙ্গেও দেখা করি এবং বক্তব্য রাখি। জাতিসংঘের তৎকালীন অধিবেশনের সভাপতি নরওয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। তার সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা প্রচারপত্র বিলি করি এবং বিভিন্ন সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই।

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। তিনি আমাদের জানান যে তার সাথে সরাসরি দেখা করা আমাদের বিপক্ষে যাবে। কেননা তিনি নীরবে আমাদের জন্য কাজ করে যেতে চান। দেখা না করলে পাকিস্তানে চাপ প্রয়োগের সুযোগ অনেক বেশী থাকবে। তিনি আরো বলেন যে, এ সিদ্ধান্ত আমাদের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি জাতিসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠান।

আমি যখন ইংল্যান্ডের বাইরে যেতাম তখন শেখ মান্নানকে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দিতাম। কারন তিনি ইংল্যান্ডে থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তার দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। বৃটেনের বিভিন্ন জায়গায় আমরা সভা করি এবং আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারন করে।

এরই মাঝে ফ্রান্সের সাথে আমরা যোগাযোগ করি এপ্রিলের শেষের দিকে। আমি সেখান গিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি। সেখানে থাকতে একজনের সাথে আমার গুরত্বপূর্ণ যোগাযোগ হয়, তিনি হচ্ছেন মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী জনাব সিউ সাগর রামগোলাম। তাকে আমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ জানাই। বিভিন্ন অবস্থার কারনে তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি কিন্তু অন্য সব ধরনের সাহায়্য তিনি আমাদের করেন। আমি প্যারিসে তার সাথে একদিন আমাদের আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি তার দেশের লন্ডনস্থ দূতাবাসকে আমাদের সব ধরনের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন। এ ছাড়া আমরা কিছু বাঙালি ছাত্রকে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে পাঠাই। আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সভায়ও আমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করি।

বৃটেনে অবস্থিত "সোস্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের" সাধারণ সম্পাদক হ্যান্স ইয়ানিতশেক আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেন। তিনি বলেন আমার অফিস তোমাদেরই অফিস, তোমরা এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারো। এখানে বলা উচিত যে, কিছুদিন আমরা এই প্রস্তাবের সদ্ব্যবহার করি।

লন্ডনে জার্মানীর প্রাক্ত চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাকে জানাই যে স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অন্য কোনো পথ সম্ভব নয়। তিনিও আমাদের সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে বলা যায় যে, যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আমরা অত্যন্ত সহানুভুশীল অভ্যর্থনা এবং সাহায্যর আশ্বাস পেয়েছি। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, বৃটেনের প্রেস আমাদের খবর এমনভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছিল যে, জনমত আমাদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলো। জুন-জুলাইয়ের দিকে একটি গুঞ্জন ওঠে যে, আমাদের ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আমি অনুসন্ধান করে দেখি যে এ সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। জুলাই মাসে বৃটেনে অবস্থিত বাঙালিদের আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জোরদার হয়ে ওঠে। আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখে আমরা ট্রাফলগার্ড স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা করি। এটি ছিল লন্ডনে অনুষ্ঠিত আমার জানামতে সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক এই সমাবেশে উপস্থিত হন। এলাকার চারিদিকে সমস্ত বাড়ীঘরের ছাদে লোকজন ভর্তি হয়ে যায়। এই সভাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মহিউদ্দিন বাংলাদেশের প্রতি তার আনুগত্যের কথা ঘোষনা করেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকারের সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মিশন চালু হয়। ২৪ নম্বর প্রেমরিজ গার্ডেনে মিশনের অফিস খোলা হয় এবং এই ভবনটি ব্যবস্থা করেন ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ। আগষ্টের শেষে পুরোদমে এই মিশনের কাজ শুরু হয়। এই সময় ডঃ মোশারফ হোসেন জোয়ার্দারের মাধ্যমে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জহরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন। তিনি সুবেদ আলী নাম নিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং বৃটেনে এই ২৪নং প্রেমরিজ গার্ডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সমস্ত খরচ বহন করতেন। মিশন হওয়ার পর আমি এর প্রধান হিসেবে যোগদান করি। বহির্বিশ্বে এটাই বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস।

আমার বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার দ্বায়িত্ব ছিলো আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করা। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আন্দোলন বেশ শক্তিশালী আকার ধারণ করে।

নেদারল্যান্ডেও একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিলো। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব জহির উদ্দিন এবং আমীর আলী। জুন মাসের দিকে ঠিক হয় যে, আমি এ্যামষ্টেডামে যাবো। একদিন পূর্বেই হঠাৎ করে আমার বাসায় এ্যামষ্টেডামের টেলিভিশনের একটি দল উপস্থিত হয় এবং আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এতে আমাদের আন্দোলন ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বলা যেতে পারে অন্য দেশ থেকে এসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা আমাদের আন্দোলনকে এক ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের শামিল।

ডাচ পার্লামেন্ট ভবনে বৈদেশিক বিষয়ক উপ পরিষদে তিন ঘন্টা আলোচনা করি। যাদের সঙ্গে আলোচনা হয় তারা ছিলেন মিঃ টারবিক, জ্যাঁ প্রাংক, মোমেসত্যাগ, স্বাধীকার, ভ্যান উস্তেন। তারা প্রায় সবাই বুঝতে পারেন কেন আমরা স্বাধীনতা দাবী করেছি। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সহানুভুতি প্রকাশ করেন এবং আমাদের বিজয় কামনা করেন। পার্লামেন্টে আমাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আমাদের প্রেস কনফারেন্সটি অত্যন্ত সফল হয়েছিলো। ডাচ সরকার আমাদের পক্ষে একটি বিবৃতি দান করেন এবং সরাসরিভাবে পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠান। ডেনমার্কেও আমাদের সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। আগষ্ট মাসের দিকে আমরা সেখানে যাই। ডেনিশ পার্লামেন্টের স্পীকারের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমাদের বক্তব্য পেশ করি। তিনি আমাদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। এখানে এক ভদ্রমহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তার নাম কিনটেন ওয়াট বার্গে। তার গৃহ আমাদের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তিনি বাসায় একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেখানে অনেক বাঙালিও উপস্থিত হন। ওই ভদ্রমহিলাকে কেন্দ্র করে কমিটি গঠন করা হয়। আমরা সেখানেও ব্যাপক প্রচারকার্যে সফল হই। ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস, এ, ডামের সঙ্গেও দেখা করি। আরেকজন যিনি আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন তিনি ছিলেন 'পলিটিকেন' পত্রিকার সম্পাদক জন ডেনষ্ট্যাম্প। তিনি শুধু আমাদের পক্ষে পত্রিকাতেই লিখেননি, বরং সাথে সাথে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচারের ব্যবস্থাও করেন। ডেনিশ টিভি সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের আন্দোলনের পক্ষে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটে। যিনি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সাক্ষাৎকার শুরু হবার পূর্বেই আমাকে জানান যে, তিনি খবর পেয়েছেন একটি ডেনিশ কোম্পানী পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্র বিক্রয় করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করা হবে যাতে আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি। সাক্ষাৎকার শুরু হবার সাথে সাথে আমি তথ্যটি জানাতে সক্ষম হই এবং সমস্ত বিষয়টির প্রতিবাদ ও ডেনমার্ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারা আমাকে আশ্বাস দেন যে এই অস্ত্র কিছুতেই পাঠাতে দেয়া হবে না। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের আন্দোলনের প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের কি ধরনের সমর্থন ছিল। এছাড়া আমি বিরোধী দলের নেতা পল হার্টলিংকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি।

নরওয়েতে দশ বারো জনের বেশী বাঙালি ছিলো না কিন্তু আন্দোলন ছিলো ব্যাপক। এর কারণ, নরওয়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা মিঃ বুল আমাদের আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য জনমতের জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাদের প্রচেষ্টায় জাতীয় টেলিভিশনে আমার বক্তৃতা প্রচার করা হয়। এক সন্ধ্যায় আমি ছাত্র পরিষদের কার্যকরী কমিটির উদ্দেশে ভাষণ দেই। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি বহু ছাত্র সমাবেশে একটি ভাষণ দেউ। আমি লক্ষ্য করি নরওয়ের ছাত্ররা আমাদের আন্দোলনকে তাদের নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করে। একজন ছাত্র(শিল্পি) ইয়াহিয়া খানের একটি ছবি আঁকেন। তাকে একজন হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করে। কয়েকজন পাকিস্তানী ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে ফলে পাকিস্তানীদের প্রতি তাদের মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে ওঠে।

অসলোর মেয়র আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি গ্রন্থে আমাকে সরাসরিভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আইন বিষয়ের প্রধানের সাথে একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করি।

নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ের ওল্ড আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে অন্যান্য বিচারপতিরাও ছিলেন। তিনি আমার পুরানো বন্ধু। এছাড়া আমি রোটারি ক্লাবে বক্তব্য রাখি। সাধারণত এই ফোরামে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে দেয়া হয় না। কিন্তু আমার বেলায় ব্যতিক্রম হয়। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমাদের সমস্ত বক্তব্য পেশ করি এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলীর কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাই। সম্ভবতঃ নরওয়ে রোটারি ক্লাবে এই ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেনি।  
সুইডেনে জনাব রাজ্জাক যিনি পূর্ব পাকিস্তান পররাষ্ট্র বিভাগে কর্মরত ছিলেন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি আমার সাথে এয়ারপোর্টে দেখা করেন এবং বলেন যে, বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিহিদ গুনার মিরডালের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করে আমি খুবই আনন্দিত হই। তিনি আমাদের আন্দোলনের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটির সুইডেন শাখারও প্রধান হিসেবে কাজ করতে রাজী হন এবং তার অফিস সেই দিন থেকে এ্যাকশান কমিটি অফিসে পরিণত হয়। তার বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাজ পরিয়ে দেই। এ সময় তার মাধ্যমেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদকদের সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং তারা আমাদের সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, মৌখিক সমর্থন যথেষ্ট নয়, তারা এর চেয়ে বেশী করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন যে, সরাসরিভাবে তারা মুক্তিবাহিনীকে অস্র দিয়ে সাহায্য করবেন। যা হোক যদিও এর পরপরই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার জন্য অস্রের আর প্রয়োজন হয়নি তবুও তাদের সদিচ্ছার তুলনা বিরল।

আমি যখন হেলসিংকি বিমানবন্দরে অবতরণ করি আমাকে প্রথমে অভ্যর্থনা করেন সেখানকার বৃটিশ কনসাল জেনারেল মিঃ রয় ফক্স। আমি খুবই আশ্চর্য হই এবং তাকে আমার সফরের উদ্দেশ্য জানাই। একজন বিদেশি কুটনীতিক হিসেবে আমার সঙ্গে মেলামেশায় বিপদের সম্ভাবনার কথা তাকে জানাই। ফক্স আমাকে বলেন, আমি তার ব্যক্তিগত বন্ধ এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কোনো অধিকার নাই তার ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার। তিনি আমাকে তার বাসায় নিয়ে যান এবং তার অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যা হোক বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে আমি সন্ধ্যা বেলায় তার বাসা থেকে হোটেলে উঠে আসি। টিভিতে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আমি পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে সংসদ সদস্যদের সাথে দেখা করি এবং আমার বক্তব্য প্রচার করি।  
বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদর দফতর এখানে অবস্থিত এবং এর সাধারণ সম্পাদক রুমেশ চন্দ্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জানান যে তার সংগঠন বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। এরপর আমি লন্ডনে ফিরে আসি।

প্রবাসে আন্দোলনের ঘটনা বর্ননা করতে গিয়ে আমি একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ্য করতে চাই। সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন লন্ডনে এ্যানথনি মাসকারেনহাস রচিত "রেইপ অব বাংলাদেশ" বইটির প্রকাশনা উৎসবে আমি উপস্থিত হই। তার পরদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডনে উপস্থিত হবার কথা। এই সভায় একজন ভারতীয় সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করবো কিনা! আমি তাকে জানাই যে, আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কোনো সময় চাইনি।

(বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সাক্ষাৎকারের এই অংশটি নিজেই ইংরেজিতে যেভাবে লিখে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই মুদ্রিত হলো)

“The Deputy High Commissioner of India in London rang up in the morning and told me that the Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi would meet the British Prime Minister Mr. Edward Heath in the afternoon at his official residence at Chequers. She would therefore like to have a meeting with me before that. She wanted to know the attitude of the countries I visited recently. In response to the request, I arrived at Claridges Hotel at 11. A. M. It so happened that the officer of the Scotland Yard who met me at Claridges saw me more than once about my security. I was at once taken by the Dy. High commissioner to the drawing room of Mrs. Gandhi's suite. Mrs. Gandhi came in a minute’s time. This was first meeting with her (I met her second time at Dhaka after independence). After she exchanged the greetings, she asked me about the reaction in the countries I visited recently about the demand for independence of Bangladesh. To that I told her that I received assurances of support from the people and the Govt. of these countries for our independence movement but to my request for recognition by the governments of those countries the uniform answer was that even the neighboring country of India did not recognize our govt. That would show that even India does not consider that our government was really an effective government. I told her that was a disappointing situation. Then I also said that although we felt very grateful to the people of India for giving shelter to those who had left Bangladesh, we really expected recognition of that government. I said I really did not know if pundit Jawaharlal Nehru could have remained satisfied by giving shelter only to the people who went over to India Mrs. Gandhi said that although she did not give formal recognition she was giving all facilities to the provisional government to function formal announcement would create certain situation. Pakistan would never take it quietly. She said they would attack India. It is true that Pakistan would ultimately be defeated but we have developed infrastructure of industries throughout the country. By initial air bombing they might be able to destroy all our ears of struggle in this field. Therefore although we have decided to help Bangladesh on humanitarian ground, my primary responsibilities is to the people of India as their Prime Minister has also to be borne in mind. I have therefore tried to do both and give recognition to Bangladesh at an appropriate time. I told her of course that we have nothing to offer except friendship on the basis of sovereign equality.

Referring to friendship of Bangladesh with India she said that it should be left to the people of Bangladesh to decide after the independence. As far as she was concerned her only expectation was that a democracy would be functioning in a neighboring country.”

(অনুবাদ)

সকালে ইন্ডিয়ান ডেপুটি হাই কমিশনার (লন্ডন) ফোন করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন যে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার এডওয়ার্ড হিথের সাথে আজ বিকেলে চেকারসে তার নিজ অফিসে দেখা করবেন। সে কারণে তিনি (ইন্দিরা গান্ধি) আমার সাথে ঐ মিটিঙের পূর্বে দেখা করতে চান। আমি সম্প্রতি যে সকল দেশ ভ্রমণ করেছি সে সকল দেশের মনোভাব তিনি জানতে আগ্রহী। এই অনুরোধের পড়িপ্রেক্ষিতে আমি সকাল ১১টা সময় ক্লারিজেস হোটেলে উপস্থিত হই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে অফিসার আমার সাথে ক্ল্যারিজেসে দেখা করেছিলেন, তিনি একাধিকবার আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন। ডেপুটি হাই কমিশনার আমাকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্যুইটের ড্রইং রুমে নিয়ে যান। কয়েক মিনিট পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসে উপস্থিত হন। এটা ছিল তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ (স্বাধীনের পর ঢাকাতে উনার সাথে আমার ২য় বার সাক্ষাৎ হয়)। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সম্প্রতি আমি যে দেশগুলো ভ্রমণ করেছি সেগুলোর মনোভাব জানতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে আমি তাকে বলেছিলাম, ঐ সকল দেশের মানুষ এবং জনগণের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের নিশ্চয়তা পেয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধের জবাবে তাঁদের সকলের জবাব ছিল একটাই যে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্ডিয়া এখনো আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। এটা প্রতীয়মান করছে যে এমনকি ইন্ডিয়াও আমাদের সরকারকে কার্যকর হিসেবে গণ্য করছে না। আমি তাকে জানিয়েছিলাম যে সেটা একটা হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তারপর আমি তাকে বলেছিলাম যদিও বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া মানুষদের আশ্রয়দানের জন্য ইন্ডিয়ার মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তথাপি আমরা সত্যিকার অর্থেই ইন্ডিয়ান সরকারে স্বীকৃতি আশা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, “আমি ঠিক জানি না এমন পরিস্থিতিতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু শুধু বাস্তুহারা মানুষকে আশ্রয় প্রদান করলেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন কিনা।“ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে, যদিও তিনি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন নি তথাপি তিনি অস্থায়ী সরকারকে সবরকম সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। পাকিস্তান ব্যাপারটাকে শান্তভাবে নেবে না। তিনি বলেন, ওরা ইন্ডিয়াকে আক্রমণ করবে। এটা সত্য যে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান পরাজিত হবে, কিন্তু আমরা দেশ জুড়ে শিল্পানুকূল অবকাঠামো তৈরি করেছি। প্রাথমিক বিমান হামলায় ওরা এই খাতে আমাদের বহু বছরের সাধনা ধ্বংস করে দিতে পারে। যদিও আমরা মানবিক কারণে বাংলাদেশকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার মূল দায়বদ্ধতা ইন্ডিয়ার মানুষের প্রতি, এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। এ কারণে আমি দুটোই একসাথে করার চেষ্টা করছি এবং উপযুক্ত সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব।

আমি উনাকে বলতে ভুলি নাই যে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ছাড়া উনাকে দেওয়ার মত আমাদের আর কিছুই নেই।

বাংলাদেশ এবং ভারতের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন, এটি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মানুষের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। উনি শুধু আশা করছিলেন যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা হোক।

এরপর আমি অস্ত্র পাঠানোর জন্য আমাদের অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কথা উঠাই। আমি বলি যে, আমরা টাকা সংগ্রহ করলেও অস্র কিনতে পারছি না। ভারত যদি কিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে তবে আমরা টাকাটা তাদের হাতে দিতে পারি। মিসেস গান্ধী তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কত টাকা সংগ্রহ করেছি। আমি উত্তর দেই প্রায় চার লক্ষ পাউন্ড। তিনি বলেন যে, একটি মুক্তিযুদ্ধে যে পরিমান অস্রের দরকার সে পরিমান অস্র এই টাকায় কেনা সম্ভব না। এছাড়া অনির্ধারিতভাবে অস্র পৌঁছালে তা বিরোধী শক্তির হাতেও পড়তে পারে। মুজিবনগর সরকারের সাথে তিনি যোগাযোগ করছেন এবং তাদের মাধ্যমে অস্র বিতরন করছেন। বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র পৌঁছালে আইনগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তিনি আমাকে বলেন যে, এই বৈদেশিক মুদ্রা পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনে আসবে। আমি তাকে জানাই যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে বলেছে, একজন বিচারক হিসেবে নিশ্চয়ই অস্র পাঠাবার সাথে জড়িত হবো না এই তারা পাকিস্তান সরকারকে দিয়েছেন। এটি এক ধরনের চাপ। অতএব কোনকিছু করতে হলে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই করতে হবে। আমার এই কথা শুনে মিসেস গান্ধী উঠে পাশের কক্ষে যান এবং পাশের কক্ষ থেকে ভারতীয় হাইকমিশনারকে নিয়ে আসেন। তিনি হাইকমিশনারকে বলেন যে, বিচারপতি চৌধুরী যা পাঠাতে চান, অস্ত্রই হোক বা অন্য কিছু হোক, তিনি যেন তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের শুভকামনা করে আমাদের সাক্ষাৎকারের ইতি টানেন।

কয়েকদিন পরেই মুজিবনগর সরকারের তরফ থেকে টেলিগ্রাম আসে যে, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে আমাকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। ষোলজন সদস্যের একটি দল নির্বাচিত হয়। এরা হলেন

(১) আব্দুস সামাদ আজাদ

(২) ফণিভূষন মজুমদার

(৩) এম, আর সিদ্দিকী

(৪) সৈয়দ আব্দুস সুলতান

(৫) ডঃ মফিজ চৌধুরী

(৬) প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ

(৭) ফকির শাহবুদ্দীন

(৮) এ্যাডভোকেট সিরাজুল হক

(৯) ডঃ এ, আর, মল্লিক

(১০) খুররম খান পন্নী

(১১) এস, এ, করিম

(১২) আব্দুল মুহিত

(১৩) রেহমান সোবহান

(১৪) মাহমুদ আলী

(১৫) আবুল ফাতহ।

আমরা বেলমন প্লাজা নামে একটি সাধারণ হোটেলে আমাদের অফিস স্থাপন করি এবং বিভিন্ন দেশের সদস্যদের সাথে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকি। আমার বিশ্বাস প্রায় সবগুলো দেশের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। এছাড়া আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রচার কাজ চালাতে থাকি। আমি হারভার্ড, এম, আই, টি, ইয়েল, কলম্বিয়া, নিউইয়র্ক সিটি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতা করি। শত শত শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা করি। প্রতিটি শ্রোতা ছিলেন আমাদের পক্ষে। এসময় আমাকে সাহায্য করতেন কাজী রেজাউল হাসান। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি অনেকগুলি ওয়াকিটকি পাঠান মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য। আমরা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বোষ্টনে ছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ইথিয়েল ডি সোলাপুল একটি ভোজসভার আয়োজন করেন যেখানে প্রায় ২৫ জন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। এই অধ্যাপকগণ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী যেহেতু আমেরিকান ষ্টেইট ডিপার্টমেন্টের পরামর্শদাতা হিসেবে সকলেই কার্যরত ছিলেন। তারা নিজেরাও আগ্রহী ছিলেন যেহেতু সরাসরিভাবে বাংলাদেশের অবস্থা জানার এটি একটি সুযোগ ছিল। হারভার্ড ল-স্কুলে আমি একটি বক্তৃতা দেই। আমি বলি যে, বাংলাদেশ স্বাধীন, কেবলমাত্র স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। এম, আই, টি অডিটোরিয়ামে আমি প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দেই এবং আমাদের পক্ষে তুমুল জনমতের লক্ষন দেখতে পাই। আমি বারবার বলি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। কিন্তু আমার জন্মভূমির উপর যা ঘটেছে তারপর আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষনা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমার পক্ষে একটি বড় সুবিধা ছিল যে, আমি যখন বাংলাদেশের পক্ষে আমার আনুগত্য প্রকাশ করি তখন আমি ছিলাম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অতএব তারা আমাকে সেইভাবে সম্মান দেখায়।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে আবার লবিং-এ ব্যস্ত হই। এ সময় বাংলাদেশের সীমান্তে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রচার চালায়। আমরা বাধা দেই। আমরা বলি একটা নির্যাতিত জাতি যখন জয়লাভ করতে যাচ্ছে তখন বিরতি অসম্ভব। কিন্তু আজ যখন দেশ শত্রুমুক্ত হতে যাচ্ছে তখন যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন উঠে কেনো? আমি নিউইয়র্কের জাতিসংঘের দফতরে রয়টার অফিসে বেশীরভাগ সময় থাকতাম। যেহেতু অবস্থা সম্পর্কিত শেষ খবর ওখানেই পাওয়া যেতো। এমন সময় ১৬ই ডিসেম্বর টেলেক্স দেখলাম, খবর এলো যে, নিয়াজী আত্মসমর্পন করেছে। ঢাকা মুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন। এই খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ধীর চিত্তে, শান্ত মনে এই সংবাদ গ্রহন করলাম এবং পরম করুনাময় আল্লাহর হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

-আবু সাঈদ চৌধুরী  
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪।



[আমিনুল হক পলাশ](https://www.facebook.com/aminul.hoque.polash?fref=ts)

<১৫,৯,৫১-১১০>

# [ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম]

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি দলের পক্ষে এত বেশী আসন লাভ করার নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। নির্বাচনে বাংলার মানুষ আওয়ামলীগের ৬ দফার পক্ষে পূর্ণভাবে তাদের রায় ঘোষণা করেন।  
  
নির্বাচনের পর '৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষনা করেন আওয়ামী লীগের কেউ বেঈমানী করলে জ্যান্ত কবর দেবেন। জনসভার প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহন করান। এই ধরনের গণশপথ পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এর কিছুদিন পর নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল একটি সাব কমিটি গঠন করে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী সাব কমিটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করে। ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকায় আসেন।

নির্বাচনের পর পর ভুট্টো ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরোধিতা শুরু করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আলোচনার দরজা বঙ্গবন্ধু খোলা রাখেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলের সাথে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমার ওপর অর্পণ করেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধি দলকে যথেষ্ট সম্মান ও সৌজন্য দেখানো হয়। ভুট্টো বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। আমাদের দলের কয়েকজন নেতা এবং ভুট্টোর প্রতিনিধি সদস্যরা একদিন নৌপথে লঞ্চের মধ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন।  
  
ভুট্টোর কয়েকজন বিশিষ্ট সহকারীর সাথে আমার আলোচনা হয়। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সহকারী ব্যারিষ্টার কামাল আফছার আমার সার্কিট হাউজ রোডের বাসভবনে আমার সাথে দেখা করেন। ভুট্টোর দলের নেতাদের সাথে আলোচনার পর একটা জিনিস বুঝতে পারি। তারা ইতোমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। ভুট্টো ও তার সহযোগীদের অনমনীয় মনোভাব থেকে এটা সুস্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আলোচনার পূর্বে ও পরে ভুট্টোকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে আনা নেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এক দিন আলোচনার পর ভুট্টোকে নিয়ে গাড়ীতে করে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখি। আমি গাড়ীতেই ভুট্টোকে বলি এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা উচিত যাতে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ মানুশের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। আর তা যদি না করা হয় তাহলে সামরিক শাসনের বেড়াজাল থেকে পাকিস্তান কোন দিন মুক্তি পাবে না। আমার কথায় প্রচ্ছন্ন এই ইঙ্গিত ছিল যে, শাসনতন্ত্র রচনায় আমাদের সাথে সহযোগিতা না করলে ভুট্টোর কোন লাভ হবে না। বরং সামরিক জান্তারই বেশী সুবিধা হবে। আমার কথার জবাবে ভুট্টো একটি তাৎপর্যপূর্ন উক্তি করেন। তিনি বলেন, 'ডোন্ট ফরগেট আমিরুল ইসলাম, দ্যাট আই গট লারজেস্ট নাম্বার অব ভোটস ইন দি ক্যানটনমেন্ট'। এই একটি কথায় বুঝে নিতে আমার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সাথে ভুট্টোর কী সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য দিনের মত ভুট্টো সেদিন হোটেলে না গিয়ে তখনকার গভর্নর হাউজে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তাকে সেখানে নামিয়ে দেয়ার সময় দেখলাম, সিঁড়ির নীচে গভর্নরের এ ডি সি ভুট্টোর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন জেনারেল আকবর ফোনে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।   
  
আমার মনে হয় এ দুটো ঘটনা আলোচনার ভবিষ্যৎকে সন্দিহান করে তোলে। ফিরে এসে আমি বঙ্গবন্ধুকে এই ঘটনা জানাই। ৩১শে জানুয়ারি ভুট্টো সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার কালে ভুট্টো বলে যান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হবে। কিন্তু করাচী ফিরে ভুট্টোর সুর বদলে যায়। তিনি বলতে থাকেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার এখতিয়ার আওয়ামী লীগের নেই। আসন্ন গনপরিষদের অধিবেশনে তিনি যোগ দেবেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্য কাউকে যোগ দিতে দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি জেনারেলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার জেনারেলদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা নেই। কেন না তারা বুঝতে পারে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সামরিক জান্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আর এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জেনারেলদের সাথে গোপনে ভুট্টোও হাত মিলান।  
  
ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের দ্বিতীয় দফা ও শেষ প্রচেষ্টা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা। পহেলা মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটির পক্ষ থেকে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। এই বৈঠকে পাঞ্জাবের মালিক সরফরাজসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়কজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এই ব্যাপারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের উপর ন্যস্ত করেন।  
  
সকালের বৈঠকের পর হোটেল পূর্বানীতে বিকেলের বৈঠকের স্থান ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সময় বেলা ১ টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে এক বিবৃতিতে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য এই একটি ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল। ঢাকা শহরের সকল শ্রেনীর মানুষ এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিতি অলিগলি রাজপথ। মিছিলকারী জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের লাঠি ও লোহার রড। জনতার মুখে একটি শ্লোগানই শোনা যায় 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশকে স্বাধীন কর'। '৬দফা, না এক দফা, এক দফা এক দফা'। সারা শহর থেকে খন্ড খন্ড মিছিল পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত হয়। পল্টনের সভায় বক্তৃতা করেন তোফায়েল আহমেদ, নুরে আলম সিদ্দিকী, আ,স,ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুল মান্নান প্রমুখ। এই সভায় ডঃ কামাল হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। জনতা সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি কামনা করছিল। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও সংসদ সদস্যরা হোটেল পূর্বাণীতে উপস্থিত হয়েছেন।  
  
বেলা সাড়ে চারটায় হোটেলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে পূর্ণ দিসব হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভবিষ্যত কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। শেখ সাহেব সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে হোটেল প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে।   
  
২রা মার্চ থেকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হয়। নীতি নির্ধারনী বিষয়াদি ঠিক করার জন্য প্রতিদিন এই বৈঠক বসে। বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ,এইচ এম কামরুজ্জামানকে নিয়ে দলীয় হাইকমান্ড গঠন করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ডঃ কামাল হোসেন এবং আমাকে বলা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রাম কমিটির গঠনের জন্য সকল জেলা, মহকুমা ও থাকাকে নির্দেশ দেয়া হুয়। আমার দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকল জেলার সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা। তাছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও আমার ওপর ছিল। ব্যাংক কর্মচারী, ডাক, তার, টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ডঃ কামাল হোসেন ও আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরী করি। এসব বৈঠক কখনও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আবার কখনও ডঃ কামালের চেম্বারে অনুষ্ঠিত হত। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলার তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ছিল তাজউদ্দিন আহমদের। মাঝে মাঝে ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। টেলিফোন বিভাগের একজন বড় অফিসার নুরুল হক সাহেব তখন খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁকে পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের রাতে হত্যা করে।   
  
পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার টেলেক্স, তার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধুমাত্র বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কথায় টেলেক্স সুবিধা দেয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমরা তিন জন উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা খসড়া তৈরী করে রাত আটটার দিকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতাম। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে বঙ্গবন্ধু তার সমাধান করে দিতেন। এরপর সংবাদপত্রে যা দেয়ার তা দিয়ে দেয়া হত। নতুন কোন সিদ্ধান্ত থাকলে জেলা সংগ্রাম কমিটিকে জানিয়ে দেয়া হতো। সে সময় চট্টগ্রাম এবং খুলনা আন্দোলনের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম,এ, হান্নান, আবদুল হান্নান প্রমুখ এবং খুলনা থেকে শেখ আবদুল আজিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ঢাকা শহরের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখা হয়। তাছাড়া জনগনের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।   
  
বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে লাইব্রেরী কক্ষটিকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এখানে থাকতেন। তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন নীতি নির্ধারণী হাইকমান্ডের বৈঠকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন বলে অফিসের দায়িত্ব বেশীরভাগ সময় আমাকে পালন করতে হত। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের লোক নানা সমস্যা নিয়ে ছুটে আসতেন। সারা দিন ধরে বাজত টেলিফোন। এগুলির সঠিক সমাধানের দায়িত্ব ছিল কন্ট্রোল রুমের। বাসভবনের নীচের কক্ষটিতে টেলিফোন ও কাগজপত্র নিয়ে আমরা কাজ করতাম। হাইকমান্ডের অধিকাংশ বৈঠক হত বঙ্গবন্ধুর কক্ষে। বাড়ির প্রাঙ্গণে সর্বদাই থাকত অগণিত উৎফুল্ল জনতা ও সাংবাদিকদের ভিড়।   
  
৩রা মার্চ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনে বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ রাখার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সঙ্গীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করায় হয়। তাছাড়া সেদিনের সভা মঞ্চে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাও দেখা যায়।   
  
৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের আহবান করেন। বাংলার মাঠে ঘাটে, হাটে বাজারে সর্বত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এদিকে বিভিন্ন স্থানে সামরিক জান্তার গুলীতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।  
  
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। বঙ্গন্ধু ১লা মার্চ নিজেই বলেছেন ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে থেকে বহু সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন। ধানমন্ডির ৩২নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর ৬৭৭ নম্বর বাড়ী সংগ্রামের সূতিকাগারে পরিণত হয়। সকালে বিকালে দেশী বিদেশী সাংবাদিক এই বাড়ীতে এসে ভীড় জমান। তারা সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিভিন্নভাবে আন্দোলন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী জানতে চান।   
  
আর পাক বাহিনীও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। শোনা যায়, রেসকোর্সের জনসভাকে লক্ষ্য করে ঢাকা সেনানিবাসে কামান বসানো হয়। শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে জনসভায় গোলা বর্ষণ করা হবে।  
  
ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলাম বঙ্গবন্ধু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন। সারা দেশের মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সমর্থন তাঁকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। তখন তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল বাঙ্গালির মনের কথা।  
  
বঙ্গবন্ধুর মনের কথা তাজউদ্দিন আহমদের জানা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিতই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের খসড়া আমরা রচনা করে দিতাম। নেতার নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হতো। তাজউদ্দিন আহমদ মুষ্টিবদ্ধ হাত মুখে রেখে কান পেতে কথা শুনতেন। একজন নিখুঁত শিল্পীর মত আমাদের রচিত খসড়াগুলো তিনি শুনতেন। এরপর তিনি বক্তব্যের খসড়া বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যেতেন। আমাদের রচিত খসড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর পছন্দ হতো। কোন কোন সময় তিনি কিছু পরিবর্তন করতেন।   
  
৭ই মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার পর বক্তব্যের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে খসড়া বক্তব্য লিখার নির্দেশ দেন। ৭ই মার্চ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে রেসকোর্সের ময়দানে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি সেদিন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির পথ নির্দেশ করেন। তিনি বাঙালি জাতির দীর্ঘদীনের ক্ষোভ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কথা উল্লেখ করেন, বাঙালি জাতিকে মরণপন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী শোনান। বক্তৃতা একদিকে ছিল যেমন আবেগময়ী, অপরদিকে ছিল নির্ভুল যুক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী।   
  
প্রকৃতপক্ষে পহেলা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু বলেন আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দেশবাসীর দায়িত্ব হল হানাদার বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ সে দায়িত্ব পালন করেছে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর।  
  
কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার সাথে তুলনা করেন। বঙ্গবন্ধু জীবনে ৭ই মার্চের আগে ও পরে অসংখ্য বক্তৃতা করে গেছেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতার সাথে তাঁর অন্য কোন বক্তৃতার তুলনা হয় কি? মুক্তিযুদ্ধকালে ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি মনে করি, ৭ই মার্চের বক্তৃতা এক অনন্য বক্তৃতা, যারা সাথে পৃথিবীর অন্য কোন বক্তৃতারই তুলনা চলে না। তাই বাঙ্গালি জাতি যতদিন বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে ততদিনই এই বক্তৃতার দ্বারা আলোড়িত হবে। বাঙালি জাতির জীবনে এই বক্তৃতা অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে।  
  
৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দেশের সর্বত্র শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৫ই মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এদিন সকালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে উপস্থিত দুই-একজন ছাড়া সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা সশস্ত্রভাবেই করতে হবে। এই বৈঠকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেটা হল এই পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশের কাছ থেকে কি রকম সাড়া বা সাহায্য পেতে পারি।   
  
আমি এই বৈঠকে আমার-বক্তব্য তুলে ধরি। চার্চিলের 'উই আর এলোন অন দি ব্রিজ' এই উদ্ধৃতি দিয়েই বক্তৃতা শুরু করি। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। সত্তরের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন বাড়তে থাকে। এরপর জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ঐতিহাসিক আন্দোলনের খবর বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদেশের কোন সরকারের কূটনৈতিক বা উচ্চপর্যায়ের লবির সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তুলনায় আমাদের বলতে গেলে কোন যোগাযোগই ছিল না।  
  
আমার বক্তৃতার পর তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে কর্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও জনগনের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে মোকাবেলা আমাদের সম্ভব নয়। তাই সংগ্রামকে গণভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। সভাপতির ভাষণে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকার ইঙ্গিত দেন।  
  
এদিন ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সহকর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের আলোচনা অব্যাহত থাকে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদের আহ্বানে প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।   
  
ঐদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। এই খসড়াটির মূল অংশগুলো মেনে নেয়া হবে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটা ধারণা দেয়া হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার কথা পরবর্তী বৈঠকে। ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের পক্ষ নীরব থাকে এবং সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেছি যে প্রত্যহ বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছে।  
  
চট্টগ্রাম থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'সোয়াত' জাহাজে করে অস্ত্র এসেছে। বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন। খবরটি ছিল সোয়াত জাহাজ থেকে যেন অস্ত্র নামাতে না দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মেজর জিয়া কোন সক্রিয়া ভূমিকা পালন না করায় পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা হয় নি।

**২৩শে মার্চ সকালে ঢাকা থেকে সকল জেলা সদরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। নির্দেশে বলা হয়, যেকোন সময় পাক বাহিনী আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। পাল্টা আঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা ইতিমধ্যেই দেশের সর্বত্র তৈরী হয়ে গেছে।**

**২৪শে মার্চ বিকেল থেকেই বঙ্গবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পেছনের ঘরে প্রায় প্রত্যেকের সাথে এক মিনিট করে কথা বলেন। অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে বাথরুমেও কারো কারো সাথে তিনি কথা বলেন।**

**২৫শে মার্চ তারিখেও এ ধরনের শলাপরামর্শ চলে। বঙ্গবন্ধু একে একে সকলকে বিদায় দিচ্ছেন। বিকেল থেকেই যেন ৩২ নম্বরের বাড়ীতে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। বিকেল প্রায় ৪ টায় আমার বন্ধু তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রিজভী বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কথা বলার সময় আছে কিনা। সময় থাকলে তার সাথে চা খেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রিজভীর বাসা বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে ২০০ গজ দূরে। আমি রিজভীর সাথে তার বাসায় গেলাম। রিজভী আমাকে বলেন, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এদেশ বসবাসের কোন যোগ্য থাকবে না। তিনি এখনই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেনানিবাসে তার ভগ্নিপতির বাসায় চলে যাচ্ছেন। রিজভী তার পাঠান দারোয়ানের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, আমি কোন সময় গেলে যেন আমাকে থাকার আশ্রয় দেয়া হয়। তিনি বলেন, ইচ্ছা করলে আমি তার বাড়ী ব্যবহার করতে পারি। পেছনের একটি দরজা দেখিয়ে বলেন, বিপদের সময় পলায়নের রাস্তা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম শহিদুল্লাহ কায়সার কিছুদিন আগে এই বাড়ীতে ছিলেন।**

**বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো শেষ করি। রিজভীর কাছে শোনা বক্তব্য এক ফাঁকে বঙ্গবন্ধুকে জানাই। বঙ্গবন্ধু শুনে গম্ভীর হয়ে যান। এর ক'দিন পূর্বে এরকম পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের কথা নিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের জন্য চাপ দেই। তিনি আত্মগোপনের কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, আত্মগোপনের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুকে বলে আসছেন। তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।**

**বঙ্গবন্ধু একদিন তাঁর বেডরুমে হাইকম্যান্ডের বৈঠকের সময় তাজউদ্দিন আহমদ ও আমাকে ডাকেন। আমি আমার সহ-হুইপ আবদুল মান্নানকে নিয়ে সেখানে যাই। বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুকে চাপ দেই। তিনি প্রশ্ন করেন আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন সম্ভব না। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।**

**২৫শে মার্চ বিকেলে আমার আবার ইচ্ছা হলো আত্মগোপন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানাই। মনে মনে ঠিক করলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন আসলে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় শেষ অনুরোধ জানাবো। তাঁরা দু'জন অন্য কাজে বাইরে ছিলেন। আমি জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর শেষ বক্তব্যের খসড়া তৈরী করতে ব্যস্ত। আমার খসড়া প্রস্তুত হলো। বঙ্গবন্ধু একটু দেখে ঠিক করে দেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সামনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।**

**আমি বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে পাশে বদরুন্নেছা আহমদের বাসায় খোঁজ নিতে যাই। নুরুদ্দিন ভাই বলেন, সেনানিবাস থেকে শিগগিরই ট্যাংক বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জনতার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি তিনি ওপরে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে আবার বেরিয়ে আসি। আমি এখনো আশায় করছি তাজউদ্দিন আহমদ ও কামাল হোসেনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ আলোচনা করবো। তাজউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দেখি নূরজাহান মোর্শেদ এম,পি বসে আছেন। বাড়ীর ভেতরে তাজউদ্দীন ভাই জোরে জোরে ভাবীর সাথে কথা বলছেন। কথা বুঝলাম তাজউদ্দিন ভাইয়ের মন খারাপ। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিছু না বলেই বাড়ি ত্যাগ করি। উদ্দেশ্য কামাল হোসেনের সাথে দেখা করা। গাড়ীতে নূরজাহান মোর্শেদকে নিয়ে নিলাম। তাকে নামিয়ে আমার বাসায় আসার পথে দেখি পাক সৈন্যরা বেতার ভবন দখল করে নিয়েছে।**

**সার্কিট হাউজ রোডের ৪ নম্বর বাড়ীতে আমি থাকি। কামাল হোসেন থাকেন ৩নম্বর বাড়ীতে। আমার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে কামাল হোসেনের বাড়ীতে যাই। তিনি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদুল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা না করার জন্য আমি তাঁদের তাড়া দিলাম। তাঁদের বিদায় দিয়ে ডঃ কামাল কি করা যা বলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। বললাম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রস্তুত হোন। আমি বাসায় লীলাকে বলে আসি।**

**১ লা মার্চ থেকে বাড়ীতে দুপুরে খাওয়ার সময় আসি। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সাথে এক প্রকার কথাবার্তা হয় না বললেই চলে। আমার শ্বশুর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব এম, ওসমান আলী ১৯শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। স্ত্রী তখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পিতৃহারা স্ত্রীকে সান্তনা দেয়ার সময়ও আমার হয়ে ওঠে নি।**

**ঘরে প্রবেশ করে লীলাকে বললাম, আমাকে এখন চলে যেতে হবে। সে শুধু জানতে চাইলো আমার কাছে টাকা আছে কিনা। পকেটে ২/১০ টাকা থাকতে পারে। আমার পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী, আর পায়ে সেন্ডেল। 'ভালো থাক' এ কথা বলেই স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পূর্বের মত দেয়াল টপকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে কামাল হোসেনের বাসায় আসি। তিনি প্রস্তুত ছিলেন।**

**পথে দেখি শাহবাগের মোড়ে জনতা গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। এই পথে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বহু কষ্টে কর্মীদের সহযোগিতায় রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পৌছি। বঙ্গবন্ধু যে আত্মগোপন করতে নারাজ গাড়ীতে ডঃ কামালকে সে কথা জানাই। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখি বঙ্গবন্ধু নীচের তলায় খাবার শেষ করেছেন। দৃশ্যটি দেখে আমার 'লাস্ট সাপারের' কথা মনে পড়লো। বঙ্গবন্ধুর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে গেঞ্জী ছিল। আমাদের দু'জনকে দেখে তিনি দরজায় আসেন। আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা পাঠ করেছ, আমি যা নির্দেশ করবো তাই শুনবে। তারপর তিনি আমাদের দু'জনের পিঠে দু'হাত রেখে বলেন, 'কামাল, আমিরুল আমি কোনদিন তোমাদেরকে কোন আদেশ করিনি। আমি তোমাদের আজ আদেশ করছি, এই মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে'। আর শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক এটা আমি চাই না।**

**বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে মোহাম্মদ মুসার বাড়ীতে যাই। আমার গাড়ী সেই বাড়ীতে রেখে মুসার গাড়ীতে উঠি। মুসার ড্রাইভার গাড়ী চালায়। আমরা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। তাজউদ্দিন ভাইকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। তাঁকে জানাই, বঙ্গবন্ধু সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইতস্তত করেন।**

**এ সময়ে বি ডি আর এর একজন হাবিলদার এসে আমাদের বলে গেলেন, বি ডি আর এর সকল বাঙ্গালি সদস্যরা বেরিয়ে পড়েছে। আজ রাতে তারা পাক বাহিনীর হামলার আশংকা করছে। তাজউদ্দিন ভাইকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বললাম। তিনি ভেতরে গেলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ কামালকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ডঃ কামাল গাড়ীযোগে অন্যত্র যেতে চাইলেন। আমি বললাম, এটা ঠিক হবে না। তাজউদ্দিন আহমদের কিছুটা দেরী হলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে পাঞ্জাবী। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আর তাঁর ঘাড়ে একটি রাইফেল। তাঁর এই বেশ দেখে আমি বললাম, শিকারে যাচ্ছেন নাকি?**

**তাজউদ্দিন ভাই গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বলছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে রাইফেল ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছেন। আরহাম সিদ্দিকী তাঁকে এই রাইফেল যোগাড় করে দেন। কিন্তু এই রাইফেল পরবর্তীকালে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাইফেল বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়**

**নি।**

**সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই এলাকায় পাক সৈন্য এসে যাবে। পুরাতন ঢাকার একটা বাড়ীতে সকলের একত্র হবার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবন থেকে বাইরে আসতে রাজী না হওয়ায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্তে নেতাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাজউদ্দিন আহমদ ভগ্নমনোরথ অবস্থায় বাড়ীতে বসে ছিলেন। তিনি নিজেকে এক রকম ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আঘাত হানার পূর্বেই আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার চেষ্টা করি। এরপর ভাবলাম, ১লা মার্চ থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন ও আমি একত্রে কাজ করেছি। এই ৩ জনকে যেকোন মূল্যে একত্রে থাকতে হবে। ১৫ নম্বর সড়কের কাছাকাছি এলে ডঃ কামাল গাড়ী থামাতে বলেন। তিনি বলেন, সকলে এক বাড়ীতে না থেকে আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে যাই।**

**আমার চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারলাম না। তবে মনে মনে খুবই বিরক্ত হলাম। কামাল হোসেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তার একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরনটা মেনে নিতে পারলাম না। তবুও কামাল হোসেন গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। কথা রইলো পরদিন সুযোগ পেলেই তিনি মুসা সাহেবের বাড়ীতে যাবেন। আমরাও সেখানে যাব, না হয় যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু এটা আর হয়ে ওঠেনি। ডঃ কামাল মুসা সাহেবের বাড়ী যেতে পারেন নি, আর আমরাও পারি নি ডঃ কামালের সাথে যোগাযোগ করতে। পরবর্তীকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। নির্যাতিত হন পাকিস্তানী কারাগারে। আর আমরা বঞ্চিত হই তার সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে। ডঃ কামালের সেদিনের একক সিদ্ধান্ত আজও আমাকে পীড়া দেয়। যদ্দিন তিনি পাকিস্তানী কারাগার থেকে ফিরে না এসেছেন, তদ্দিন নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়েছে। কেন সেদিন জোরে বাধা দিতে পারিনি।**

**ইতিমধ্যে ধানমন্ডির বিদ্যুৎ চলে গেলো। রাস্তা জনমানব শুন্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দুই একটা গাড়ী মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর মত দেখা যায়। কালবিলম্ব না করে লালমাটিয়ায় রেলওয়ের এককালের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ীর কাছে গিয়ে দু'জন নেমে গেলাম। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে মুসা সাহেবের বাড়ী চলে গেলো।**

**গফুর সাহেব আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা তাকে পূর্বে কোন খবর দেইনি। তবুও তিনি আমাদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করলেন। আমরা বাড়ীতে ঢুকার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই এক প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত ঢাকা শহর কেঁপে উঠলো। পরে জেনেছি এটা ছিল আঘাত শুরু করার সংকেত।**

**শুরু হলো চারদিক থেকে ব্রাশ ফায়ার। অবস্থা জানতে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই বাড়ীর ছাদে যাই। পাক বাহিনীর ব্যপক হামলার মাঝে আমাদের ছেলেদের ৩০৩ রাইফেলের বিচ্ছিন্ন শব্দ। 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনতে পাই। পাশাপাশি মোহাম্মদপুরের কয়েকটি বাড়ি থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেলো। আমরা মোহাম্মদপুরের কাছাকাছি ছিলাম। তবে একদিক থেকে আমাদের বাড়ী নিরাপদ মনে হলো। কেননা অবাঙালি অধ্যুষিত মোহাম্মদপুর এলাকায় পাক বাহিনী কোন হামলা করবে না। আক্রমণের ব্যাপকতা ও আকস্মিকতায় আমরা একেবারে 'থ' হয়ে গেছি।**

**আমাদের ওপর হামলা হবে একথা জানতাম। সেটা হবে রাজনীতিবিদ, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর। কিন্তু আধুনিক সমর সজ্জিত পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারি নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের নজির আর কোথাও দেখিনি। গফুর সাহেবের বাড়ীর অসম্পূর্ণ ছাদের ইট-সুরকির ওপর বসে আমরা দু'জন পাক সৈন্যদের হামলার মুখে ভয়ার্ত মানুষের আর্তচিৎকার শুনছি। এক সময় তীব্র নীলাভ এক উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা শহর আলোকিত হয়ে উঠল। বিভিন্ন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের কালো ধোঁয়ায় ঢাকার আকাশ ক্রমশঃই কালো হয়ে উঠছে।**

**মধ্যরাতের দিকে ব্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দিন বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করছে। এ সময় তিনি কেঁদে উঠলেন। বঙ্গবন্ধু কি তাঁর বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন? বঙ্গবন্ধু যখন কোন অবস্থাতেই বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে অসম্মত হন, তখন আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ ছিল, তাঁর বাড়ীর পেছনে জাপানীদের অফিসে যেন তিনি চলে যান। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কথা, তাঁর পরিবার পরিজনের কথা, দলের বিভিন্ন নেতাদের কথা বার বার মনে হতে লাগলো।**

**এক সময় আমরা দুইজন ছাদ থেকে নেমে এলাম। নীচে এসে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। শুধু ভাবছি আর ভাবছি। এমনিভাবে রাত ভোর হতে চলল। চারদিক থেকে গুলির শব্দ আসছে। শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে উঠছে।**

**সকালে আমি বাথরুমে গেলাম। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। মনে হলো এক রাতে একটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে।**

**পাশে পড়ে ছিল গফুর সাহেবের ব্লেড। ১৯৬১ সালে লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় সযত্নে রক্ষিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি কেটে নিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর তাজউদ্দিন ভাই অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। বুঝলাম, দাড়ি কাটা কাজ দেবে। ২৬ শে মার্চ সকালে দু'জন বসে গত রাত থেকে ঘটনাগুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে দেরী করিনি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো এই বাড়ী ত্যাগ করা। বাড়ীর সামনে দিয়ে পাক বাহিনীর টহলদার জীপ আসা-যাওয়া করছে। রুমাল বেঁধে কিছু লোক জীপে করে পাক সেনাদের সাথে ঘুরছে। তারা বাঙালি নেতা-কর্মীদের বাড়ীঘর, অবস্থান পাক বাহিনীকে দেখিয়ে দেয়ার কাজে সহায়তা করছে আন্দাজ করলাম।**

**স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির একটি চালাঘরে কয়েকজন কর্মী আত্মগোপন করে রয়েছে। তাদের কাছে একটা রেডিও ছিল। ওরা রেডিওর খবরাখবর শুনছে।**

**২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বক্তৃতা দেন। আমরা দেয়ালে কান পেতে বেতারে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা শুনি। পাক প্রেসিডেন্ট বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিষোদ্গার করেন। জনগনের শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট লাভকারী আওয়ামী লীগকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেআইনী ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার গলা থেকে সুতীব্র ক্রোধ বেরিয়ে আসে। ইয়াহিয়ার বক্তৃতা ও গত কয়েক ঘন্টার নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।**

**দু’জনে ঠিক করলাম, পাক বাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার খবর যে কোন ভাবে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। ২৫ শে মার্চে ঢাকার গণহত্যার খবর ভারত কিংবা বিশ্বের কোন বেতারে প্রচারিত হয় নি। তবে ২৬ শে মার্চ রাতে অস্ট্রেলিয়া বেতার ঢাকার গণহত্যর খবর প্রচার করে।**

**পাক বাহিনী আমাদের বাড়ী সার্চ করতে পারে এই আশংকায় আমরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ি। প্রথম সমস্যা তাজউদ্দিন আহমদের রাইফেল। যদ্দিন আমরা এই বাড়ীতে ছিলাম, এর সমাধান করতে পারি নি। দ্বিতীয় সমস্যা, আমরা তিনজন পুরুষ মানুষ ছাড়া এ বাড়ীতে কোন মেয়ে মানুষ নেই। মেয়ে লোক না থাকাতে আমাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে।**

**এই অবস্থায় তাজউদ্দিন ভাই এর নাম মহম্মদ আলী আর আমার নাম রহমত আলী ঠিক করে নেই। সার্চ হলে বলা হবে মহম্মদ আলী চাঁদপুরে গফুর সাহেবের ঠিকাদারীর কাজ তদারকি করেন। আর আমার বাড়ী পাবনা, আমি গৃহস্বামীর ভাই এর ছেলে। ঢাকায় বেড়াতে এসেছি।**

**২৬শে মার্চ সারাদিন গফুর সাহেবের বাড়ীতে আটক থাকি। বাইরএ কার্ফু। চারদিকে মিলিটারী জীপ টহল দিচ্ছে। ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের উপর সেনাবাহিনীর ক্যাম্প করেছে। উপরে সার্চ লাইটের মতো কি যেন একটা বসানো হয়েছে। এটা দেখে মনে হয় একটা যুদ্ধের ছাউনী। কলেজের ছাদের ওপরে মেশিনগান তাক করে ওরা কন্ট্রোল রুম থেকে সকল এলাকা পাহারা দিচ্ছে। আমরা যে বাড়ীতে আছি সে বাড়ী থেকে সব দেখা যাচ্ছে। আমরা আশংকা করছি যে কোন মুহূর্তে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী শুরু হতে পারে।**

**পরদিন ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করলাম, কার্ফু ও গোলাগুলির মধ্যেও সাধারণ মানুষের গতি অব্যাহত রয়েছে। সামনে রাজপথ নিয়ে লোকজনের চলাচল নেই। কিন্তু ভেতরের রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করছে। ছোট ছোট ছাপড়া দোকানগুলো ঝাপ উঠিয়ে সওদা বিক্রয় করছে। কাজের মেয়েরা কলসী দিয়ে পানি নিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলে আমার চলাচলেও কোন অসুবিধা হবে না।**

**আমি একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। যে কোনভাবে সাত মসজিদ রোড পার হতে হবে। আমার অবস্থান থেকে সাত মসজিদ রোড বেশ দূরে। আমার খুবই পরিচিত কুষ্টিয়ার আতাউল হক সপরিবারে সাত মসজিদ রোডের কাছাকাছি থাকেন। গলি দিয়ে পার হচ্ছি। পথে একজন মৌলানাকে পেলাম। এমনিতেই তার সাথে কথা বলি। তিনি লালমাটিয়ার পুরাতন অধিবাসী। মৌলানা সাহেব আতাউল হককে চিনেন। তার সাহায্যে আতাউল হকের বাড়ীতে পৌছি। মৌলানাকে বললাম, আমি হক সাহেবের আত্মীয়, পাবনা থেকে এসেছি। ওরা আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারে নি। পরে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।**

**মৌলানাকে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয় মহম্মদ আলী আছেন, তাকে নিয়ে আসার জন্য বললাম। কিছুক্ষণ পর মহম্মদ আলী এসে হাজির হলেন।**

**হক সাহেবের বাড়ীতে আমাদের নাশতা তৈরী করতে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। বিভিন্ন বাড়ীর পেছনের অলিগলি দিয়ে পথ চলছি। আমার আশংকা হচ্ছিল এই বাড়ী থেকে বেরোতে না পারলে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়ে সাত মসদিজ রোডে পৌছার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে একটি মিলিটারী জীপ এই রাস্তায় ঢুকে পড়ে। রাস্তায় ঢুকেই ওরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে। আমি একটি বাড়ির পাশে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। জীপটি ফিরে যেতেই আমি আতাউল হকের বাড়ীতে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর এ ধরনের গোলাগুলি চরম আকার ধারণ করে। কোথাও আগুন জ্বলছে। ভয়ার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে পরিবেশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে।**

**আতাউল হকের ঘরের বেড়া ও চাল টিন দিয়ে তৈরী। টিনের বেড়া ফুটো করে গুলী যে কোন একজনের গায়ে লাগতে পারে। গৃহকর্ত্রী বলেন, পাশের পাকা বাড়ীতে চাকর ছাড়া অন্য কোন লোকজন নেই। আমরা ইচ্ছা করলে দেয়াল টপকে সেখানে যেতে পারি। তার কথায় আমি পাশের পাকা বাড়ীতে যাই। তাজউদ্দিন ভাই ঐ বাড়ীতে গেলেন না।**

**এলোপাথাড়ি গুলি প্রায় আধা ঘন্টা ধরে চলে। পরে শুনেছি, এটা ছিল প্রথম পর্যায়ের অপারেশন। পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশকে আতংকিত করে ঢাকাবাসীকে গ্রামের দিকে ঠেলে দেয়া। বস্তি এলাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নীড়হারা বস্তির হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। ছিন্নমূল মানুষগুলো সামান্য আসবাবপত্র ও ছোটছোট ছেলেমেয়েদের কোলে দিয়ে এসেছে এখানে। কার্ফু জারী থাকা অবস্থায়ও এলোপাথাড়ি গুলি চলে। এমন সময় একটি মাইকে কেউ বলে গেল, কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নেয়া হয়েছে।**

**সে সময় একজন ছাত্র এ বাড়ীতে আসে। সে আমাদেরকে চিনতে পারে। তার মুখে শহরের টুকরো টুকরো খবর পেলাম। আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল ৩২ নম্বরে কি হয়েছে? ছাত্রটি সঠিক কিছু বলতে পারলো না। তবে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে দু'ধরনের খবর শুনেছে। কেউ বলেছে বঙ্গবন্ধু সরে গেছেন। আবার কেউ বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

**বাইরে কার্ফু না থাকায় আমরা বাড়ী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের দুজনের হাতে ১টি করে বাজারের থলি। যেন আমরা বাজার করতে যাচ্ছি। তাজউদ্দিন ভাই এর পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি। বাজারের থলির নীচে তার নিজের ব্যাগ রাখা হয়েছে।**

**আমরা সাত মসজিদ রোডে পৌছি। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিলে ১৯ নম্বর রাস্তা। সেটা পার হলেই রায়ের বাজার। এমন সময় আমাদের পেছনে একটি মিলিটারী জীপ এলো। জীপটি চলে যেতেই আমরা আবার রাস্তায় চলে আসি। ডানে মোড় নিলে লালমাটিয়ার সীমানা পেরিয়ে ১৯ নম্বর সড়ক। ডানে মোড় নেব এ সময় তাজউদ্দিন ভাই থমকে দাঁড়ান। আর একটু এগুলেই ডান পাশে তার বাড়ি। তিনি তার বাড়ী যেতে চাইলেন। আমি জোর আপত্তি জানাই। যুক্তি দিলাম, আপনার বাড়ী নিশ্চই আক্রান্ত হয়েছিল। হায়েনার দল এখনো বাড়ীর আশেপাশে আড়ি পেতে বসে থাকতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই-এর মনে পড়লো তার ঔষধগুলোর কথা। সেগুলো বাড়ীতে রয়ে গেছে। বাড়ীতে আর যাওয়া হলো না।**

**ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা রায়ের বাজারে পৌছি। এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাঁটি তখনো রয়েছে। নির্ভীক কর্মীরা সংগ্রাম কমিটির অফিস পাহারা দিচ্ছে। এদের সাহস দেখে একদিকে যেমন বিস্মিত হলাম, অপরদিকে আমার হাসিও পেল। কেননা প্রবল প্রতিদ্বন্দী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মোকাবেলা সাহসের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দী হলেও কৌশলের দিক দিয়ে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।**

**পাক বাহিনীর হামলা তখনো আসে নি। এলাকাবাসীর মনের ভয়ের লেশমাত্র নেই। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও অন্যান্য নেতাকর্মীদের সাথে আমাদের কথা হলো। তারা আমাদের কাছে এই মুহুর্তের করণীয় জানতে চাইল। আমরা সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি নির্দেশ দেই।**

**রায়ের বাজার থেকে দুজন লোককে দু’দিকে পাঠালাম। একজন গেল ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর খোঁজখবর জানতে, আর অপরজনকে পাঠালাম মুসা সাহেবের বাসায় ডঃ কামাল এসেছেন কিনা তা জানার জন্য। ৩২ নম্বরের খোঁজ নিয়ে আমাদের প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে পুলিশ নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন লোকজন নেই। পরস্পর জানতে পেরেছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আর মুসা সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ডঃ কামাল হোসেন সেখানে পৌছুতে সমর্থ হন নি।**

**সংগ্রাম কমিটির এই অফিসে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে খবর আসছে। মানুষের মুখে মুখে খবর প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ প্রমূখ নদী পার হয়ে জিনজিরার দিকে চলে গেছেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ-খবর জানতে পারলাম না।**

**কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব। সেখানে জমায়েত নেতাকর্মীদের বললাম, সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেরিয়েছি। তারা সময়ে সময়ে নির্দেশ পাবে।**

**ইতিমধ্যে আমরা অনেক ভেবেছি। পাক বাহিনীর নগ্ন হামলার জবাব দিতে হবে। বাংলার দামাল যুবকদের পুনর্গঠিত করতে হবে। ২৭শে মার্চ রায়ের বাজারের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। এই বিদায় ছিল মর্মস্পর্শী। তাজউদ্দিন ভাইকে আমি বলি, এখন পথই আমাদের ঠিকানা, পথই আমাদের সঠিক পথে পৌঁছে দেবে। বিদায়ের সময় রায়ের বাজারের একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করেন আমাদের পরিবারের জন্য কিছু বলার আছে কিনা। আমরা দু'জনে দু'টুকরো কাগজ নিয়ে কিছু লিখে তাদের হাতে দিলাম। কর্মীরা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাজউদ্দিন ভাইয়েরটা পৌঁছুল, আমারটা কর্মীরা পৌঁছাতে পারেনি। শুনেছি আমার বাড়ীওয়ালী কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। আমার খোঁজে কেউ আসলে তাকে ভয় দেখাতেন।**

**পরবর্তীকালে দু'জনে আলাপ করে দেখেছি স্ত্রীর কাছে আমাদের দু'জনের লেখার মাঝে আশ্চর্য রকমের মিল ছিল। আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছি। কবে এর শেষ হবে জানি না। আট কোটি মানুষের সাথে মিশে যাও। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখা হবে।**

**আমরা আবার যাত্রা করি। তাজউদ্দিন আহমদের পায়ে কাপড়ের জুতা। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। জুতা খুলে তিনি হাঁটতে থাকেন।**

**আমরা রায়ের বাজার থেকে নদী পার হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় যাব। অগণিত লোক পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে হেঁটে চলেছি। ঢাকা থেকে ভাগ্যাহত মানুষ যাচ্ছে। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ রয়েছে। পাক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে লোকজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের মিছিলে সর্বশ্রেণির মানুষ রয়েছে। এই মিছিলে আমরা মিশে গেছি। কেউ জানে না আমরা কারা। শুধু জানি আমিও ওদের একজন। চলতে চলতে এক সময় হয়তো এক বৃদ্ধার মাথার পুঁটলিও নিজের হাতে নিয়েছি। কখনো বা কোন ছোট শিশুকে কোলে করে পার করে দিয়েছি।**

**আমাদের গতি দ্রুত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হাজার হাজার মানুষ উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে গ্রামের মানুষ মিছিলের মানুষকে উদার হস্তে খাওয়াচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। ডেকে ডেকে মানুষকে খাওয়াচ্ছে। আতিথেয়তার প্রতিযোগিতা ছিল প্রতিটি গৃহে। সেদিন বাঙ্গালির জন্য বাঙ্গালিদের দরদ দেখেছিলাম, এতে আমি নিশ্চিন্ত হই যে বাংলার স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।**

**চলার পথে একজন সিপাই যুবকের সাথে কথা হলো। তার পরনে লুঙ্গি। ২৫শে মার্চ রাতে সে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ছিল। সে রাতে কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলো, কিভাবে তার সঙ্গী সাথীরা পাক বাহিনীর বর্বরতার শিকার হলো, এই ভয়াবহ কাহিনী তার মুখ থেকে শুনলাম। অন্য একজন সিপাই। সে মিটফোর্ড হাসপাতালে একজন রাজবন্দীর পাহারায় ছিল। অতি কষ্টে সে জীবন নিয়ে চলে এসেছে।**

**কাফেলাতে শুধু জীবন্ত মানুষ নয়, এখানে রয়েছে লাশ। কয়েক দিনের পুরনো লাশও রয়েছে। প্রিয়জনের মৃতদেহ ওরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। পথে পথে অনেক জানাজা হতে দেখলাম। ঢাকাতে যারা শহীদ হয়েছে তাদের লাশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।**

**পথিমধ্যে তাজউদ্দিন ভাইকে অনেকে চিনে ফেলে। একজন আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও এক প্রকার জোর করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। তার জোর দাবী কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।**

**আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা এক প্রকার ভুলে গেছি। চা ও বিস্কুট খেলাম। কিছু বিস্কুট পকেটে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করি।**

**যাবার আগে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলে গেলাম, সংগ্রাম কমিটির আওতায় সব কিছু পরিচালনা করতে হবে। শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। শত্রুদের খবর পেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।**

**পথ চলতে চলতে এক সময় বেলা পড়ে গেল। সামনে নদী। এই নদী পার হলে নবাবগঞ্জ থানা পার হয়ে আমরা দোহার থানায় যাব। খেয়া নৌকায় লোকজনকে পার করে দেয়া হচ্ছে। তবুও নদীর দু'ধারেই মানুষের ভিড়। তবে মানুষকে পার করে কেউ কোন পয়সা নিচ্ছে না। আশেপাশের মানুষ নিজেদের নৌকা দিয়ে ভাগ্যাহত জনতাকে পার করে দিচ্ছে। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সাথে একটি নৌকায় পার হই। নৌকাওয়ালা পয়সা নিতে রাজী হলো না।**

**ওপারে নেমেই দেখি একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল। সে যেন আনন্দে আত্মহারা। যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। সে বলল, আপনাদের নেয়ার জন্যই আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।**

**মোটর সাইকেলে দুইজনের বেশী ওঠা যায় না। প্রথমে তাজউদ্দিন ভাইকে নিয়ে গেল তার গ্রামে। আমি হাটতে থাকি। পরে আমাকেও নিয়ে গেল। সে গাঁয়ে আওয়ামী লীগের এক বিশিষ্ট নেতার বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। বাড়ীর সামনে পানি ভরা পুকুর। সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও দু'জনে গোছল করি। এরপর বৈঠকে বসি। ইতিমধ্যে এই বাড়ীতে অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হলো।**

**আহার শেষে দু'জনে এক চৌকিতেই ঘুমাতে যাই। পরদিন ভোরে আমাদের যাওয়ার জন্য ২টি মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবস্থান থেকে পদ্মার দূরত্ব ৫০ মাইল। মোটর সাইকেলযোগে রওনা হয়ে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা সুবেদ আলী এমপি'র বাড়ীতে পৌছি। সুবেদ আলী টিপু ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। বিলেতে থাকাকালে তার সাথে আমার পরিচয়। তিনি একজন উৎসাহী দলীয় সদস্য।**

**এই বাড়ীতে আমরা আবার বৈঠকে বসি। সেখানে কৃষক নেতা জিতেন বাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি ন্যাপ এর সদস্য। ঘন্টাখানেক পরে আমরা আবার যাত্রা করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপর একজন এমপি এ আশরাফ চৌধুরীর বাড়ীতে পৌঁছে যাই। গৃহস্বামী মাত্র ১ ঘন্টা আগে বাড়ী পৌঁছেছেন। তিনি ২৫শে মার্চের কালরাতে ঢাকায় ছিলেন। বিরাট দ্বিতল বাড়ী। পানি এনে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কিছু খেয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। পথ দেখাবার জন্য স্কুলের একজন বাঙালি দফতরী আমাদের সাথে রয়েছেন। পদ্মার তীরে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রমত্ত পদ্মার বুকে তখন প্রচণ্ড ঢেউ। কয়েকটি নৌকা তীরে বাঁধা রয়েছে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কোন নৌকা আমাদের ওপারে নিয়ে যেতে সাহস পেল না। অগত্যা তীর থেকে আমরা আগারগাঁও নামক একটি গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের দলীয় একজন কর্মী-বন্ধুর বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।**

**বাড়ীর লোকেরা তাঁতের কাজ করে খায়। স্নান করে খেতে যাব, হঠাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান কানে ভেসে আসলো। ঘোষক বেতারে বলছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে হাজির হতে বেতারে নির্দেশ দেয়া হলো। প্রথমে এদের নাম-ধাম কিছুই বুঝা গেল না। ঠাওর করে উঠতে পারলাম না, কারা কোত্থেকে এই বেতার চালাচ্ছে। পরে বেতারে মেজর জিয়ার কন্ঠ শোনা গেল। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান।**

**মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। পরদিন এই বেতার থেকে টিক্কা খানের আহত হবার কথা শুনি। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের অনেক খবর প্রচার করা হয়।**

**আমরা দু'জন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে অবিলম্বে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পরদিন ভোরবেলা আবার রওনা হই। পদ্মা তখন শান্ত। মাঝ নদীতে চর পড়েছে। আমাদের তাই দুই অংশে পার হতে হবে। আমাদের সাথে আশরাফ আলী চৌধুরীর স্কুলের পিওন রয়েছে।**

**পদ্মার ঘাটে ছোট বড় অনেক নৌকা। অনেক নৌকা খুলনা বরিশালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি এবারে ফসল কেটে সব নৌকা কি ঘরে ফিরতে সমর্থ হবে? এমনিভাবে ভাবতে ভাবতেই নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠছি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি। সকলের মনেই ভীতির ভাব। এমন সময় আইডব্লিউটিএ'র একটি মোটর যান দেখা গেল শব্দ করে আমাদের দিকে আসছে। কেউ কেউ এটাকে পাক সামরিক বাহিনীর মোটর যাব ভেবে আশংকা প্রকাশ করে। আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ি ওরা ঢাকা ছেড়ে আসতে পারে না। মোটর যানটি কাছে আসার পর দেখা গেল এতে কিছু সাধারণ যাত্রী রয়েছে। পরে শুনেছি, পাক বাহিনী যাতে ব্যবহার না করতে পারে এ জন্য শ্রমিকরা এই বোটগুলোকে নিয়ে এসেছিল।**

**আমরা নদীর ওপারের খবর জানি না। সেখানে একটি বাজার দেখা যাচ্ছে। একটি নৌকা করে আমরা নদীর ওপারে যাই। আর নদীর এপার থেকেই পথ দেখাতে আসা স্কুলের পিওনকে বিদায় করে দেই।**

**বাজারের পাশেই একটা মাঠ। মাঠে কেউ লাঙ্গল চালাচ্ছে কেউ বা অন্যান্য কাজ করছে। চারদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলো। এই অবস্থায় আমরা বাজারে গিয়ে পৌছি। বাজারে গিয়েই সেখানকার সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের সাথে দেখা হলো।**

**আমরা এখান থেকে ফরিদপুর যাব। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ছাড়া অন্য কোন পথে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পায়ে হাঁটা পথও ভাল নয়। খাল, বিল, নালা পেরিয়ে যেতে হবে। তবে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। অগত্যা আমরা দুটি ঘোড়াই ভাড়া নেই। এই বাজার থেকে ৭ মাইল দূরে ফরিদপুর শহর। ঘোড়ায় চড়ে শহরের এক প্রান্তে নামি। সেখান থেকে রিক্সাযোগে আওয়ামী লীগ নেতা ও এমপি ইমামউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হই। বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝলাম লোকজন বেশ শংকিত। গত রাতে শহর থেকে লোকজন গ্রামে চলে গেছে। ঢাকা থেকে লোকজন এসে সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা দিয়েছে। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনেই লোকজন রাতের বেলা শহর থেকে চলে যায়।**

**ইমামউদ্দিনের স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। বাড়ীতে তিনি একা। ইমামউদ্দিন বাড়ীতে নেই, তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আশেপাশের পুলিশ ও বি ডি আর-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ইমাম সাহেব বাড়ী আসেন। তাড়াতাড়ি ডালভাত রান্না হলো। শহরের লোক আশংকা করছে এখানে যশোরের পাক সৈন্যরা যে কোন সময় হামলা করতে পারে।**

**আমরা সবে মাত্র খেতে বসেছি। এমন সময় খবর এলো পাক সৈন্য এদিকে আসছে। কোন দিক দিয়ে আসছে সে সময় তা বুঝা গেল না। চারদিক লোকজন ছুটোছুটি করছে প্রাণ ভয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম এখান থেকে মাগুরার পথে রওনা হবো। সেখান থেকে যশোর সেনানিবাস ও আশেপাশের খবর পাওয়া যাবে।**

**স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি। রাস্তার বিভিন্ন অংশ কেটে দেয়া হয়েছে পাক সৈন্যরা গতি রোধ করার জন্য। একটা রিক্সাযোগে আমরা কামারখালীর পথে চলেছি। কোথাও কোথাও নিজেরা রিক্সা পার করেছি। এমন সময় ফরিদপুরের দিকে একটি জীপ আসতে দেখি। জীপটি কার তা দেখার জন্য আমরা রাস্তার আড়ালে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম জীপটিকে অসামরিক লোক রয়েছে। জীপে চালকের সাদা পোশাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক বসা। রাস্তায় এসে জীপটি থামাবার ইঙ্গিত দেই। পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক। নাম শাহ ফরিদ। তার কাছে টুকরো টুকরো খবর পেলাম।**

**শাহ ফরিদ মেহেরপুর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তিনি জানান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক ইলাহী চুয়াডাঙ্গার পুলিশ ও বি ডি আর এর সাথে যোগাযোগ করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। ঝিনাইদহ, যশোর, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়ার জনগণ পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করছে। সেখানে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এসব খবর শুনে আমরা দু'জন আশান্বিত হই।**

**শাহ ফরিদ আমাকে চিনল কিনা বুঝলাম না। ঢাকার পরিস্থিতি তাকে জানাই। আমি বললাম, আমরা আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে এই এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এসেছি। পরে শাহ ফরিদ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।**

**রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের পুলিশ ও বিডিআরদের কুষ্টিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেই। স্থানীয় একটি বাসে অন্যান্য কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠি। কিছুদূর যেয়ে বাসটি আর যেতে পারলো না। এখন আমার সাথে অনেক যাত্রী। কামারখালী পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।**

**সামনে নদী পার হতে হবে। একটি মাত্র খেয়া নৌকা। যাত্রী বেশি। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। নৌকা প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা। অনেক কষ্টে নদী পার হলাম। আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। হাঁটতে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। এখান থেকে মাগুরা ৮ মাইল। আমাদের সাথে আরো অনেকে রয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু ছাত্র-যুবকও রয়েছে। আমরা এদের মধ্যে অচেনা রয়ে গেছি, যেমনি ছিলাম সারা পথে। ঘনিষ্ঠ কর্মী ছাড়া কারো কাছে নিজেদের পরিচয় দেই নি।**

**সন্ধ্যাবেলা কামারখালী ঘাটে রেডিও শুনি। রেডিওর কাছে বহু লোক ভিড় করে। বেতারে টুকরো টুকরো খবর প্রচার হয়। 'মুক্তিবাহিনীর গুলিতে টিক্কা খান আহত,' পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বেতারে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানানো হয়।**

**মাগুরা খালের ওপর কাঠের পুলটি পুড়তে দেখলাম। শত্রুদের গতিরোধ করার জন্য নিজেরাই পুল পোড়াচ্ছে। টর্চের আলোতে ওপারে সঙ্গীন দেখা গেল। বললাম, আমরা বন্ধু। পার হবার জন্য একটি মাত্র ছোট নৌকা ছিল। দুই জনের বেশী নৌকায় ওঠা যায় না। আমরা দুইজন সকলের শেষে পার হই।**

**ওপারে গেলে সকলের দেহই তল্লাশি করা হলো। আমার পর তাজউদ্দিন ভাই-এর পালা। মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরলো। নেতাকে চিনতে পেরেছে। তাজউদ্দিন ভাইও তাকে জড়িয়ে ধরেন।**

**রাত তখন অনেক। একটি রিক্সাওয়ালাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। আমরা দু'জনে রিক্সায় আর সে হেঁটে চলে। অনেক রাতে আমরা আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেনের বাড়ি পৌছি। সোহরাব ভাই-এর স্ত্রী রাতের বেলা আমাদের জন্য রান্না করেন। খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল।**

**সোহরাব হোসেন এখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। মাগুরার মহকুমা প্রশাসক কামাল সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। স্থানীয় কর্মীরা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।**

**সিদ্দিকী আমার পূর্ব পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্য কয়েকজনের সাথে সিদ্দিকীকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমি তার পক্ষে কৌসুলি ছিলাম। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালেও সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।**

**আমরা দু'জন ও সোহরাব ভাই জীপযোগে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ঝিনাইদহ পৌছি। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল আজিজের বাসায় উঠি। আমরা সেখানে পৌঁছে এসডিপিও মাহবুবউদ্দিনকে খবর পাঠাই। মুক্তিযুদ্ধকালে মাহবুবের ভূমিকা ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল। পরে তিনি ঢাকার পুলিশ সুপার হন।**

**মাহবুব ঝিনাইদহে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে। আমাদের দেখে খুবই উৎফুল্ল হলো। এই কন্ট্রোল রুম থেকে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যশোর সেনানিবাসের চারদিক জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। হাজার হাজার লোক বজ্রকন্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে সেনানিবাস পুড়িয়ে দেবার জন্য। জনতার হাতে বন্দুক, রাইফেল, বল্লম, বর্শা, দা, কুড়ালসহ স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র। কুষ্টিয়াতে তিন শতাধিক পাক সেনা মুক্তিবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ।**

**কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ থেকে ২৮ মাইল দূরে। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার অবাঙালি মহকুমা প্রশাসককে হত্যা করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার অবরোধ জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিভিন্ন জরুরি নির্দেশ দিয়ে আমরা দুইজন ও মাহবুব চুয়াডাঙ্গা চলে যাই। সেখানে পৌঁছে তওফিক এলাহী ও মেজর ওসমানের সাথে ব্যাপক আলোচনা হয়। চুয়াডাঙ্গার সকল আওয়ামী লীগ কর্মীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। ইতিমধ্যে আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি বিডিআর বাহিনী কুষ্টিয়া প্রেরণ করি।**

**কুষ্টিয়াতে পাক সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। গ্রাম থেকে অগণিত লোক শহরে আসে। হাজার হাজার মানুষের শ্লোগানে শহর কেঁপে ওঠে। মানুষের হাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ অস্ত্র। পুলিশের সকল রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। অবাঙালি এডিসি সার্কিট হাউজে পাক সেনাদের সাথে অবরুদ্ধ। এডিসি নিহত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। তিনি একজন পাক জেনারেলের আত্মীয়।**

**কুষ্টিয়ার সর্বশ্রেণীর লোক যুদ্ধে অংশ নেয়। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত, ডিম, রুটি, পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠায়। আমাদের অগণিত সৈনিকদের রসদের কোন অভাব হয় নি। ঝিনাইদহ থেকে খবর পাই, কিছুসংখ্যক পাক সৈন্য ভয়ে পালিয়ে গেছে ।**

**সারাগঞ্জ ব্রিজ আমার বাড়ির পাশে। যশোর-কুষ্টিয়ার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার ওপর এই ব্রীজ দিয়েই যশোর থেকে পাক বাহিনী কুষ্টিয়া আসতে পারে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ব্রীজের পাশে মাটি কেটে এর উপর চট বিছিয়ে দেয়। চটের মধ্যে আলকাতরা দিয়ে রাস্তার পিচের মত কালো করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে পাক সেনাদের একটি পলাতক জীপ সেই খাদে পড়ে যায়। গ্রামের লোক ওদের পিটিয়ে মারে। এমনিভাবে কুষ্টিয়ার গ্রামের মানুষ পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের পিটিয়ে মারে।**

**চুয়াডাঙ্গা থেকে খবর পাই, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়ী হয়েছি। ওরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পলায়নোন্মুখ। এদের একজনও যশোর সেনানিবাসে ফিরে যেতে পারেনি। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ার বীর জনতার প্রতি একটি অভিনন্দন বাণী পাঠাই। আমার এই বিবৃতি ভারতে কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত হয়।**

**চুয়াডাঙ্গা গিয়ে তিন ভাগে বৈঠক করি। একটি রাজনৈতিক, একটি সামরিক ও অপর বৈঠকটি করি তওফিক ও মাহবুবকে নিয়ে। তওফিক একাধারে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক। সেখানে বসে পাবনার খবর পাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের যোগ দিয়েছেন। মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুরে আমাদের অবস্থা ভাল। যশোর সেনানিবাস বীর জনতার দ্বারা তখনো অবরুদ্ধ।**

**ঢাকার অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চট্টগ্রামের খবর বিপ্লবী বেতারযোগে পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলছে। বাংলার সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশসহ সর্বশ্রেণীর লোক সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বীর জনতার মনোবল থেকে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত। বিভিন্ন স্থানে খণ্ড যুদ্ধে আমরা জয়ী হলেও বিশাল পাক বাহিনীর সাথে লড়াই করার মত অস্ত্রসম্ভার এই মুহূর্তে আমাদের নেই। তবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জনতার শক্তি দানা বেঁধে উঠেছে, একে সুসংহত করতে হবে। জনযুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যোদ্ধাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তুলে দিতে হবে। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার কৌশল আমাদের যোদ্ধাদের শিখাতে হবে।**

**চুয়াডাঙ্গায় তৌফিক, মাহবুব ও মেজর ওসমানের সাথে আবার বৈঠক করি। ডাঃ আসহাবুল হক আমাদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করছেন। অস্ত্রের জন্য ভারতে যে আমাদের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন।**

**বেলা ৩টার দিকে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই সীমান্তের পথে রওনা হই। তওফিক ও মাহবুব আমাদের সাথে ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হবো না বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করলেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের আলোচনা সম্ভব।**

**সীমান্ত থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট খালের ওপর একটি বৃটিশ যুগের তৈরী কালভার্ট। কালভার্টের ওপর তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বসে আছি। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তওফিক ও মাহবুবকে ওপারে পাঠাই।**

**তাজউদ্দিন ভাইকে বিষণ্ন মনে হলো। তার বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ছোটবেলার একটা কথা তার মনে পড়ছে। তিনি বলতে থাকেন ছোটবেলা হিন্দু সহপাঠীরা বলতেন, তোদের পাকিস্তান টিকবে না। আমি পাল্টা জোর দিয়ে বলতাম অবশ্যই টিকবে। ছোটবেলার সহপাঠীদের কথা তার মনে পড়ছে। সূর্য ডুবু ডুবু করছে বাংলাদেশের আকাশে আবার কখন নতুন সূর্যের উদয় হবে, তা ভাবতে আমরা দু'জনেই কালভার্টের ওপর শরীর এলিয়ে দেই।**

**তওফিক এলাহী ও মাহবুব চলে যাওয়ার পর অনেক্ষণ কেটে গেল। ওরা ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে গেছে। জঙ্গলের ভেতর বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। জনবসতি নেই বললেই চলে।**

**চারদিকে আগাছায় ভরে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাজউদ্দিন ভাইকে ডেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। শব্দ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসছে। আগন্তুকরা কাছে এসেই অস্ত্র উঁচু করে সামরিক কায়দায় আমাদের অভিবাদন জানান। অফিসারটি জানান, আমাদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাউনিতে নিয়ে যেতে এসেছেন।**

**আগন্তুক অফিসারের সাথে আমরা ছাউনিতে চলে যাই। ছাউনিতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের আগমনের খবর ইতিমধ্যে কোলকাতায় পৌঁছে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসএফ-এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনীতে এসে পৌঁছলেন। আমরা আমাদের সংগ্রামে ভারতে সর্বাত্মক সাহায্যের আবেদন জানাই।**

**মজুমদার বলেন, আপনাদের আবেদনের জবাব শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই বলতে পারেন। তিনি জানান, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তার সাথে কোলকাতা যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তার পক্ষে ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র দেয়া সম্ভব। তবে দিল্লীর সাথে আলোচনা ছাড়া কিছু করা সম্ভব না। তওফিক এলাহী ও মাহবুবকে বিদায় দিয়ে মজুমদারের জীপে করে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কোলকাতা যাত্রা করি।**

**মজুমদার নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, আমাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ফ্লাইটে দিল্লী থেকে একজন কর্মকর্তা আসবেন। তার এ কথা শুনে আমরা কিছুটা আশ্চর্য হই। রাতেই তার সাথে যোগাযোগ করেন। জীপ থেকে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বড় কালো রঙ এর একটি গাড়ীতে তোলা হলো। বিমান থেকে ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা একজন লোক নেমে সোজা আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। মজুমদার তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হলেন বিএসএফ এর প্রধান রুস্তমজী।**

**রুস্তমজী এক সময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন।**

**এদিকে আমার কাপড় চোপড়ের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। গাড়ীতেই শুরু হয় আলোচনা। রুস্তমজীর প্রথম প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কোথায়? মজুমদারের প্রথম প্রশ্নও ছিল এটাই। এর পরেও আরো অনেকের সাথে দেখা হয়েছে সকলেরই প্রথম প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কেমন আছে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা তৈরী ছিলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের সাথে বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের ব্যাপারে আমরা একই উত্তর দিয়েছি। আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাচ্ছি। তিনি জানেন, আমরা কোথায় আছি। তিনি আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সময় হলে বা প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি উপযুক্ত স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবেন।**

**একটি সুন্দর বাড়ীতে (আসাম হাউজ) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একটি ঘরে আমি আর তাজউদ্দিন ভাই, অন্য ঘরে রুস্তমজী। আমরা খুবই ক্লান্ত। স্নান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সাথে অতিরিক্ত কোন কাপড় নেই। রুস্তমজী আমার পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের কথা জেনে তার ইস্ত্রি করা পায়জামা ও কোর্তা দিলেন। ছ'ফুট লম্বা মানুষের কোর্তা সামাল দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।**

**তখন প্রায় মধ্যরাত। স্নানের কাজ সেরে নিলাম। এত রাতে খাবার পাওয়া কষ্টকর, তবুও গোলক মজুমদার আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। খাওয়ার পর টেবিলের ওপর রাখা একটি মানচিত্রের দিকে আমরা চোখ রাখি। কোনদিন যুদ্ধ করি নি বা এর কথা ভাবি নি। অথচ আজ যুদ্ধের পরিকল্পনায় অংশ নিতে হচ্ছে। রুস্তমজী রণকৌশলী। আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে জানালাম। আজ রাতেই আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।**

**আমাদের প্রথম কাজ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের একত্রিত করে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো, মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করা। বিএসএফ-এর বিভিন্ন প্রধানদের এই গভীর রাতে ডাকা হয়। তার যোগাযোগ প্রধানের সাথে এই রাতেই যোগাযোগ করা হলো। আওয়ামী লীগের এমএলএ, এমপিসহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরি করে এতে তাদের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এসব নেতার সাথে যোগাযোগের জন্যে এই তালিকা বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়। আমরা বিশেষ ক'জন দলীয় নেতার কথা জানালাম যাদের সাথে আমাদের সহসাই যোগাযোগ প্রয়োজন। যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়লাভ করেছি এবং চুয়াডাঙ্গাতেও আমাদের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অতি দ্রুত আমাদের সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের এই খবর পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। বিএসএফ এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ নেতৃবৃন্দের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেয়া শুরু করি।**

**যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সাহয্য দিতে বিএসএফ রাজী হলো। পরামর্শ করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা বিছানায় যাই। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে রেডিওর শব্দ শুনি। বিএসএফ-এর চট্টোপাধ্যায় এই রেডিও দিয়েছিলেন। রেডিওতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনি। আমাদের মা-বোনদের ওপর বর্বর অত্যাচারের কথা শুনে মনের অজ্ঞাতেই বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত দু-চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।**

**বিএসএফ আমাদের আতিথেয়তার ভার নেয়। চট্টোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। ৯ মাস আমাদের সাথে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেছেন। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। একজন বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে এমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেও কোন দিন কোন কৃতিত্বের দাবী করেন নি। মিঃ চট্টোপাধ্যায় আমার জন্য একটি প্যান্ট ও একটি শার্ট যোগাড় করলেন।**

**আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। যেসব স্থানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পর চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ হলো। চুয়াডাঙ্গাকে আমরা বিপ্লবী সরকারের রাজধানী করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করেছি। পরদিন দেখি, সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই খবর ফাঁস না করার জন্য ডাঃ আসহাবুল হককে আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, আনন্দের আতিশয্যে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছ তিনি তা বলে দিয়েছেন। ডাঃ আসহাবুল হক, মেজর ওসমান ও তওফিক ইলাহীর সাথে আমাদের ফোনে যোগাযোগ হলো। মেজর ওসমানকে বললাম তার সাথে সহসাই আমাদের দেখা হবে। তিনি বেশ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা তৈরী করে রাখেন।**

**সেদিন ছিল কোলকাতা 'বন্ ধ’। বাংলাদেশের আন্দোলনের সমর্থনে এই ‘বন্ ধ’ ডাকা হয়। কোলকাতার জনজীবন একেবারে স্তব্ধ। গাড়ী ঘোড়া সবকিছু বন্ধ। কোলকাতার ভাইরা সেদিন আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কোলকাতাস্থ পাক সরকারের কার্যালয়ের চারদিকে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।**

**আমাদের জন্য একটা বাড়ী দরকার। রুস্তমজী বাড়ির সন্ধানে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পাকিস্তান কনস্যুলেট এর কাছে আমাদের জন্য একটি বাড়ি নির্বাচিত হলো।**

**ঘরে ফিরেই তাজউদ্দিন ভাই ও আমাই তিনটা খসড়া পরিকল্পনায় হাত দেই। এগুলো হলো দলের সাংগঠনিক, সরকার গঠন ও সামরিক পরিকল্পনার কাজ। যা মাথায় এসেছে, তাই লিখেছি। সাথে সাথে ছক কেটে তীর চিহ্ন দিয়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেছি। এরপর মুক্তিযুদ্ধের জন্য সারাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়।**

**পরদিন আমাদের দিল্লী যাওয়ার কথা। বিএসএফ ও অন্যরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করছে আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য। পরদিন সকালে সীমান্তের দিকে যাই। খবর অনুযায়ী মেজর ওসমান অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরি করে নিয়ে আসেন। মেজর ওসমানকে কিছু অস্ত্র দেয়া হলো। এর মধ্য এলএমজিও ছিল। ইতিমধ্যে খবর এলো পাক সৈন্যরা যশোর সেনানিবাস থেকে বের হবার চেষ্টা করছে। তাকে এক্ষুনিই যেতে হবে। মেজর ওসমান সদ্য পাওয়া এলএমজি কাঁধে নিয়ে দ্রুত রওনা হলেন।**

**চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর ওসমানের সাথে তার স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। এই তেজস্বী মহিলা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাহসী এই বীরের স্ত্রী বেগম ওসমান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি স্বামীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতেন, অপরদিকে বিডিআর জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি যুদ্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন।**

**১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর সেনা বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে ওসমান নিহত হন।**

**১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল। আজ আমরা দিল্লী যাচ্ছি। গোলক মজুমদার আমাদের সাথে আছেন। সরজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিমানবন্দরে আমাদের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। ইতিমধ্যে চট্টোপাধ্যায় আমাদের দুজনের জন্য একটি স্যুটকেস ও একটি ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। হাত ব্যাগে কাগজপত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রয়েছে। স্যুটকেসে আমাদের পরিধেয় কাপড়, তোয়ালে ও সাবান। রাত ১০ টার দিকে জীপে করে একটি মিলিটারী মালবাহী বিমানের কাছে আমাদের নিয়ে আসা হল। মই দিয়ে আমরা বিমানের ককপিটে উঠি। পাইলট ও তার সহকারীদের ছাড়া নিমানে বসার জন্য কোন আসন নেই। শুধুমাত্র কেনভাসের বেল্ট দিয়ে আমাদের চারজনের বসার ব্যবস্থা করা হল। বিমানের পিছন দিক উন্মুক্ত। এদিয়ে অনায়াসে মাল উঠা-নামা করা যায়। তখনও এতে মাল ভর্তি ছিল। এই মালবাহী সামরিক বিমানে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সকল এজেন্সী থেকে আমাদের যাত্রা গোপন রাখা।**

**এটা ছিল একটা পুরনো রাশিয়ান বিমান। এর শব্দ ছিল বিকট। বিমানের যাত্রা শুরু হল। সমস্ত ককপিট কাঁপছে। তাজউদ্দিন ভাই বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ওভাবে বসে থাকতে পারলেন না। দিল্লী পৌছতে রাত শেষ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর একটা কেনভাস বিছিয়ে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই মেঝেতে শুয়ে পড়ি। গরমে আমরা ঘামছিলাম। বিমানের কাঁপনের সাথে আমাদের শরীরও কাঁপছিল। এমনি করে আধা ঘুমে আধা জেগে ভোরের দিকে আমরা দিল্লী পৌছি। সেখানে মিলিটারী বিমান বন্দরে আমাদের জন্য একটি গাড়ি প্রস্তুত ছিল। একজন কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে গেলেন। চট্টপাধ্যায় আমাদের সাথে ছিলেন। মজুমদার গেলেন তাঁর মেয়ের বাসায়। প্রতিরক্ষা কলোনীর একটি বাড়িতে আমাদের রাখা হলো। পরে জেনেছি বাড়িটি ছিল বিএসএফ-এর একটি অতিথিশালা। এ বাড়ীতে অন্য আর কেউ নেই। আমি ও তাজউদ্দিন ভাই এক ঘরে, চট্টপাধ্যায় অন্য ঘরে। আমাদের দুটি বিছানা রয়েছে। ঢাকা থেকে বেরোবার পর থেকে দু'জন একত্রেই থাকছি। এতে সুবিধা অনেক। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত সব কিছু পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই। গোলক মজুমদার ও রুস্তমজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের কিন্তু বিলম্ব সইছে না। ইতিমধ্যেই দিল্লীর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রশ্ন তুলছে যে মোহম্মদ আলী প্রকৃতই তাজউদ্দিন আহমেদ এবং রহমত আলী ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম কিনা।**

**ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্হার আচরণে কখনো অবাক হয়েছি আবার কখনো ভীত হয়েছি। তবে 'র' RAW নামক একটি গোয়েন্দা সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় খুবই ব্যস্ত ছিল। এই সংস্থাটির কার্যকলাপে কখনই সন্তুষ্ট হতে পারি নি। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আমাদের সাথে আলাপ করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় আসলেই আমরা আওয়ামী লীগের লোক কিনা। তাদের আলোচনার পর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মিঃ কউলের কিছুটা বিশ্বাস জন্মে যে সত্যিই আমরা আওয়ামী লীগের লোক।**

**মেজর ওসমানের অস্ত্রের তালিকাটা তখনো আমার পকেটে। কথায় কথায় মিঃ মীরন আমাদের জানান যে, আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র পেতে আমাদের বিলম্ব হবে। মিঃ মীরনের কাছে আমরা জানতে পারি, লণ্ডনে মিনহাজ উদ্দিনের সাথে তাদের কথা হয়েছে। আমাদের কোন খবর থাকলে তিনি তা পৌঁছে দিতে পারেন।**

**মিনহাজ আমার পূর্ব পরিচিত। আমি তাকে চিঠি লিখি। আমি চিঠিতে অস্ত্রের একটা তালিকা পাঠাই। তাকে জানাই, লণ্ডনস্থ বাঙালিরা ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। তখনো বুঝে উঠতে পারি নি অস্ত্র কেনা বা তা সরবরাহ করা তত সহজ নয়।**

**ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম, রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান দিল্লীতে পৌঁছেছেন। তাছাড়া এম, আর সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আব্দুর রউফ তখন দিল্লীতে ছিলেন। তাদের সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের বৈঠক হয়। এম আর সিদ্দিকীর কাছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মোটামুটি কিছু খবর পাই। তাঁর কাছে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের কাহিনীও শুনি। তিনি জানান, মেজর জিয়া একটা জীপে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগের নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করান। তিনি আরো জানান চট্টগ্রাম থেকে তারা একটি ট্রান্সমিটার আগরতলাতে নিয়ে এসেছেন, এবং তা দিয়ে প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও জনগণ তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একটি সরকার গঠন করার জন্য তিনি আমাদের অনুরোধ জানান। কর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি আগরতলা চলে যান। তবে তাকে সরকার গঠন করার ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। আবদুর রউফকে নির্দেশসহ রংপুর পাঠিয়ে দেই।**

**এ সময় ময়মনসিংহ থেকে রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া ও সৈয়দ আবদুস সুলতানের চিঠি পেলাম। সৈয়দ সুলতান বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।**

**এমনিভাবে দিল্লী আসার পর ২ দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছেন। আমরা তাদের দু'জনকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, বাঙালি হলেও আমাদের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সত্ত্বা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের ৫৪ হাজার বর্গমাইল ভূ-খন্ডের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি।**

**৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন ভাই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাদের কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও পূর্বাপর আলোচনার বিষয় আমার জানা ছিল। সাক্ষাতে যাওয়ার পূর্বে তাজউদ্দিন ভাই আমার সাথে কয়েক ঘন্টা ধরে সম্ভাব্য আলোচনা সূচী নিয়ে আলোচনা করে যান।**

**মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন ভাই আমাকে সব কিছু জানান। মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দিন ভাই-এর গাড়ী পৌঁছে যাওয়ার পর তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাডি রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন। 'হাউ ইজ শেখ মুজিব, ইজ হি অল রাইট?' এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কেননা এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরকে আরো অনেকবার হতে হয়েছে। মিসেস গান্ধীর প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫শে মার্চের পর তাঁর সাথে আমাদের আর যোগাযোগ হয় নি। সাক্ষাতে তাজউদ্দিন ভাই আরো বলেন, বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যে এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বললেন, পাকিস্তান আমাদের আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাতে পারে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমাদের অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন ভাই ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশের নেতা জানান, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোট নিরপেক্ষ। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহায়তা আমরা চাই।**

**আমরা একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিৎ। এদিকে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুটস্বরে তিনি বলে ফেলেন বঙ্গবন্ধু আমাকে কী বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই দ্বিধাগ্রস্থ কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।**

**আমার সরল মনের কাছে দেশের এমন ভয়াবহ একটি পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়।**

**তাজউদ্দিন ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? আমি স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে রেখে গেছেন। আমি বললাম, যে ৫ জন নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাই কমাণ্ড গঠন করেছিলেন, এই ৫ জনকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক ও তিনজন সহ-সভাপতি নিয়ে এই হাই কমাণ্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দিন ভাই পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দ্বিধা না করে এবারও জবাব দিলাম, ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের দায়িত্ব পালন করবেন।**

**তাজউদ্দিন ভাই অনেকক্ষন ভাবলেন। আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা কোনভাবেই তিনি নাকচ করতে পারলেন না। তিনি এত বেশি কেন ভাবছিলেন তার উত্তর জানতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।**

**তাজউদ্দিন ভাই নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী পুরুষ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দল ও দেশের স্বার্থে কাজ করতেন। নিজে বেশিরভাগ কাজ করেও তিনি কৃতিত্বের দাবি করতেন না। সকল কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি যখন বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করি, তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এই দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আবার আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা কে কোথায় কী অবস্থায় আছেন, এ নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। পত্রিকাতে ইতিমধ্যে অনেকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য পত্রিকাতে নিহতের তালিকায় তাজউদ্দিন ভাই এবং আমার নামও রয়েছে।**

**নিহতের তালিকায় আমাদের দু'জনের নাম দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের নেতারাও হয়তো জীবিত রয়েছেন। আমাদের আর একটি চিন্তা হলো বঙ্গবন্ধুকে সরকারের প্রধান করা হলে আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হবে। অথবা তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ দেখা দিবে কিনা। এ নিয়ে দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করি। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেই আবার খণ্ডন করি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ফলাফল যাই হোক, বঙ্গবন্ধুকে সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে।**

**তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে তাঁর সাথে কাজ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে, কোন প্রকার ভয় ভীতি বা চাপের মাধ্যমে পাক সরকার বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন বিবৃতি দিতে সমর্থ হবে না।**

**আমরা যেহেতু একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু তখন শত্রুর কারাগারে বন্দী কাজেই সে সময় আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয়েছিল। তাছাড়া ভাবাভাবির বেশি সময়ও ছিল না। কেননা আমাদের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। একটা সরকার গঠন করা ছাড়া কাজে এগুনো যাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সিপাহশালার শত্রুর হাতে বন্দী। আবার তাঁকে বাদ দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা কল্পনাও করা যায় না।**

**তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কী হবে। আমি বললাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' তাজউদ্দিন ভাই এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এ সময় সরকারী কাগজপত্র ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে মনোগ্রাম সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাতে আঁকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল-এর মাঝে সোনালী রং- এর মানচিত্র। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম সরকারী অনুমোদন।**

**এই দিন সন্ধ্যার পর রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রেহমান সোবহান এর আগে একবার দেখা করে গেছেন। এ সময় আনিসুর রহমান স্বচক্ষে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তিনি নিজের বাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে অন্যদিক দিয়ে বাসায় ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসার মেঝেতে শুয়ে রাত কাটান এবং জানালা দিয়ে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেন। পাক দস্যুরা তার বাসার গেটে দরজা দেখে চলে যায়। সারাদিন আমি তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা তৈরী করেছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেদিনই তার কাছে জানতে পারি যে, ডঃ কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। তার ইংরেজী খসড়ার একটা অংশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ছিল 'পাকিস্তান ইজ ডেড এণ্ড বারিড আন্ডার মাউন্টেন অব কর্পসেস' বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত ‘প্রমাণ লাশের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে’। শেষ অনুচ্ছেদ আমি লিখি, 'আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশ।' এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি। লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দিন ভাইকে শোনাই।**

**রাজনৈতিক খসড়া প্রণয়নে তাজউদ্দিন ভাই খুবই দক্ষ। কোন একটি খসড়া করার পর তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মাথা নাড়তেন, কোন স্থানে থেমে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। এমনিভাবে চূড়ান্ত বক্তব্য তৈরী হতো। আমাদের দু'জনের মন ও চিন্তা যেন একইভাবে কাজ করছিল।**

**আমার হাতের লেখা খুব ভাল নয়। তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা টেপ করতে হবে। আমি একটি টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করি। তিনি সমস্ত বক্তৃতা নিজের হাতে লিখে নিলেন। চট্টপাধ্যায় তার নিজের হাতে আরো একটি কপি করে নেন। তখন তিনজনের হাতে বক্তৃতার তিনটি কপি হয়ে গেল। পরদিন তাজউদ্দিন ভাই দ্বিতীয়বারের মত ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধী জানান, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য এই খবর পাকিস্তান সরকার তখনো সরকারীভাবে প্রকাশ করে নি।**

**ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, তাঁদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের খবরা খবর প্রচারের জন্য একটি বেতার ষ্টেশন স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা হয়।**

**এদিকে আমাদের নেতারা যে কোথায় আছেন সে খবর আমরা এখনো জানি না। তাঁদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে আমাদের সাথে দেন। ঐ জেনারেলের নাম নগেন্দ্র সিং। তাঁর বয়স ৬০ এর উর্ধ্বে। তিনি সামরিক ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দেবেন। জেনারেল সিং মনে-প্রাণে একজন খাঁটি সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধর্মপ্রাণ। এছাড়া মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। আমাদের সংগ্রামের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল। দিল্লীতে বসেই তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে আমার কণ্ঠ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয় এখন তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবেন। এরপর তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা শুরু করেন।**

**আমরা বিমানে করে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। এখানে এসে জানলাম মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) এসেছেন। তাঁদের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। খবর নিয়ে জানলাম কলকাতায় গাজা পার্কের কাছে একটা বাড়িতে কামরুজ্জামান ভাই থাকেন। শেখ ফজলুল হক মনি ঐ বাড়িতে আছেন। পরে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল ইসলাম খান এই বাড়িতে ঘাঁটি গড়েন।**

**আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছে দেখা করতে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে এ পর্যন্ত ঘটনাবলী ব্যক্ত করি। কামরুজ্জামান ভাইয়ের মনে একটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে যে আমরা তাড়াহুড়া করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছি। নেতাদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল।**

**শেখ মনি আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এটা বুঝালেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়ার কারণ হলো তাঁরা এখান থেকে ক্লিয়ারেন্স দেন নি। তিনি বুঝাতে চাইলেন তাঁরা একটি শক্তিশালী গ্রুপ এবং তাঁদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে।**

**আমাদের সরকার গঠনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন এমন অনেক এমপিএ, এমএনএ ও আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় এসেছেন। প্রিন্সেস স্ট্রীটের এমএলএ হোষ্টেলে ওরা উঠেছেন।**

**একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ শুরু হয়ে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে আলাপ-আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে কামরুজ্জামান ভাইকে নিয়ে কতিপয় এমপি ও নেতা প্রিন্সেস স্ট্রীটে একটি বৈঠক করেছেন। আর এতে ভালভাবে সুর মিলিয়েছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম এই দল দিয়ে কি স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে?**

**আমরা বিএসএফ এর লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে অবস্থান করছি। ভারত সরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা ভারতে মাটিতে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই কথা প্রকাশ করতে রাজী নয়।**

**আমাদের নেতাদের বিভিন্নমুখী বৈঠকে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছি। কামরুজ্জামান ভাই খুবই সুবিবেচক মানুষ। তিনি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বললেন। রাতের বেলা লর্ড সিনহা রোডে আমাদের বৈঠক বসল। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান, মিজান চৌধুরী, শেখ মনি, তোফায়েল আহমদ ও আরও অনেকে। শেখ মনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রুশিবিরে বন্দী, বাংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা চলবে না।**

**মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে।**

**তাজউদ্দিন ভাই ও আমি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলে শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন। তাজউদ্দিন ভাই যেহেতু নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, তাঁর পক্ষে পাল্টা জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হলো। উপস্থিত প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল আমি ও তাজউদ্দিন ভাই আগেভাবে দিল্লী গিয়েছি ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য।**

**আমি আমাদের দিল্লী যাওয়ার সমর্থনে ও শেখ মনির বক্তব্যের বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি পেশ করি। আমার প্রথম যুক্তি ছিল, দিল্লী যাত্রার পূর্বে আমাদের জানা ছিল না কারা বেঁচে আছেন এবং কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তাজউদ্দিন ভাইয়ের রয়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে। তখন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। তৃতীয়ত আমরা বঙ্গবন্ধু নিয়োজিত হাই কম্যাণ্ড নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠনের পরিকল্পনা করেছি মাত্র।**

**আমি আরও বললাম, বাংলাদেশ বার ভুঁইয়ার দেশ। বারটি বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনগত সরকার দরকার। কেননা, আইনগত সরকার ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার অধিকার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। যে কোন জনগোষ্ঠীর তাদের নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার হরণই হচ্ছে জনগণের অধিকার হরণ।**

**শেখ মনির বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য দু'টি যুক্তি দিলাম। শেখ মনির প্রস্তাবিত বিপ্লবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দুইটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবে না। কোন কাউন্সিলের সাথে বিদেশের সরকার সহযোগিতা করবে। এই ক্ষেত্রে একাধিক কাউন্সিল গঠনের সম্ভাবনাই নয় কি?**

**সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকারই হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আজকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে অন্য কোন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকারকে অবমাননা করা হবে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মনি ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলে তাঁদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন।**

**কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, শেখ মনির কথানুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা যায় কিনা। আমি তাঁকে বললাম, তা করা হলে যুদ্ধ বিপন্ন হবে। তিনি আমার কথার আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমি তাঁকে বলি তার সাথে দেখা করে আমি বিস্তারিত সব বলবো।**

**সভার শেষ পর্যায়ে তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেন।**

**১০ই এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা। একটি ছোট্ট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উড়তে পারেন। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। মনসুর ভাই, কামরুজ্জামান ভাই ও তোফায়েল আহমেদ একই বিমানে আমাদের সাথে যাবেন।**

**পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই-এর সাথে দেখা করে তাঁকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি।**

**তাঁর সাথে বলতে গেলে আমার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রাণখোলা সহজ-সরল মানুষ। দু'জনে একান্তে প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মনের জমাট মান অভিমান দূরীভূত হয়ে গেল। বিপ্লবী পরিষদ গঠনের জন্য যুবকদের প্রস্তাব যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব এবং এটা যে যুদ্ধের সহায়ক হবে না তাও তিনি মেনে নিলেন।**

**তাজউদ্দিন ভাই-এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর আর কোন আপত্তি রইলো না। আমাদের সাথে বিমানে আগরতলা যাওয়ার জন্য কামরুজ্জামান ভাইকে বললাম। তিনি বলেন, যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তিনি খবর পেয়েছেন, তাঁর পরিবার পরিজন কোলকাতার পথে দেশ ত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি খুশি মনে বিদায় নেই।**

**১০ই এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওনা হওয়ার কথা। তাজউদ্দিন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমানবন্দরে যাই। অন্যানের মধ্যে মিঃ নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট। এতে বসার মত ৫/৬ টি আসন ছিল।**

**খুব নিচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি অব্যবহৃত বিমানবন্দর বমলার কয়েকটিতে আমরা নামি। এগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি।**

**ছোট ছোট বন্দরগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। একটি বিমান বন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বিএসএফ-এর মাধ্যমে খবর দেয়া হলো কোন আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোন বিমানবন্দরে তৈরি রাখতে।**

**উত্তর বঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশীর ভাগ কোলকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোগরা বিমান বন্দরে নামি। সেখান থেকে জীপে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভেতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলোতে উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এখানের কোন একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারিত হবে। এ সময় তোফায়েল আহমেদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মনি বলেন, তোফায়েল আহমদের কলকাতা যাওয়া দরকার। শেখ মনি কিছু নির্দেশসহ তোফায়েল আহমদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।**

**মনসুর ভাই-এর জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। আমি তাঁর পাশে বসে আছি। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। এরপর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রী পদের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তোলেন নি।**

**পাঁচজন নেতার মধ্যে তিনজনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন ভাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কোন আপত্তি করবেন না। তাছাড়া তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকি রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন।**

**তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন ভাই-এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দিন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো।**

**শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাই-এর সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বিএসএফ-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম।**

**শেখ মনির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এমপি, এমএনএ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা করা না হলে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।**

**আমি সরকার গঠনের পক্ষে পুনরায় যুক্তি দিলাম। আমি বললাম, সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কে কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসে নি। ইতোমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষণ করবেন। আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়। ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। আমার এসব কথা শেখ মনি মানতে রাজী নন। বেশি করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান, তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাঁকে যথাসময়ে জানানো হবে।**

**গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। এ কথা শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিক ঠাক সে মুহুর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে প্রশ্ন দেখা দেবে। তা আমরা ভেবে দেখছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে।**

**আমি গোলক মজুমদারকে বললাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে ন'টা। সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কন্ঠ ভেসে আসলো। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা প্রচারিত হলো। সারা বিশ্বব্যাপী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।**

**বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শুধু বললাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করতে পারেন নি। মনসুর ভাই রুটি খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পান নি।**

**পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাই-এর কাছে ক্ষমা ও শাস্তি প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন যে, সে সময় আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরো বৃদ্ধি পেত বৈকি।**

**শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাতে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়িতে চলে যান।**

**তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্নেল (অবঃ) নুরুজ্জামান (সেক্টর কমান্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদের সাথে আলোচনা করি। উত্তর বঙ্গে কয়েকটা সেক্টর রয়েছে। একটি সেক্টরের দায়িত্ব রয়েছেন কর্নেল জামান। তারা জানান, গেরিলা কায়দায় আকস্মিক হামলায় শত্রুদের পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।**

**আমি অবাঙালিদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাঙালি বিহারীদের ওপর জনগণ ক্ষুব্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশ কিছু বিহারী রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে এদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা হয়ে গেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হামলা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।**

**পরদিন ১১ই এপ্রিল সকালে নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশ খুশী।**

**খুব নিচু দিয়ে আমাদের ছোট বিমান উড়ছে। দু'দেশের নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য ময়মনসিংহ সীমান্তে আমরা খবর দিয়ে রেখেছিলাম। সৈয়দ নজরুলকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে শুনলাম, নেতৃত্বস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায় নি। পরে বিএসএফ-এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নীচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা 'ইউরেকা' বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।**

**মাত্র আড়াই ঘন্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন। নজরুল ভাই জীপ থেকে প্রথমে নামেন। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানালাম ২৫শে মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব খুব কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে দু'দিন পায়খানায় পালিয়ে ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়ক পথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছেন।**

**সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তাঁর ভাই যথেষ্ট উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দিন ভাই ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী তাঁকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাইকে বিমানে মোবারকবাদ জানান। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার বিমানে উঠি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহন করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা থেকে পলায়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি ডঃ আলীম চৌধুরীর ছোট ভাই-এর বাসায় থাকতেন। তিনি ছিলেন নজরুল ভাই-এর আত্মীয়। সেই বাসা থেকে পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরিধান করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মনসুর ভাই এ কথা নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা করলেন যে বিমানে কেউ না হেসে থাকতে পারলেন না। আমাদের আগরতলা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।**

**ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা হলো। তাঁর চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। প্রথমে চিনতেই পারছিলাম না। আমার নিজেরও দাড়ি কেটে ফেলেছি। দু'জনেই দু'জনকে ডেকে হাসি ঠাট্টা করলাম।**

**আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ডঃ টি হোসেন ঢাকা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন। এম আর সিদ্দিকী কয়েক দিন পূর্বে আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আবদুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী ছিলেন।**

**আগরতলা সার্কিট হাউজ পুরোটা আমাদের দখলে। ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং ভিন্ন একটি ঘরে অবস্থান করছেন।**

**ওসমানী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরী করে ফেলেন। আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব না। ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন।**

**রাতে খাবারের পর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। খন্দকার খুবই মনঃক্ষুণ্ণ। নাটকীয়ভাবে তিনি বললেন, আমরা যেন তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেই। আর মৃত্যুকালে তার লাশ যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি ডঃ টি হোসেনের মাধ্যমে মোশতাক সাহেবের মনোভাব জানতে চাইলাম। মোশতাক ও টি হোসেন-এর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনেই এক জেলার লোক। পারিবারিক পর্যায়েও তাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনিই তাকে নিয়ে এসেছেন আগরতলায়।**

**টি হোসেনের সাথে আলাপ করে জানলাম, মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এই পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানিয়েছেন। সারা রাত পরামর্শ হলো।**

**অনিদ্রা ও দীর্ঘ আলোচনায় আমি খুবই ক্লান্তি অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।**

**শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রী সভায় থাকতে রাজী হলেন, তবে একটা শর্ত হলো, তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে একথা জানান। সবাই এতে রাজি হলেন। কেননা, একটা সমঝোতার জন্য এই ব্যবস্থা একেবারে মন্দ নয়। অবশেষে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টি সুরাহা হলো। একজন হেসে খবর দিলেন, তিনি যোগদানে রাজি হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহুর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করে এসেছেন। তাঁর মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধ ঘন্টা ধরে আবেগপ্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তাঁর মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন হারানো, দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিলাম।**

**স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়।**

**এদিকে ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং-এর বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বৈঠকে এক পর্যায়ে আমি অংশ নেই। এর পূর্বে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লী কলকাতাসহ দেশের বাইরে ভেতরে সীমাবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সব ক'টিতে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝবার চেষ্টা করি।**

**১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আবদুস সামাদ আজাদ ও কর্নেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যান্যরা কলকাতায় রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা ২টি প্রবেশ পথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এই পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে। অন্যান্য জেলার লোকজনের জন্য প্রবেশ পথ করা হয় কলকাতা। পরে অবশ্য সিলেটের জন্য ডাউকি, ময়মনসিংহের জন্য তোরা পাহাড়, রংপুরের জন্য ভুরুঙ্গামারী, দিনাজপুরের জন্য শিলিগুড়ি, বরিশালের জন্য টাকি-এ রকম বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ ঠিক করা হয়।**

**মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্য ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্য আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাক দস্যুরা সেখানে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গা রাজধানী করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত তা আর গোপন থাকে নি। চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে হলো।**

**এই নিয়ে গোলক মজুমদারের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত হন যে যেখানেই আমরা অনুষ্ঠান করি না কেন, পাক বাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।**

**শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারন করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দিন ভাই, গোলক মজুমদার এবং বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায় জানতাম। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।**

**অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্ধারন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদনও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ইংরেজী কপি বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা।**

**আমি আর তাজউদ্দিন ভাই যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরের একটি ছোট্ট স্থানে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোন বই নেই, নেই অন্য দেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কোন কপি।**

**আমেরিকার ইন্ডিপেনডেন্স বিল অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। সেই অরিজিনাল দলিল চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই বড় বড় হাতের স্বাক্ষরগুলো। কিন্তু ভাষা বা ফর্ম কিছুই মনে নেই। তবে বেশি কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম না। শুধু মনে করলাম, কি কি প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণাপত্রের একটা খসড়া তৈরি করলাম। স্বাধীনতার ঘোষণায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হলো।**

**স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দিন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। আমি বললাম, আমরা সকলে এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভাল হতো। তিনি বললেন এই মুহূর্তে কাকে আর পাবেন, যদি সম্ভব হয় কাউকে দেখিয়ে নিন।**

**ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। রায় চৌধুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। আমি তার লেখা কিছু নিবন্ধ পড়েছি বলে মনে হলো। বিএসএফ-এর মাধ্যমে রায় চৌধুরীর সাথে দেখা করতে চাই। তিনি রাজি হলেন। বালিগঞ্জে তার বাসা। আমার পরিচয়, 'রহমত আলী' নামে। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার প্রয়োজন নেই।**

**তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার, তা মানবাধিকারের একটা অংশ। এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি এর ওপর একটা বই লিখবেন। এই ঘোষণাপত্রের একটা কপি তাকে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এরপর আইন ব্যবসা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বই লেখা শুরু করেন। তার রচিত বইটির নাম হচ্ছে 'জেনেসিস অব বাংলাদেশ'- আন্তর্জাতিকভাবে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহুবিধ বিদ্যালয়ে এখন তা পড়ানো হচ্ছে।**

**এটা ছিল সুব্রত চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর থেকে যুদ্ধ সমাপ্ত পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই-এর মত সময়ে অসময়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার জন্য তার দুয়ার সর্বদাই ছিল খোলা।**

**এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানির সামরিক পোষাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোষাক প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোষাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোন পোষাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোষাক তৈরি করা হলো।**

**শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জনে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই। সমস্ত প্রেসক্লাব লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাই নেই। সার্চ লাইটের মত অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরকে প্রথম অনুরোধ জানাই আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। এরপর বললাম, আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।**

**সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে প্রেসক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন তাদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। তাদের কেউ কেউ আরো প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোন উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। এতে তারা কেউ কেউ হতাশও হন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ি তৈরি থাকবে বলেও জানালাম।**

**আওয়ামী লীগের এমপি, এমএনএ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্য।**

**বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্য ১০০টি গাড়ির ব্যবস্থা করতে। এর ৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের বহন করার জন্য। অবশিষ্ট ৫০টার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো হবে।**

**রাত ১২টা থেকে নেতাদের আমি গাড়িতে তুলে দেই। বলে দেয়া হলো, কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। সকাল বেলা আমরা একত্র হবো। গাড়ীর চালক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবেন। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতা সনদের কপিগুলো গুছিয়ে নিলাম। হাতে লেখা কিছু সংশোধনী রয়েছে। কয়েকজনকে এগুলো সংশোধন করার জন্য দেই।**

**১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ওসমানী একটি গাড়িতে রওয়ানা হয়ে যান।**

**আমি ও আব্দুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। ভোরেও ক্লাবে লোক ধরে নি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল।**

**আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কিভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। আমি পুনরায় বলি, আমি আপনাদের সাথে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব। আমাদের গাড়ীগুলো তখন প্রেসক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়ীতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০/৬০ টা গাড়ীযোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। আমি ও আব্দুল মান্নান দু'জন দুই গাড়ীতে। আমার গাড়ীতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সাথে অনেক কথা হলো।**

**শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান আম্রকাননে পৌছতে ১১ টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক এলাহী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন।**

**এদিকে পাক হানাদার বাহিনীর চাপের মুখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হঠতে হয়েছে। সম্মুখ সমরে হানাদের বাহিনীর মোকাবিলা করা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্দেশ সত্ত্বেও দেশ মাতৃকার মুক্তি পাগল যোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে আসতে রাজি হচ্ছিল না। মাহবুব ও তওফিক তাদের সৈন্যসহ পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন। তারা সুকৌশলে পিছু হটে আসেন। মনোবল ঠিক রেখে পশ্চাদপসরণ করা একটা কঠিন কাজ। ক্লান্ত শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে উঠে আসে। ওদের চোখে মুখে বিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল।**

**কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট্ট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই স্থানের নাম মুজিবনগর করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।**

**সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তাঁর সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তর) যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু শত্রুশিবিরে বন্দী। কিন্তু আমরা তা বলতে চাই নি। পাক বাহিনী বলুক এটাই আমরা চাচ্ছিলাম। কারণ আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধু পাক শিবিরে, আর তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে। আর আমরা যদি বলি তিনি দেশের ভেতরে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন হানাদাররা বলে বসবে তিনি বন্দী।**

**আম বাগানের অনুষ্ঠানে ভর দুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কন্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগান।**

**আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্য অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। সাংবাদিকদের গাড়ীযোগে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ পরিবেশন করেন।**

**কলকাতার বাসায় ফিরে তাজউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করি কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে আমাদের পক্ষে আনা যায় কিন। ফরিদপুরের আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সাথে যোগাযোগ করা হল। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন।**

**গঙ্গার ধারে একটি হোটেলে দু'জনের সাক্ষাৎ হল। হোসেন আলী আমাদের পক্ষে আসতে রাজী হলেন।**

**ইতিমধ্যে বিশ্বে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য লণ্ডনে ফোন করি। লণ্ডনের গেনজেজ হোটেলের মালিক তসদ্দুক আহমদ আমার পুরাতন বন্ধু। এক কালে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার সাথে যোগাযোগ করে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর ফোন নম্বর পেলাম। বিচারপতি চৌধুরী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই লণ্ডনে ছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।**

**বিচারপতি চৌধুরীর মাধ্যমে লণ্ডনের তৎকালীন কাউন্টি কাউন্সিলের সদস্য এলভারস্যান, শ্রমিক নেতা ডোনাল্ড চেসয়ার্থ-এর সাথে যোগাযোগ করি। ডোনাল্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় সূত্রেই বন্ধুত্ব। ডোনাল্ড ও অন্যান্যদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার আবেদন জানাই।**

**লণ্ডনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ডোনাল্ডের যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তার সাথে টেলিফোনে কথা হল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সে সময় রকিব সাহেব সিলেট থেকে কলকাতা আসেন। তিনি লণ্ডনে যাবেন। তার কাছে আবু সাঈদ চৌধুরীকে একটা চিঠি দিলাম। চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে মত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আহবান জানাই। চৌধুরীর সাথে আমার ফোনেও যোগাযোগ হল।**

**১৮/১৯ তারিখের দিকে ওয়াশিংটন থেকে হারুনুর রশীদ এলেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরী করেন। তার কাছে বিদেশে অবস্থানরত বাঙালিদের মনোভাব জানতে পারলাম। ওয়াশিংটনে এ এম মুহিত ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় তারা একটি গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি তাদের পক্ষে তাদের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরে আমরা খবর পেয়েছিলাম প্রফেসর নুরুল ইসলাম কোলকাতায় আছেন।**

**মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পরদিন (১৮ই এপ্রিল) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সকালবেলা কলকাতা পাক মিশনের হোসেন আলীসহ প্রায় সকল কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত পাক দূতাবাসে এত দিন ধরে যেখানে পাকিস্তানের পতাকা উড়তো, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হল। এই ঘটনায় দেশে বিদেশে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দূতাবাসে সেদিন জনতার ঢল নামে। বিভিন্ন সংগঠন মিছিল করে সার্কাস এভিনিউতে এসে হোসেন আলীকে স্বাগত সম্ভাষন জানায়। ফুলের মালায় মিশনের প্রাঙ্গন ভরে যায়।**

**বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রেরণ করেন হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। হোসেন আলীর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক ছেলের সাথে পরিচয় হল। তারা সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে শরিক হলেন। হোসেন আলীর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। এ ব্যাপারে স্বামীকে তিনি প্রচণ্ড সাহস যুগিয়েছেন।**

**বিদেশী বেতারের সাথে বাংলাদেশের পাক দস্যুদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন। কান্নাজড়িত তার এই বক্তব্য কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয়। এই মহিলার হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য যারা শুনেছেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।**

**১৮ই এপ্রিলের পূর্ব রাতে বেগম হোসেন আলী ও তার একমাত্র মেয়ে মিলে স্বাধীণ বাংলার পতাকা তৈরি করেন। আমি থাকতে থাকতে বহু লোক এলো হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। বেশীক্ষণ সেখানে আমি অবস্থান করি নি। বহু গণ্যমান্য লোককেও আসতে দেখলাম।**

**বাংলাদেশের বহু লোক পাক বাহিনীর অত্যাচারে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্য সাহায্য প্রয়োজন। ১৯শে এপ্রিল থেকে মিশনে কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য আসতে থাকে। হোসেন আলী আগেই পাক মিশনের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে রেখেছিলেন। এই অর্থ দিয়ে মিশন পরিচালনা করা হবে।**

**পাক মিশনের একজন মাত্র কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেননি। তিনি তার বাসায় রয়ে গেলেন। মিশনে আসেন না। এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে তার বাসায় গেলাম। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ১৯৬৪ সাল, তখন মোনায়েম খানের রাজত্ব। এই ভদ্রলোক সে সময় পাবনার পুলিশ সুপার ছিলেন। তার নাম আর আই চৌধুরী। সরকার বিরোধী এক মিছিল করায় পাবনায় সে সময় বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের দলের নেতা মনসুর আলী তখন জেলে। আমি ও নাইমুদ্দিন পাবনা গিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশ করি। জেলে আমাদের নেতাদের সাথে দেখা করার পর আদালতে তাদের জামিনের আবেদন করি।**

**পুলিশ সুপার আর আই চৌধুরীর প্রচণ্ড দাপটের কথা তখন আমার মনে পড়ছিল। তবে '৬৪ সালের চেহারার সাথে আজকের চেহারার কোন মিল নেই। তার স্ত্রী তখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিছুদিন পর তার স্ত্রীর কলকাতা আসার পর আর আই চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর ডালিম তার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের পিতা রাজী হননি। পরে ছেলে মেয়ে নিজেদের উদ্যোগে বিয়ে করে। তাজউদ্দিন ভাই তাদের মিলিয়ে দেন।**

**ক্রমশঃ আমাদের লোকজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিএসএফ বালিগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করে। আমরা সেই বাড়ীতে উঠি। তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একটি ঘরে। অন্য একটি ঘরে সৈয়দ নজরুল ও মনসুর ভাই এবং পৃথক একটি ঘরে খন্দকার মোশতাককে। কামরুজ্জামান ভাই থাকতেন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে।**

**১৯শে এপ্রিল বাংলাদেশ মিশনের একটি ভবনে তিন তলায় আমি অফিস করছি। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন করা। কয়েকজন টাইপিস্ট আমার সাথে রাত দিন কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর ১০ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিলের বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে হবে। স্বীকৃতির আবেদনপত্রসহ বক্তৃতার বহু কপি তৈরী করা হলো। স্বীকৃতির আবেদনে দস্তখত নিয়ে একটুর ঘাপলার সৃষ্টি হল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক এগুলোতে নানা অজুহাতে সই দিতে দেরী করলেন। এদিকে আমি অস্থির হয়ে গেছি। কয়েকদিন গড়িমসি করে পরে তিনি সই করেন।**

**স্বীকৃতির এই আবেদনপত্রগুলো কিছু ডাকযোগে আবার কিছু লোক মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। আবদুস সামাদ আজাদ কিছু চিঠিসহ বিদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমাদের এই স্বীকৃতির আবেদনের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।**

**মোশতাক সাহেবের পরিবার আনার জন্য ডঃ টি হোসেন আগরতলা থেকে আবার ঢাকা ফিরে গেছেন। আমার পরিবারের খবর সম্ভব হলে নেয়ার জন্য ডঃ টি হোসেনকে অনুরোধ করেছি। কিন্ত তিনি ঢাকায় সন্ধান করেও আমার পরিবারের কোন খোঁজ পাননি। তার আগেই আমার পরিবারকে ঢাকা ছাড়তে হয়েছে। ডঃ হোসেন আমার প্রতিবেশী ডঃ নাইমুর রহমানের বাসায় আমার পরিবারের খোঁজ করেছিলেন। তারা ভাল আছেন বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোথায় তারা ছিলেন এই খবর পাই আরো পরে। কিছুদিন পর ডঃ টি হোসেন কলকাতা ফিরে আসেন।**

**ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমি সন্ধ্যায় মিশন থেকে বাসায় ফিরে জানলাম, আমাকে প্রধানমন্ত্রীর 'প্রিন্সিপাল এইড' করা হয়েছে। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।**

**আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, আমাকে কেন এই পদে নিয়োগ করা হলো। তিনি বলেন, এটা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং আমারও ইচ্ছা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আমার করণীয় কি হবে? তাজউদ্দিন ভাই জানান, "প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি যা কিছু করবো তার সবকিছুই আপনার কাজের অংশ হবে।"**

**এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কিছু বেসামরিক অফিসার এসে গেছেন। পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক হান্নানসহ আরো অনেকে। এদের কাজ দেয়া হলো। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কয়েকদিন কাজ করে ফিরে চলে যান।**

**সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে শত শত লোক প্রতিদিন আসছে। এদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, উকিল, ছাত্র-যুবক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বিভিন্ন স্তরের লোক রয়েছে। সকলেই চলে আসে বাংলাদেশ মিশনে। এদের পেশা উল্লেখ করে নাম ঠিকানা রেকর্ড হতে লাগলো। পেশা জানার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনে কাজে লাগানো। মিলিটারী, পুলিশ, বিডিআর, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ছিল। এখান থেকে আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম।**

**এ সময়টা আমাদের জন্য চরম সংকটের সময় ছিল। পাক হানাদার বাহিনী প্রচণ্ড হামলা করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রায় সকল ফ্রন্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করছে। এ সময়ে তাদের মনোবল ঠিক রেখে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল খুব কঠিন কাজ।**

**বনগাঁ সীমান্তে একটা তাঁবুতে মেজর ওসমান, তওফিক এলাহী ও মাহবুব তাদের দল বল নিয়ে অবস্থান করছেন। তখনো তারা ভারতে ভেতরে প্রবেশ করেন নি। কাষ্টম চেক পোষ্টের ওপারে তাদের ছাউনী।**

**সারাদিন অফিসে খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও সীমান্তে যোদ্ধাদের খোঁজ খবর প্রতি সন্ধ্যায় নিতে চেষ্টা করতাম। এ সময় আমার জুনিয়র পার্টনার ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ কলকাতা পৌঁছেন। সহযোগিতা করার জন্য তাকে আমার সাথেই রাখলাম। আমার অফিসের পাশে একটা ঘরে তার বসার ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিকে তিনি বিদেশী প্রেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ কাজ তিনি খুবই দক্ষতার সাথে করেন। পরে তাকে বহিঃপ্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।**

**এরপর বাংলাদেশ সরকার ডাকঘর স্থাপন করেন। মওদুদ আহমদ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হন। বিমান মল্লিকের নকশা করা স্ট্যাম্প বাজারে ছাড়া হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এই স্ট্যাম্প ছাড়া হয়।**

**দৈনিক প্রচুর লোক আসতো। এসেই জিজ্ঞাসা করতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? সোজা জবাব দিতাম, 'এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি আমাদের ম্যানেজ কমিটির সদস্য হলেন। যেখানে রাত হবে, সেখানেই ঘুমাবার চেষ্টা করবেন। কেউ খেতে বললে কোন আপত্তি করবেন না।'**

**কলকাতায় অনেকের বন্ধু বান্ধব রয়েছে। অনেকে আবার বাংলাদেশে থেকে গেছেন। কিছু কিছু বাংলাদেশী সেই সূত্রে আশ্রয় লাভ করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে থাকতেন কেউ কেউ। পরে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীর পাশে একটি স্কুলে ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এমনিভাবে কলকাতা শহরে বিভিন্নভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আগরতলাতেও এমনি ধরনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আসাম ও মেঘালয়ের জীবন ছিল আরো শক্ত। শেষোক্ত দু’টি রাজ্যের মানুষ তত প্রাণখোলা ছিল না।**

**এ সময় বৃটেনের শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য ডগলাস ম্যান কলকাতা আসেন। আমার বন্ধু ডোনাল্ডের চেষ্টায় তিনি আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য আসেন। ডোনাল্ড আমাকে ফোন করে বলেন, ডগলাস ম্যান-এর সাথে যেন বাংলাদেশ সরকারের কারো সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেই। ডগলাস ম্যান বৃটিশ হাই কমিশনারের বাড়ীতে উঠেছেন। সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করি। মিঃ ম্যান ও আমি বাংলাদেশের ভেতরে যাব। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে তার দেখা হবে।**

**তাজউদ্দিন ভাই ভোরে চলে গেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সাক্ষাতের প্রয়োজন। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাষ্টম চেক পোষ্টের কাছে প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আমি ডগলাস ম্যানকে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। সেখানে মেজর ওসমানকে পাওয়া গেল। বৃটিশ এমপিকে নিয়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গেলাম। এই বিদেশীকে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা খুবই খুশী হলো। তারা ডগলাস ম্যান-এর কাছে মুক্তিযুদ্ধ, পাক সেনা হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বর্ণনা করেন। আমরা তাকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের দূত হয়ে সারা বিশ্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর মিঃ ম্যান আমার হাত ধরে বলেন, আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করো। তিনি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। মানবিক গুণে গুণান্বিত খাঁটি পুরুষ ডগলাস তার কথা রেখেছিলেন।**

**ডগলাস ম্যান-এর এই সফর এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ-এর সাক্ষাৎ-এর খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাড়া জাগে। ডগলাস ম্যান ফিরে গিয়ে খবরের কাগজ, বৃটিশ পার্লামেন্ট, শ্রমিক দলের বৈঠকসহ বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।**

**ডগলাস ম্যানকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতা ফেরার পথে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি যশোর অঞ্চল থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক করি। তারা খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। সেখানেও শরণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পথে আসতে আসতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে শরণার্থীসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।**

**বাংলাদেশ থেকে খবর আসছে যে, সেখানে সর্বত্র হানাদার বাহিনীর আক্রমনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়ছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে শরণার্থীদের সংখ্যাও সেই হারে বেড়ে চলেছে। ২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে যে হারে মানুষ গ্রামে চলে গিয়েছিল আজো সেই হারে বাংলাদেশ থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে।**

**কলকাতা ফিরে আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরীর সাথে শরণার্থী নিয়ে আলোচনা করি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। সমিতির সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বলেন, পরদিন তিনি সীমান্তের দিকে যাবেন। কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জেলা সীমান্তে। আমি গেলে তিনি নিয়ে যেতে পারেন। আমি রাজী হলাম। কথা হলো, তিনি আমাকে বাংলাদেশ মিশন থেকে তুলে নেবেন।**

**সীমান্তে যাওয়ার জন্য আমি হাতের কাজ গুছিয়ে নেই। আমার সেখানে যাওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, সীমান্তের এই অঞ্চলে নিজের জেলা কুষ্টিয়ার অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হবে। কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখি, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এক বাড়ীতে অফিস করেছে। সেদিন সেখানে শরণার্থী সমস্যার সমাধান ও মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৈঠক আহবান করা হয়েছে। প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী বৈঠকে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাকে পেয়ে তারা খুশী হন।**

**আমি সমাবেশে আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বঙ্গের সচেতন অধিবাসীদের কাছ থেকে কি আশা করি তাও জানালাম। ছোটবেলায় দাদুর মুখে শোনা কৃষ্ণনগর, 'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর' আজ স্বচক্ষে দেখলাম। বাংলাদেশের ভিটে মাটি হারা মানুষ আসছে। কিন্তু এপারের জনগণ আঁতকে ওঠে নি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় বলেই এপারের মানুষ ওপারের ভাগ্যহত মানুষদের আশ্রয় দিচ্ছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসলে চুয়াডাঙ্গার সকল কর্মী ভাইয়েরা আমার সাথে কোলাকুলি করেন। এদের মধ্যে মিছকিন মিয়া, ফকীল মোহাম্মদ, ডাঃ নজির আহমদসহ আরো অনেকে ছিলেন। তাদের মুখে অনেক কথা শুনলাম। আমি তাদেরকে বললাম, এদেশে আমরা যেন বাস্তুহারা হয়ে না যাই। এই যুদ্ধে সকলকে অংশ নিতে হবে। যিনি অস্ত্র হাতে নিতে পারবেন, তিনি প্রশিক্ষণ নেবেন। আর যিনি তা পারবেন না, তাকে সহকারী হিসেবে যুদ্ধের সামগ্রী বহন করতে হবে। সকলকে একত্র থাকতে হবে। যা পাই তা ভাগ করে খেতে হবে। আমি তখন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও জেলার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।**

**এর পর আমি কয়েকদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার দলীয় কর্মীদের খুজে বের করি। চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক (বর্তমানে জাসদ নেতা) মীর্জা সুলতান রাজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাংগঠনিক ব্যাপারে তিনি আমাকে সক্রিয়া সহায়তা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারে তার প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তাকে খুজে বের করি। মীর্জা সুলতান, আবুল হাশেম, ডাঃ নাজিরসহ আরো অনেকে মিলে একটি বাড়ীতে একটি ক্যাম্প গড়ে তুলেছেন। বিভিন্নভাবে তাঁবু, খাবার ও রান্নার জিনিসপত্র যোগাড় করা হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি বিশেষ করে দিলীপ চক্রবর্তী এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেন।**

**এমনিভাবে বয়রা, মামাভাগ্নে, কৃষ্ণনগর, শিকারপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ছোট ছোট ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে শিকারপুরের অবস্থা অতি করুণ। কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, রাজাবাড়ী ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন এখানে জমা হয়েছে। একটি ছোট গুদাম ঘর স্থানীয় লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে সকল রাজনৈতিক কর্মী স্থান নিয়েছেন। কুষ্টিয়ার আব্দুল হামিদ, আজিজ মিয়া, আবুল কালাম, জলিল সবাই এখানে স্থান নিয়েছেন। এক হাঁটু পানি দিয়ে এই গুদাম ঘরে যেতে হয়। কোন রকমে ছাউনি দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে বিছানা পেতে থাকতে দেয়া হয়েছে। এত কষ্টের মধ্যে থেকেও এদের মনোবল ও উদ্দীপনা কমে নি। কিভাবে দেশ স্বাধীন হবে, এই যেন তাদের সবসময়ের চিন্তা। মেহেরপুরের এমপিএ মহিউদ্দিন, এমপিএ নুরুল হক, জলিল এদেরকেও খুঁজে পেলাম। তারা একটি পাটের গুদামে আশ্রয় নিয়েছে।**

**আমাদের সকলের চিন্তায় এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে এক পরিবারভুক্ত তা বিপদের দিনে বুঝা যায়। কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। যা পাবে, তা সকলে মিলে ভাগ করে খাবে এমনি মনোভাব গড়ে উঠেছে। সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। কোন কোন দিন রাত ১২ টার দিলে কলকাতা ফিরতাম। দিনের বেলা অফিসে আর রাতের বেলা সীমান্তে এই ছিল নিত্যদিনের কাজ। প্রধানমন্ত্রীকে প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ণ মনে হতো। নকশালীদের তখন চরম দাপট। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট অঞ্চলে তাদের তৎপরতা চলছে। তেমনি কলকাতায়ও। ২/১ ঘন্টা ঘুমিয়ে, উঠে পড়তাম। সকালে নাশতার টেবিলেও তাজউদ্দিন ভাই-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। ১২/১ টার মধ্যে মিশনে গিয়ে কাজ শেষ করতাম। এরপর হোসেন আলীর সাথে দুপুরের খাবার সেরে নিতাম। হোসেন আলীর স্ত্রী ডালভাত পাক করতেন। বিদেশ থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত সার ও প্রেস ক্লিপস প্রধানমন্ত্রীকে দিতাম। দুপুরের খাওয়া শেষ করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হতাম।**

**ইতিমধ্যে শরণার্থী সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলো। সীমান্তের কাছাকাছি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের স্কুল কলেজগুলো বন্ধ করে দিতে হলো। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা এগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা এতো ব্যাপক যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এর সমাধান সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার চাল, ডাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু রান্নার হাঁড়ি, পাতিল, বাসন কোসনের অভাব রয়েছে। পায়খানা প্রস্রাব করার স্থানেরও অভাব। পানির ব্যবস্থা নিতান্ততই অপ্রতুল। এই অবস্থার জন্য আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিবিরে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা এসব সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টা করছে। কোন কোন শিবিরে কলেরা, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি রোগ দেখা দিয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ সীমান্ত পথ পাড়ি দিয়ে শিবিরে এসে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনাহার ও রোগের বেশী শিকার হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে মা মৃত শিশুকে সৎকার না করে পথিমধ্যে ফেলে এসেছে। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের আহার, বিশ্রাম প্রয়োজন। শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থার দেখে চোখের জল বাধ মানে না। কিন্তু দুরবস্থার মধ্যে থেকেও মানুষের মনোবল কমে নি। কলকাতার বন্ধুদের আমাদের এই দুরবস্থার কথা জানাই। বিভিন্ন ত্রাণ সমিতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।**

**মৈত্রেয়ী দেবী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির আহ্বায়িকা। তিনি ছোট এক ত্রাণ তহবিল গঠন করেছেন। রবি ঠাকুরের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী বাংলার মানুষের দুঃখের দিনে এগিয়ে এলেন। তাকে নিয়ে আমি বিভিন্ন শিবিরে গিয়েছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিশেষ করে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।**

**একটি লিফলেট ছাপা হলো। লিফলেটে শরণার্থী শিবিরে থাকার নিয়ম কানুন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি লিখা ছিল। এটা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাহায্যে শিবিরগুলো পরিচালিত হয়। পরে অবশ্য এগুলোর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহন করে। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে বরিশাল ও স্থানীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর সহায়তায় শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালিত হতে থাকে।**

**বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। আগরতলাতে খালেদ মোশারফ ও শফিউল্লাহ নিজ নিজ ছাউনীতে নিয়মিত বাহিনীর সাথে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছেন। নতুন নতুন যোদ্ধা তৈরী হচ্ছে। পাক বাহিনীর সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে নবাগতরা অংশগ্রহণ করে।**

**আমাদের সাথে ভারত সরকারের কথা হয়েছিল তারা ১ লাখ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেবে। এছাড়া একটি বেতার ষ্টেশন চালুর ব্যাপারেও ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীর লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। কখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কখনো সামরিক লিয়াজো আমাদের কাছে আসছে। এসব বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয়।**

**মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করার জন্য সকল মন্ত্রী দিল্লী যান। দেখা করে তারা কলকাতা ফিরে আসেন। এ সময় ওসমানী রাজনৈতিক সচেতন ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব করেন। রাজ্জাক, তোফায়েল প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাদের দায়িত্ব দিলে তারা ভাল ছেলে রিক্রুট করে দিতে পারে। ওসমানী তাদের প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি আমার পাশের ঘরে থাকতেন। বালিগঞ্জে তার অফিস ছিল। তার অফিস তখনো ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি। তিনি আমাকে একটা অথোরাইজেশন লেটার লিখে দেয়ার অনুরোধ করেন। আমি তা লিখে টাইপ করে দিয়ে দিলাম। ওসমানী তার পক্ষে রাজ্জাক, তোফায়েলকে রিক্রুট করার অধিকার দিয়ে দিলেন। এই চিঠির সুযোগ গ্রহণ করেই শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ, স, ম, আবদুর রব 'মুজিব বাহিনী' নামে আলাদা বাহিনী গড়ে তোলেন।**

**ভারতের ২টি স্থানে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেনারেল ওভান এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারছি না মুজিব বাহিনী নামে এই আলাদা বাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিল কি না। তবে যদ্দুর জেনেছি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র"-এর সাথে শেখ মনির লবি ছিল। তাকে বুঝানো হয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সে সময় নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ হবে। অথবা এই নেতৃত্ব কোন প্রকার আপোষ করতে পারে। তাকে আরো বুঝানো হয়, যে যুব শক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তারাই কেবলমাত্র সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে এই নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নব্যশক্তি চীন বা নকশাল পন্থীদের স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে। পরে আরো জেনেছি, ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যার অর্থ হলোঃ "এক বাক্সে সকল ডিম না রাখা"।**

**বিএসএফ-এর রুস্তমজী মুজিব বাহিনী গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য করা হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ভারত সরকার মুজিব বাহিনী গঠন সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত মুজিব নগর সরকারের কাছে গোপন রাখে। তবে মুজিব বাহিনী গঠনের বিষয়টি আমাদের কাছে আর গোপন থাকেনি। তাজউদ্দিন ভাই-সহ আমাদের অনেককে এই সিদ্ধান্ত পীড়া দেয়। জাতি যখন সম্পূর্ণভাবে একটি নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাবান তখন যুব শক্তিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের যেমন সহায়ক হয় নি, তেমনি পরে দেশ পুনর্গঠনের কাজেও অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।**

**আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় (সেট ব্যাক) আর কিছু হতে পারে না। আমাদের এমপি, এম এন এ ও নেতাদের মনোনীত ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওসমানীর প্রত্যাশিত 'সোনার ছেলে' পাওয়া গেল না। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তাকে এই সুযোগ দেয় নি। ওসমানীর প্রাথমিক ধারণা ছিল তারা হয়তো তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি। কিন্তু পরে তিনি জানেন, এই দায়িত্বের ভার নিয়ে তারা অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন।**

**স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠার জন্যে সবাই তাগিদ দিচ্ছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার শুরুতেই প্রধান কর্মসূচী ছিল। আমার জানামতে আমাদের নিজস্ব বেতার ষ্টেশন স্থাপনের ব্যাপারে ভারতে প্রধানমন্ত্রী খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে এতে জটিলতা দেখা দেয়। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের জট খুলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়।**

**ইতিমধ্যে ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের মিঃ রয়, মিঃ নাথ, কংগ্রেসের বহু নেতা উপনেতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রিগুণা সেনের সাথে বাংলাদেশ মিশনে পরিচয় হয়। তিনিও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানান।**

**কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা এমন হলো যে আমাদের কর্মসূচী রেকর্ড করে তা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচার করতে পারবো। আমরা বালিগঞ্জের যে বাড়ীতে থাকতাম সেখানে একটা ঘরে রেকর্ড করা শুরু হয়। একটা টেপ রেকর্ডার-এর ব্যবস্থা করে তা করা হয়। কিছুদিন পর থিয়েটার রোডের একটি বাড়ীতে রেকর্ডের কাজ করা হয়। বেতার কেন্দ্রও ঐ বাড়ীতে চলে যায়। আবদুল মান্নান বেতার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় বৃটেন থেকে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ আসেন। তার সাথে আসেন "ওয়ার অন ওয়ান্ট"- এর পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল। সাথে ছিলেন ফাদার হার্ডেলসন ও মাইকের বার্নস এমপি। তিনি আসার আগেই আমাকে খবর দেয়া হয়। প্রতিনিধিদল সরেজমিনে শরণার্থীদের ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখেন।**

**আমি তাদের থাকার জন্য সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ীর তিন তলায় ব্যবস্থা করি। কিন্তু তারা সেখানে উঠেন নি; তারা উঠেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেখানে উঠেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ফাদার হার্ডেলসন ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার। এই প্রতিনিধিদলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা জানতে চান কিভাবে আমাদের সাহায্য করবেন। আমি প্রস্তাব করি, "ওয়ার অন ওয়ান্ট" নিজেরা প্রত্যেক ক্যাম্পে সাহায্য করতে পারবে না। কারণ, সমস্যা অতি ব্যাপক। তাই তারা যদি বাংলাদেশী কোন সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা তা ক্যাম্পে পৌছাতে পারবো।**

**ডোনাল্ড পূর্ব থেকেই আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহী। তিনি অন্যান্য ট্রাষ্টিদের সাথে আলোচনা করে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আমার কাছে পরিকল্পনা ও বাজেট চান। আমি তা দিই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও এ নিয়ে আলোচনা হয়। শরণার্থী শিবিরের সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা ছাড়াও রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী যারা কোন কাজ করতে পারছেন না, তাদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।**

**আমি বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এর একটা বাজেট পেশ করি। প্রধানমন্ত্রী এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি এই সংগঠন করার অনুমতি দেন।**

**বরিশাল থেকে নূরুল ইসলাম মনজুর ও মহিউদ্দিন এম পি অস্ত্রের জন্য আসেন। সে জেলায় তখন প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। বরিশাল শহর ও তার আশপাশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। তারা জানান, অস্ত্র পেলে সেখানে তারা পাক বাহিনীর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। আমি বুঝলাম, বরিশালে যে শক্তি আছে, তাদের এদিকে নিয়ে এসে নতুন সাংগঠনিক রূপরেখায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তারা তাদের সংকল্পে অটল। তাদের দু'জনেরই বিশ্বাস অস্ত্র পেলে তারা বরিশাল মুক্ত করতে পারবেন। মেজর জলিল এই সেক্টরের কমান্ডার। বরিশালে তিনি বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে দু' নৌকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।**

**দুর্ভাগ্যবশত পাক চরেরা আগে ভাগে এই খবর পেয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা সাধারণতঃ আমাদের আন্দোলন সহানুভূতির চোখে দেখতো না। এদের কেউ কেউ হানাদারদের মদদ দিত। নৌকা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় চব্বিশ পরগনার কোন এক স্থানে পাক বাহিনী এই ছোট্ট নৌকাকে এমবুশ করে। পাক বাহিনীর হামলার হাত থেকে মনজুর রক্ষা পেলেও মহিউদ্দিন ও অপর একজন শত্রুর হাতে বন্দী হন। তাদের অকথ্য নির্যাতন করা হয়। কিছুদিন পর মেজর জলিল ও নূরুল ইসলাম মনজুর দলবল নিয়ে টাকিতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেন।**

**টাকি থেকে নৌপথে খুলনা সাতক্ষীরা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা যেতাম। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও সংগঠনের অবস্থা এমনিভাবে জানা সম্ভব হতো। হাজার হাজার শরণার্থী এই অঞ্চলে বসবাস করছে। এরা খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালীর শরণার্থী। এরা নৌকায় সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। দেশ থেকে চাল, ডাল, হাঁড়ি পাতিল সব এনেছে। হাজার হাজার নৌকায় এভাবে লোকজন বসবাস করেছে। ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে কিভাবে ঢেউ-এর সাথে লড়াই করছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুঃখী মানুষের এই দুঃসাহসী মনোবল দেখে আমার মন গর্বে ভরে উঠেছে। চব্বিশ পরগনার কয়েকটি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীসহ আমি বহুবার গিয়েছি।**

**বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এরা বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এসব বরেণ্য সাংবাদিকদের মধ্যে পিটার হেজেল হার্ষ্ট, নিউইয়র্ক টাইমস-এর সিডনী সেন বার্গ, লা মদের একজন সাংবাদিক ও লণ্ডনের গ্রনেডা টেলিভিশনের প্রতিনিধি শিলার নাম উল্লেখযোগ্য।**

**শিলা খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের চিত্র সারা পৃথিবীতে প্রচার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুক্তিযুদ্ধ কাল্পনিক কিছু নয়। এক সময় শীলাকে আমি খালেদ মোশারফের যুদ্ধ ক্যাম্পে পাঠাই। খালেদ পূর্বাঞ্চলে এক দুঃসাহসী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। খালেদ আমার পুরাতন বন্ধু। আমরা দু'জনেই ঢাকা কলেজের ছাত্র। আমি তখন ছাত্র রাজনীতি করি। সামরিক বাহিনীতে যাওয়ার পরেও তার সাথে আমার দুই-একবার দেখা হয়েছে। খালেদের দুঃসাহসিক বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। খালেদ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে শফিউল্লাহ, এম, এ, জলিল, রফিকুল ইসলাম, ওসমান চৌধুরী, নূরুজ্জামান, নজমুল হুদা, তওফিক, মাহবুবসহ আরো অনেকের ভূমিকা ছিল অনন্য।**

**শিলা খালেদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় এক সপ্তাহ বাংকারে বসে ছবি তুলেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেন, আমি যা দেখেছি, এতে জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। পৃথিবীর কোন শক্তি এই অদম্য স্পৃহা দমাতে পারবে না। শিলা খালেদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনিভাবে টেলিভিশন ক্রুসহ বিদেশী প্রতিনিধি নিয়ে বহুবার রণাঙ্গনে গেছি। একদিন বয়রার কাছে একটি ক্যাম্পে যাই। ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ঐ ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন।**

**একটি পানি ভেঙ্গে শিবিরে যেতে হয়। কয়েকদিন পূর্ব থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিলো। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি কোথাও কোন শুকনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। ছেলেদের গায়ের কাপড় ভিজে গেছে। আমরা সবাই শীতে থর থর করে কাঁপছি। বিকেল ৩/৪টা বেজে গেল, তবুও তাদের খাওয়া হয়নি। ভেজা কাঠে রান্না করতে হলো। তবুও হুদা কোন অভিযোগ করলেন না। ফেরার সময় হুদা শুধু বললেন, কিছু মশারী দিতে পারলে ভাল হয়। মশার খুবই উৎপাত। পরদিন দিলিপ চক্রবর্তীর কাছে মশারী চাইলাম। তিনি কয়েক'শ মশারীর ব্যবস্থা করে দিলেন। দুই দিন পর এই মশারী সহ ক্যাম্পে যাই। সেদিন লুঙ্গি ছিল। তাই ক্যাম্পে পৌছাতে কোন অসুবিধা হলো না। হুদার সাথে অনেক আলোচনা হলো। মুকিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পর দেশে পাঠানো এবং দেশে এদের পরিচালনার ব্যাপারে নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি বিশয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি এসব বিষয় নিয়ে পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আবেদন জানাই।**

**বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এসেছেন। এদের মধ্যে ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ, বেগম নূরজাহান মোর্শেদ, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস-এর সাথে কথা হল। আমরা কিছু কাজ তাদের কারো কারো মধ্যে ভাগ করে দিলাম। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বিবৃতি তৈরী করার দায়িত্ব ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ ও ডঃ আনিসুজ্জামানকে দিলাম। তারা খসড়া তৈরী করতেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে এগুলোর চূড়ান্ত রুপ দিতাম। ডঃ মল্লিককে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হলো। তার প্রচেষ্টায় সেখানে শিক্ষক সমিতি গড়ে ওঠে।**

**(স্কুল) শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান এই শিক্ষক সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বন্ধু মঈদুল হাসানও কলকাতা আসলেন। তাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কয়েক দফা বৈঠক হলো। তিনি দিল্লী চলে গেলেন। সেখানে নেপথ্যে থেকে তিনি আমাদের লবি সৃষ্টি করেন।**

**এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক কোন কাজেই হাত দিচ্ছেন না। মাহবুব আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে আগরতলা থেকে কলকাতা আসার জন্য মোশতাক চাপ দিচ্ছেন। মোশতাক-এর দাবী অনুযায়ী তাদের দু'জনকে কলকাতা আনা হলো। চাষীকে মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র সচিব এর পদের নিয়োগ করেন। আমি বুঝলাম আমার মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে যোগাযোগ হচ্ছিল তাতে মোশতাক খুশী হতে পারেন নি। চাষী কাজ শুরু করেছেন। মোশতাক এরপর দাবী করলেন, বাংলাদেশ মিশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন বিভাগ থাকতে পারবে না। এতদিন আমি বাংলাদেশ মিশনে কাজ করেছি। মোশতাকের এই নতুন দাবীর অর্থ বুঝতেও আমার অসুবিধা হলো না। অর্থাৎ আমাকে সার্কাস এভিনিউস্থ পররাষ্ট্র মিশন থেকে তাড়াতে হবে।**

**থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমার বসার ব্যবস্থা হলো। আমার পরিবার না আসা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও আমি একটি ঘরের দুইটি চৌকিতে থাকতাম। থিয়েটার রোডের বাড়ীটি বেশ বড়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার না আসা পর্যন্ত তিনিও এখানে থাকতেন। এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক ও কামরুজ্জামান পৃথক পৃথক ফ্ল্যাটে ওঠেন। কিন্তু পরিবার আসার পরেও প্রধানমন্ত্রী থিয়েটার রোড ত্যাগ করেন নি। তাজউদ্দিন ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তিনি পারিবারিক জীবনযাপন করবেন না। তিনি বলতেন, যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবার বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে, আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা করতে পারবো না কেন? তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।**

**আমার পরিবার আসতে অনেক দেরী হয়ে যায়। ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার ছোট্ট পরিবার ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে, ছেলে প্যাবলু স্ত্রীর সাথে, আর মেয়ে শম্পা তার নানীর সাথে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। ২৫শে মার্চের পর পাক বাহিনী নারায়ণগঞ্জ আমার শ্বশুরের বাড়ী এবং স্ত্রীর ভাই মুস্তফা সারোয়ারের বাড়ীতে আগুন দেয়। মেয়েটি তার নানীর সাথে মানুষের মিছিলে শামিল হয়। এরপর বহু কষ্টে শ্বশুরের পৈতৃক বাড়ী দাউদকান্দির জামালকান্দিতে উপস্থিত হয়।**

**আমার স্ত্রী লীলা আমার কোন খোঁজ খবর পাননি। বাড়ীওয়ালী বেগম হাবিবউদ্দিন ওপর তলায় থাকতেন। আমাদের সাথে তার খুবই সদ্ভাব ছিল। আমি তাকে খালাম্মা ডাকতাম। তিনিও পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আমার স্ত্রীকে ৪ বছরের ছেলেসহ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করেন। স্ত্রী পাশের বাড়ীর নাইমুর রহমানের সাথে আমার খোঁজে মুসা সাহেবের বাড়ীতে যান। আমি মুসা সাহেবের বাড়ীর ছাদের যে ঘরে থাকতাম, সেখানের একটি চৌকিতে একটি রক্তাক্ত চাদর ছিল। আমার স্ত্রী এই চাদর দেখে ফেলেন। ২৫শে মার্চে রাতে সে চৌকিতে একজন গাড়ী চালক ঘুমিয়েছিলেন। হানাদারদের গুলিতে সে নিহত হয়। এরপর লীলা আমার খোঁজে শ্বশুরবাড়ী নারায়ণগঞ্জে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেন নি। ফতুল্লায় পাকবাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে। ফিরে এসে তিনি দু'একজন আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও যান। কিন্তু অনেকেই সেদিন তাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তবে কোন এক সাহসী সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার স্ত্রী প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন। সেখান থেকে ডঃ নাইমুর রহমানের স্ত্রীর সহযোগিতায় গাড়ীযোগে তিনি নারায়ণগঞ্জ যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্বশুরবাড়ীর কাউকে না পেয়ে নৌকাযোগে জামালকান্দি চলে যান। তখনো আমার মেয়ে সেখানে পৌছে নি। নদীর প্রায় কাছাকাছি আমার শ্বশুরের গ্রামের বাড়ী। মিলিটারী হামলার আশংকায় আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গ্রামান্তরে দৌড়াতে হয়েছে। তা'ছাড়া তিনি তখনো জানতে পারেননি আমি কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছি। আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী রহমত আলীর কাছে খবর পেলাম আমার স্ত্রী জামালকান্দিতে রয়েছেন। রহমত আলীর কাছে তাজউদ্দিন ভাই-এর পরিবারের খবর পাওয়া গেল। রহমত আলী জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে নিয়ে আসবেন। আমি রহমত আলীর কাছে চিঠি দিলাম। রহমত আলী প্রথমে বেগম তাজউদ্দিন ও জুন মাসের শেষ দিকে আমার পরিবারের লোকজনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।**

**মে-জুন মাসের দিকে আগরতলা গিয়েছিলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর বড় ভাই আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম শামজ্জোহা তার পরিবার পরিজন নিয়ে আসেন। তাঁদের কাছে আমার পরিবারের খোজ খবর পাই। আমার পরিবার যখন কলকাতায় পৌঁছেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারি নি। বিএসএফ-এর মিঃ চট্টপাধ্যায় একটি কার্গো বিমানে করে তাদেরকে আগরতলা থেকে কলকাতা নিয়ে যান। বিএসএফ-এর ভাড়া করা বাড়ী কোহিনূর ম্যানসনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এসময় আমি খুব ব্যস্ত। আমাদের অভ্যন্তরীন রাজনীতির একটি প্রচণ্ড সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো।**

**প্রথম থেকে মন্ত্রিসভার প্রতি আমাদের যুব সমাজের একটা অংশের বিরূপ মনোভাব ছিল। তারা মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। যুবকদের এই অংশের কাজ ছিল বিভিন্নভাবে সরকারকে অপদস্থ ও হয়রানি করা। তারা ভারতে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পর্যন্ত মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে কুৎসা ও ভুল তথ্য পরিবেশন করে। অপপ্রচারের অংশ হিসেবে তারা প্রচার করে যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি অধিকাংশেরই সমর্থন নেই।**

**এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য ও নেতাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ এমন একটি বৈঠকই প্রমাণ করতে পারে যে তাজউদ্দিন সরকারের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শুধু সমর্থনই নেই, এ পর্যন্ত তার সকল কার্যক্রমের প্রতিও তাদের অনুমোদন রয়েছে।**

**এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জঙ্গলে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নদীর পাশে পাহাড়িয়া এলাকার এই জঙ্গলে বৈঠকের জন্য অনেকগুলো তাঁবু টানানো হয়। নির্বাচিত সদস্য ও দলীয় নেতাদেরকে বৈঠকে একত্রিত করার ব্যাপারে বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায়ের বিরাট অবদান রয়েছে।**

**বৈঠকে খোলাখুলিভাবে সরকারের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করা হয়। এতদিন যারা তাজউদ্দিন সরকারের অপপ্রচার করেছিল, বৈঠকের ফলে তাদের মুখে ছাই কালি পড়ে। শিলিগুড়ির বৈঠকের পর কলকাতা বিমান বন্দরে জানলাম, আমার পরিবারবর্গ এসেছে।**

**কোহিনূর ম্যানসনের ফ্ল্যাটে স্ত্রী, মেয়ে ও পুত্রের সাথে মিলিত হলাম দীর্ঘ দিন পর। ফ্ল্যাটে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানা পাতা রয়েছে। একই ফ্ল্যাটে আমরা ছাড়াও শামসুজ্জোহা ও মুস্তফা সরওয়ারের পরিবারবর্গ রয়েছে। জায়গার তুলনায় আমরা লোক ছিলাম বেশী।**

**এ সময় হানাদার বাহিনীর সমর্থকরা আমার গ্রামের বাড়ী জ্বালিয়ে দিলে তারা গৃহহারা হন। অসুবিধা হলে দেশ ছাড়ার জন্যে আমি আব্বাকে ইতিপূর্বে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেশের মাটিতে থেকেই আমাদের জন্য তিনি দোয়া করছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় চাকরি সূত্রে তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন। তার কলকাতা আসার কোন ইচ্ছা ছিল না। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পরে আত্মীয়স্বজনরা এক প্রকার জোর করে আব্বাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন।**

**হানাদাররা আমার বাড়ীর সকল সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। তাদের গুলিতে আমার চাচী আহত হন। বাড়ীর মেয়েরা অন্যত্র আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। আব্বাসহ যুবক ও অন্যান্য পুরুষ মানুষ কলকাতা চলে আসেন। ২৫শে মার্চের রাত থেকেই এ পর্যন্ত তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একত্রে থেকেছি। পরিবার আসার পর তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। তাকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া রাতের বেলায় এই বিচ্ছিন্নতায় কাজেরও বিরাট ক্ষতি হলো। কেননা, এতদিন দিনের শেষে রাতের বেলা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতাম। আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাছাড়া সকল প্রতিকূলতার ভেতর সংগ্রাম করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবন যাপন করে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর এই শারীরিক অসুস্থতার সময় আমার কাছে থাকা খুবই প্রয়োজন। অসুস্থ স্ত্রীকে ডঃ অমীয় ঘোষের কাছে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে আসছেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ অপুষ্টি ও অনিয়মের কারণে গর্ভজাত সন্তান বিপদমুক্তভাবে প্রসব নাও হতে পারে। অন্যান্য সংসদ সদস্যদের হারে মাসিক যে টাকা পেতাম, তা দিয়ে কোন রকমে বাজার খরচ চলতো।**

**আমার জন্য একটি সরকারী জীপ বরাদ্দ ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল দিতেন বলাইদা। বলাইদা ছিলেন একজন নামকরা সলিসিটর। তার এক মক্কেলের এক্সপেন্স একাউন্টে একটি নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প থেকে স্লীপ দিয়ে গাড়ীর জন্যে পেট্রোল নিতাম। ৯ মাস যুদ্ধের সময় এই দানের পেট্রোল ছিল চলাফেরার একমাত্র সহায়।**

**ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস (বি ভি এস) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য, কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা ঠিক করা হয়েছে। আমি নিজে বিভিএস-এর চেয়ারম্যান। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক করিমুদ্দিন আহমদ উপদেষ্টা এবং শাহীন স্কুলের অধ্যক্ষ মামুনুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক।**

**'ওয়ার অন ওয়ান্ট' আমাদের প্রাথমিক কাজের জন্য টাকা দেয়। প্রত্যেক শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' বিভিএসকে একটি জীপও দেয়। সদর স্ট্রীটে গাজা সংলগ্ন বাড়ীতে মিশনের বদান্যতায় বিভিএস-এর অফিসের জন্য দুইটা ঘর পাওয়া গেল।**

**কৃষ্ণনগরে সেচ্ছাসেবকদের একটি সম্মেলন হয় জুলাই-এর কোন এক সময়ে। শরণার্থী শিবিরে করণীয় কার্যক্রমের বিশদ বিবরণসহ পুস্তিকা ছাপানো হয়। সকাল বেলা সম্মেলনে যাত্রার পূর্বে দেখলাম, আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। বেগম শামসুজ্জোহার সাহায্যে পাশের ক্লিনিকে তাকে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অবস্থায়ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাকে সম্মেলনে যেতে বললেন।**

**এমনি এক অবস্থায় আমাকে সাহস দিয়ে সম্মেলনে প্রেরণের কথা কোনদিন ভূলে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্মেলনে ডঃ মোশাররফ হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ আমার সাথী হলেন। আমার বন্ধু ও রাজনৈতিক সাথী কুষ্টিয়ার কুমারখালি কলেজের অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদকে কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলনের প্রস্তুতির ভার দিয়েছিলেন।**

**বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসেন। এদের সকলেই রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী। তবে তাদের যুদ্ধের যাওয়ার বয়স নেই। আর্তমানবতার সেবা করাই সম্মেলনে আগত সকলের উদ্দেশ্য। ডঃ মোশাররফ হোসেন সম্মেলনে বক্তৃতা ছাড়াও কিছু ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এসব পুস্তিকায় বিভিএস-এর কর্মসূচী, শরণার্থী শিবিরে করণীয় কর্তব্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে এদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা ছিল। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ স্বদেশ বোস এবং শিল্পী কামরুল হাসানও বক্তব্য রাখেন।**

**কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পথে জানলাম, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীরা এখানে আশেপাশে রয়েছে। খবর পেলাম, কুষ্টিয়ার খোকসা থানার ৭টি গ্রাম পাক বাহিনী জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। একতারপুর গ্রামের কাপালিকরাও গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন। এসব গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে তাদের অত্যন্ত আপনজন জানতেন। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ক্লিনিকে যাই। বুকের ভেতর ছিল চাপা উত্তেজনা। ক্লিনিকে গিয়ে জানলাম আমার পুত্র সন্তান হয়েছে। মা ও সন্তান সুস্থ আছে বলেও জানলাম। আমরা শখ করে সন্তানের নাম রাখি জয়; কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। জন্মের পর জয় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই জয় আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অর্থাভাবে জয়-এর চিকিৎসা করাও সম্ভব হয় নি। ক্লিনিকে মৃত্যপথযাত্রী জয়কে নেয়া হয়। সেলাইন-এর বিল আমরা পরিশোধ করতে পারবো কি না, এই নিয়ে ক্লিনিকে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সেলাইন দেয়ার আর প্রয়োজন হয় নি। তার আগেই জয় চলে যায়।**

**পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা যেন কোন পিতা মাতার না হয়। আমি জয়কে নিজে হাতে মাটিতে নামিয়ে দেয়ার সময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি আল্লাহ আমার জয়-এর পরিবর্তে স্বাধীনতা দিও। এই শোক সামলে নিতে আমার প্রায় সপ্তাহখানেক সময় লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর সেই স্মৃতি আজো মুছে যায় নি। তা ছাড়া কোন মায়ের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ডঃ স্বদেশ বোস পরে বলেছিলেন, সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় পথে পথে ঘুরে এবং খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে মা ও সন্তানের অপুষ্টি হয়। এই সন্তান বেচে থাকলেও সংশয় মুক্ত ছিল না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি প্রতিদিন শরণার্থী শিবিরে বহু শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। এরপর থেকে স্ত্রীও আমার সাথে সীমান্ত শিবির দেখতে যেতেন। এমনিভাবে স্ত্রী আমার কাজের সহযোগী হয়ে ওঠেন। আমরা এ সময়ে বিভিন্ন শিবিরে অর্থকরী কাজে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহন করি। তাছাড়া প্রতি ক্যাম্পে শিশু কিশোরদের জন্য কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। প্রতি ক্যাম্পে ভোর বেলা পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধের গান, পিটি, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে। ক্যাম্পগুলোতে ময়লা নিষ্কাশন ও স্বাস্থের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ড্রেন কাটা, নালা সাফ, আবর্জনা পরিষ্কার ও ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমাশয় রোগে বিভিন্ন শিবিরে বহু লোক মারা যায়। তন্মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারই বেশী। ডাক্তার ও ওষুধের প্রচণ্ড অভাব। প্রত্যেক ক্যাম্পে মেডিক্যাল সেন্টার খোলার সঙ্গতি আমাদের নেই।**

**এসময় আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের খুঁজে বের করে প্রত্যেক ক্যাম্পে নিয়োগ করি। তাদের ওষুধের বাক্স দেয়া হল। এতে বেশ কাজ হলো। সীমান্তের নিকটে আমরা হাসপাতাল ক্যাম্প গড়ে তুলি। একজন কর্মঠ ডাক্তার এবং তাকে সাহায্যকারী কয়েকজন নার্স পেলেই হাসপাতাল শুরু করা যায়। কোন ছোট গুদাম জাতীয় স্থান নামমাত্র অর্থে ভাড়া নিয়ে সেখানে ছোট ছোট চৌকি ফেলে ১০/১২ বেডের হাসপাতাল তৈরী করা হতো। বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য সহযোগিতায় হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়।**

**এসব হাসপাতাল আমাদের খুবই উপকারে আসে। এতদিন পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আহত যেসব মুক্তিযোদ্ধা সামান্য চিকিৎসার অভাবে মারা যেত, হাসপাতালগুলো চালু হওয়ার পর তারা চিকিৎসা পেতে থাকে। ডাক্তারী পড়া ছাত্ররা এসব হাসপাতালে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার এমপিদের প্রতি মাসে ২০০ টাকা মাসহারা দিত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এ ধরনের কোন আর্থিক সুবিধা ছিল না। বিভিএস ( বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস)-এর পক্ষ থেকে এসব রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের মাসিক ৫০ টাকা মাসহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুঃসময়ে এ টাকা তাদের খুবই কাজে আসে।**

**প্রধানমন্ত্রী আমাকে দু'বার দিল্লী পাঠান। প্রথমবার দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিভিন্ন এজেন্সীর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখায় হয়। এদের কাছে বিভিন্ন ধরনের খবর পাওয়া গেল। বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার-এর সাথেও আলোচনা করি। তাছাড়া দিল্লীতে অবস্থিত বিদেশী মিশনের কর্মকর্তাদের সাথেও পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হই।**

**এদের সাথে সাক্ষাতের সময় শুনতাম বেশী, বলতাম কম। দেশ-বিদেশে আমাদের সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াসহ পরাশক্তিসমূহের মনোভাবও জানার সুযোগ হয়। ভারত সরকার সম্পর্কেও অনেক খবর জানা সম্ভব হলো। হিন্দুস্তান টাইমস-এর সম্পাদক উইলিয়াম ভারগিস ও তার মত আরো অনেকে বুঝাতে চান, ভারতের সকলে যে বাংলাদেশের পক্ষে আছে বা থাকবে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। তারা বলেন, আজো অনেকে ভাবেন যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই ভারতের জন্য মঙ্গল হবে। কারণ পাকিস্তানকে এতদিনে চেনা-জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারো কারো ধারণা, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হবে।**

**এ সময় দিল্লীতে শেখ আবদুল্লার সাথেও আমার দেখা হয়। একটি বাড়ীতে আধা নজরবন্দী অবস্থায় তিনি থাকতেন। তার চলাফেরার উপর বিভিন্ন সংস্থার কড়া নজর ছিল। তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তবুও পুরো একটা দিন তিনি আমার জন্য ব্যয় করেন।**

**বহুদিন পূর্ব থেকেই তার নাম শুনেছি। কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার চোখে তিনি বীর। ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি স্পষ্টবাদী। তিনি তার মনোভাব গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তিনি পাকিস্তান চান নি। কিন্তু বাঙালিরা চেয়েছিল। তারা আবার আজকে বাংলাদেশ চায়। আগামীতে তারা আবার কি চাইবে, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? শেখ আব্দুল্লাহর কথাগুলো তখন আমার খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তার কথার ভেতরে যে ইঙ্গিত ছিল, পরে তার মর্ম বেশী করে উপলব্ধি করেছি।**

আমি শেখকে বুঝাবার চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি আজ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের সংগ্রাম ৮ কোটি বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা বলতেই তিনি আবার ক্ষুদ্ধ কন্ঠে বলেন, তোমরা জিন্নাহর পিছনেও ছিলে। নাচাটাই তোমাদের স্বভাব। আজ তোমরা বঙ্গবন্ধুর পেছনে আছো। আবার কালকে তাঁর বিরোধিতা করতেও তোমাদের সময় লাগবে না। কাজেই তোমাদের প্রতি অন্ততঃ আমার কোন সমর্থন নেই।

সে সময় পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে এমন কিছু ব্যক্তির সাথেও আমি সাক্ষাত করি। তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংসদে একটি প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করা হয়। মিঃ ফনীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আমি দিল্লী আসার আগেই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারতীয় সংসদে বক্তৃতা করেন। আমি দিল্লী এসেছি জেনে তারা আমার সাথেও যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে থাকার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হলো। সম্মেলনে পেশ করার জন্য বক্তব্য তৈরী করে নিয়ে গেলাম। ফনীদা জানতেন বিদেশী প্রেসের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করছি। দিল্লী প্রেসক্লাবে তিনি আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলাম। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আহবান করি। শাহ মোয়াজ্জেম আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনো আমি ছদ্মনাম ‘রহমত আলী’ হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রচারিত হলো। পরিবার পরিজনের সাথে তখনো আমার দেখা হয় নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের মূল বক্তব্য ছিল পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায় অনভিজ্ঞ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে সফল হবেন এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাই বা কী? উত্তরে বললাম, দেশ মাতৃকার জন্য রক্তদানে প্রস্তুত মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করবেই। আমাদের ধারণা ছিল বর্ষাকালে পাক বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। প্লাবন ও বন্যায় অনভ্যস্ত পশ্চিমা বাহিনী এ সময় মূলতঃ শহরে আটকে থাকবে। আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনাও তেমনি ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে এরূপ ইঙ্গিত দেই। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা অন্যরূপ। পাক হানাদার বাহিনী গান বোটের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর উপর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

দিল্লী থাকাকালে অন্য একটি কাজ করি। সিপিআই-এর একজন এমপি’র মাধ্যমে দিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ হয়। সংসদীয় দলের ৩ জন প্রতিনিধিসহ আমরা ৪ জন সোভিয়েত দূতাবাসে যাই।

এটি পাক দূতাবাসের সামনে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী কর্মকর্তা আমাদের সাথে দেখা করেন। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য তিনি মস্কোতে পাঠাবেন। এর বেশী কিছু তিনি করতে পারবেন না বলে জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগে আগ্রহী ছিলেন না। আব্দুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে মস্কো যান। তখনো তিনি সোভিয়েতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তির সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন নি।

শান্তি সম্মেলনের সময় খাবার টেবিলে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পতাকা থাকতো। আব্দুস সামাদ আজাদ সেখানে বাংলাদেশের পতাকা রাখার দাবী জানালে স্বাগতিক দেশ অসম্মতি প্রকাশ করে। এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে একটি পতাকা রাখতে চাইলে মস্কোর তা পছন্দ হয় নি। এরপর আব্দুস সামাদ আজাদ নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাজউদ্দিন ভাই সাংবাদিক মঈদুল হাসানের মাধ্যমে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন করতে মস্কোর যে অসুবিধা ছিল, সেটা আমরা বুঝতাম। তবে আমাদের সংগ্রামের প্রতি যে মস্কোর সমর্থন রয়েছে, সেটা বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর পাক সরকারের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্টর চিঠিতে তার আভাস পাওয়া গেছে। ২৫ শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর হামলার প্রতিবাদ করে পদগোর্ণি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই সে সময়ে মস্কোর পক্ষে আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন দেয়া সম্ভব হয় নি।

তবে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেয়ার জন্যে ভারতের সাথে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করে। আমাদের সংগ্রাম চলার সময় মিঃ হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন সফর করেন। আর চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে পাকিস্তান দূতিয়ালী করে। এই ঘটনা ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষিত রচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও বৃহৎ শক্তির ভারসাম্যের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎবাণী কার্যে পরিণত হয়েছিল।

এসব আলোচনাকালে আমরা দু’জনেই মোটামুটি একইরকম মতামত পেশ করতাম। কিসিঞ্জার চীন সফরের খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সফর আমাদের সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে এটা সত্যে প্রমাণিত হয়। মস্কো উপলব্ধি করে যে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে রাশিয়াবিরোধী জোট গঠনে ব্যস্ত রয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চীন-মার্কিন তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর রুশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতর হয়। এখন রাশিয়ার পক্ষ থেকে ভারতের একটি আশ্বাস প্রয়োজন। সেই আশ্বাসটি হলো, কোন কারণে চীন ভারতে হামলা করলে রাশিয়া যেন পাল্টা চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, যাতে চীন নির্বিঘ্নে ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে।

হিমালয়ের তুষার ও সোভিয়েতের বন্ধুত্ব এই দু’টি ছিল চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা কবচ। তাই সময় ও সুযোগে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ভারত তখন অপেক্ষা করছিল, সে সময় বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাক বাহিনীর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দিল্লীতে আমি ভারতের বৈদেশিক দফতরে টি এন কাউলের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদেরকে বিদেশে প্রচার কাজের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেন। তিনি বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী, সেখানকার সরকার, সংবাদপত্র ও জনমত সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা দেন। আমি এসব দিল্লী সফরের রিপোর্ট হিসেবে একটা নকশার মত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের সরকারগুলো কে কি ভাবছে, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। এ ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই-এর একটি মোটামুটি হিসেব ছিল। তিনি জোর দিয়েই বলতেন যে আগামী শীতেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কেননা এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্যে প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে শত শত তরুণ যুবক আসছে। তাদের মুখে এক কথা-ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহনে ইচ্ছুক যুবক ছাড়াও প্রতিদিন বহু লোক আমার অফিসে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ভিড় করা শুরু করলেন। তাদের সবার বক্তব্য, স্ব স্ব স্থানের ছেলেদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম, যে সংখ্যায় মুক্তযোদ্ধা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আমরা করেছি, এর চেয়ে বহু বেশি সংখ্যায় যুবকরা আসছে প্রশিক্ষণের জন্যে। এ সময় আমরা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই ক্যাম্পগুলো এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা পরিচালনা করেন।

এর পরের ধাপ ছিল অভ্যর্থনা শিবির। অভ্যর্থনা শিবিরের কাজ ভারতীয়রা ও আমরা যৌথভাবে পরিচালনা করতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে ছয় সপ্তাহের ট্রেনিং-এ পাঠানো হতো।

প্রথমে আমাদের ২৫ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। পরে এই সংখ্যাকে এক লক্ষে উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে ট্রেনিং শেষ করে ৯০ হাজার স্বদেশে আসতে সক্ষম হয়। তাছাড়াও ছিল নিয়মিত বাহিনী। সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিডিআর-এর সৈনিকদের দ্বারা এই বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশের সংখ্যাও ছিল পর্যাপ্ত।

সীমান্তে ছাউনী তৈরী করে নিয়মিত বাহিনী অবস্থান করতো। সেখান থেকেই তারা পাক বাহিনীর ওপর হামলা করেছে। তাছাড়া ছিল সহায়তাকারী একটি গোষ্ঠী। একটু বয়ষ্ক, যাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছিল না, তারা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' ও 'অভ্যর্থনা ক্যম্পে' নিয়মিত বাহিনীর সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতো।

ইয়ুথ ক্যাম্প করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া গেল। বাংলার হাজার হাজার দামাল ছেলের দ্বারা ক্যাম্পগুলো ছিল পরিপূর্ণ। তাদের শুধু একটাই কথা-ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। খান সেনাদের যে কোন মূল্যে খতম করতে হবে।

এসময় আমি নিয়মিত ইয়ুথ ক্যাম্পে যেতাম। প্রিনসেপ স্ট্রীটে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অফিস খোলা হল। এই মন্ত্রণালয় ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাজের মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে আমার সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে কয়েকবার আমাদের বৈঠক হতো। এতে কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) ও আমি সড়কপথে বাংলাদেশের পুরো সীমান্ত দেখার জন্য ২৫ দিনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করি। স্বরাষ্ট্র সচিব আব্দুল খালেক আমাদের সাথে ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে খালেক রাজশাহীতে ছিলেন, পরে সীমান্ত পার হয়ে আসেন। আব্দুল খালেক পুলিশ বাহিনীর লোকদের সংঘবদ্ধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক। তাঁর উদ্যম ও কর্মোৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী। আমরা রওয়ানা হই কলকাতা থেকে। মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরের শিলিগুড়ি পার হয়ে মেঘালয়ের তোরা পাহাড় অঞ্চলের পাদদেশে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। ফিরে আসার সময় পথে পথে সকল ক্যাম্প পরিদর্শন করি।

আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হতো ইয়ুথ ক্যাম্পে। ইয়ুথ ক্যাম্প ছাড়াও পথিমধ্যে নিয়মিত যোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে গেছি। আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সরেজমিনে দেখা এবং স্থানীয় ও ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। তোরাতে মেঘালয়ের মূখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হলো।

মূখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। মেঘালয়ের জনগনের অধিকাংশ খৃস্টান। তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মিশনারীদের পুরাতন প্রভাব বিদ্যমান। এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মতো সহায়তায় এত ব্যাপক নয়। আমাদের লোকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

মেঘালয় সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা হলো। হেনা ভাই-এর সাথে মূখ্যমন্ত্রীর ছাত্রজীবনের সম্পর্ক ছিল। আলোচনায় এ সম্পর্ক আরো গভীর হলো।

এখানেই মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। খবর পেয়ে তিনি ডাকবাংলোতে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর থেকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অফিসারের একটা গ্রুপ তৈরীর ভার ছিল জিয়ার ওপরে। কয়েকদিন পূর্বে জিয়া সৃষ্ট আমাদের শিক্ষানবিশ গ্রুপটিকে পাক বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করাও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্প সার্ভে করি। সবকিছু শুনে মনে হলো শত্রুর মুখে শিক্ষানবিশ অফিসাররা নিতান্তই নিরাপত্তাহীন ছিল। এত বড় আঘাতের রেশ তখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। মেঘালয়ের কাজ শেষে আমরা শিলং-এর পথে রওয়ানা হই। পাহাড়ি পথ বেয়ে আমাদের গাড়ি চলতে থাকে। পাহাড়ি অঞ্চলে রাতের বেলা শীত বাড়ে।

জঙ্গলে ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্পে শত্রুহানার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। রাতের বেলায় এমন একটি ক্যাম্পে গিয়ে আমরা উপস্থিত হই। পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প করা হয়েছে। চালা দেয়া ঘর এবং কয়েকটি তাঁবু রয়েছে। ছেলেরা তখন আগুন পোহাচ্ছিল। শীতের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় নেই। পাহাড়ী জঙ্গলে খাওয়া দাওয়ার এমনিতেই অসুবিধা। যোগাযোগের অবস্থাও ভালো নয়। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে অম্লান হাসি। তাদের সাথে অনেকক্ষণ খোলাখুলি কথা হয়। কারো কারো প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর দেশকে কিভাবে পূনর্গঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হবে ইত্যাদি। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করি। তারা জানান, তাদের প্রয়োজন শুধু অস্ত্রের। তাদের অভাবের তালিকায় শীতবস্ত্র, জুতা, কম্বল ও খাবারসহ অনেক কিছু ছিল। কিন্তু তারা এসবের কিছুই উল্লেখ করেন নি। তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দাবী হলো অস্ত্র চাই। শত্রুকে হত্যা করে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

সারারাত গাড়ী চালিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করে পরদিন সিলেট সীমান্তে আসি। পথে পথে বহু শিবির আমরা পরিদর্শন করেছি। সিলেটের কিছু অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রয়েছে। হেনা ভাইয়ের খুব ইচ্ছা বাংলার মাটিতে রাত কাটাবেন। বর্ষার পানিতে সিলেটের হাওড় তখনো পরিপূর্ণ। আমাদের আসার খবর চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট নৌকায় আমাদের দলীয় নেতা-কর্মীরা দেখা করতে এলেন। নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় বিএসএফ কর্মকর্তার সাথে আলোচনা শেষে শিলং-এর পথে যাত্রা করি।

এখানে মুক্তাঞ্চলে বহু শরণার্থী শিবির রয়েছে। রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শিবির। এখান থেকে গিয়ে তারা হানাদারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। একটি গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে বিরাট জনতার সমাগম হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আমরা বক্তৃতা করি। স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রকাশ্যে জনসভা করতে পেরে অফুরন্ত আনন্দ পেলাম। জনসভা শেষে রাতেই শিলং পৌছার কথা রয়েছে। এই অঞ্চলে সিলেটের একজন এম.পি আব্দুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি এক সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হন।

সেখান থেকে আমরা শিলং ডাকবাংলাতেই যাই। সিলেটের একজন এম.পি এই অঞ্চলে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন। এই এম.পি’র নাম ব্যারিষ্টার মোনতাকিম চৌধুরী পরে তাকে জাপানে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েকটি বৈঠক করি। পরদিন আমরা সিলেট ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত 'বালাট'-এর পথে রওয়ানা হই। কিছুদিন পূর্বে বালাটের কাছে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আমাদের কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের মাটিতে এই বীরদের কবর দেয়া হয়েছে। বালাটেও স্থানীয় নেতাদের সাথে আমাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়।

আমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হল। শিলং-এ পৌছে দিনের কর্মব্যস্ততা শেষ করে পশ্চিম বাংলার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের বাসায় যাই। তার কাছ থেকে স্থানীয় রাজনীতি, আসাম ও মেঘালয় সরকারের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হই। এর পূর্বে আমি কয়েকবার গৌহাটি, আগরতলা ঘুরে গেছি। আসাম সরকার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না। শরনার্থী শিবিরগুলোতে খুবই কড়াকড়ি। তাই তাদের জীবন এখানে খুব সুখকর ছিল না।

এর আগে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে নিয়ে আমি আগরতলা গেছি। তাকে নিয়ে আমি সাবরুমে গেছি, এখানে ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তে একটি রেষ্ট হাউজ রয়েছে। সেখানে হানাদার বাহিনী ক্যাম্প তৈরী করেছে। পাক হানাদার বাহিনী এখানে নারী নির্যাতন করেছে। দস্যুরা নারীদের উলঙ্গ করে পর্যন্ত রাখে। ওপারের লোকের মুখে এসব নির্যাতনের কথা আমরা শুনি। সাবরুমের ডাকবাংলোতে বিশ্রামের সময় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সাথে আমাদের দেখা হয়। বারী একজন সাধারণ শরনার্থীর মতো ডোনাল্ডের কাছে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। ডোনাল্ড এসব কথা বৃটিশ সংসদে বলবেন বলে আমাদের জানান। এবং তিনি পরে তা করেছিলেন।

হ্যনসার্ড-এর রিপোর্টে বাংলাদেশের করুণ এই আলেখ্য প্রকাশিত হয়। আমি জন স্টোন হাউজ, ডগলাস ম্যান, পিটার বার্নস এমপিসহ অনেক সাংবাদিককে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে পৌছি। এমন একটি দল নিয়ে পাটগ্রামের মুক্তাঞ্চলে যাই। যুদ্ধ চলার সময়ও আমি বহুবার পাটগ্রামে গেছি। পাটগ্রামে একবার আমরা একটি ডাকঘর উদ্বোধন করি। এ সময় প্রখ্যাত ডিজাইনার বিমান বোস অংকিত স্বাধীনতা যুদ্ধের কোমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প লণ্ডন ও কলকাতায় বিক্রি করা হয়।

পাটগ্রামে ডাকঘর উদ্বোধন করার সময় টেলিভিশনসহ বেদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং মোস্তফা সারওয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পাটগ্রাম থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমরা ১ রাত ১ দিন কাটাই। সামরিক ছাউনীতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আমরা দিনাজপুরের পঁচাগড় পর্যন্ত মুক্তাঞ্চলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিই। আমাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কামান বিপুল উৎসাহে গর্জে ওঠে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে তখন কামান এসে গেছে। এই কামানের গোলায় দূরের পাকিস্তানি বাংকারগুলো ভেঙ্গে পড়েছে। দূরবীন দিয়ে পলায়নপর পাক বাহিনী দেখে উল্লাসিত হই।

দিনাজপুর জেলার এই অঞ্চলের একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসী মুক্তিবাহিনীর জন্যে গ্রামটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। গ্রামটির নাম মনে নেই। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়ি-ঘরে টিনের বা খড়ের চালা। ঘরের ভিটিগুলো বেশ উঁচু। ঘরের ভিতরে বাংকার তৈরী করা হয়েছে। মেঝেতে গর্ত করে মাটির ভেতরে কামান বসানো হয়েছে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহ্বান 'ঘরে ঘরে দুর্গ ঘড়ে তোল' এ কথা মনে হত। গোরস্থানে কবরের ভেতরেও অনেক স্থানে বাংকার হয়েছে। গ্রামবাসীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা দূরে গরু চরাতে গিয়ে পত্র বাহকের কাজ করেছে ও দূরে শত্রুদের অবস্থান জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভিয়েতনামের জনগন পরম পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের মাটিতে একাধিক বীরত্ব গাঁথা জন্ম নিচ্ছে। এই বীরত্ব গাঁথার সবগুলো হয়ত কোন দিনই লেখকের কলামে, কবির কবিতায় বা শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়তো কোন দিনই লেখা হবে না। তবে ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহস দেখে মন ভরে উঠতো। প্রথম প্রথম বেশ ভয় করতাম। পরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাই। একদিন ভারতীয় একজন জেনারেলের কথা শুনে আমার ভয় অনেকটা কমে গেল। তিনি বলেন, ‘যে গুলিতে তুমি মারা যাবে, সে গুলির আওয়াজ তোমার কানে আসবে না। আর যে গুলির শব্দ তুমি শুনছ, তা তোমার গায়ে লাগবে না।’ এরপর বলতে গেলে গুলির শব্দে আর ভয় পাই নি।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আমি যুদ্ধের নিয়ম কানুন কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি। তাছারা কোন ক্যাম্পে গেলে আমাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। আর বিশেষ কথা হলো আমাদের তখন মরার ভয় ছিল না, ভয় ছিল শত্রুর হাতে যেন না পড়ি। শত্রুর হাতে না পড়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারন, যুদ্ধাবস্থায় বন্দিত্ব মৃত্যুর চেয়ে খারাপ হতে পারে। সে সময় পঁচাগড়ের একটা সেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। সেতুর স্থান থেকে ঢাকার মেইল স্টোন দেখা যায়। ভাবতাম, এই পথে কখন ঢাকা যাব। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলগুলো ছিল আমাদের আগামি দিনের মাইল পোস্ট।

প্রধানমন্ত্রী ও আমি পাটগ্রাম সফর করে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি। শিলিগুড়ির মিলিটারী হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে গেলাম। আহতদের মুখে মুক্তিযুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনলাম। তাদের চোখে মুখে দেশে ফেরার স্বপ্ন। শিলিগুড়ির এক কাকর বিছানো পথ দিয়ে আমরা পাটগ্রাম যেতাম। পাটগ্রামের পরিত্যক্ত রেল স্টেশনে বসে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তাকারী বন্ধু ডোনাল্ড ও স্টোনহাউস কে বাংলাদেশে প্রবেশের ভিসা প্রদান করি। শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মচারীদের একটি প্রশাসন কাঠামো ছিল। গণসংযোগের জন্য আমি একবার শিলিগুড়ি বারে যাই।

প্রধানমন্ত্রীর সাথেও একবার শিলিগুড়ি যাই। সারদিন কর্মসূচি ছিল। এবার চিত্তদের বাসায় যেতে পারি নি। সন্ধাবেলায় শিলিগুড়ির ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মিলিটারি ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো। এই অঞ্চলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান, তার সঙ্গী সাথী কর্মকর্তারা সকলে উপস্থিত। তাদের ব্যবহার খুবই ভাল। তাদের আলোচনায় একতি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিষ্ফুট হয়ে উঠে। তা হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। গনপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাভাব দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। বুঝলাম সে দেশে কেন গণতন্ত্র টিকে আছে।

পরদিন সকালে আমরা আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পরিদর্শনে গেলাম। এগুলো ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি তত্বাবধানে। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি শিক্ষানবিশ মুক্তিযোদ্ধারা টার্গেট শুটিং-এ ব্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শেষে লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী কে অভিনন্দন জানায়। জয় বাংলা শ্লোগানে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত ক্যাম্প কেঁপে ওঠে। আমাদের সবার কন্ঠে ভেসে আসল ‘আমাদের সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’।

ক্যাম্পের সীমার শেষ প্রান্তে এসে ছেলেরা আমদের বিদায় দিয়ে গেল। এখান থেকে আমরা রংপুরের ভূরুঙ্গামারীর দিকে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ভারতীয় একজন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী রয়েছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলেছেন। পেছনে একটি জীপে সেই ক্যামেরা ম্যান। আমাদের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের খান, আলোকচিত্র শিল্পী আলমসহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক। ভূরুঙ্গামারী পৌঁছে জানলাম, এই অঞ্চলে একজন জজ ( নাম সম্ভবতঃ আনোয়ার) যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

পরদিন আবার আমরা মুক্তাঞ্চলে যাই। এ সময় আমাদের মাঝে মধ্যে খাল, বিল, খরস্রোতা নদী ও মুক্তি যোদ্ধাদের উড়িয়ে দেইয়া সেতু পার হতে হত। একদিন প্রধানমন্ত্রী ও আমি কলা গাছের ভেলায় করে একটি খাল পার হই। এই ভেলাসহ আমাদের সেই ছবি আন্তর্জাতিক ভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বই-এ এই ছবি প্রকাশিত হয়।

এই সফর সূচিতে আমরা বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ছুঁইয়ে আগরতলা পৌঁছি । কঠিন দূর্গম ও পাহাড়ী পথ। আগরতলা, সাবরুম, হরিনা, বালাট, তোরা, ভূরুঙ্গামারী, পাটগ্রাম, পঞ্চগড়, রাজশাহী, বেতায়, শিকারপুর, মুজিবনগর, বেনাপল, মামা ভাগ্নে, টাকি, দেবহাটা এগুলো ছিলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাইল পোস্ট। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের মানচিত্রকে মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

সীমান্তের ওপারে এক কোটি মানুষের ভিড়। এরা ঘরে ফিরতে আগ্রহী। শৃংখল মুক্তির উদ্দাম আবেগ তাদের মনে। মুক্তিযোদ্ধারা প্লাবনের মত সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা বাংলার নিভৃত গ্রামে, অরণ্যে মাঠে, নদী খাল বিল, হাটে ঘাটে,বাজার ও শহরের পাড়াতে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশের জনগন মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভরসা করে রয়েছে। এরা ঢাকার ইন্টারকন থকে মতিঝিল আবাসিক এলাকা, ফার্মগেট, মফস্বল শহরের রাজপথ, গঞ্জে বাজারে, ধানক্ষেতে রাজাকারের ক্যাম্প, দালালের গৃহ, হানাদার বাহিনীর ছাউনিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আগরতলা এসে আমরা মেজর শফিউল্লার সাথে মিলিত হলাম। শফিউল্লাহ হরিণাতে ক্যাম্প স্থাপন করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছেন।

আমরা মেজর খালেদ মোশারফের ক্যাম্পেও গেলাম। ক্যাপ্টেন রফিক খুব শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেক দিন পরে তার সাথে দেখা। ইয়াহিয়ার শাসনামলে আমলে কুষ্টিয়া ছিলেন। দু’সপ্তাহ পূর্বে তিনি ফ্রন্ট থেকে ফিরেছেন। কয়েক দিন পূর্বে তার জ্বর হয়েছিল। জ্বর থেকে সেরে উঠেছেন। যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি উদগ্রীব। এই ক্যাম্পে সবাই মাটিতে বসে আমরা দুপুরের খাওয়া খেলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দিত। পাক সেনাবাহিনী তখন আগরতলা সীমান্তে দারুন চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের গোলা সীমান্ত পার হয়ে শরনার্থী শিবির পযুর্ন্ত আসছে। হানাদার হটাবার জন্য আমাদের মুক্তিবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সময় চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী ও এম.এ হান্নানের সাথে দেখা হলো। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করি। আগরতলাতে জনসংখ্যার চেয়ে শরনার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফেরার পথে মালেক উকিলের সাথে দেখা হলো। এখানে ছোট পরিবার নিয়ে তিনি থাকেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যান সেখানেই বিপুল লোকের সমাগম হয়। তাদের দুজনের আগমনে এখানে প্রাণচাঞ্চল্য বয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমরা খালেদ মোশারফের ক্যাম্পে গেলাম। খালেদ আমাদের জানান, এই মুহূর্তে তিনি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারছেন না। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক তিনি অবরোধ করে রেখেছেন বলে তিনি আমাদের জানান। তার লোকজন অনেক গভীরে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। আমাদের নিয়ে তিনি জঙ্গলের পথে বের হলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কয়েকটি পরিছন্ন গ্রাম। ভারতীয় সীমান্তের সাথে লাগানো। এই গ্রামের মানুষের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গেছে। পুকুর থেকে গ্রামের মেয়েরা পানি নিচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে চলাচল করছে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। গ্রাম থেকে একটু দূরে আম বাগানের ভিতরে বৃহৎ কামান বসিয়ে গোলা ছুড়ছে আমাদের আমাদের গোলান্দাজ বাহিনী। এই কামান গুলো খুব পুরানো বলে মনে হলো। এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। খালেদ আমাদের কামানের সামনে নিয়ে গেল। আমাদের মাথার উপর দিয়ে কামানের গোলা উড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক উত্তেজনা শিহরণ। এরপর খালেদ পাহাড়ে উঠার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমাদের শত্রুর শিবির দেখানোর কথা বলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে না নিয়ে যেতে পারলেও সড়কটি আমাদের দেখাতে চাইলেন। কন্টকাকীর্ণ পথ। খালেদের চাল-চলন দেখে মনে হলো, তিনি যেন এখানে মানুষ হয়েছেন। তার কাঁধে একটি দূরবীণ, পায়ে বুট এবং হাতে একটি ছোট ছড়ি। আমাদের হাতেও এমনি করে লাঠি দিয়েছেন পথ চলার সুবিধার জন্য। আমাদের উঠতে কোন অসুবিধা হচ্ছিলো না। নজরুল ভাইকে কে নিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পাহাড়ে উঠে দূরবীণ দিয়ে খালেদ কি যেন দেখলেন। এক সময় খালেদ পাক-ছাউনি দেখালেন। আমি দেখলাম। ঢাকা চট্টগ্রাম সড়ক ও দেখলাম। রাস্তাটি একেবারে জনমানবহীন।

আমাদের গোলান্দাজ বাহিনী তখনও গোলাবর্ষণ করেছে। শত্রু বাহিনী ছাউনীর কাছে সেই গোলা গিয়ে পড়েছে। শত্রুছাউনীর পাশে একটি রেস্ট হাউজ দেখা যাচ্ছে। খালেদ যোগযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

কতক্ষণ পর ফিরে গেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জোয়ানদের সাথে। ইতিমধ্যে গাফফার (অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল) একটি ছোট বাহিনী নিয়ে আসে। গাফফার অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বাড়ি খুলনা। অসম সাহসী, ধীর, স্থির। একটা ভালো লাগার মত ব্যক্তিত্ব। তার কাছে যুদ্ধের বহু কাহিনী এবং মুক্তিযুদ্ধাদের বীরত্বের কথা শুনলাম। সন্ধ্যা হতেই আমরা আগরতলা ফিরে আসি। পরদিন আমাদের কলকাতা যাবার কথা। বি.এস.এফ এর মালবাহী বিমানে আমদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। খালেদ সকালবেলা আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। তিনি সুবিধা-অসুবিধা এবং আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যোগাযোগের অভাবের কথা জানান। কিছুদিন পূর্বে মুজিব বাহিনীর কার্যক্রর্মের সাথে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আমরা তা’ দূর করতে সক্ষম হই। দুই দিন পর কলকাতায় এসে আওয়ামী লীগ কাযর্করী কমিটির বৈঠকে আমরা সবর্শেষ পরিস্থিতি আলোচনা করি। এই সময় খবর আসে যে খালেদ মোশারফ আহত হয়েছেন। তাকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

আওয়ামী লীগের এই বৈঠক ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তখন বুঝতে পারি যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সব কিছু মিলে আমাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত পযার্য় চলে এসেছে। এ সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আসে। বাংলাদেশের শরনার্থীদের নিয়ে আমরা দেশের ভেতরে যেতে পারি কিনা। ভূ-খণ্ড দখলের ব্যাপারে ভারত সরকার সাহায্যের আশ্বাস দেয়। আমরা এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করি। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষেই আমাদের সংগ্রামের পক্ষে। হানাদার বাহিনীর বন্দুক কামানের বাইরে সারা দেশেই বলতে গেলে স্বাধীন। আমাদের তাই নতুন করে ভূ-খণ্ড দখলের প্রয়োজন নাই।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম হই। জুলাই মাস পর মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। শত্রুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিশ্বব্যাংকের একটি দল আগস্ট মাসে ঢাকা আসে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক সরকার সাহায্য পাবে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ১২ আগস্ট তারিখে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে বলে পাক সরকার যে প্রচার চালাচ্ছিল এই গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে তা অনেকটা ব্যর্থতায় পযর্বসিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গেরিলারা অতি অল্প সময়ে কলা কৌশল রপ্ত করে। প্রথম দিকে পাক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশল পরিবতর্ন করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

জুন মাসের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য করছি। কুষ্টিয়া কলেজের বীর যোদ্ধা তারেক। এক সম্মুখ সমরে তারেক শহীদ হয়। কৃষ্ণনগর ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছি। শুনলাম, তারেক দলবল নিয়ে যুদ্ধে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসলো, কিন্তু তারেক ফিরে আসল না। জরুরী কাজে আমার কলকাতা ফিরে আসা দরকার। ক্যাম্পের বাইরে ৪ টি ছেলেকে দেখতে পাই। তাদের মুখে শুনলাম কিভাবে তারেক বীরের মত শহীদ হয়েছে। আমি তাদের বললাম, “যুদ্ধে বিজয় বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হলো বীরত্বের কথা। আমরা তারেকের গর্বে বেঁচে থাকবো। তারেক শহীদ হলেও তার একটা জিনিস পাওনা আছে। তা’হলো তার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্মান। তাঁকে সেই সম্মান দেখাতে হবে। তোমরা তার লাশ আনতে পার নি। তার আত্মা কে তোমরা নিয়ে এসেছো। এসো, আমরা তাকে সম্মান করি।”

সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হলো। পতাকা অর্ধনমিত রাখা হলো। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তারেক কে সম্মান করলাম। সবার চোখে নেমে আসলো অশ্রুধারা। ধরা গলায় আবার গাইলাম “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।”

অন্য একদিনের ঘটনা। শিকারপুর ক্যাম্পে। তওফিক এলাহী এই ক্যাম্পের অধিনায়ক। যুদ্ধে একজন আনসার মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাশ নিয়ে আসে। বুট পায়ে সামরিক পোশাক পরে ছাউনির সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে শহীদ ভাই। বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো শরীর। তাকে সামরিক কায়দায় দাফন করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এসে দেখি, শহীদের স্ত্রী। কোলে অবুঝ পুত্র। সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। জানি না আজ তারা কে কোথায় কেমন আছে। যুদ্ধকালে এই পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নিয়েছিলো বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস। এমনি শত শত মুক্তিযোদ্ধা শুয়ে আছে সিলেটের বালাট সীমান্তে। তাদের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বাংলার মাটিতে কবর দেওয়া হয়। শুধু বালাট নয়, ২৪ পরগনার টাকি পযর্ন্ত পুরো সীমান্তে শহীদের অসংখ্য কবর রয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করার সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হলেও আমি সেখানে একটা সংযোগ রাখার চেষ্টা করতাম। সেখানে আমার তদারকি মোশতাক আহমদ কিছুতেই পছন্দ করতেন না। খন্দকার মোশতাক মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব করেছেন। হোসেন আলী কলকাতা মিশনের প্রধান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। হোসেন আলী থেকে শুরু করে কলকাতা মিশন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়।

পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি প্রচার সেল খোলা হয়। আমার বন্ধু ও সহকারী মওদুদ আহমেদ এ সেলে কাজ করতেন। এ সময় তার একটি পুস্তক বিদেশ অফিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মান্নান সাহেব জয়বাংলা পত্রিকা ও বেতার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ডাঃ টি হোসেন থাকেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে। তিনি যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন শিবিরে আহতদের শুশ্রুষা চালু করেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের “প্রকাশনা সেল” কে একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদেশী প্রতিনিধি দল আসলে তাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব এরা পালন করতে থাকে। মিঃ বটমলির নেতৃত্বে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। এদের কলকাতা আসার কথা ছিলো। তাদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য আমরা একটি ছোট দল গঠন করি। এই দলে সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ টি হোসেন, ডাঃ স্বদেশ বোস সহ আর অনেকে ছিলেন।

বেনাপোলের ডাক বাংলোতে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের লোকদের বিভিন্ন শিবিরে পোস্টার ও ফেস্টুন সহ পাঠাই। প্রতিনিধি দল আসেন বেশ বিলম্বে। বটমলি বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন। আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান মানুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি বললাম যে, আমরা বুদ্ধি বিবেকহীন মানুষের অত্যাচারে আজ দেশ ছাড়া, গৃহহারা। বুদ্ধি বিবেক সম্পুর্ণ মানুষের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষায় আছি। তাই তার এই পালার্মেন্টারী ডেলিগেশনের সাথে আমাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য সব কিছু করার আশ্বাস দেন।

টেড কেনেডী আসেন একবার। তাঁর সাথে আমাদের প্রতিনিধিদলের দেখা হয়। আমি ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ স্বদেশ বোস ও মুস্তফা সারয়ার। কেনেডী প্রথমেই জানতে চান, আমাদের জন্যে তারা কী করতে পারেন। আমি বললাম, মার্কিন জনগন, সেদেশের পত্র-পত্রিকা ও কেনেডী আমাদের জন্যে যা করেছেন,এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আরো বলি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি কিছুই না করেন, তাহলেই আমরা খুশি। সফরের পর কেনেডীর রিপোর্ট আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরমভাবে দেখা দেয়। এই উচ্চাভিলাস যুবক, ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধা, সিপাই, চাকরিজীবি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল তবে উচ্চভিলাষীদের সংখ্যা তত বেশী ছিল না।

মিলিটারীদের প্রতি যুবকদের একটা চরম অবিশ্বাস ছিল। তাদের অভিযোগ, এককালে এরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থাকায় তাদের ভাবধারা প্রভাবাম্বিত। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দিলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আত্মবিকাশের চরম বিপর্‍্যয় ঘটাবে।

অপরদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে আওয়ামী লীগের যুবকদের প্রতি তেমন অবিশ্বাস। এর মধ্যে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ফলে এই অবিশ্বাস আর বৃদ্ধি পায়। একজন সংসদ সদস্য থাকা সত্ত্বেও ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহু সামরিক অফিসারের মধ্যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে । তাদের বক্তব্য ছিল সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হওয়া উচিত নয়।

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ প্রমুখ ওসমানী সম্পর্কে এ ধরনের উদাসীন উক্তি করেছেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তখন থেকেই শুরু হয়। শফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ এই তিন জনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে আমার ধারনা। শফিউল্লাহ ও খালেদ দু’ জনেই যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরা চিরকাল বীর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়ার তেমন কোন বীরত্বের নজীর নেই। তবে তার মধ্যে ক্ষমতার অস্পষ্ট প্রস্ততি তখন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। নূরুল ইসলাম শিশু প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলতেন, ‘‘সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারের সহযোগিতা ও সম্মান আমাদের অজর্ন করতে হবে। তবে আমাদের প্রতি তাদের আস্থার অভাব স্পষ্টতঃই দেখা যায়। শিশু তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের কাছে আছেন ও থাকবেন। আমাদের কতটুকু কাজে লাগবে জানি না। তবে তার মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের আস্থা ও সম্মান অজর্ন করার চেষ্টা করা উচিত। ওদের এটাও বুঝানো দরকার যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ অচল এবং নতুন দেশ গড়াও অসম্ভব। তাই দেশপ্রেমের তাগিদে যারা অস্ত্র ধরেছেন, এই কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে ওদের কাতারবন্দী হওয়াও উচিত।”

সামরিক বাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর, মুজিব বাহিনীর সাথে অনিয়িমিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কমীর্দের খুটিনাটি বিরোধ দেখা দেয়। এসব বিষয় আওয়ামী লীগ কাযর্করী কমিটির বৈঠকেও আলোচনা হয়। তাজউদ্দিন ভাই এই বিষয় সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক মুল্যায়নের নির্দেশ দেন। তার বক্তব্য ছিল কে বা কারা পাকিস্তানি ভাব ধারায় অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী গণবিরোধী মনোভাব প্রভাবাম্বিত বা কে তা নন, এর বিচার শুধু ভবিষ্যতেই সম্ভব।

নয় মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে তাজউদ্দিন ভাই-এর সেই আবেদন কতটুকু সফল হয়েছিল তা ভবিষ্যত ইতিহাসই বলবে। প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন করে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয়। বেশির ভাগ লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন সংসদ সদস্য। সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান সিভিল সাভির্স থেকে যে সব অফিসার যোগ দেন, এদের মধ্যে উচ্চভিলাষী লোকের অভাব ছিল না। আবার এদের মধ্যে বেশিরভাগ অফিসারই অসীম সাহসিকতা, ত্যাগ ও কমর্স্পৃহার পরিচয় দেন।

মাগুরা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন ও তওফিক এলাহীর অবদান স্বণার্ক্ষরে লেখা থাকবে। একজন ছেলেদের সাথে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন, যিনি পরে ঢাকা জেলার জজ হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ব্যাপক ও সম্মানিত আন্দোলন ছিল । এখানে অনেক লোকই তাদের পোশাকী, পদবী ও মনোভাব বজর্ন করতে পেরেছিলেন। পাক সিভিল সাভির্সের অনেকের মধ্যে পদবী মেজাজের রেশ ছিল। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই কিছুটা ক্ষোভ দেখা দেয়। এই পদবীজনিত মনোভাবের কারনে পরবতীর্কালে বাংলাদেশে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

এসব পদবী মনোভাবাপন্ন অফিসারদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, ফাইলের খেলা, কলম দিয়ে পিষে নোট লিখা, লাল ফিতাতে বাঁধা এমন এক পর্যায়ে এলো যে পুরো ৪/৫ তলা বাড়ি প্রবাসী সরকারের অফিস পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপকতায় এদের মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে এরা একটি ভিন্ন মনোভাব ও ভিন্ন স্রোত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

কেবিনেটে তাজউদ্দিন ভাই-এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে চরম অসন্তোষের বারুদ নিয়ে বসে ছিলেন খন্দকার মোশতাক। ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি ভিন্ন মনোভাব, যে কোন কারণেই হউক না কেন, মোশতাক অনেক কাজেই বাঁধা সৃষ্টি করেছেন।

মোশতাক কখনো শেখ মনিসহ যুব নেতাদের উস্কিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মোশতাকের ভাবশিষ্য তাহের ঠাকুর একবার স্বাধীন বাংলা বেতারে শিল্পীদের দিয়ে ধর্মঘট করার ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করেন। অবশ্য এসব সফল হয় নি। সাধারণ কর্মীদের সংগ্রামের প্রতি ছিল সমর্থন আর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের দলগত দিক থেকে তাজউদ্দিন ভাই-এর প্রতি মিজান চৌধুরীর একটি ক্ষোভ ছিল। প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাজউদ্দিন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়েন নি।

আর অনান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি দল গুলোর দাবী ছিল একটি সবর্দলীয় সরকার গঠন করার। আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল নিবার্চিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। সবর্দলীয় সরকার গঠনের দাবীদারদের কেউ কেউ ভারতবর্ষের বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে লবি সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

ভারতে সিপিআই ও সিপিআই (এম)-এর কংগ্রেসের ওপর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাদের কাজ থেকেও সবর্দলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আনাগোনা শোনা যেতে লাগলো।

এ সবের অবসান ঘটাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সাথে পরামর্শ করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এতে ভাসানী, মনি সিং ও মোজাফফর আহমদ সদস্য হলেন। উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কাযর্করী কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্থাব উত্থাপন করা হয়। সেরেনিয়াবাত এই প্রস্তাবের নেত্তৃত্ব দেন। শেখ আজিজ, শাহ মোয়াজ্জেমসহ আর কেউ কেউ নেপথ্য থেকে এই প্রস্তাব চাঙ্গা করেন। অবশ্য আলোচনার পর এই প্রস্তাব নাকচ করা যায়।

যুদ্ধকালে তাজউদ্দিন ভাইকে ঘায়েল করার জন্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল কম চেষ্টা করে নি। এইসব প্রচেষ্টা অনেক সময় সামগ্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন কিছু বলা সম্ভব হতো না, তখন তাকে উচ্চভিলাষী রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। সে সময় কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু কে ধরিয়ে দিয়ে ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে ভারতে এসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন।

তাজউদ্দিন ভাই বহুদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুকেই তার জীবনের একমাত্র নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসব ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। সহকমীর্দের মাঝে কাউকে খুঁজতেন তার এই ভার বইতে। মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে কখনোই অভ্যস্থ ছিলেন না। তাই তাকে অনেক কষ্ট ও বেগ পেতে হয়েছে। কর্তব্যে অটল, নীতিতে দৃঢ়, কঠিন প্রত্যয় নিয়ে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার চারিত্রিক গুনাবলিকে তার সংস্পর্শের লোকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব, মিসেস গান্ধী, সরকারি কর্মচারী, সামরিক কর্মচারী, বিএসএফ থেকে বিভিন্ন এজেন্সী, সবাই মুগ্ধ ছিলেন। এদের সকলের সম্মান অজর্ন করতে তিনি সক্ষম হন। গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্ব তাজউদ্দিন ভাই-এর মত চরিত্রের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। দলের অভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্র সত্বেও আমাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিপুল অংশ তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। তিনি একজন বড় নেতা ছিলেন। তাঁর চিন্তাকর্ম ও ভাবধারার সাথে দলের ও ক্যাবিনেটের খুব কম লোকেরই মিল ছিল। ক্যাবিনেটের মধ্যে মনসুর ভাই ও হেনা ভাই একাগ্র মন নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। তবে, তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবী কম-বেশী যাই হোক না কেন, সমান থাকার কারণেই এরা একাত্ম হতে পারে নি।

ইয়াহিয়ার কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন চলছে। এই বিচারের বিরুদ্ধে আমরা বিদেশে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমরা বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের চিঠি পাঠিয়েছি। লণ্ডনে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে চিঠি লিখে তাকে জানাই সেখানে বাংলাদেশ কমিটির সাথে যোগাযোগ করে জেনেভা কনভেনশনের চার নং ধারা মতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা। কোন যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্মুখ সমরে যারা লিপ্ত, তাদের গ্রেফতার ও বিচারে জেনেভা কনভেনশনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর বিচার আইনসিদ্ধ ছিল না। পাকিস্তান জেনেভা কনভেনশন মানতে বাধ্য থাকায় এই মর্মে কোন ব্রিটিশ নামী কৌসুলির একটি মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক।   
  
তাছাড়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শন ম্যাকব্রাইডের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ লিখিত মতানুযায়ী জেনেভাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে এই ব্যাপারে আমরা আবেদন করতে পারি। ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরী পৃথক পৃথক ভাবে লিখে জানান, এ ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাইকে এসব অবহিত করার পর তিনি আনন্দিত হন। পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী হিসেবে এ ব্যাপারে খন্দকার মোশতাকের মত নেয়া প্রয়োজন। তাজউদ্দীন ভাই আমাকে খন্দকার মোশতাকের সাথে দেখা করতে পাঠান। মোশতাক সাহেব তাঁর পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করতে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরও কিছু লোক তাঁর সাথে গল্প-গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তাঁর এ বক্তব্য আমি কোন দিন ভুলতে পারবো না। তিনি বলেন, “You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence, you can’t have both.”

*-(অনুবাদঃ তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তোমরা কী চাও, স্বাধীনতা না শেখ মুজিব? দু’টা একসাথে পাবে না)*

আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, “We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete.”

-*(অনুবাদঃ আমরা দু’টোই চাই। শেখ মুজিব ছাড়া স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতা ছাড়া শেখ মুজিব, দু’টোই অপূর্ণ)*

আমি বুঝলাম, তাঁর মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পিছনে একটা যোগ-সূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরণের ব্ল্যাক মেইল বলে আমার মনে হলো। আমি যে উদ্দেশ্যে গিয়েছি, মোশতাক সুকৌশলে যে তা এড়িয়ে গেলেন, তা বুঝতে আর বাকি রইলো না। খুব বিরক্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে তাজউদ্দীন ভাইকে সব জানালাম।   
  
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি এ ব্যাপারে ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরীকে চিঠি লিখি। ম্যাকব্রাইড ও মিঃ চৌধুরী আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে পাক সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জেনেভা কনভেনশনের চার নং আর্টিকেলে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা উল্লেখ না থাকায় আমাদের কোন পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইয়াহিয়া সরকার এর গুরুত্ব উপলদ্ধি করেন। ম্যাকব্রাইড পরে ইসলাবাদ গিয়ে আমাদের পক্ষে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন সময় বিদেশ থেকে নানা ধরণের লোক প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসতেন। অনেকের সাথেই তিনি দেখা করতেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিজে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি আমাকে পাঠাতেন।

এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুস্তাভ পাপানেক কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে প্রাথমিক আলোচনার জন্য তাজউদ্দীন ভাই আমাকে প্রেরণ করেন। একটি হোটেলে তাঁর সাথে আমি দেখা করতে যাই। তাঁর সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই। পাপানেক বলেন, “সি.আই.এ. বাংলাদেশের আন্দোলনের পক্ষে নয়। হোয়াইট হাউজের মত পাল্টাতে হলে আগে সি.আই.এ. এর মত পাল্টাতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রয়োজন। মার্কিন প্রশাসন, বিশেষ করে সি.আই.এ.-এর মত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তরে আমি জানাই, একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তাও আমি বুঝতে পারি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন খোলা-মেলা ব্যাপার। এর মধ্যে কোন আঁতাত বাঁ ষড়যন্ত্রের চিহ্ন নেই। তাছাড়া, সি.আই.এ.-এর মত একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের কোন বক্তব্য থাকলে, বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খোলাখুলি উত্তর পেতে পারেন।

পাপানেকের প্রস্তাব নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। তবুও প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তাঁকে চূড়ান্ত কথা জানাবার প্রতিশ্রুতি দেই। তাঁর প্রস্তাব শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সফর কিংবা সি.আই.এ.-এর সাথে সাক্ষাৎ কোনটাতেই তিনি রাজী নন। আমি প্রধানমন্ত্রীর জবাব পাপানেককে জানাই। আমার জানা মতে একমাত্র বিদেশী ব্যক্তিদের মধ্যে পাপানেকের সাথেই প্রধানমন্ত্রী দেখা করেননি। প্রফেসর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পক্ষে কাজ করেন।

ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। ব্রিটিশ জনমত গড়তে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। শোরের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত, মানবিক দিক, বাস্তুহারা সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এই সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ও আমি উপস্থিত ছিলাম। শোর ও ডোনাল্ড উভয়েই প্রধানমন্ত্রীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। পরে শোর সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতামত ব্রিটেন ও ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

ব্রিটিশ এম.পি. মাইকেল বার্নসের সাথে দেখা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। স্থানটা ছিল চব্বিশ পরগণা পার হয়ে বাংলার মাটিতে। তিনটি টুল ছিল। এগুলো অনায়াসে হাতে বহন করা যায়। পাশে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সামরিক টেলিফোন সেট। কিছু দূরে নদীর ওপার থেকে গোলা-গুলির আওয়াজ আসছে। এমনি করে টাইমস পত্রিকার নামী সাংবাদিক হেজেল হার্টসের সাথেও সাক্ষাৎ হয়।   
  
সেপ্টেম্বর মাসের শেষা-শেষি আমাদের সুখবর আসতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। আঁদ্রে মালরো থেকে শুরু করে তরুণ বিটলস এবং ইহুদি মেনহুইন থেকে পন্ডিত রবি শঙ্কর, কৃশকায় পপসিঙ্গার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন।   
  
এছাড়াও বাংলাদেশের উপর গান রচনা ও রেকর্ড হয়ে আসছে। বিদেশী বন্ধুরা টাই পরে এসেছেন, তাতে বাংলাদেশের ছবি। বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর অন্তরে।   
  
ইতিমধ্যে নানা রকম পরিকল্পনা এসেছে। ভারত বিরাট ও ব্যাপক দেশ। নানা ধর্ম ও বর্ণের লোক এখানে বাস করে। ভারত সরকারও একটি বৈচিত্র্যময় সরকার। মিসেস গান্ধী তাঁর নিজস্ব পরকল্পনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছেন। অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর কাছে বহু প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো তিনি কিভাবে দেখছেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু, আমরা দূর থেকে দেখে যা বুঝেছি, দিল্লী থেকে বিভিন্ন এজেন্সী কাজ করতো। ভারতীয় বিশেষ মন্ত্রণালয় কলকাতায় অফিস খোলে। মিঃ রায় ও মিস অরুন্ধতী এই অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। অপর একটি এজেন্সী ছিল ‘র’। এর পক্ষ থেকে লিয়াজোঁ করতেন মিঃ নাথ।

পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে হৃদরোগে তিনি মারা যান। মিঃ নাথ ছিলেন বাঙালি সুপুরুষ, ধীর-স্থির ব্যক্তিত্ব। সচরাচর গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের থেকে তিনি পৃথক ছিলেন। এছাড়া তিনি বি.এস.এফ.-এর কর্মকর্তা। ইস্টার্ন সেক্টর কমান্ডার গোলক মজুমদার প্রথম থেকেই সর্ব বিষয়ে আমাদের দেখা-শুনা করতেন। ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল সরকার আমাদের কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দিল্লী থেকে লিয়াজোঁ করার জন্য কেউ কেউ কলকাতায় থাকতেন।   
  
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতা সাত্তার সাহেব আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দিল্লী থেকেও অনেকে আসতেন। প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আমাকে ন্যস্ত করেন। কিন্তু, রাজনৈতিক যোগাযোগ কখনোই সফল রূপ নিতে পারে নি। তবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এটা খুবই কার্যকরী হয়। কিন্তু নীতিগতভাবে এই লিয়াজোঁর খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। এমনি বিভিন্ন মহল ও এজেন্সীর সাথে সমন্বয় করতে একটি মূল সূত্রের অভাব সর্বদা লক্ষ্য করেছি। ফলে অনেক সময় যোগাযোগের অভাব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়। মিঃ ডি.পি. ধরের দিল্লীতে আসা পর্যন্ত এই বিভ্রান্তি বিরাজ করছিলো। ডি.পি. ধর ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেন। মিঃ ধর যদি মিসেস গান্ধীর পক্ষে থেকে কাজ করতেন, তাহলে হয়তঃ বহু ভুল বুঝা-বুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। দিল্লী সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী, তাদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তাদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার মনোভাব। ফলে, সামগ্রিক উদ্দেশ্য অনেকবার বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। ডি.পি. ধরের সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও ডি.পি. ধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।   
  
শামসুল হককে দিল্লীতে আমাদের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়। শাহাবুদ্দিন প্রথম থেকেই পাক দূতাবাসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমাদের সাথে চলে আসেন। একই সাথে দূতাবাসের প্রেস এটাচীও আসেন। এদের সাথে প্রথম থেকেই আমাদের যোগাযোগ হয়। প্রথমবার দিল্লী গিয়েই তাদের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে অফিস করার ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করি। পরবর্তীকালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে আসার পর দিল্লীতে অফিস স্থাপনে সক্ষম হই। অক্টোবরের শেষ দিকে মিসেস গান্ধীর সাথেও বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগামী শীতেই বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলতে গেলে, অক্টোবর থেকেই আমরা ভারতের স্বীকৃতির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকি।

১৫ই অক্টোবর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে স্বীকৃতির জন্য পুনঃরায় অনুরোধ করেন। সেই চিঠিতে এটাও দাবী করা হয় যে, বাংলাদেশের অর্ধেক ভূ-খণ্ড মুক্তিবাহিনীর দখলে ও বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সেখানে চালু আছে। এই চিঠির সূত্র ধরেই ১৫ই নভেম্বর অন্য একটি চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, স্বীকৃতির অনুরোধ, তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ছিল। এই চিঠি লেখা হয় মিসেস গান্ধীর ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে। ২৩শে নভেম্বর অপর একটি চিঠি লেখা হয় তাঁর সফর শেষে ।   
  
এই চিঠিতে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও বিশ্ব জনমতের প্রতি ইয়াহিয়ার চরম উপেক্ষার কথা বলা হয়। এই চিঠিতে আরও ছিল শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থার কথা। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা শীতের আগে দেশে ফিরে যেতে না পারলে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এক চিঠিতে জানান, বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকলেও পাক হানাদাররা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হামলা করে সম্পদ ধ্বংস করছে। জবাবে ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সহযোগিতার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের বন্ধুসুলভ সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও বেসামরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পাক-ভারত যুদ্ধের ডামা-ডোল বেজে উঠলো । স্বভাবতই বোঝা গেলো পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চাচ্ছে ।   
  
এসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতীয় সমর শক্তির সরাসরি যুদ্ধে অবতরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে এক জরুরী আবেদনে বলেন, বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেন বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। আবেদনে আরও বলা হয়, একটি যৌথ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং এই বাহিনী দু’দেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর, বাংলাদেশ যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখনই ভারতীয় বাহিনীকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লী থেকে ডি.পি. ধর কলকাতায় আসেন। থিয়েটার রোড থেকে অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে ডি.পি. ধরের দু’দিনব্যাপী আলোচনা হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় পারস্পারিক সমঝোতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।   
  
৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেয়ার এটা ছিল যথোপযুক্ত সময়। হানাদার বাহিনী তখন সেনানিবাসের ভেতরে আবদ্ধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে পারলেই দেশে যাওয়া সম্ভব।   
  
সীমান্তের ভেতরে-বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের তখন উল্লাস দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে। প্রধানমন্ত্রী কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেন, তোমরা জানতে চাচ্ছো আমি কেমন আছি? সন্তানের জন্মের কথা জনক না জানলে তাঁর মর্মব্যাথা তোমরা বোঝ? আমি একটি ধাত্রির কাজ করেছি মাত্র। বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর তাঁর জনক রয়েছেন হানাদারদের কারাগারে। জাতির জনক হয়তঃ কিছুই জানেন না। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় তাজউদ্দীন ভাই কেঁদে ফেলেন। তিনি অবিলম্বে জাতির জনককে মুক্তি দেয়ার দাবী করেন।

৭ই ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাসের পতন হয়। এরপর আমি বেশীরভাগ দিন কাটিয়েছি অগ্রগামী দলের সাথে।   
  
আমি যশোরে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য রওয়ানা হই। পরদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যাবেন। অগ্রগামী দলে আমি ও মুস্তফা সারওয়ার ছিলাম। পথে পথে মানুষের বিপুল উল্লাস। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে চলছে। চারদিকে এই অস্ত্র দেখে সারওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে তো?  
  
যশোর সার্কিট হাউজে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে অস্ত্র জমা দেয়া হলো। পথে দেখলাম, ট্রাক ভর্তি করে হানাদার বাহিনীর সদস্যদের নেয়া হচ্ছে। জনগণ এদের মেরে ফেলতে চায়। বহু সাবধানে ও কড়া পাহারায় এদের ভারতে নেয়া হয়।   
  
ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর অতি দ্রুত পুল-কালভার্ট মেরামত করে দেয়। কোথাও বেইলী ব্রিজ তৈরী করে দেয়া হয়।

বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ছিলে মুস্তফা সারওয়ার। রওশন আলীসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমরা বেনাপোল সীমান্তে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধামন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আমি ও মুস্তফা সারওয়ার সার্কিট হাউজের কক্ষে সামরিক অফিসারের ব্যবহৃত পিস্তল ও কাপড়-চোপড় পাই।

সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসা শুরু করেছে। সর্বস্তরের মানুষ আসছে কে কার আগে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে। শিল্পী মুস্তফা আজিজ বলেন, তিনি আমার একটি স্কেচ করবেন। তাঁর ভাই মুস্তফা মনোয়ার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন।   
  
স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি আসলো। হাজার হাজার মানুষ ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার আহবান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে কলকাতা ফিরে আসি।

-ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম

জুন,১৯৮৩



[কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ (ইশরাত কনক)](https://www.facebook.com/israt.kanak.7?fref=ts)

<১৫,১০,১১০-১৩>

# [মৌলভি আসহাবুল হক]

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের পর আমরা গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করি। চট্রগ্রামের এম, এ, হান্নান ও এম, এ, মান্নান সাহেব এবং পটিয়া জেলার আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে থাকি। এদিকে আনুমানিক ২১/২২ শে মার্চ তারিখের রাতে পাক বাহিনী হঠাৎ করে চট্রগ্রাম নেভাল বেইস-এর শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। আমরা এর প্রতিবাদে মিছিল বের করলে পাক বাহিনী বাধা দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে তিনজন পাক সেনা নিহিত হয় আর আমাদের পক্ষেও কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। মূলত: এই ঘটনার পর থেকেই পাক বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় আমাদের প্রধান কেন্দ্র ছিলো স্থানীয় রেস্ট হাউজ। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এম, এ, হান্নান, এম, এ, মান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী, ছাত্র নেতা ইউসুফসহ আমরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করি।

২৬ শে মার্চ সকাল ৮ টায় আমরা ঢাকার সংবাদ জানতে পারি। পটিয়ায় এসে দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য। ডা: ফারুক কয়েকজন ইপিআর নিয়ে কাপ্তাই চলে যান এবং কয়েকজন পাঞ্জাবী সৈন্য হত্যা করে পুনরায় পটিয়া চলে আসেন। পাঞ্জাবী সৈন্যরা যাতে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য প্রতি রাস্তার মোড়ে চেকপোস্ট বানানোর ব্যবস্থা করে আমি ২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্রগ্রাম শহরে চলে যাই। রেস্ট হাউজে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীর সাথে আলোচনা করে সমগ্র শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করি এবং ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করি। কয়েকজন পলায়নপর পাঞ্জাবীকে ধরে হত্যা করা হয়। ঢাকা হতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য চট্রগ্রাম আসে এবং কুমিরাতে আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। কিন্তু তারা টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশ্য দুদিন পরই সমগ্র শহর পাক বাহিনীর আয়ত্তাধীনে চলে যায়।

এরপর আমরা পটিয়াতে চলে আসি। তখন পটিয়াই ছিলো আমাদের প্রধান কেন্দ্র। ডা: মান্নান, প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মেজর জিয়া ও আমি বেতারের ট্রান্সমিটার এনে পটিয়া মাদ্রাসায় স্থাপন করি। এখান হতে মেজর হারুনের নেতৃত্বে আমরা হানাদারদের মোকাবেলা করি এবং ১২/১৪ দিন যুদ্ধ চলে। এ সংঘর্ষ চলাকালে আমি প্রধান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অসংখ্য লাশ দেখতে পাই। পাক বাহিনী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফেরার পথে একটি পাক বাহিনীর গাড়ি আমাকে উঠিয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিন্তু জনৈক মেজর জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে ছেড়ে দেয়। দু'দিন শহরে থাকার পর আমি পটিয়া চলে আসি। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হারুন আহত হলে তাকে চিকিৎসার জন্য চিরিঙ্গা পাঠানো হয়। এরপর আমি পটিয়া ক্যাম্পে কাজ করতে থাকি। ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল আটটায় নিজ বাড়িতে যাই। এদিন দুপুর পর্যন্ত বিমান থেকে গুলি চালানো হয়। এর ফলে পশ্চিম পার্শ্বের মোড়ে কতগুলো দোকান ধ্বংস ও বেশ কিছুসংখ্যক লোক নিহত হয়। স্থানীয় মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাসার দু'জন মৌলভী ও কিছুসংখ্যক ছাত্র মারা গিয়েছে। কলেজেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

বিজ্ঞান ভবনের পূর্বপাশে পটিয়া থানার সংগ্রাম পরিষদ নেতা অধ্যাপক ফজলুল করিম ও আরো কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়। ঐ দিন কালুরঘাট হতে পটিয়া পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা বাহিনী ছিলো সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। আমি আশেপাশের যুবকদের একত্রিত করে আলাপ আলোচনা করি। এর পরের দিন একটা গ্রেনেড নিয়ে শহরে গমন করি এবং বিকেল তিনটায় বাসায় উপস্থিত হই। হানাদার বাহিনীর কয়েকটা ট্রাক তখন চকবাজারের দিকে যাচ্ছিল। রাত সাতটার দিকে স্টীম লন্ড্রির ছাদ থেকে আমি একটা ট্রাক লক্ষ্য করে গ্রেনেডটি ছুঁড়ে মারি। ট্রাকটি কয়েকজন হানাদার ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। আমি ঐ ছাদেই শোয়া অবস্থায় ছিলাম। অন্যান্য ট্রাক হতে পাক সৈন্য রাত একটা পর্যন্ত গুলি চালায়। আশপাশের সব দোকান পুড়িয়ে দেয়। তারা সরে পড়লে আমি অতি গোপনে হাঁটতে হাঁটতে সকালে পাথরঘাটা পৌঁছি। দুইদিন দুইরাত হেঁটে মিরেরশরাই পৌঁছি। তারপর অতি কষ্টে ২১ শে এপ্রিল শ্রীকান্ত সীমান্ত পার হই। সেখানে মিরেরশরাই-এর এম পি মোশাররফ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এর পরের দিন ছাগলনাইয়ার প্রাক্তন এম এন এ ও সাবেক পটিয়া কলেজের অধ্যক্ষের সংঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পরের দিন বাসে করে বেলুনিয়া যাই। সেখানে পাক বাহিনী ও আমাদের বাহিনীর সঙ্গে যে সংঘর্ষ চলছিলো তাতে আমি অংশ নেই। দুজন আহত ইপিয়ার কে নিয়ে বেলুনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে সাবরুমে যাই। সেখানে এম, এ, হান্নান, এস, এম, ইউসুফ, মির্জা মনসুর, স্বপন কুমার চৌধুরী, চট্রগ্রাম জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি হাসেম, চট্রগ্রাম কলেজের ভিপি জামালউদ্দিন এবং সাবের আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের সাথে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বাংলাদেশ হতে যুবকদের এনে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। সিদ্ধান্ত মোকাবেক আমরা উপস্থিত কয়েকজন লোক এবং কয়েকজন ই, পি, আর নিয়ে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। এ ক্যাম্প পরিচালনার জন্যে হাসেম, মন্টু, মহিউদ্দিন ও আমি রইলাম। বাকি কয়েকজন আলাপ আলোচনার জন্যে আগরতলায় চলে গেলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো কিছুসংখ্যক লোক এসে আমদের এই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেন। এ সময় আগরতলা থেকে এস, ডি, ও ও আরো কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা আগমন করলে তাদের সাথে পরামর্শ করে রেশনের ব্যবস্থা করি।

কিছুদিন এভাবে ক্যাম্প চললো। কিন্তু ভারতে আগমনকারী বাঙালিদের মধ্যে সবাই শরণার্থী হিসেবে আসতো। ট্রেনিং নেয়ার লোকের অভাব উপলব্ধি করে আমি চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রামের ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগ কর্মীদের তালিকা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। প্রায় ১ মাস ১৭ দিন পায়ে হেঁটে চট্রগ্রাম জেলার মিরেরশরাই থানা হতে টেকনাফ ও পার্বত্য চট্রগ্রামের রাঙ্গামাটি, মাইওনী ও ফটিকছড়ি থানায় ঘুরে ঘুরে সকল কর্মীর ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার সংবাদ দেই। এর মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র মৌলভী সৈয়দ আহমেদ ও শাহজাহান ইসলামাবাদী ছোট ছোট আক্রমণ পরিচালনা করছেন। ১ মাস ১৭ দিনের ভ্রমণের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র নিয়ে পটিয়া তহশীল অফিস, ষোলশহর তহশীল অফিস, আনোয়ারা থানা তহশীল অফিস ও আরো কয়েকটি তহশীল অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। প্রফেসর নূর মোহাম্মদ ও ওবায়দুল্লাহ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে আমি হরিণা ক্যাম্পে যাই। এর মধ্যে কয়েকজন যুবককে আমি ভারতে পাঠাই। কিন্তু পথিমধ্যে মিজো ও পাঞ্জাবীদের দ্বারা আক্রমণে হারুন ও ফরিদ নামক দুজন যুবক নিহত হয়। বাকী যুবকরা ভয়ে ফিরে আসে। বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে কিভাবে যুবকদের ভারত নিয়ে যাওয়া যায় সে জন্যে মেজর রফিক, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন মাহফুজ, এম, এ, হান্নান, সাবের, ইউসুফ, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনা সভা বসে। এই আলোচনার পর মেজর রফিক আমাকে চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রামসহ প্রতিটি থানার মানচিত্র নেয়ার দায়িত্ব দেন। কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি হতে সমগ্র চট্রগ্রামের মানচিত্র সংগ্রহ করি। প্রত্যেক সি ও এর কাছ থেকেও মানচিত্র সংগ্রহ করি এবং লোক মারফতে ওপার বাংলায় মেজর রফিকের কাছে প্রেরণ করি। এ সময় আমার খালুর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফেরা করি এবং অনেক পাক সৈন্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন বিগ্রেডিয়ার অফিসে ঢুকে দুটো আর্মী ম্যাপ সংগ্রহ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

এর কয়েকদিন পর দক্ষিণ চট্রগ্রাম থেকে ৪৪/৪৫ জন ছেলে এবং উত্তর চট্রগ্রাম থেকে ৪০/৪৫ জন ছেলে সংগ্রহ করে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করি। আমিও ভারতে চলে আসি। সঙ্গে আনা আর্মী ম্যাপটা মেজর রফিককে প্রদান করি। যেসব ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্য এসেছিল তাদের প্রতি সাতজনের একটি গ্রুপ করে মোট ৩৬ টি গ্রুপ তৈরি করি। প্রত্যেক গ্রুপে একজন কমান্ডার ছিল। তারপর মেজর রফিকসহ চট্রগ্রামকে কেন্দ্র করে তিনটি চ্যানেল খোলা হয় এবং কয়েকজন গাইড নিযুক্ত করা হয়। ফটিকছড়ির দায়িত্ব দেয়া হলো জহুরুল হককে এবং মিরেরসরাই এর দায়িত্ব দেয়া হলো নূর মোহাম্মদকে। তিনজন গাইড নিযুক্ত করা হলো এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ হতে একজন করে কুরিয়ার নিযুক্ত করা হল। প্রত্যেক গ্রুপকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয় এবং সমস্ত গ্রুপের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হলো সার্জেন্ট এ, এইচ, এম মাহি আলম চৌধুরীকে। তারপর সবাইকে শপথ গ্রহণ করানো হলো। মেজর রফিকুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এনাম, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট সুলতান, হান্নান, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ, রফি সাহেব, সাবের সাহেব, আজগরী, জালালউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবর্গ এখানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস বানচালের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ৩রা আগস্ট আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। প্রথমে পাগলাছড়িতে মিজোদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এতে বেশ কয়েকজন মিজো মারা যায় এবং বাকি মিজোরা পালিয়ে যায়। রাজবাড়ীতে পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ১৩ জন পাঞ্জাবী ও ২ জন মিজো মারা যায় এবং একটা জীপ ধ্বংস হয়। তৃতীয় সংঘর্ষ হয় ফটিকছড়ির বিবিরহাটে। উক্ত সংঘর্ষে সাত জন পাঞ্জাবী ও ১৪ জন মুজাহিদ মারা যায়। পাঞ্জাবীরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাউজান কলেজের সামনে চতুর্থ সংঘর্ষে ৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। দুটি চাইনিজ স্টেন, তিনটি চাইনিজ রাইফেল, ৫ টি বেয়নেট এবং এক পেটি গুলিও আমরা পাই। পঞ্চম সংঘর্ষ হয় গোমদণ্ডী স্টেশনে। এই সংঘর্ষে ৪০/৪৫ জন রাজাকার নিহত হয়। হাবিলদার ফজলুও নিহত হন। কয়েকজন রাজাকারের বাড়িও পুড়িয়ে দেয়া হয়। সারোয়াতলীতে সপ্তম সংঘর্ষে ৩৫ জন রাজাকার নিহত হয়। ২০ টি রাইফেল, একটি এল, এম, জি, তিন পেটি গুলি আমরা উদ্ধার করি।

১৪ই আগস্টকে বানচাল করার জন্য আমরা ১৩ ই আগস্ট পতেঙ্গা থেকে মদুনাঘাট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশনের টাওয়ারগুলো নস্ট করে ফেলি। ঐদিন রাতে আমরা বিভিন্ন স্খানে ৩৬ টি মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শক্রর উপর আঘাত হানি। একই রাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেমন: পাহাড়তলী পাঞ্জাবী ক্যাম্প, দেওয়ানহাটের ক্যাম্প, চকবাজার ক্যাম্প, লালদীঘির পশ্চিমের স্খান, চাকতাই ক্যাম্প, কালুরঘাট ক্যাম্প, দোহাজারী ও পটিয়া ক্যাম্প, বিবিরহাট ক্যাম্প, রাউজান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্প গেরিলা পদ্ধতিতে অপারেশন চালাই। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ঐ রাত্রে বিভিন্ন অপারেশনে ১২৫ জন পাঞ্জাবী, ২৩০ জন রাজাকার মারা যায়। ফলে পাঞ্জাবী, রাজাকার ও দালালরা গ্রাম ছেড়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও থানাগুলোতে আশ্রয় নেয়। দিনের বেলা তারা বিরাট দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতো এবং মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এই পরিস্থিতিতে আমরা পাক বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করি। একদিন ভোর সাড়ে চারটায় আমরা থানা আক্রমণ করি। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাক সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রায় ২০০ জন পাঞ্জাবী ও রাজাকার মারা যায় এবং থানার বহু পুলিশ ও রাজাকারকে আমরা আটক করি। বেশির ভাগকে হত্যা করা হয়। থানা থেকে ২০ পেটি বুলেট, ২৫০ টি রাইফেল, তিনটি এল, এম, জি উদ্ধার করি। এখান থেকে আমরা খরনা রেলওয়ে স্টেশনে রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। কিছু সংখ্যক রাজাকার নিহত হয়। বলঘাট মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং ১৪ জন মিলিশিয়া নিহত হয়। ৩টি চাইনিজ স্টেন, ৫টি চাইনিজ রাইফেল, ৫টি রাইফেল, ৩ হাজার বুলেট ও ২ টি রিভালবার উদ্ধার করি। কদুরখিল(?) গ্রামের রাস্তায় আমরা বেশ কয়েকটি রাইফেল উদ্ধার করি। সার্জেন্ট আলমের পায়ে গুলি লাগলে আমরা কমলাছড়ি পাহাড়ে আশ্রয় নেই। তখন গ্রুপ কমান্ডার মহসীন, শাহজাহান ইসলামাবাদীও আমার সঙ্গে ছিলেন।

কমলাছড়িতে মোস্তাক আহমদ ও পটিয়া থানার আনসার কমান্ডার আবদুল আলীমের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে আমি একটি বৌদ্ধমন্দিরে অবস্থান করি। সেখানে ই পি আর বাহিনীর সুবেদার মেজর টি এম আলী এবং তার অধীনে ১৫০-২০০ জন ই পি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান ছিলেন। কিন্তু সুবেদার আলী আমাকে বন্দী করে রাখেন। অবশ্য তিনদিন বন্দীর পর মেজর রফিকের সুপারিশপত্র পেয়ে টি এম আলী আমাকে ছেড়ে দেন।

কমলাছড়ির বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থানকালে আমি ধোপাছড়িতে মোখলেসুর রহমান, সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরী পটিয়ার এম সি এ-এর নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক ই পি আর ও স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের দুটি গ্রুপ নিয়ে অবস্থানের সংবাদ শুনি। তাজউদ্দিন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কুসুমপুরীকে ভারতে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি কমলাছড়িতে ফিরে আসি। সার্জেন্ট আলমকে চিকিৎসার জন্য কমলাছড়িতে রেখে আমি শাহজাহান ইসলামাবাদী, মহসীন আবুল হোসেন প্রমুখদের নিয়ে পটিয়ার দিকে আসি। পটিয়ার রেলস্টেশনের কাছে রাজাকার ঘাঁটিতে আমাদের সঙ্গে রাজাকারদের সংঘর্ষ বাধলে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। সেখান থেকে তিনটা রাইফেল, একটা এল, এম, জি, তিনটা মাইন উদ্ধার করি। তাছাড়া প্রায় ৩ হাজার গুলিও আমরা পাই। অপারেশন শেষ করে একটা দলসহ আমি আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করি কিন্তু আমরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার একদিন পর পাকসেনার গৈরিলা গ্রামখানা জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া বলঘাটে রাজাকার মুজাহিদ ও পাক ফৌজ অকথ্য অত্যাচার চালায়। বলঘাটবাসীদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমরা তাই বলঘাট রেলওয়ে স্টেশনের পাঞ্জাবী ঘাঁটি আক্রমণ করি। স্টেশনে আগত শেষ ট্রেনটি আমরা যাত্রীদের নামিয়ে পুড়িয়ে দেই। তারপর ঘাঁটির উপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করি। পাক ফৌজের ঘাঁটি থেকে আমরা জি-৩ গান, ২৭ টা স্টেনগান, ৩ টা এল এম জি, ১১ টি রাইফেল, ৩ টি রিভলবার ও ৭ হাজার গুলি উদ্ধার করি। এখান থেকে নিজ গ্রামে যাই। গ্রামের কয়েকজন দালাল পটিয়া থেকে পাঞ্জাবী ডেকে গ্রামখানা ঘেরাও করে। আমরা পালিয়ে যাই এবং আরাকান রোডের পাশে গোপনে অবস্থান নেই। পাকবাহিনী সে পথে যাওয়ার সময় আমরা গুলি করি। এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং বাম হাতে গুলি লাগলে আমি আহত হই। সার্জেন্ট আলম এ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। এ আক্রমণের পর আমরা পটিয়ার জিরি গ্রামে চলে যাই। জিরি গ্রামে এসে দেখতে পেলাম পশ্চিম আনোয়ারা থানার গ্রামাঞ্চলে রাজাকার, আলবদর ও পাকফৌজের নিদারুণ নির্যাতনে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তখন সার্জেন্ট আলম সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পটিয়ায় অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা নেই। এ সময় ভারত থেকে ৪০ জনের একটি ফ্রগম্যান গেরিলা বাহিনী মেজর রফিক ও এম এ মান্নান সাহেবের দু'খানা পত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা চর লইক্ষ্যা চাকতাই হতে পতেঙ্গার বঙ্গোপোসাগরের মোহনা পর্যন্ত যেসব স্টিমার ও জাহাজ ছিল সেগুলো মাইন দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা মোতাবেক ফ্রপম্যানদের দিয়ে মাইন লাগিয়ে স্টীমার ফাটিয়ে দিলে পাকবাহিনী বেপোরোয়া ভাবে গুলি চালায়। আমরাও এর জবাব দেই। এভাবে ১১ দিনে আমরা ৫টি জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম হই।

স্বাক্ষর/-

হাফেজ মৌলভী আসহাবুল হক

গ্রামঃ নাইখাইল, ডাকঘরঃ গৈড়লা

পটিয়া, চট্টগ্রাম

মে, ১৯৭৩



[তাজমুল আখতার](https://www.facebook.com/tajmul42?fref=ts)

<১৫,১১,১১৩-২১>

# [এ, এম, এ মুহিত]

নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালিরা সংগঠিত হতে থাকে। নিউইয়র্কের ‘ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা’ ঘূর্ণিঝড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা নিয়ে কথা তুলে আর বাঙালিদের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হয়। কাজী শামসুদ্দীন আর ডঃ আলমগীর মার্চ মাসে স্বাধীনতার দাবি উঠান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের নালিশ করেন আর জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যা শুরু হলে এই লীগ নাম পরিবর্তন করে এবং জুন মাস পর্যন্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি ভূমিকা পালন করে। ২৫শে পরে মার্চের শহরে শহরে লীগের শাখা গড়ে ওঠে তবে তাঁরা সকলেই নিজস্ব কার্যক্রম অনুযায়ী এগুতে থাকে। সমন্বিত সংগঠন গড়ে উঠতে কয়েকমাস চলে যায়। তবে নিউইয়র্কের ‘লীগ অব আমেরিকা’ই বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে।

মার্চ মাসে যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং এর ফলে বাঙালিরা ও বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের অধিকার লাভ করবে। এখানে বলা দরকার যে, সামরিক বাহিনী বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এ রকম একটা আশংকা আমরা করেছিলাম। কিন্তু যখন আলোচনা শুরু হয় তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম।

২৫ তারিখ ভোর ৪টার দিকে আমেরিকা পররাষ্ট্র বিভাগের একজন বন্ধু আমাকে ফোন করে খবর শুনতে বলেন। আমার নিজের বাসায় রেডিও ছিল না তাই আমি গাড়ীতে গিয়ে রেডিও শুনি এবং ২৫শে মার্চের রাত্রির ঘটনা জানতে পারি। খবরটি শোনার পর একটি কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিলো এবং সেটি হচ্ছে ‘পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে’। দূতাবাসের অবস্থা কিছুটা অদ্ভুত ছিল কারণ আমরা দেশ থেকে সঠিক বা পুরো খবর পাচ্ছিলাম না। অতএব আমাদের প্রতিক্রিয়াও কিছুটা ভিন্ন হচ্ছিল। পাকিস্তানী কর্মচারীরা তখন বেশ হতবাক। তারা মোটেই জারিজুরি খাটাচ্ছিল না, বরং বলা যায় যে কিছুটা চুপচাপই ছিল।

২৯শে মার্চ সোমবার ওয়াশিংটনে বাঙালিদের একটি সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। কেপিটাল হিল, হোয়াইট হাউস, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সামনে এই সমাবেশ হয়। প্রায় দুইশত মানুষ আসে এবং এদের মধ্যে বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী এবং গবেষক ছিলেন। যথা জনাব সাফদার, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব রহিম , অর্থনীতিবিদ মহিউদ্দীন আলমগীর, শামসুল বারী, ডঃ ইউনুস এবং আরো বেশ কয়েকজন। এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে, এই সমাবেশ আয়োজনে দূতাবাসের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ন যেহেতু তারাই ফোনের মাধ্যমে বেশিরভাগ যোগাযোগ স্থাপন করেন। সমাবেশ শেষ করার পর আমার বাসায় প্রায় ৭০জন মিলিত হন এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর হিসেবে আমেরিকার সহকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মহলে আমার যোগাযোগ ছিল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এদের সঙ্গে আমার সংযোগগুলি আন্দোলনের পক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করবো। স্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্রেইগ বাক্সটার আমাদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি বহু তথ্য আমাদের দেন যেগুলো আমাদের আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠে। টাউনসেগু সোয়েজি এইড দফতরে বাংলাদেশ ডেস্ক এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাদের আন্দোলনের এমনই সমর্থন ছিলেন যে আমেরিকার নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। এছাড়া আরচার ব্লাড, যিনি ঢাকায় কনসান জেনারেল ছিলেন বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেসব তথ্য প্রেরণ করেন সেসব কাহিনী ওয়াশিংটনে প্রকাশ পেলে আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এপ্রিলের শুরুতে হারভার্ডের মাস্ন, মার্গলিন ও ডর্ফম্যান বাংলাদেশ সমস্যার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের স্বপক্ষে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মার্গলিন ও পরে ডর্ফম্যান আলমগীর মহিউদ্দীনকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কংগ্রেসে জোর তদবীর চালান । পয়লা এপ্রিল সিনেটর কেনেডী, সিনেটর মনডেল বাংলাদেশের স্বপক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন। আমার বেশিরভাগ সময় কাটত বিশ্বব্যাংক, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এইড, কংগ্রেস আর সংবাদপত্রের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনায়। আমি তাঁদের এটাই বুঝানোর চেষ্টা করতাম যে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান কোনদিনই এক হবে না এবং এটা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ পাকিস্তানকে হত্যাকান্ড বন্ধ করে বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে বাধ্য করা। আর এটা সম্ভব সাহায্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। কারণ পাকিস্তান যতই সাহায্য পাবে ততই সে তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাবে।

এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি আমার কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাই কিন্তু দূতাবাসের ব্যবস্থা এরপর পরিবর্তন হয়। এইসময় বাঙালি প্রতিরোধের শেষ কেন্দ্রস্থল ভেঙ্গে যাওয়ার পর পাকিস্তানীরা নিশ্চিত হয় যে তাদের পুরোপুরি পক্ষে চলে গেছে এবং তারা তখন আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

৮ই এপ্রিল ‘শাহীন’ এবং ‘ময়নামতি’ নামে দু’টি পাকিস্তানি জাহাজ থেকে কয়েকজন বাঙালি নাবিক পালিয়ে যান। তখন জাহাজগুলো বালটিমোরে অবস্থান করছিলো। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ সময় কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির জনাব গ্রিনোর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। তিনি তাঁদের উদ্ধার করেন এবং উকিলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন যিনি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

১৩ই এপ্রিল বিবিসির মাধ্যমে জাকারিয়া চৌধুরী ঘোষনা করেন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ থেকে আমরা অনুমান করি যে আন্দোলন এবার নতুন পর্যায়ে শুরু হবে। জাকারিয়া চৌধুরীর সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয় এবং তিনি দীর্ঘায়িত মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে উপদেশ দেন। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ যেতে পারে। ১৬ই এপ্রিলে সম্মেলনে আমি পাকিস্তানী প্রতিনিধি হিসেবে যাই এবং সেখানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার প্রচন্ড বাক বিতন্ডা হয়। এই বাক বিতন্ডার বিষয় ছিল তুরস্ক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান। এরপর তিনদিন পর আমাকে আমাকে এই সম্মেলন থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এক কথায় আমাকে যতদূর সম্ভব অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমি তবুও আমার কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আমি ১২ টার সময় বের হয়ে যেতাম এবং প্রায় চারটার দিকে অফিসে ফিরতাম। এই সময়টুকুতে আমি আমার যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যেতাম।

২৭শে এপ্রিল বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনমারার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। আমি পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের আবেদন জানাই। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের সহকারি পরিচালক গ্রেগিরু ভোটার সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতে থাকি। তিনি বাংলাদেশের বিষয়টি দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া ইউ এস এইডের মিঃ ডন ম্যকডোনাল্ড এর সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

১৩ই এপ্রিল দূতাবাসের কর্মচারী এবং আরো কয়েকজন চাঁদা তুলে হারুন রশীদকে কলকাতায় পাঠান সংবাদ সংগ্রহ এবং সঠিক অবস্থান জানতে। হারুনুর রশীদ বিশ্বব্যংকে চাকুরী করতেন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় গিয়ে মুজিব নগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এর সাথেও দেখা করেন। তিনি শপথ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। ফিরে এসে তিনি খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক খবর দিতে পারেন নাই। তিনি জানান, অবস্থা এখনো পরিস্কার না এবং আন্দোলনে ভারতের কাছ থেকে পূর্ন সমর্থন পাচ্ছে না। এসময় ‘আমেরিকান সোসাইটি ফর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ‘ল’ এর বার্ষিক অধিবেশনে গ্যাটলিয়ের ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। এই সম্মেলনে আমি যোগ দিই কিন্তু দূতাবাস অন্য একজন পাকিস্তানীকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে। এপ্রিল মাসে ২৬ তারিখে নিউইয়র্ক দূতাবাস থেকে মাহমুদ আলী বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। এমনিতেই তাঁর প্রতি পাকিস্তানী গোয়েন্দারা প্রসন্ন ছিলেন না যেহেতু তিনি সে বছর জাঁকজমকের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করেছিলেন। পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী সেই থেকে তাঁর পিছে লেগেই ছিল।

মে মাসের প্রথম পক্ষেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে । ৯ ই মে জনাব এম এম আহমেদ ওয়াশিংটন পৌঁছেন। ১১ই মে পাকিস্তান সমস্যার ওপর কংগ্রেসে ‘গ্যালাগার শুনানী’ শুরু হয় । ১২ই মে জনাব রেহমান সোবাহান একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেটি অত্যন্ত সফল হয় । এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনমত আমাদের আন্দোলনের পক্ষে আরো তীব্র হয়ে উঠে এবং প্রচুর প্রচার হয় । একই সময় দূতাবাসের সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব এ আর খান গ্যালাগার শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্য চাকুরীচ্যুত হন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লবী সংগঠিত ও জোরদার হয়ে উঠে। বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলে চাপ প্রয়োগ আরো তীব্র এবং ফলপ্রসূ হতে থাকে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটিই। তা হলো পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক এবং অন্যান্য সাহায্য বন্ধ করা।

জনাব এম এম আহমেদ ওয়াশিংটনে এসে কয়েকটি কাজ করার চেষ্টা করে। তিনি সব জায়গায় প্রচার করতে থাকেন যে অবস্থা যত খারাপ বলা হচ্ছে মোটেই ততটা খারাপ নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থন সর্বব্যাপী নয়, তাছাড়া বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান যে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান একান্ত প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা মার্চের ‘গন্ডগোলের’ কারনে খারাপ হয়ে গেছে। অতএব ঋণ শোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

জনাব এম এম আহমেদের সাথে পূর্বে থেকেই আমার আলাপ ছিল এবং তাঁর সাথে এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। সেখানে আমরা খোলাখুলি আলাপ করি । তিনি খোলাখুলি বলেন যে, নির্মম ও দুঃখজনক ঘটনা চতুর্দিকে ঘটেছে ব্যপকভাবে। সবার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং বাঙালিদের মনোভাব সহজ অনুমেয়। মার্চের ঘটনার পর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা সারানো সত্যিই সমস্যা হবে। তিনি আরো বলেন যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আসলেই আগ্রহী। তিনি একদল মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগের লোকজন খুঁজছেন এবং অবশ্যই ৬ দফাতে যতদূর মেনে নেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়াহিয়া খান আসলেই যা চেষ্টা করছেন তা কি করতে পারবেন। তিনি বলেন সে ব্যপারে নিশ্চিত কোন উত্তর দিতে পারছি না। সেটি একটি কঠিন সমস্যা বটে । এম এম আহমেদ আরো বলেন যে, মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চলছিল তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবগুলিই কার্যকরী কিনা। তিনি বলেছিলেন যে, প্রস্তাবগুলো কার্যকরী করা সম্ভব তবে সামান্য যৌক্তিকরণের প্রয়োজন আছে। যেমন প্রতিরক্ষার জন্য শিল্পখাত এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যপারে দুটি একাউন্ট তখনই সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে হতে পারে। বিদেশী সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রদেশভিত্তিক হওয়া উচিৎ না। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সাহায্যকারীর সাথে আলাপ শুরুর আগে ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন ও দাবীগুলো সম্পর্কে একমত হওয়া যেতে পারে ও তাঁর ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে । ইয়াহিয়া খান তাঁকে ভূট্টোর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। কিন্তু ভূট্টো কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়েই আলাপ করতে চান। তিনি বলেন তাঁর মতে ভূট্টো প্রস্তাবগুলি কোনমতেই মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। যদিও তিনি (এম এম আহমেদ) আমাকে জানান যে, ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারনাই ছিল না যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস , তিনি ঢাকা ত্যাগের আগেই তাঁর আভাস পেয়েছিলেন। ব্যাক্তিগত পরামর্শ হিসেবে তিনি আমাকে জানান যে দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিব হিসেবে কাজ করতে পারি।

মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার কংগ্রেসে ‘ফরেইন এসিস্টেন্স এমেন্ডমেন্ট’ প্রস্তাব পেশ করা হয়। সিনেটে স্যাক্সাবি-চার্চ প্রস্তাবে পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধ করার দাবী করা হয়। আর হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভে গ্যালাগার প্রস্তাবে একই দাবী উত্থাপন করা হয়। এদিকে দূতাবাসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। বহু লোককে চাকরীচ্যুত করা হচ্ছিল। আমরা দেশের কোন খবরই পাচ্ছিলাম না এবং আমাদের কোন কাজও করতে দেয়া হচ্ছিল না। বহু পাকিস্তানকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাঁরাই সব কাজ করতো। এ সময় দূতাবাসের উপ-প্রধান জনাব এনায়েত করিম হৃদ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

২৯ শে মে শনিবার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে নিউ ইয়র্কে আমার সাক্ষাত হয়। একই সময় জনাব এফ আর খানে নেতৃত্বে শিকাগোয় ‘ডিফেন্স লীগ অব বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটামুটি এ রকম চিন্তা করা হয় যে এই সংগঠনটি আমেরিকার বিভিন্ন বাঙালিদের সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। ওয়াশিংটনে ‘বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার’ও একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যেসকল আমেরিকান ডাক্তার কোন না কোন সময়ে কাজ করতেন তাঁরা এই সংগঠনে সুক্রিয় ছিলেন। সবার সাথে আলোচনার পর স্বিদ্ধান্ত হয় যে, মাহমুদ আলী (নিউ ইয়র্কে) গঠিত সংগঠনকে আর্থিক সাহায্যদান করা হবে এবং আমি কোন বাঙালি সংগঠনে ১৫ই জুন যোগদান করবো। ৬ই জুন শিকাগোতে জনাব এফ আর খানের বাসায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বাঙালি আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সবাই উপস্থিত হয়। এই সভাতেই ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে উল্ল্যেখ্যে যে, জনাব খানের বহু ইহুদী বন্ধু আর্থিকভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য করেন।

এই সভায় আমি কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করি। প্রথমটি হচ্ছে নিউইয়র্কে মাহমুদ আলীকে যে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল তা দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সদস্য বার বার দূতাবাসের কর্মচারীকে আনুগত্য প্রকাশের জন্য কিন্তু নিজেরা আমেরিকাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছদ্মনাম ব্যবহার করছিলেন। আমি প্রশ্ন করি যে তাঁরা যখন নিজেরাই ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন তাহলে কিভাবে আশা করেন যে দূতাবাসের কর্মচারীরা আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অবশ্য এখানে উল্ল্যেখ্য যে তাঁদের কর্মকান্ড বা স্বিদ্ধান্তে আমি নিজে খুব একটা প্রভাবিত হই নাই যেহেতু আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়েছিলাম।

এর মধ্যে দূতাবাসে আমার পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং পাকিস্তানে বদলী করা হয়। বস্তুতপক্ষে আমি শিকাগোর সভা থেকে আমি এই খবর পাই। এ সংবাদ পাওয়ার পর আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে ইয়াহিয়া খানকে একটি চিঠি লিখি। বলাই বাহুল্য। চিঠির কোন উত্তর আমার কাছে আসে নাই। ৩০শে জুন মুজিবনগর সরকারের প্রতি আমি আনুগত্য প্রকাশ করি। আমার বাসা বেসরকারী দূতাবাসে পরিনত হয় এবং আমি মুজিব নগর সরকারের পক্ষে কাজ করি। তবে আমার স্বিদ্ধান্তের খবর সাময়িকভাবে গোপন রাখা হয় যেহেতু আমার কিছু সহকর্মী আনুগত্য প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁদের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল।

জুন মাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কংগ্রেসে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর শুনানী। জন রেডি ঢাকা থেকে ফিরে এই শুনানিতে স্পষ্ট বিবৃতি রাখেন। তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার সপক্ষে মন্তব্য রাখেন। এই শুনানী ও আরো অনেক কর্মকান্ড থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে মার্কিন সরকারী বিপক্ষে একটি প্রভাবশালী মহল বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন করেছেন। ৫ই জুলাই মুজিবনগর সরকার সমস্ত বাঙালি কূটনীতিককে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানান। আমেরিকায় অবস্থিত বেশিরভাগ কূটনীতিক সিদ্ধান্ত নে যে, আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন। এই সব তথ্য আমি মুজিব নগর সরকারকে জানাই। এ সময়ের মধ্যে জনাব এনায়েত করিম দ্বিতীয়বারের মতো হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এই ঘটনা মানসিকভাবে অনেক কূটনীতিককে দুর্বল করে দেয়। সবার মধ্যে “ কি হবে, কি হয়” একটা ভাব দেখা যায়। আমি মুজিব নগর সরকারকে আবার জানাই যে অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং অনেকে আনুগত্য প্রকাশ নাও করতে পারে।  
  
এতদিন পর্যন্ত আমি জনসমক্ষে কোন বক্তব্য রাখিনি কিন্তু এই অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিই যে এবার খোলাখুলি কাজ করতে হবে। সিনেটর কেনেডি আমাকে আমন্ত্রন জানান একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর বদলে উপস্থিত হবার জন্য। ২৭শে জুলাই এন বি সি টেলিভিশনের ‘কমেন্টস’ অনুষ্ঠানে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা করি কেন পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেছি। অনুষ্ঠানটি ১লা আগষ্ট প্রচারিত হয়।  
  
পাকিস্তান এ সময় কিছু বাঙালিকে তাঁদের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকা পাঠায়। ওয়াশিংটনে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের সাক্ষাত হয় জুলাই মাসের প্রথম দিকে । জনাব মাহমুদ আলী তো বলে বসলেন যে গণহত্যা কিছু হয়নি। শুধু দুস্কৃতিকারীরা কিছু মারা গেছে আর বাঙালিরা বিহারীদের মেরেছে। তিনি আরও জানালেন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আর শেখ মুজিবের কোন জনপ্রিয়তা নেই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে তাঁর আত্মীয় সিলেট হাঁসপাতালের ডাঃ শামসুদ্দিনকে কে বা কেন হত্যা করেছে। তিনি অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বললেন যে বেখেয়ালীতে গোলাগুলিতে মৃত্যু হয়েছে। তিনি আমাকে দেশে ফিরতে উপদেশ দিলেন। তবে এও বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে গেলে ভাল হয়। তার কথাবার্তা আওয়ামী লীগ বিশেষ করে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি দূতাবাসের হুকুমমত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করেন এবং সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লিখেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরীকে খুন খারাবীর বিবরণ দিতে বেশ বস্তুনিষ্ঠ বলেই মনে হলো। তিনি বললেন যে বিহারীরা বাঙালিদের খুব মেরেছে এবং সেনাবাহিনী জুলুম করেছে। সব পরিবারেরই কিছু কিছু না কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অথবা প্রান হারিয়েছে। যে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে তা সারতে বহুদিন লাগবে। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে ভাব করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। কিছুদিন হয়তো দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে। তাঁর মূল কথা ছিল দোষ যারই হোক ভারতের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমি যখন তাঁকে বললাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে আর কিছুদিন পরে যেখানে আমরা ইতিহাস বিশ্লেষন করতে পারবো। তখন তিনি রাগের সাথেই বলেন, “ তোমাদের বাংলাদেশে আমাকে পাবে না”। আমি হেসে বললাম, “আমরা তাহলে জেনেভায় বসেই বিগত দিনের আলোচনা করতে পারবো। হক সাহেব অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সাথে দেখা করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে পূর্বপাকিস্তানের জন্য বিশ্বব্যাংক কি করতে পারে, কি উপদেশ তিনি এ ব্যাপারে মিঃ ম্যাকনামারকে দিতে পারেন। দূতাবাস তাকে নানা কাজ করতে বলে ও তাঁর জন্য চিঠি পত্র তৈরি করে দেয়। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায়, নিজের ঢং এ পাকিস্তানের প্রচারকার্য করেন।  
  
বাঙালি কূটনীতিক জনাব এস এ করিম দূতাবাসের কাজে বিদেশ গিয়েছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্ক পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় ব্যাক্তি ছিলেন এবং মার্কিন মুল্লুক যত বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আফ্রিকা সফর শেষ করে ওয়াশিংটনে আসেন। তিনি এসে তাঁর সহকর্মীদের বুঝালেন যে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার আর যৌক্তিকতা নাই আর বাংলাদেশ সরকারের আহবানে সাড়া দিতে কোন দ্বিধা দ্বন্দের অবকাশ নেই। তিনি বলিষ্ঠভাবে একে একে সব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। সবচেয়ে সমস্যা ছিল অসুস্থ জনাব এনায়েত করিমকে নিয়ে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর চিকিতসার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই অবস্থা সহকর্মীদের মন দুর্বল করে দেয়। পরে সিদ্ধান্ত হল করিম দম্পতির সাথে সরাসরি আলাপ করাই ভাল। কিন্তু বেগম করিম এবং জনাব এনায়েত করিম উভয়ে অত্যন্ত সাহস দেখান। জনাব করিম বলেন যে , তাঁর স্বিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন, “ আমি আপনাদের সাথেই আছি”।  
  
৩রা আগষ্ট মুজিবনগর পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাহমুদ চাষী ও তাঁর সহকারী তৈয়ব মাহতাবের সাথে আমার কথা হয়। এছাড়া বিচারপতি চৌধুরীর সাথেও আমি যোগাযোগ করি । ৪ঠা আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করি আমি এবং ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার ন্যাশনাল এফেয়ার্স বিভাগের সম্পাদক রোনাল্ড কোভেন এতে আমাকে সহযোগীতা করেন। তিনিও নিউইয়র্ক টাইমস এর বেঞ্জামিন ওয়েলসকে একদিন আগে আমি জানিয়ে দিই যে সম্মেলনে আমার সব কাছের বন্ধু আনুগত্য পরিবর্তন ঘোষণা করবেন। একই সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সন এর প্রেস কনফারেন্স হচ্ছিল যার ফলে আমাদের আনুগত্য প্রকাশের সংবাদ ততটা ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেনি। তবে এই সাংবাদিক সম্মেলনে নিক্সন বলেন যে আমেরিকা সবসময়ই “পশ্চিম পাকিস্তানের” সাথে থাকবে। তাঁর এই বিশেষ বাক্য ব্যবহার সবারই কানে লাগে এবং এটি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ৫ই আগষ্ট জনাব এম আর সিদ্দিকী আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আগমন করেন। ৩রা আগষ্ট গ্যালাগার সংশোধনী পাস হয়। যদিও সিনেটে এর ভবিষ্যত কি হবে তা নিশ্চিত ছিল না তবুও এটা ছিল বিরাট বিজয়। ১৯শে আগস্ট টরেন্টোতে অক্সফাম আয়োজিত একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার হিউ কিননীসাইত এতে সভাপতিত্ব করেন আর বৃটেনের জুডিথ হার্ট, ভারতের জেনারেল চৌধুরী , প্রফেসর নুরুল হাসান এবং কানাডায় বহু সংসদ সদস্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো সুবিখ্যাত ‘ টরেন্ট ডিকলারেশন’ হিসেবে পরিচিত। এই সম্মেলনে জনাব এম আর সিদ্দিকী এবং আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলাম।

এর কিছুদিন পর শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত খবর আসে। আমরা এর বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালাতে থাকি। এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়। বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য বিবৃতি দেন এবং এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করার মধ্যে। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং আমরা সেই সব জায়গায় গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি ও প্রবাহ ব্যাখ্যা করতাম। ৩রা সেপ্টেম্বর ডাঃ মালিক গভর্ণর হয়। কিছুদিন পরেকটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা পরবর্তীকালে মিথ্যা প্রমানিত হয়।  
  
লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো, ডেনভার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সভা করি। ফিলাডেলফিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান “ ফ্রেন্ডস অব ইষ্ট বেঙ্গল” খুবই সক্রিয় ছিল। সেখানে সুলতানা ক্রিপেনডরফ এবং মাজহারুল হক একটি একটি টিচ-ই এর ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মিঃ চার্লস কান এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে উল্ল্যেখযোগ্য যে কয়েকজন পাকিস্তানীও এত বাংলাদেশের সমর্থনে অংশগ্রহন করেন যথা জনাব এজাজ আহমেদ। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সাহায্যে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হয়ে উঠে ঐ সময়ে। সিনেটে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলে। অনেকরই মত ছিল যে খাদ্য সরবরাহকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিৎ। আমরা যুক্তি দেখাই এ সাহায্য দিলে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তা কখনো বন্ধ হবে না। বরং এতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাহায্যই হবে।  
  
একই সময়ে পাকিস্তান সাহায্য গ্রুপের মিটিং হয়। আমরা বিভিন্ন মহলে এর বিরুদ্ধে তদবির করতে থাকি। হারুনুর রশীদ ও রেহমান সোবহান এ ব্যাপারে খুব সচেষ্ট ছিলেন। পাকিস্তান চাচ্ছিল তাদের দু’শ চল্লিশ মিলিয়ন ডলার মওকুফ করে দেয়া হোক। আমেরিকা এতে রাজি হচ্ছিল না এবং চাপ দিচ্ছিল একশ মিলিয়ন ডলার দাবী থেকে কমিয়ে আনার জন্যে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ হয়। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার। ইউ.এস.এইডের প্রতিনিধি মরিস উইলিয়ামস প্রথমে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকা সফরের পর তিনি বোধ হয় মত পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এন্ডারসন পেপারস থেকে দেখা যায় যে পাকিস্তান সমর্থন ছিল নিতান্তই ওপরতলার ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর তার উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারই সে কার্যক্রমের হোতা ছিলেন।

আগেই বলেছিলাম জুন মাসের দিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের বাংলাদেশ এনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়। প্রথমে এটা পরিচালনা করেন মিসেস আনা টেইলর এন্ড ডেভিড ন্যালিন। বাঙালিদের মধ্যে রাজ্জাক খান ও তাঁর বন্ধুবর্গ এবং মহসীন সিদ্দিকী এটা চালাতেন। এর প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেসে লবি করা ও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এই সেন্টারের সঙ্গে বাঙালি জামান(কচি) এবং মার্কিন ডেভিড ওয়াইজব্রডের নামেই প্রচার লাভ করে। এরা জুন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন ও তৎপরবর্তীকাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকেন। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ও শিক্ষকেরা দল বেঁধে ওয়াশিংটনে এসে ক্যাপটিল হিলে লবি করে যেতে ওই সংগঠনের সাহায্য নিতেন। বোষ্টন , ইন্ডিয়ানা, টেকসাস, শিকাগো, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলস এবং আরো অনেক জায়গা থেকে বাঙালি ছাত্র , শিক্ষক ও গবেষকরা নির্দিষ্ট নির্ঘন্ট অনুযায়ী ওয়াশিংটনে এসে লবি করতেন। আমরা সব সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের ফর্দ বানিয়ে নিশ্চিত করাতাম যে সবাইকে আমাদের বলার সুযোগ হয়েছে। মূলতঃ মার্কিন নাগরিকরা বেশী করে লবী করতো, বাঙালিরা তাঁদের সঙ্গ দিতেন। আমার মনে হয় লবি দল হিসেবে আমরা বেশ সুসংগঠিত ও সুসংহত ছিলাম। আর এতে ছিল বাংলাদেশ মিশন ও ইনফরমেশন সেন্টারের যৌথ প্রচেষ্টা। আমার মনে পড়ে কোনদিন বিকেলে হয়তো কেউ আমার বাসায় রাত্রি যাপনে আসলেন আর পরের দিন সকালেই কেপিটল হিলে চলে গেলেন এবং সেখান থেকেই বিকালে বিদায় নিয়ে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। এরা নিজের ইচ্ছায় আসতেন, দেশপ্রেম তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্টোবরে লবির কাজ তুঙ্গে কারন তখন টার্গেট ছিল বৈদেশিক সাহায্য বিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের শুরুতে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় এবং তাতে আমিও অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। পাকিস্তান এইড কনসরটিয়ামের সভা শেষে আমি নিউইয়র্কে প্রতিনিধি প্রতিনিধি দলে যোগ দিই। আমরা বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আন্দোলনের পক্ষে ৪৭টি সমর্থনসূচক বিবৃতি সংগ্রহ করি। কমবেশী সব দেশই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং সবাই চাচ্ছিল একটি রাজনৈতিক সমাধান। এ সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা আমাকে আলোড়িত করে। ১৪ই অক্টোবর বেলমন্ট প্লাজা হোটেলে রাত ৯/১০টার দিকে ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মফিজ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন এক সাথে বসে আলাপ করছিলাম। এমন সময় খবর এলো যে মোনায়েম খান মারা গেছেন। আমরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠি। এমন সময় হঠাৎ করে মল্লিক সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন যে, দেখো, যুদ্ধ আমাদের কি রকম করে ফেলেছে। একটি মানুষের মৃত্যুতে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি।  
  
৮ই নভেম্বর পাকিস্তানে সব ধরনের অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১০ই নভেম্বর “পাকিস্তান অর্থনৈতিক সাহায্য” বিল পাস হয়। এ বিলে বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত রিফিউজিদের ফিরে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে না ততদিন কোন অর্থনৈতিক সাহায্য করা হবে না।  
  
আর একটি গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাব ছিল যে “হেলষ্টকি প্রস্তাব”। এই প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ন অংশ ছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগ করা।  
  
নভেম্বরের শেষে বর্ডার এলাকায় গোলাগুলি শুরু হবার পর বিভিন্ন মহলে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে লাগলো। তখন সবাই চিন্তা করছিল কিভাবে এই রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়। সে বাঙালিদেরই হোক, পাকিস্তানীদেরই হোক কিংবা রাজাকারদেরই হোক। এছাড়া পুনর্বাসন নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এমনকি মুজিব নগরের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন দেশ পরিচালন করতে পারবে কিনা তা কিয়েও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠে। আমার মনে পড়ে সিনেটর স্যাক্সাবি, যিনি এই আন্দোলনের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে বললেন,” আমাকে আশ্বাস দাও যে , দেশ স্বাধীন হলে তোমরা তা পরিচালনা করতে পারবে।”  
  
ডিসেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা এক প্রকার নিশ্চিত ছিলাম যে যুদ্ধে আমরা জয়ী হবোই। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘটনার কথা উল্ল্যেখ করা যায়। অক্টোবর মাসের দিকে সারওয়ার মুর্শেদ খানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান এর পক্ষ থেকে চিঠি আসে। এতে ছিল বিমান বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী কামান-গোলার বিশদ বিবরণ কিন্তু এই বিবরণ বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা খুবই উদ্ভট ছিল যেহেতু এইসব সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল এবং এর জন্য অর্থ প্রয়োজন হতো তাও আমাদের ছিল না । অবশ্য যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম। জুন মাসে বোষ্টনের ফিরোজের উদ্যোগে বেশ কিছু কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি আমরা মুজিবনগরে পাঠাই। বোধ হয় এতেই ধারনা হয়েছিল যে ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতেও আমরা সক্ষম হব। নভেম্বরের শেষেই মনে হয়েছিল সরাসরি যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী কিন্তু পাকিস্তান যে সেই যুদ্ধ শুরু করবে এমন নির্বুদ্ধিতার আশংকা আমরা মোটেই করিনি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু পাকিস্তানী আমাদের মুজিব নগর সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে। তাঁদের কয়েকজন জানায় যে, এই প্রস্তাব ভূট্টোর মস্তস্কপ্রসূত। তারা মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হবে যদি শেখ মুজিব সরাসরি জাতিসংঘে এসে পাকিস্তানের ভূখন্ডথেকে সব বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানান এবং তাতে আহবানে ভারত সাড়া দেয়। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনীতিক সমঝোতায় এসে বাঙালিদের সব দাবী মেনে নেবে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত চতুর বলে মনে হয়েছিল। আমরা উত্তরে জানাই যে সর্বশক্তি বলতে আমরা ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কে বুঝি। ছেড়ে যেতে হলে উভয়কে যেতে হবে একসাথে কিন্তু এই আলোচনা সরকারী পর্যায়ে পৌছানোর আগেই বন্ধ হইয়ে যায়।

১১ ই ডিসেম্বর আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তানীরা এসে উপস্থিত এবং সমঝোতার জন্য চাপ দেয়। তারা এই প্রস্তাব পেশ করার জন্য বিচারপতি চৌধুরীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি পাকিস্তানীদের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে একটি ভীতিপূর্ন ঘটনা ছিল চট্টগ্রামের উদ্দ্যেশ্য সপ্তম নৌবহরের যাত্রা। আমার বিশ্বাস, যদি কংগ্রেসে ব্যাপারটা ফাঁস না হয়ে যেত তাহলে হয়তবা সত্যি সত্যি নৌবহর চট্টগ্রামের নিকট এসে যেত।  
  
এ সময় আমরা সবাই ঢাকার অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। কংগ্রেস সদস্য কোরম্যান কর্তৃক আয়োজিত একটি ভোজসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে এশিয়ার ব্যাপার নিয়ে গবেষনারত মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হয়। সেদিন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে। যুদ্ধবিধ্বস্থ ও অত্যাচারে নিপীড়িত জাতিকে কি অবস্থায় আমরা পাবো আর কি করে পুনর্বাসন করা যাবে।   
  
১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হলো এবং ১৮ তারিখ জানতে পারলাম বহু বুদ্ধিজীবিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন আমি ইয়েলে গিয়েছিলাম অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে ঢাকার পথে বিদায় দেওয়ার দিতে।  
  
বোষ্টনে একদল বাঙালি মার্কিন বন্ধুদের সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক রুপরেখা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন অক্টোবরের দিকে। মহিউদ্দীন আলমগীর, হারুনুর রশীদ ভূঁইয়া, মতিলাল পাল এরা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। অধ্যাপক ডফম্যান ও হাভার্ড পপুলেশন সেন্টার এবং অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এই উদ্যোগের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন এ কাজে আমাদের সাহায্য আসে। মার্চ মাসেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে আমি একটা প্রতিবেদন করেছিলাম। ইষ্ট পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগের তৈরি পরিকল্পনাও আমাদের হাতে আসে। এই সবের ওপর ভিত্তি করে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা খসরা তৈরি করি। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এই খসড়া নিয়ে বাংলাদেশের পথে পাড়ি দেন স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই।   
  
মুজিবনগর থেকে মন্ত্রী পরিষদ সচিব তাওফিক ইমামের কাছ থেকে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ পরিকল্পনা বোর্ড স্থাপনের খবর পাই । বোর্ডে যোগদানের জন্য অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান ও হারুনুর রশীদের প্রতি আহবান আসে। এই প্রসঙ্গে খাদ্য ও দুর্ভিক্ষের উপর সিনেটর রিফিউজি সাব কমিটির জন্য আমাকে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। এই সাব কমিটির জন্য পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও আরেকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করি ডিসেম্বরে। ঐ মাসে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরেকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সুযোগ আমার হয়। এসব কাজে বিশ্বব্যাংক এবং ইউ এস এইডের কর্মকর্তাদের সাহায্য ও হারুনুর রশীদের সার্বক্ষনিক সহায়তা কৃতজ্ঞভরে স্বরণ করি। মোটামুটি ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন আমরা বিদেশে থেকেও অনুভব করি আর তাঁর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিই।

স্বাক্ষর/-  
আব্দুল মুহিত

৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৪



[ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<১৫, **১২, ১২১-১২৭**>

# [এম আর সিদ্দিকী]

একাত্তরের পহেলা মার্চ। রেডিওর সংবাদে ভেসে আসলো একটি খবর। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত। হোটেল পূর্বাণিতে তখন শেখ মুজিবুর রহমান একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছিলেন। খব শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হলেন। বেরিয়ে আসলেন এবং ২রা মার্চে ঢাকা এবং ৩ তারিখে সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল ডাকলেন। ডাক দিলেন ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশের। ঘোষণা দিলেন, সরকারের সাথে আর কোন সহযোগিতা নয়। আর কেউ ট্যাক্স দেবে না। স্থানীয় আওয়ামী প্রধানের নির্দেশনা ছাড়া কোন ব্যাঙ্ক কোন লেনদেন করবে না। সংগ্রাম শুরু হলো।

চট্রগ্রামে আমি জেলা আওয়ামিলীগ এর সভাপতি ছিলাম। দ্রুত একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হল এবং আমি এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলাম। অবাঙালি সংস্থাগুলো ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেওয়ার সময় আমার কাছ থেকে অনুমতি দিত। এমনকি সেনাবাহিনী পরিবারের সদস্যদের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার পূর্বেও আমার অনুমতির দরকার ছিল। ওদিকে বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং তারা মিছিল ও শ্লোগান দেওয়া শুরু করল। চট্রগ্রামে রেলওয়ে কলোনিতে একটা বড় বিহারী সম্প্রদায়ের লোক থাকত । যখন কলোনির পাশ দিয়ে একটি মিছিল যাচ্ছিল, তখন তারা লাঠি, ধারালো অস্ত্র, বন্দুক দিয়ে আক্রমন করল। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটা বিহারী পরিবারকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু এটা আমাদের জানা ছিল না। অনেক বাঙালি আহত হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিলেন। বিহারী এবং বাঙালীদের মাঝে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। দিন দিন তা খারাপ পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হল। সেনাবাহিনী নিয়োগ দেয়া হল। পূর্ব পাকিস্তানি প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন কর্নেল চৌধুরী । উনি বাঙালীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। শীঘ্রই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে একজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। তিনি অবাঙালীদের পক্ষাবলম্বন করলেন। সরকারি সার্কিট হাউজের প্রধান দপ্তরে সামরিক শক্তি নিয়োগ দেওয়া হল। নৌবাহিনীও যোগ দিয়েছিল।  
  
আহত বাঙালিদের পাহাড়তলি এলাকার মেডিকেল হাসপাতালে আনা হলে আমি তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যাক্তিগতভাবে সার্কিট হাউসে যাই। তারা আমাকে সাহায্যের জন্য আশ্বস্ত করল। যখন আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য সাহায্য চাইলাম তখন তারা আমাকে একটি নৌবাহিনীর ট্রাকে তুলে দিল যেটি বিহারী কলোনির দিকে যাচ্ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তারা আমাকে হত্যা করার জন্য বিহারিদের হাতে তুলে দিতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের থামার জন্য বললাম কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না। একটা সময়ে অন্য একটা মিলিটারীর ট্রাক বিপরীত দিক থেকে আসছিল। যখন তারা গাড়ির গতি কমিয়ে একে অপরের সাথে আলোচনা করছিল ঠিক তখনই আমি সুযোগটা নিলাম এবং ট্রাক থেকে লাফ দিলাম।

ঢাকাসহ বাদবাকি বাংলাদেশের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগলো। এক ধরণের সমান্তরাল সরকার চালু হয়ে গেল।

এসময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামির সাথে একটি সংলাপের ঘোষণা দিয়ে ১৫ই মার্চে সকল আর্মি সহকর্মী এবং প্রধান সারির নেতাদের নিয়ে ঢাকা আসলেন। উনাদের সাথে প্রয়াত জুলফিকার আলী ভুট্টোও ছিলেন। সংলাপ চলাকালীন তাঁরা বেসামরিক পোশাকে আর্মির সদস্যদের প্লেনে এবং জাহাজে এ দেশে নিয়ে আসতে লাগলেন।

চট্রগ্রামে মেজর রফিক এবং পরে ই পি আর ক্যাপ্টেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করল এবং তারা আমাদের জানাল পুরো ই পি আর অফিসার এবং জওয়ানরা আমাদের সাথে আছে। সে রাঙামাটি, কাপ্তাই এবং কক্সবাজার এ নিয়োজিত সবার সাথে যোগাযোগ করল এবং তাদের ইশারা দেওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য বলা হল।  
  
বিগ্রেডিয়ার মজুমদার ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীর মাধ্যমে প্রতি রাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তাদের সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানালেন। তারপর চট্রগ্রামের ডি.সি. মোস্তাফিজুর রহমান এবং এস পি তাদের সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানালেন। আওয়ামিলীগকে সহায়তার জন্য পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা এস পি নিহত হন।  
  
এম.ভি. "সোয়াত" নামে একটা জাহাজ অস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরক ও সেনাবাহিনী সহ চট্রগ্রাম এ পৌছাল। সদা সতর্ক থাকা আওয়ামিলীগ এর কর্ম পরিষদ বন্দরে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে জাহাজ এর মালামাল না নামানোর নির্দেশ দিলেন। সেনাবাহিনীরা বন্দুক উচিয়ে শ্রমিকদের ভয় দেখাল কিন্তু তাতে কাজ হল না। যারা কাজ করতে না করেছিল, তাদেরকে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ই পি আর জওয়ানদের গুলি করতে নির্দেশ দিল। ইপিআর সদস্য রা অস্বীকৃতি জানালে পরে ৭ জন ইপিআর সদস্যকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়।  
  
তারপর তারা ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনীকে জাহাজের মালামাল নামানোর নির্দেশ করল। বিগ্রেডিয়ার মজুমদার আমার উপদেশ জানতে চাইল যে তার কি করা উচিত। আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষনা এবং তাদের মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।   
  
২৩ শে মার্চ আমি সরাসরি ঢাকায় গেলাম বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ নেওয়ার জন্য এবং তাঁর নির্দেশনার জন্য। আমি তাঁর বাসায় মিলিত হলাম। তিনি জানালেন যে আলোচনার মাধ্যমে ভালো একটি সমাধানের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। যেহেতু ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সেখানে উপস্থিত সেহেতু তিনি ভাবেন নি যে, যুদ্ধ হবে। আমি তাঁকে জানালাম যে, চট্রগ্রাম এ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং পুরোপুরিভাবে আক্রমনের জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। তিঁনি আমাকে দ্রুত চট্রগ্রামে ফিরে যেতে বললেন এবং সকল বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন ও চট্রগ্রামে প্রতিরোধ করতে বললেন। যদি কোন কারনে আক্রমন করে তিনি চট্রগ্রামে পালিয়ে চলে আসবে এবং আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কখন সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক প্রশাসনকে যুদ্ধের সবুজ সংকেত দিবো। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। কর্নেল ওসমানিকে পরামর্শের জন্য ডাকা হল। উনি ওসমানীর পরামর্শ মোতাবেক বললেন যে, যখন রেডিও প্রচারণা বন্ধ হবে তখন বুঝে নিতে হবে আমরা শেষ সময়ে এসে গেছি। কিন্তু আমি বললাম যে, বৈদ্যুতিক শক্তির কারনেও এমনটা হতে পারে। তারপর সে বলল যে যখন তারা আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করবে তখন আমাদের ধরে নিতে হবে যে যুদ্ধ শুরু হয়্র গেছে এবং তা প্রতিরোধ করতে হবে। যাই হোক আমি চট্রগ্রামে ফিরে আসলাম কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে বিগ্রেডিয়ার মজুমদার এবং ক্যাপ্টেন আমিন কে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঢাকায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট তখন এক অবাঙালী অফিসারের নির্দেশে চলছিল। সেনাবাহিনীরা সব অস্ত্র 'সোয়াত' থেকে নামিয়ে ফেলেছিল এবং সেগুলো ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু জনগন রাস্তার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল। উপায় না দেখে সেনাবাহিনীরা হালিশপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে সব অস্ত্র জমা করে।  
  
২৫ শে মার্চ চট্রগ্রামের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল। আমরা জানতাম না ঢাকায় কি ঘটছে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে শেখ সাহেবের প্রতিবেশী মোশাররফ হোসাইন এবং নাঈম গুহের মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি তাদের মাধ্যমে আমাকে জানাতে বললেন যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশ কে অস্ত্র জমা দিতে না করলেন এবং জনগনকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলল। তারপরে ঢাকার সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।  
  
সংগ্রাম পরিষদ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল এবং গোপনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ২৬শে মার্চ সকাল ৬:৩০ মিনিটে আমার স্ত্রী লতিফা মি. মইনুল আলম (ইত্তেফাক পত্রিকা চট্রগ্রাম এর সাংবাদিক) এর কল রিসিভ করলেন এবং চট্রগ্রাম ওয়ারলেস অপারেটরের মাধ্যমে পাওয়া একটি মেসেজ গ্রহণ করলেন। মেসেজে বলা হয়েছে   
  
*"বাংলাদেশ এবং বিশ্বের জনগনের কাছে বার্তা। হঠাৎ গভীর রাত ১২ টায় সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানার ইপিআর আক্রম করেছে। হাজার হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। আমাদের মুক্তির সংগ্রামে বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন কর। যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোল। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা। শেখ মুজিবুর রহমান।“*  
সংবাদটি দ্রুত আমাকে আমার কানে এল। সংগ্রাম পরিষদ শীঘ্রই মেসেজটি নিয়ে আলাপ করল এবং রেডিওতে তা ঘোষনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপস্থিতির জন্য আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশনে প্রবেশ করা গেল না। আমরা বেলাল চৌধুরী, সুলতান আলী এবং রেডিও পাকিস্তানের অন্যান্য কর্মকর্তাদের খুঁজছিলাম যারা আমাদের বার্তাটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ড. আবু জাফর এবং অন্যান্য বাঙালী ঘোষনার একটি খসড়া তৈরী করেন। এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে জেলা আওয়ামিলীগ এর সাধারন সম্পাদক এম,এ, হান্নান ঘোষনাটি দিবেন। সে অনুযায়ী তিনি ২৬ শে মার্চ দুপুর ২:৩০-এ শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষনা দেন। তার উপর ভিত্তি করে পরে বাংলাদেশ সরকার ২৬ শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষনা করে।  
  
মেজর জিয়া এবং তার সৈন্যদল কালুরঘাট রেডিও স্টেশন পাহারার দায়িত্ব নেয়। পরের দিন ২৭ শে মার্চ জিয়া নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষনা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষনা দেন। আওয়ামিলীগ নেতা এবং সাধারন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পরে। প্রাক্তন মন্ত্রী এ, কে খান সেই ঘোষণা শুনে মনে করেন যে, এর মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে ধারণা হবে যে এখানে একটি আর্মি ক্যু হয়েছে। তাই এর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বব্যাপী ক্ষুণ্ণ হবে। তাই তিনি পুনরায় ভাষণের একটি খসড়া তৈরি করে দেন এবং মেজর জিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেই নতুন খসড়া মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পুরোদমে যুদ্ধ চলছিল। সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় বের হয় কিন্তু জনগন রাস্তা ব্লক করে, আলকাতরা মেশানো নুড়ি তে আগুন ধরিয়ে সেনাবাহিনী কে তাদের ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট এর দিকে পশ্চাৎপদসারণ করতে বাধ্য করে। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বেলুচ রেজিমেন্ট কর্নেল এম, আর, চৌধুরী এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালী অফিসার ও জওয়ান কে হত্যা করে। কেউ কেউ অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। সিডিএ মার্কেটের কাছে অবস্থিত অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মেজর জিয়াউর রহমান সেই নির্দেশ অমান্য করে অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের কে নিয়ে অবাঙালী সেনাপতিদের হত্যার মাধ্যমে যুদ্ধে যোগদান করেন। মেজর জিয়ার নেতৃত্বে আওয়ামিলীগ ক্যান্টনমেন্টে আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নিল। ইপিআর, পুলিশ এবং আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক সহ আরাকান রাজার ৪০০ বেতনভূক্ত কর্মচারীসহ সর্বমোট প্রায় ২০০০ জন রেডি ছিল। পরে আক্রমনটি পরিচালিত হয় নি।  
  
পরে ২৭ শে মার্চ পাকিস্তান সরকার কুমিল্লা থেকে একটি বড় সৈন্যদল চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এ পাঠান। আমরা রেলওয়ে স্টেশন এর টেলিফোন এর মাধ্যমে তথ্যটি পাই। নোয়াখালী আওয়ামিলীগ এর সহযোগীতায় আমরা রাস্তা ব্লক করে দিই, সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল শোভাপুর ব্রিজ এর একটা বড় পার্ট আমরা উড়িয়ে দিই। যাই হোক, সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তার অবরোধ গুলো ধীরে ধীরে সরাতে সক্ষম হয়। ত্যাগী ইবিআর বাহিনী এবং ইপিআর বাহিনী সুসজ্জিত সৈন্যদলকে তছনছ করে দেয়। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া এবং ক্যাপ্টেন রফিক এর নেতৃত্বে আমরা খাবার এবং অন্যান্য জিনিস পত্র সংগ্রহ করি। ওৎ পেতে থাকা অতর্কিত বাহিনীর আক্রমনে তারা তাদের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র যানবাহন নিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এবং বাকিরা নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়। তারা এক পাকিস্তানি সিনিয়র আফিসারকে হারায়। আমাদের বাহিনী তখন উত্তরের দিকে ধাবিত হয় এবং ফেনী নদী পর্যন্ত রাস্তার নিয়ন্ত্রন দখল করে।  
  
স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি চট্রগ্রাম বিমানবন্দর ও কুমিল্লার বিভিন্ন স্থান থেকে অগ্রসরমান শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় এবং তাদের প্রতিহত করে। কিন্তু তারপর নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী যোগ দেয় ওদের সাথে। নৌবাহিনী সমুদ্র থেকে শেল নিক্ষেপ শুরু করল এবং পাকিস্তান এয়ার ফোর্স আমাদের কেল্লা এবং বাজারগুলোতে আক্রমন করল। আমাদের যোদ্ধারা পাহাড়ের উপর দিয়ে ভারতের দিকে অপসৃত হতে লাগল কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে গেল।   
  
মেজর জিয়া আমাকে ভারত থেকে গুলি সংগ্রহের কথা বললেন, কারন গুলি ছাড়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। আমার কিছু হিন্দু বন্ধুর সহায়তায় আমি জহুর আহমেদ চৌধুরী, আতাউর রহমান খান এবং আবদুল্লাহ আল হারুনকে সাথে নিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাবরুমে যাই। ভারতের সীমান্তবর্তী পুলিশ আমাদের ভালোভাবে নিল, তারা আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন এবং পরে আগরতলায় তাদের প্রধানের কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করা হল এবং তাদের প্রধানের অনুরোধে মানচিত্রে চট্রগ্রামের কিছু নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করলাম। সেখানে আমাদের ট্রুপের ঘনত্ব বেশি ছিল। উনি জানালেন যে অবরূদ্ধ পাক আর্মি এসব জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ঐ জায়গা গুলোতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা আমার অনুরোধে গুলি ব্যবস্থা করে দিল এবং তারা বলল যে আমাকে অবশ্যই দিল্লী সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং সেখান থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে।  
  
এমএনএ, এমপিএ-র বহু লোক চট্রগ্রাম,নোয়াখালি এবং কুমিল্লা থেকে আগরতলায় পৌঁছে। তারা সকলে একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্য আমাকে চেপে ধরে যাতে আমরা ভারত সরকারের সাথে একটি মধ্যস্থতা করতে পারি। কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোস্তাক, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলীর মত শীর্ষস্থানীয় নেতা না থাকায় আমি তা প্রত্যাখান করি। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তারা বিশেষ ক্ষমতায় ছিলেন।  
  
তখন আমাকে ত্রিপুরার রাজ্য প্রধান সচিন্দ্র সিং এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সাথে সাথে বেগম গান্ধীর সাথে ফোনে কথা বলেন। আলোচনার পরে তিনি আমাকে নয়া দিল্লী যাওয়ার পরামর্শ দেন। ওইদিনই ড. আনিসুর রহমান এবং প্রফেসর রহমান সোবহান আগরতলায় পৌছান। আমার সাথে সঙ্গী হওয়ার জন্য তাদেরকে জানালাম। আমাদের জন্য গুপ্ত হিন্দু নাম দেওয়া হয়। দিল্লী পৌছার পর, আমাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে অফিসার ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুনা সেনসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি এপয়েনমেন্ট নেওয়া হয়। সন্ধ্যাববেলায় আমাকে জানানো হল যে বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য নেতারাও সেখানে এসে পৌঁছেছেন। আমি খুব আনন্দিত হলাম ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে দেখে। আমি তাদের সাথে কিছু সময় কথা বললাম এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার অনুরোধ করলাম যাতে আমি পরেরদিন সকালে আমাদের সৈন্যদলের কাছে ফিরে যেতে পারি। যথারীতি ফিরে গেলাম।  
  
কিছু দিনের পরে বেগম তাজউদ্দিন এবং আমিরুল ইসলাম আগরতলায় পৌছালেন। এই সময়ের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদও এসে পৌছালেন । সরকার গঠন করার একটি প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে নেওয়া হল। আমরা আশা করেছিলাম যে, শেখ মুজিব পরবর্তী ১ম উপরাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কিন্তু তাজউদ্দিন বলল যে সে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মিসেস গান্ধীর সাথে কথা বলেছে এবং সে বলল যে যদি এখন আমরা তা পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যাবে। খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাজী ছিল না এবং অধিকাংশ এমএনএ দ্বিমত ছিল। ফলস্বরুপ একটা অকার্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল।   
  
সকাল পার হল। সবাই অধৈর্য হয়ে গেল। একটা সময় আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে কথা বললাম এবং তার সর্বশেষ অবস্থান কি জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমাকে বললেন, তাজউদ্দিন যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চায়, তাহলে তাকে আন্দোলনের সুবাদে তা করতে দাও। এই ব্যাপারে আমার কোন ব্যক্তিগত অভিলাষ নেই। এটা সিদ্ধান্ত হল যে, সবাই একসাথে কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করবে এবং তারপর কলকাতায় ফিরে আসবে।  
  
এ সময়ের মধ্যে হাজারো মানুষ আগতলায় এসে পৌছেছে আশ্রয়ের জন্য। তাদেরকে চিহ্নিত করা, থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা অফিস হিসেবে একটা কক্ষ নিয়েছিলাম। এটি "জয় বাংলা" অফিস নামে পরিচিত ছিল। আমরা সকল আশ্রয়ী লোকদের একটি তালিকা করলাম এবং তাদের একটি পরিচয় পত্র দিলাম। আগরতলার চারিদিকে ক্যাম্প তৈরী করা হল। প্রত্যেক ক্যাম্পের জন্য একজন এমএনএ অথবা এমপিএ নিযুক্ত করা হল। রেশনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। যখন এইকাজ গুলো করছিলাম তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়টি মাথায় আসল যে,আমরা কিভাবে পাকিস্তানীদের প্রতিহত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করব। অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সেনা প্রধান কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানি কে যুদ্ধের সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল। সমস্ত যুদ্ধকে কতগুলো সেক্টরে ভাগ করা হল এবং একজন করে মেজর সেক্টর প্রধান নির্বাচন করা হল। মেজর দত্ত সিলেট সেক্টরে, মেজর জিয়া চট্রগ্রাম সেক্টরে, মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা সেক্টরে এবং মেজর শফিউল্লাহ পূর্বাঞ্চল জোন ময়মনসিংহ সেক্টর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উনারা যখন যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, তখন আমাদের দায়িত্ব থাকবে তাদেরকে রেশন, তাবু ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা।  
  
অনুধাবন করলাম, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে আমাদের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ' মুক্তি বাহিনী ' গঠন করা দরকার। ১ লক্ষ আশ্রয় গ্রহনকারী যুবককে ট্রেইনিঙের পরিকল্পনা নেওয়া হল। শীঘ্রই পৃথক ‘যুব ক্যাম্প’ তৈরি করা হল এবং ব্যবস্থাপকদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করা হল। ভারত সরকারের সাথে সমঝোতা হতে হতে আমরা আমাদের সেক্টর কমান্ডারদেরকে বললাম যে, যদি তারা চায় তাহলে প্রশিক্ষন দেয়া শুরু করতে পারে। শুধু মেজর খালেদ মোশাররফ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিলেন এবং ঐ সকল যুবক রেশন না পাওয়া পর্যন্ত তিনি নিজের রেশন যুবকদের সাথে শেয়ার করে নিলেন। কমান্ডো হিসেবে এদেরকেই প্রথমে দেশে পাঠানো হয়েছিল।

আগরতলায় মাহাবুব আলম চাষী এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর আমাকে সব সময় সহায়তা করেছিলেন। তৌফিক ইমামকে অফিসের মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। তিনি রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এবং আমাদের সাথে আগরতলায় এসেছিলেন। নির্বাসিত অবস্থাতেও এক ধরণের বেসামরিক সরকার কাজ শুরু করেছিল।

## স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

রেডিও পাকিস্তানের বাঙালি অফিসাররা ভারতে পালিয়ে আসার সময় ৫ কিলোওয়াট এর একটি একটি ট্রান্সমিটার নিয়ে এসেছিল। আগরতলায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কাজ শুরু করে। প্রফেসর মোহা. খালেদ, এমএনএ কে প্রচারনার কাজের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। যেহেতু পুরা বাংলাদেশে প্রচারনার জন্য ট্রান্সমিটারটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, তাই আমরা ভারত সরকারকে আরো শক্তিশালী একটি ট্রান্সমিটার ধার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তাই একটি ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু এটা স্থাপন করা হল কলকাতায়। তাই রেডিও স্টেশন আগরতলা থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হলো।   
  
মন্ত্রীসভা গঠন করার পরে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম কাজগুলো যথেষ্ট পরিমাণে গুছানো হচ্ছে না। আমি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে পরামর্শ দিলাম যে তাদের উচিত প্রতিনিয়ত সরকারিভাবে অফিসের কাজ পরিচালনা করা। তাঁরা আমাকে জানাল যে তাঁরা এমন কাউকে পাচ্ছে না যে তাদের সাহায্য করবে। আমি আগরতলা থেকে অফিসার দিয়ে তাদের সাহায্য করার কথা প্রতিশ্রুতি দিলাম। ডেপুটি হাই কমিশনের ২য় তলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় বসানো হল এবং মাহাবুব আলমকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল। আমি তৌফিক ইমাম কে মন্ত্রীসভার সচিব হিসেবে তাজউদ্দিন আহমেদ এর কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং আসাদুজ্জামানকে অর্থসচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল।   
  
আমাকে পূর্ব জোন এর "ইনচার্জ" হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল এবং কর্তৃপক্ষ আমাকে সকল ব্যাংক একাউন্ট এবং অন্যান্য ফান্ড পরিচালনার জন্য " গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার " লেখা একটি সীলমোহর দিলেন। চাষী সাহেব পাকিস্তান এম্বাসিতে নিয়োজিত সকল বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাদেরকে বেরিয়ে এসে নির্বাসিত সরকারের সাথে কাজ করার জন্য বললেন। তাৎক্ষণিক একটা ফলাফল পেলাম এবং ওয়াশিংটন এ নিযুক্ত সকল বাঙালি অফিসাররা প্রবাসী মিশন ‘ডিফেক্ট’ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধে আমি আমেরিকা এবং কানাডাতে নির্বাসিত সরকারের প্রথম এম্বাসেডর হিসেবে প্রেরিত হলাম।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আমেরিকাতে যাই। আমরা কানেকটিকাট এভিনিউর অফিস ব্লক এ একটি ফ্লোর নিই যেটি ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম দূতাবাস। যেহেতু বাংলাদেশকে তখনও অ্যামেরিকা স্বীকৃতি দেয় নাই, সেহেতু আমিও একজন ‘দূতাবাসের কর্মকর্তা’ হিসেবে স্বীকৃতি পাই নাই। কিন্তু আমি একটি ‘মিশনের প্রধান’ হিসেবে নিবন্ধন করার অনুমতি পেলাম যার ফলে আমি বৈধভাবে রাজনৈতিক তদবির চালিয়ে গেলাম। যদিও পাকিস্তান সরকারের সাথে আমেরিকার সরকারের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল তবুও আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম, সভা, পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং সাধারন জনগন আমাদের ব্যাপকভাবে সমর্থন দিয়েছিল কারন আমাদের দাবী সঠিক ছিল এবং বিশ্ববাসী পাকিস্তানের গণহত্যার বিষয়টি জেনেছিল। কিছু আমেরিকান, যারা বাংলাদেশে ছিল তারা নিজেদের মধ্যে একটি দল বানায় এবং ওয়াশিংটনে "বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র" স্থাপন করে। এটা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে এদের মধ্যে ড. গ্রিনাফ, ড. ডেভিড নালিন, টম ডিনি, আন্না টেইলর উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিবিদদের মধ্যে সিনেটর চার্চ, সিনেটর কেনেডি, সিনেটর পারসেই, সিনেটর সাক্সবি, কংগ্রেসম্যান গাল্লাহার তারা আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং আমাদের কাছে যুদ্ধের কারণগুলো শুনে তারা এটাকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। তাঁদের অফিসটা আমাদের ‘ক্যাম্পেইন সেন্টার’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলো। সেই সাক্সবে-চার্চ সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য বন্ধ করা হয়েছিল।  
  
আমেরিকার প্রত্যেক শহরে অবস্থিত বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে সংস্থা গড়ে তুলে এবং তহবিল গঠন করা সহ যতভাবে সাহায্য করা যায়, তা করেছিল। এফ.আর. খান, বিখ্যাত স্থপতি, তিনি শিকাগোর ‘বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন’-এর প্রধান হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দূতাবাসের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক বাধা দূর করার লক্ষে মন্ত্রী এনায়েত করিম, কাউন্সিলর কিবরিয়া, অর্থনৈতিক কাউন্সিলর মুহিত, প্রেস কাউন্সিলর আবু রুশদি মতিন উদ্দিন এবং সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী সকল অফিশিয়াল প্রোটকল ভেঙে নির্বাচনী প্রচারণার মতো করে ব্যাপক লবিং করেন।  
  
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ আসলো। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্নসমর্পন করলো। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হল। আমরা শেখ মুজিবকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে তিনি আমাকে ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী টেলিফোন করলেন। আমি উনার সাথে ফিরতে পারি নি। কয়েকদিন পর ফিরেছিলাম। মুক্তির সুবাতাস বইছিলো। এ যেন এক নতুন জীবনের অনুভূতি।

এরপর বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হওয়াটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। উনি আমাকে উনার উষ্ণ আলিঙ্গনে টেনে নিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাকে তাঁর মন্ত্রীসভার বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বানিজ্য মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করতে অনুরোধ করেছিলেন।

-এম. আর. সিদ্দিকী

মার্চ, ১৯৮৪



[লিও](https://www.facebook.com/leo.amarblog) এবং [ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<১৫,১৩,১২৭-৩০>

# [এম এ হান্নান]

দেশের অন্যান্য স্থানের মত চট্রগ্রামেও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিন গুলোতে অসহযোগ আন্দোলন চলে । ৩রা মার্চ পাহাড়তলী এলাকার শ্বরৈহপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জনাব খলিল উল্লাহ সওদাগরের নেতৃত্বে ছাত্র শ্রমিক ও জনগণের মিছিল পাহাড়তলী অয়ারলেস কলোনী সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে জয়বাংলা ধ্বনি সহ প্রদক্ষিণ করার সময় রেলওয়ের বিহারী শ্রমিকরা আধুনিক আধুনিক অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রমন করে এবং অয়ারলেস কলোনী ও ফিরোজ শাহ কলোনীতে বাঙালীদের বাড়ি ঘড়ে আগুন লাগিয়ে দেয় । পাঞ্জাবী সৈন্যরা ছদ্মবেশে বিহারীদেরকে সাহায্য করে । হামলায় মিছিলকারীদের মধ্যে কয়েকজন আহত এবং কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে ।  
  
 এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোস্তাক আহমদকে চট্টগ্রামে পাঠান । তাঁরা উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন এবং আহত ও শহীদ পরিবারবর্গকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন ।  
  
 অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্রগ্রাম জেলায় পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।   
  
 এম,আর সিদ্দিকী ও জহুর আহমদ চৌধুরী যুগ্ন আহবায়ক; এম, এ, হান্নান , এম, এ, মান্নান এবং অধ্যাপক মোঃ খালেদ সদস্য ছিলেন ।  
  
 অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অর্থাৎ ২৫ শে মার্চ সমগ্র চট্রগ্রাম জেলায় সরকারী , বেসরকারী অফিস আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে । এ সময় জেলা কমিটির উদ্যোগে চট্রগ্রাম জেলার সকল মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় । সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার , জোয়ান ও আনসারদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগাড় করা হয় ।

২৪ শে মার্চ চট্রগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে অবস্থানরত সোয়াত জাহাজ হতে সকাল ৮ ঘটিকার সময় পাক-সামরিক জোয়ানরা অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ নামানোর কাজ শুরু করে । আমি এম, এ, হালিমের কাছ থেকে এ সংবাদ পাই । সংবাদ পাওয়ার পর আমি নিউ মোরিং পোর্টে চলে যাই ।পরে ট্রাফিক ম্যানেজার গোলাম কিবরিয়া , তদকালীন পুলিশ সুপার ও ডেপুটি কমিশনারের সাথে অস্ত্র না উঠানোর ব্যাপারে আলাপ করি কিন্তু তারা তাদের অপারগতার কথা জানান । তবে পোর্ট ট্রাস্টের শ্রমিক নেতা নবী মিস্ত্রী ও চিটাগাং স্টিল মিলের ম্যানেজার জাহেদ সাহেব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামানোর ব্যাপারে বাধা দেয় ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সার্বিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন । তাক্ষণিকভাবে নবী মিস্ত্রি মাইক দ্বারা শ্রমিক ও যুবকদের যার যা আছে তা নিয়ে নিউ মোরিং পোর্টে ঘেরাও করার আহবানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার ছাত্র , শ্রমিক জনতা নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করে ফেলে । পাক-বাহিনীও বাধা দেয়ার জন্য কামান ও মেশিনগান তাক করে রাখে । বিকেলে অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ার ব্রিগেড ময়দানে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয় । উক্ত জনসভায় সালেহ আহমদ (এম,এন, এ), মোশারফ হোসেন ( এম,পি,এ ), এম, এ মজিদ (এম, এন, এ) বক্তৃতা করেন । আমি সভাপতির ভাষণ দিই । সেখানে উত্তেজিত জনতাকে চট্রগ্রাম সেনানিবাস হতে পোর্ট ট্রাস্ট পর্যন্ত পথে বেরিকেড সৃষ্টি করার আহ্বান জানানো হয়। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক হাজার লোক শহরের ও শহরতলীর সকল পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে । উদ্দেশ্য হলো পাক বাহিনী কোন অবস্থাতেই যেন অস্ত্র বা গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাক বা গাড়ি সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে । এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাই । উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাক হানাদার বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে । ২৪ শে মার্চ রাত্রে পাকবাহিনী বেরিকেড ভাঙ্গতে সমর্থ হয় এবং অস্ত্র বোঝাই ট্রাক নিয়ে সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হয় ।   
  
 ২৫ শে মার্চ চট্রগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় । সে সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে কুমিল্লা সেনানিবাস হতে একটি আর্মি কনভয় (Army Convoy) চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ।এ সংবাদ পেয়ে মিরেরশরাই থানার এম,পি, এ জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সুভপুর সেতু নষ্ট করে দেয়ার জন্য পাঠানো হলো । কিন্তু কোন Explosive না থাকায় এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয় মাত্র ।  
  
 ২৫ শে মার্চ রাত্রে আমরা আবার এম আর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে চট্টগ্রামের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হই । রাত ১০ টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম, আর , সিদ্দিকী সাহেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ দেন । সংবাদটির মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা ।   
  
 তারপর আমি ও সভার সকল সদস্যবৃন্দ ডেপুটি কমিশনার সাহেবের বাংলোতে আসি এবং বঙ্গবন্ধু কতৃর্ক প্রেরিত সংবাদের কথা বলি । কিন্তু ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন । সেখানে পুলিশ সুপার শামসুল হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন । তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন ।   
  
 ডেপুটি কমিশনার হতে সাড়া না পেয়ে আমরা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে স্টেশন রোডস্থ রেষ্ট হাউসে আসি এবং স্থির করা হয় যে প্রতিরোধ আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকজন সদস্য সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট তৈরি করে শহরের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হবে । এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

রেষ্ট হাউস থেকে আমরা ই,পি,আর হেড কোয়ার্টার টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি । ই,পি,আর অফিসের হেড ক্লার্কের সাথে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয় । তোকে জরুরী সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারনা দেই। তার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিককেও সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য বলা হয় ।  
  
কাপ্তাই ই,পি আর শাখাতেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় । ক্যাপ্টেন হারুন তার পরদিন সকালেই সমস্ত শাখার জোয়ানদিগকে নিয়ে চট্রগ্রাম শহরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে মিলিত হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন । পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সকালে এসে কালুরঘাটে পৌঁছেন ।  
  
২৫ শে মার্চ গভীর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চারপাশে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উঠসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য । সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইকযোগে সকলকে অবহিত করা হয় ।  
  
২৬ শে মার্চ খুব সকালে আমি আতাউর রহমান কায়ছার ও এম, এ, মান্নানসহ সেনানিবাসের দিকে যাই । পথিমধ্যে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে পাই । উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান তার কোম্পানি নিয়ে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন । এখানে আমরা জানতে পারি যে সেনানিবাসের E.B.R. সেন্টারে প্রশিক্ষনরত বাঙালি জোয়ানদিগকে রাতে পাক-বাহিনী হত্যা করেছে । আমরা কালুরঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন । আমরা মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তাঁর জোয়ানদের সহ দেখতে পাই তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই । তবে ২৭ শে মার্চ তিনি কালুরঘাটে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । কাপ্তাই হতে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ই,পি,আর মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে একত্রিত হন।  
  
কালুরঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে । সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ শে মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার করি । প্রচারে আমাকে সহযোগীতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক , মীর্জা আবু মনসুর , আতাউর রহমান কায়সার ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এম,পি, এ ও এম, এন, এ গণ ।  
  
২৭ শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমান রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয় । তাই সেদিন রাত্রে আমি মীর্জা আবু মনসুর ও মোশাররফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ, কে , খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি । পুনঃঘোষণার জন্য একটি খসড়া করে দেন । আমি ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই । সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ, কে, খান কতৃর্ক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ।  
  
২৮ শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়া তৎকালীন মেজর মীর শওকত ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করেন । সেদিন রাত্রে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ১০ খানা ট্রাক ও বাস যোগাড় করি এবং সন্ধ্যার দিকে সেগুলি হস্তান্তর করি । পরিকল্পনা মোতাবেক তৎকালীন ফুলতলী বাংলা বাহিনী হেড কোয়ার্টার হতে বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ মীর শওকতের নেতৃত্বে রাত্রে কালুরঘাটে পৌছেঁন ।  
  
এখানে মীর শওকত আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে জিয়ার সাথে পরামর্শ করেন এবং উভয়ই ফুলতলী বাংলা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে চলে যান। সেদিন নৌঘাঁটি আক্রমণ করা যায় নি। পরের দিন ২৯ মার্চ সকালে ফুলতলী বাংলা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গেলাম । মীর শওকত ও মেজর জিয়াউর রহমানকে সেখানে পাওয়া গেল না । জানতে পারলাম এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে তাঁরা কক্সবাজার চলে গেছেন । এ সময় তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল ।  
  
৩০ শে মার্চ পাকবাহিনী কালুরঘাট রেডিও ট্রান্সমিটার সেন্টার লক্ষ্য করে বিমান হামলা করে । সেখানে সুবেদার ছাবেদ আলী তাঁর প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিলেন । বিমান হামলার পর শহরের বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরে ই,পি আর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে । চকবাজারে ক্যাপ্টেন হারুন, ও লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী তাঁদের প্লাটুন নিয়ে যুদ্ধ করেন । শমসের মবিন ও ক্যাপ্টেন হারুন চকবাজার ও কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হন । অবশ্য পাকবাহিনী শমসের মবিনকে ধরে ফেলে। এভাবে পর পর কালুরঘাট , নয়াপাড়া , কাপ্তাই পাকবাহিনীর কবলে চলে যায় । কিন্তু রামগড়, বাগানবাড়ী, খাগড়াছড়ি, চিকন ছড়া আমাদের দখলে ছিল। ২ রা মার্চ পাক-বাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে রামগড়ও পাকবাহিনীর কবলে চলে যায় । বাংলা বাহিনীর সকল জোয়ান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে আশ্রয় নেয় । কয়েকদিনের মধ্যে হরিণা নামক স্থানে জোয়ানদের জন্য শিবির স্থাপন করা হয় । এখানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয় । জুন মাসে হরিণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্প প্রধানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয় । দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমি উক্ত শিবিরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি । তাছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক বিষয়াদি এবং সামরিক বাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবেও নিজ দায়িত্ব পালন করি ।  
  
-এম এ হান্নান  
(সভাপতি , চট্রগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ )  
২৭ আগষ্ট, ১৯৭৩



[মাঈমুনা তাসনিম](https://www.facebook.com/hiddenbirdmm?fref=ts) এবং [মেহজাবীন মোস্তফা](https://www.facebook.com/mehjabeen.mostafa?fref=ts)

<১৫,১৪,১৩০-৩৩>

# [ওয়াহিদুল হক]

১৯৭১ সালের আন্দোলন হঠাৎ করে হয় নি। এর পেছনে সংগ্রাম ও চেতনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাসের সাথে সবাই পরিচিত। তবে আমার বিশ্বাস যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই চেতনা প্রবাহের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবসময়ে এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে। নিজেদের বৃত্তে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং এর চরিত্রও কেবলমাত্র কলা-ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ছিল না।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার মূল সুর ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান সরকার এর বিরোধীতা করে। কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এই উৎসব উদযাপনে সৃষ্টি হয় তা থামিয়ে রাখার মত শক্তি কারও ছিল না। এই উদযাপনের সরাসরি ফসল হচ্ছে ‘ছায়ানট’ যা পরে আমাদের গভীরতম বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রসারের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। অতএব বাঙালীদের রাজনীতি সবসময়ে তার সংস্কৃতির উপর নির্ভর করেছে। হয়ত বা অন্য যে কোনো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও।

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর খবর আসে যে মহাপ্রলয় হয়েছে তখন প্রথমে খুব একটা কাউকে নাড়া দেয়নি। ঐ সময়ে আমরা কয়েকজন খবরের ভাষা বুঝি যে ওখানটায় একটা কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করে ‘দুর্যোগ নিরোধ কমিটি’ গঠন করে নগ্ন পদযাত্রা শুরু করি রাস্তায় ‘ভিক্ষা দাওগো, পুরবাসী’ গানটা গেয়ে। আমরা তখনকার দিনেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা উঠাই। এর মধ্যে দুর্যোগের ব্যাপকতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্যোগবাসীদের সাহায্য করার জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেই কাজ করতাম। জায়গার নাম ছিল চর কাজল (রায়পুরা)। ৭ই মার্চ সেখানে ছিলাম। পরে ঢাকায় ফিরে এসে দেখি খুবই খারাপ যদিও কত খারাপ তা ধারণা করিনি।

পঁচিশের রাতে আমি আমার সংবাদপত্র অফিসেই ছিলাম। সারারাত ধরে শুধু আওয়াজ শুনেছি। ২৬ তারিখে বের হওয়া যায়নি। অতএব ২৭ তারিখে আমরা অফিস ত্যাগ করতে সমর্থ হই।

আমার গাড়ীতে করে আমরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই এবং বন্ধু-বান্ধবদের খবর নেই। কাউকে পাই, কাউকে পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। ড. সরওয়ারের মাধ্যমে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করি এবং তাকে বলি এই মুহূর্তে কি কাজ করা উচিত তা যেন সবাইকে জানিয়ে দেয়া যায়। এরপর আমি জনাব রেজা আলীর (বিটঙী) সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ছিলেন একাই রাইফেল ক্লাবের সদস্য। আমি তাকে বলি তার কাছে যা আছে তা আমাকে দেবার জন্য। রেজা আলী আমাকে ১২টা রাইফেল দেন। আমি এই অস্ত্র নিয়ে সাভার চলে যাই এবং দেওয়ান ইদ্রিসের কাছে দিই। তিনি ছিলেন উক্ত এলাকার একজন নেতা। ২৭ তারিখ আমার স্ত্রীকেও সেখানে দিয়ে যাই এবং পরে ঢাকায় ফিরে আসি।

মির্জা সামাদ একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা। তার সাথে আমার আলাপ হয় পরিস্থিতি নিয়ে। অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনবোধে ভারতীয় সাহায্য নিয়ে পাকসেনাদের পরাজিত করা। আমার মনে হয়েছিল রাজনৈতিক কারণেই ভারত আমাদের পক্ষে থাকবে।

২রা এপ্রিল কামাল সিদ্দিকী, কাজী ইকবাল এবং আবুল খায়ের লিটুকে নিয়ে গাড়ীতে করে আমরা রওয়ানা হই। পথে সাভার থেকে হাসান ইমামকে তুলে নেই। তাঁর পরিবারও সাভারে ছিল দেওয়ান ইদ্রিসের গৃহে। আরিচা দিয়ে আমরা নৌকাপথে ঝিনাইদহ যাই এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে নদীর ওপারে ‘জয় বাংলা’ পতাকা উড়ছে! সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমার সাথে থানা পুলিশ অফিসার মাহবুবের আলাপ হয়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী, কামাল সিদ্দিকী এবং আরও কয়েকজন। জানতে পারি কামাল সিদ্দিকী প্রায় ১০০ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন।

মেহেরপুর বর্ডার বি.এস.এফ সৈন্যদের সাথে দেখা হয়। আরও দেখা হয় কানাডীয় সাংবাদিকদের সাথে। তাঁরা আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা পরে বহু জায়গায় প্রচারিত হয়। বি.এস.এফ.-এর সহায়তায় আমরা কলকাতায় পৌঁছাই।

কলকাতায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতা মনসুর হাবিবের বাসায় উঠি। এরপর দেখা করি ভবানী সেন এবং ইন্দ্রজিত গুপ্তের সাথে। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি যশোর দখল করে নেয় এবং দূর্গ স্থাপন করতে পারে তবে আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করতে পারবো।

এর মধ্যে লক্ষ্য করি যে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তারা এখনও একত্রিত হয়নি যদিও ‘কিড স্ট্রিট’-এর এম.পি হোস্টেলে অনেকেই জমায়েত হয়েছে। আমার সাথে আওয়ামী লীগারদের কোনো যোগাযোগ ছিল না অতএব আমি হাসান ইমামকে বলি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে ঢাকায় ফিরে আমার পরিবারকে নিয়ে আসবো। ২৭ এপ্রিল ঢাকা পৌঁছি। লক্ষ্য করি যে শহরের চেহারা পাল্টে গেছে। চারদিকে থমথমে ভাব। মানুষ হাঁটাচলা করছে সন্ত্রস্তভাবে। সবার সাথে পরিচয়পত্র। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বাড়ীতে হামলা হচ্ছে এবং মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রায় কেউই ফিরছে না।

এরই মধ্যে পালাবার একটা মোটামুটি রুট সৃষ্টি হয়েছে। শিবের বাজার হয়ে সোনাইমুড়ি দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায়। অটোরিকশা দিয়ে আমরা কয়েকজন এভাবে আবার সীমান্ত পার হলাম। কিড স্ট্রিট তখন বেশ লোকারণ্য। অমিতাভ দাশগুপ্ত (ভারতীয় বামপন্থী নেতা) এদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তিনি চেষ্টা করেন আমাকে এদের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিতে কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেহেতু জানা যায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নাই।

এরপর মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি এই পর্যায়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। জানা যায় যে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। তাঁরই উদ্যোগে প্যাড ছাপানো হয়। স্ট্যাম্প, ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়। আরও খবর পাওয়া যায় যে বি.এস.এফ-এর মাধ্যমে একটি বেতার ট্রান্সমিটারও পাওয়া যাবে।

এপ্রিলের শেষ দিকে খবর আসে যে ‘জয় বাংলা’ নামে একটি পত্রিকা বের হচ্ছে। এর অফিস বালু হাক-কাক লেনে। এও খবর শুনি আব্দুল মান্নান এই পত্রিকার দায়িত্বে আছেন। জহির রায়হান তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। যা হোক বেতার কেন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে আমরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শামসুল হুদা চৌধুরী, মোস্তফা মনোয়ার, কামরুল হাসান, এম. আর. আখতার মুকুল এবং আমি একটি কমিটি গঠন করি। সার্কাস এভিনিউ-এর বাসায় আমরা বসতাম। ঠিক হয় যে জামিল চৌধুরী এবং মোস্তফা মনোয়ার বাজেট ও কর্মী তালিকা তৈরি করবেন। তাঁরা তা প্রস্তুত করেন এবং হিসেব দাঁড়ায় মাসিক ১৮,০০০ টাকা সব খরচ ধরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ মহলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বাজেট ধরা হয়েছে দৈনিক ১৮,০০০ টাকা। এই সব ঘটনার পর আমরা বেতার কেন্দ্র থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি নিজেদের ইচ্ছায়।

আমি আবার ঢাকায় আসি এবং কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাই। এর মধ্যে পরিচিত হচ্ছেন বেনু এবং শাহীন মাহমুদ। কলকাতায় যাবার আগে তাদের বিয়ে দিয়ে তারপর নিয়ে যাই। ততদিন পশ্চিম বঙ্গ শিল্পী সাহিত্যিক সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছে। দীপেন বিশ্বাস ছিলেন এর সংগঠক। অর্থও সংগৃহীত হয় এবং প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিক এর সাথে জড়িয়ে পরেন। যে সাংস্কৃতিক দল তৈরি হয় তার সভাপতি হন সনজীদা খাতুন, আমি হই পরিচালক। এর নাম দেয়া হয় ‘বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’। মে মাসে এটা গঠিত হয়। স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যা ছিল একশজনের মত।

১৪৪, লেলিন সরণীতে পি.পি.আই. অফিসের একটি কক্ষে রিহার্সাল হতো। তিরিশ দিনের প্রতিদিনই রিহার্সাল হয়। ৩রা জুন প্রথম অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্র সদনে। শাহরিয়ার কবির রচিত ‘রূপান্তরের গান’ নামে একটি গীতি আলেখ্য। আলোকসজ্জা ও মঞ্চ সাজাবার দায়িত্বে ছিলেন মোস্তফা মনোয়ার। যদিও আমাদের সামর্থ্য সীমিত ছিল তবুও অনুষ্ঠান কল্পনাতীতভাবে সফল হয়। বহু সুধীজনের সামনে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। আমাদের মনোবল দারুণ বেড়ে যায়।

এরপর আমরা পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতে থাকি। যে ডাকতো আমরা যেতাম। পুজোর সময়ে প্রচুর অনুষ্ঠান করি। কলা মন্দিরেও আমাদের অনুষ্ঠান হয়। তবে আমাদের প্রধান কাজ ছিল ক্যাম্পে ক্যাম্পে সঙ্গীত পরিবেশন করা। বেনু এবং শাহীন মাহমুদ দলের নেতা ছিলেন। সকাল বেলা আমাদের একটি গাড়িতে যতজন ধরতো ততজনকে পাঠানো হতো একটি ক্যাম্পে। সারাদিন প্রোগ্রাম করে তারা ফিরতো আবার পরদিন যাবার জন্য। অনুষ্ঠান চলতো এক ঘন্টা ধরে। আমার অনুমান ২৫০ টিরও বেশি অনুষ্ঠান করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথম, বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একত্র করে একটি সংগঠন করা হয়। এর নাম দেয়া হয় ‘লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেন্টসিয়া’। এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন অধ্যাপক এ.আর.মল্লিক। জহির রায়হান এবং আলমগীর কবীর এই সংগঠনে বেশ সক্রিয় ছিলেন।

জহির রায়হান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন তা বলা যায় না। একটা বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে ‘জীবন থেকে নেয়া’ ছবির একটি প্রিন্ট কলকাতায় এসেছে। সারাদিন খোঁজের পর পাওয়া গেল সেটি। শেরপুর এলাকার একটি সিনেমা হলের মালিক সাহস করে নিয়ে এসেছেন। মালিক জানালেন এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রিন্ট তিনি দেবেন না। তখন মীমাংসায় বসা হলো। জনাব খায়ের (সংসদ সদস্য) এর দায়িত্ব নিলেন। ষাট হাজার টাকা নগদ দেওয়া হলো মালিককে। এরপর ঠিক হলো ছবি দেখিয়ে যা আয় হবে তার অর্ধেক পাবে শিল্পীরা আর বাকিটা পাবে এম.সি.এ.। জহির রায়হান নিজে কিছুই নিলেন না। মনে রাখা দরকার সবার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

একই মাসে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসে বলেন যে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে আমরা যাবো গান শোনাতে। ৩৫ সদস্যের একটি দল নিয়ে আমরা পৌঁছাই। আমাদের অনুষ্ঠান অসাধারণভাবে সফল হয়। মঞ্চ নির্দেশনায় মোস্তফা মনোয়ার আশ্চর্যরকম আবহ সৃষ্টি করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান যে কি রকম সাড়া জাগায় তা বলার নয়। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ভারতীয় গণসঙ্গীতের দুই প্রধান পুরুষ বিনয় রায় এবং জ্যোতিন্দ্র মিত্র মঞ্চে আসেন। এবং গান শোনান। সে অভিজ্ঞতা বলার নয়।

এভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন শিবিরে। একই সাথে চলছিল অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। তখন ডিসেম্বর মাস। আমি গেলাম জহির রায়হানের কাছে এই ব্যাপারে আলাপ করা জন্য। তাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছিল। আমি কথাটা তুলতেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, “ওয়াহিদ ভাই, এসবের প্রয়োজন হবে না। আমি ১৬ তারিখ ঢাকায় যাচ্ছি।” আমি এই কথার কোনো কিছুই বুঝলাম না। কারণ, দেশ যে মাত্র কদিন পরই স্বাধীন হবে ভাবিনি। যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে দেশ স্বাধীন তখন আমি নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ছিলাম। আনন্দে যে কি করেছি তা বলার নয়। ১৬ তারিখেই দেশ স্বাধীন হয়। সেদিনের কথা জহির রায়হান বলেছিলেন দু’সপ্তাহ আগে।

-ওয়াহিদুল হক

মার্চ, ১৯৮৪



[লিও](https://www.facebook.com/leo.amarblog) এবং [ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<১৫,১৫,১৩৩-৩৪>

# [কণিকা বিশ্বাস]

২৫ শে মার্চ আমি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানী থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলাম এবং সেখান থেকেই পাক বর্বরদের অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ জানতে পারি। জুলাই মাসের শেষ ভাগে ভারত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করি এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকদের সংগঠনের চেষ্টা করি। মে মাসের মধ্যে আমরা বেশ শক্তিশালী হই এবং ৫ই মে গোপালগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা গোপালগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। গোপালগঞ্জ থানা ইনচার্জ নিহত হয় এবং থানা থেকে ৮২ টি রাইফেলসহ বহু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। প্রথমদিকে গেরিলা যুদ্ধে আমরা সুবিধা করতে সক্ষম হলেও মে-র মাঝামাঝি প্রায় হাজারখানেক পাকসেনা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৬ ই মে রবিবার পাক সৈন্যরা গোপালগঞ্জ থানার সাতপাড়া গ্রামে একাধারে পাঁচ ঘন্টা গুলি চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এখানে ১০৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী পাকসেনা কর্তৃক নিহত হয়। ঠাকুরবাড়ীতে গর্তে একই পরিবারের ৮ জনকে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করে।

১৮ ই মে মকসুদপুর থানার ভেন্নাবাড়ী পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সমগ্র গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ কর্মী অমলকে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে হত্যা করা হয়। ভেন্নাবাড়ী ও রথবাড়ী এই দুই গ্রামের মধ্যের বিলই ছিল হত্যাকান্ডের কেন্দ্র। এখানে প্রায় ১৩২ জনকে পাক বর্বররা হত্যা করে। এছাড়া কদমবাড়ী, আনন্দপুর, বেদভিটা, মাদুকান্দি, আড়ুয়াকান্দি, তৈলীভিটা,বৌলতলী, রঘুনাথপুর, গোলাবাড়িয়া এলাকায় পাক সেনারা গণহত্যা চালায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতপাড়া গ্রামে ১০৩ জন, ভেন্নাবাড়ী গ্রামে ১৩২ জন লোককে হত্যা করা হয়। তাছাড়া কদমবাড়ীতে ৮ জন, আনন্দপুরে ৫ জন, বেদভিটায় ১২ জন, মাদুকান্দিতে ৪৫ জন, আড়ুয়াকান্দিতে ২ জন, তেলীভিটায় ৭ জন, বৌলতলীতে ১০ জন, রঘুনাথপুর ১৪৪ জন এবং গোলাবাড়িতে ১৫০ জনকে পাকসেনারা হত্যা করে। এদের অধিকাংশকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের তারা আছাড় মেরে বা বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে।

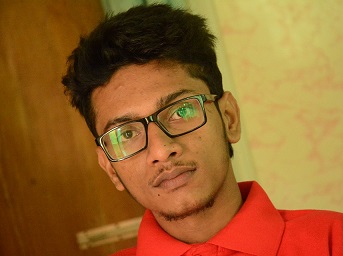
দিন দিন আমাদের বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটাতে থাকলে আমরা বেশ কয়েকজন উন্নত অস্ত্র এবং ভারতের সাহায্যের আশায় জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহে ভারতাভিমুখে যাত্রা শুরু করি। সাতদিন পথ চলার পর অষ্টম দিন ভারতে পৌঁছি। ভারতের বালেশ্বপুর, ব্যারাকপুর পলতাতে অবস্থান করি। কয়েকদিন পর মুজিবনগরে যাই এবং মুজিবনগরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এরপর ঠাকুর নগর সলট লেক,হাসপুর, গয়া, হেলেঞ্চা, খড়েরমাঠ প্রভৃতি স্থানের শরণার্থী শিবিরে সেবাকার্যে আত্ননিয়োগ করি। ৭২-এর মার্চের দিকে আমি দেশে ফিরে আসি।

-শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাস

জাতীয় সংসদ সদস্য

(ফরিদপুর, সংরক্ষিত আসন)

৬ জুন, ১৯৭৩



[মারুফ আহমেদ](https://www.facebook.com/rockstaah.maruf)

<১৫,১৬,১৩৪-৩৯>

# [কাজী জাফর আহমেদ]

১৯৭১ সালে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)’ ও ‘কৃষক সমিতি’ এবং আমাদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত ‘বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন’ ও ‘পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন’-এর সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ছিলাম ‘বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি’। আমাদের মূল সংগঠন ছিল ‘’কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি’’। স্বাধীন জনগনতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠার লক্ষকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আমরা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। সে বৎসরেরই এপ্রিলে আমরা স্বাধীন জনগনতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ করি। এতে পরিকল্পিত রাষ্ট্রকে ‘পূর্ব বাংলা জনগনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’ আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্থান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আয়োজিত এক সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে আমরা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি। এই অভিযোগে পাকিস্থানের সামরিক আইনের অধীনে আমাকে এবং রাশেদ খান মেননকে সাত বতসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয়া হয়, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহকে দেয়া হয় এক বৎসরের কারাদন্ডাদেশ। আমরা আত্মগোপনে চলে যাই, অবশ্য মাহবুব উল্লাহ পরবর্তিকালে গ্রেফতার হন।  
  
১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আমরা বিরোধিতা করি। এর কারণ আমরা তখন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্থানে আর বিশ্বাস করতাম না, তদুপরি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবননাশী নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকদের ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষায় আমরা ছিলাম বিক্ষুব্ধ। অন্যদিকে ইয়াহিয়া ঘোষিত ‘‘লীগ্যাল ফ্রমওয়ার্ক অর্ডারে’র’ অধীনে নির্বাচন এবং এতে বিজয় পূর্ব বাংলার জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। তাই আমরা নির্বাচন বর্জনের আহবান জানাই এবং পাশাপাশি শ্লোগান তুলে ধরিঃ ‘শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা অস্ত্রো ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো’। মাওলানা ভাসানীও নির্বাচন বর্জন করেন এবং ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার আহবান জানান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ে অনেকে আশাবাদী হলেও আমরা বলেছিলাম পাকিস্থানী বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠী যে কোন আজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগনকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে দেবে না। এজন্যই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য স্বাধীনতার আহবান জানাতে থাকি।  
  
’৭১ এর মার্চে আসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আমাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ৭ই মার্চ প্রচারিত এক প্রচারপত্রে আমাদের আহবান ছিল, “‘আঘাত হানো, সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো, জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করো।“

মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের খুব আশান্বিত করতে পারেনি- সেদিনই তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এত বিপুল রক্তক্ষয়কে এড়ানো যেতো। কয়েকজন সহকর্মীসহ আমি তার সাথে দেখা করে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষনা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে কথা বলি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের খারাপ ছিল না। তিনি বলেন ‘তোমাদের গেরিলা যুদ্ধের দরকার নেই,, আমি সব ঠিক করে দেবো। ওখানে আমি, এখানে তাজউদ্দীন, তারপর দেখবে কি হয়’। এই কথায় স্বাধীনতার প্রশ্নে তাকে খুব সিরিয়াস মনে হয় নি- আদৌ তিনি স্বাধীনতার কথা, সশস্ত্র সংরামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা চিন্তা করছিলেন কি না সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় ছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে তিনি তখন ভাবছিলেন বিচ্ছিন্নতার কথা- ক্ষমতায় যাবার পর দাবি করতে না পারলে তিনি হয়ত পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনায় আমরা বিরোধীতা করেছিলাম, কারণ সারা পূর্ব বাংলা তখন জ্বলছে একটি মাত্র দাবিতেঃ স্বাধীনতা।   
  
এই পরিস্থিতিতে আমাদের (বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন)-এর উদ্যোগে ২৫ মার্চ বিকালে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৩ দফা কর্মসূচী তুলে ধরি। এই সভায় আমরা বলেছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তাই সারাদেশে অবিলম্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এটাই ছিল তৎকালীন “পূর্ব পাকিস্থানের” পল্টন ময়দানের শেষ জনসভা। সভা শেষে এক প্রকান্ড মিছিলযোগে আমরা শহীদ মিনারে যাই এবং সেখানে শপথ গ্রহণ করি। কর্মীদের পাঠিয়ে দেই তাদের নিজ নিজ এলাকায়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্থানের সেনাবাহিনী তাদের পৈশাচিক হত্যাকান্ড শুরু করলে আমি আশ্রয় নেই এদেশের প্রগতিশীল সিনেমা আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ জহির রায়হানের বাসায়। তিনি এবং তার স্ত্রী নিজেদের জীবনের ঝুকি নিয়ে আমাকে তিন দিনের আশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জহির রায়হানের গাড়িটিও আমাদের দিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্যে। এই গাড়ী নিয়েই আমি ঢাকা জেলার শিবপুর চলে যাই সেখানে আমাদের সংগঠনের নেতা মান্নান ভূঁইয়া গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট গেরিলা বাহিনী। উল্লেখ করা দরকার যে জহির রায়হানের গাড়িটি যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই শিবপুরে ছিল এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছিলেন।  
  
শিবপুরে আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নেই। হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননকে মাওলানা ভাসানীর সংগে যোগাযোগের জন্যে টাংগাইল পাঠানো হয়। তারা দেখা করতে পারলেও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাননি, কেননা, ৩ এপ্রিলের মধ্যে পাকবাহিনী মাওলানা ভাসানীর সন্তোষ এবং বিন্নাফৈরের দুটি বাড়িই জ্বালিয়ে দেয়। মাওলানা ভাসানী আত্মগোপনে চলে যান।  
  
এদিকে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল নিজ এলাকা কুমিল্লার চিত্তারায় গিয়ে বাম এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে। চিত্তরা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ছিলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আওয়ামী লীগের নাতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন।  
  
২৫ বা ২৬ এপ্রিল আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দেবেন সিকদারের আগরতলা থেকে লেখা একটি চিঠি পাই। ওতে জানানো হয়েছিল যে, ৩০ এপ্রিল ভারতের জলপাইগুড়িতে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বামপন্থিদের এক নীতিনির্ধারনী সভা হবে, আমি যেন অন্য সকলকে জানিয়ে নিজেও চলে আসি। সভা নির্দিষ্ট ৩০ এপ্রিল অনুষ্টিত হলেও সেখানে আমাদের আকাংক্ষিত নেতা মাওলানা ভাষানী উপস্থিত ছিলেন না। জানানো হয় যে, মাওলানা ভাসানীকে ভারত সরকার সীমান্ত থেকে নিয়ে গেছেন। গ্রেফতার কিনা জানা যায়নি। ফলে সভায় উৎসাহ সঞ্চারিত হতে পারেনি। একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হয় যে, আমরা বাম্পন্থীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবো। পরবর্তি সভার তারিখ নির্ধারিত হয় ২১ ও ৩০ মে এবং এর স্থান নির্বাচন ও আয়োজনের দায়িত্ব অর্পিত হয় দেবেন সিকদার ও ন্যাপ সম্পাদক মশিউর রহমানের ওপর। এই সভায় আমি ছাড়া উপস্থিত অন্যরা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অমল সেন, মশিউর রহমান, দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, ডাঃ মারুফ হোসেন, ডাঃ সাইফ-উল-দাহার এবং নজরুল ইসলাম। আমরা ফিরে আসি দেশের অভ্যন্তরে।

পরবর্তী সভা অনুষ্টিত হয় কলকাতায় কিন্ত এতে মাওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন না। তার লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনানো হয় যাতে তিনি লিখেছিলেন যে, বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে তার অসুবিধা আছে, তিনি ভাল আছেন।  
  
মাওলানা ভাসানী আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, তার নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্যে। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে গনচীনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সমর্থন চেয়ে। এ প্রসংগে বলা দরকার যে কাগজে-কলমে না হলেও পরোক্ষভাবে সুকৌশলে মাওলানা ভাসানীকে বন্দী দশায় রাখা হয়েছিল।   
  
এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা শ্রবরোদা ভূষণ চক্রবর্তী। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে ‘জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমন্বয় কমিটি’ গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন দেবেন সিকদার (পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি) নাসিম আলি (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-হাতিয়ার) অমল সেন (কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র) ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার (কমিউনিস্ট কর্মী সঙ্ঘ) এবং আমি (কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি) । সভায় গৃহীত স্বিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্ব লাভ করি আমরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় ঘোষণাটি ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিলো। এতে বিভেদের নীতি পরিহার করে সকল বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশগ্রহনের আহবান জানানো হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তিনি হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীনে কমিউনিস্টদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা উল্লেখ করেন, তাদের প্রচারপত্রের প্রসংগও টেনে আনেন। আমরা বলি হক-তোয়াহারা যা করেছেন তা নিজের দায়িত্বেই করেছেন, এর সংগে বামপন্থীদের বিরাট অংশটি আদৌ জড়িত নয়। আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দীন জানান যে তাকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদের উপস্থিতি সে অপ্রিয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।  
  
দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ আটক করে নিয়ে যায় শিলং- এর একটি ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। ঘটনাটিকে আমি গ্রেফতার বলবো না, কেননা, কোন খারাপ আচরণ আমার সাথে করা হয়নি। কিন্তু সাত দিনব্যাপী আমাকে অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যতিব্যস্থ রাখা হয়। আমাকে প্রশ্ন করছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মিঃ সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে ‘নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা’ হিসাবে বোঝাতে চাচ্ছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থিদের ভূমিকা সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছিলো। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ ও ভারতের প্রতি বামপন্থিদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলামঃ এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান সমস্যা পাকিস্থানের সেনাবাহিনী; এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে চাই, আওয়ামী লীগের সাথে মতপার্থক্যসমূহ এখন আমরা তুলে ধরবো না- তাদের সাথে আমাদের সমস্যা সমূহের মীমাংসা আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে করবো, যুদ্ধের মধ্যে কিংবা ভারতের অভ্যন্তরে নয়। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনার প্রসঙ্গে আমি বলেছিলামঃ ভারতের পক্ষে সেটা উচিত হবে না, আমরা বাংলার মাটিতেই শত্রুদের খতম করবো। স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে আনতে চাই কারো অনুগ্রহে পেতে চাই না।   
  
অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে ব্যর্থ আলোচনার পর আমরা নিজেদের উদ্যোগে যেখানে যতটুকু শক্তি নিয়ে যেভাবে সম্ভব স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখি। মুজিবনগর সরকারকে আমরা অস্বীকার করিনি, কিন্ত তাই বলে প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগও রাখিনি, সহযোগিতাও পাইনি। সরকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন ছিল, সমালোচনা ছিল, কেননা তারা আওয়ামী লীগের বাইরে বিশেষ করে বামপন্থীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে অযৌক্তিক সংকীর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি আমাদের হতাশ করেছিল। এজন্যেই আমরা নিজেদের উদ্যোগে লড়াই চালিয়েছিলাম।  
  
স্বাধীনতাযুদ্ধকালে আমাদের নীতি ছিল দুটিঃ   
  
১। যেখানে সম্ভব বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারি মুক্তিবাহিনীতে যোগদিয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং (২) কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলে কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে ‘গেরিলা ফৌজ’ গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিল ‘গেরিলা ফৌজ’। এর গঠন প্রণালী ছিল- পাঁচ থেকে সাতজন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে হত একটি আঞ্চলিক ইউনিট। এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ ২৫ মার্চের জনসভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল।   
  
দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আমাদের কর্মীরা মুক্তিবাহিনীর সাথে একযোগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেটা সম্ভব না হওয়ার বিশেষ কয়েকটি এলাকায় গেরিলা ফৌজ গঠন করতে হয়। এই এলাকাগুলো ছিল নিন্মরূপঃ

১। ঢাকা জেলার শিবপুর, মনোহরদি, রায়পুর ও কলিগঞ্জ নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এই এলাকায় যুদ্ধকালে অন্য কোন বাহিনী গঠিত হয় নি, এমনকি রাজাকার বা বদর বাহিনী ও গঠিত হতে পারেনি। প্রসংগত একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিলঃ মাঝে মাঝে মিথ্যে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে এখানে মুক্তি বা মুজিব বাহিনীকে পাঠানো হত আমাদের যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার জন্য। প্রায় ক্ষেত্রেই উল্টোটি ঘটতো, কিংবা গেরিলা তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে আগত যোদ্ধারাও দলভূক্ত হয়ে যেতেন। এই এলাকায় আমাদের বিখ্যাত কমান্ডার ছিলেন পাকিস্থানের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য নেভল সিরাজ। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধকালে এই এলাকাটি আমাদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।  
  
২। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে গেরিলা ফোউজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।  
  
৩। টাংগাইলে প্রথমদিকে গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে মতৈক্যের আমাদের প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা অংশ নেন। কাদের সিদ্দিকি দলীয় সংকীর্ণতায় থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কর্মীরা তার নেতৃত্বে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।  
  
৪। খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় সৈয়দ কামেল বখতের নেতৃত্বে প্রায় দু’হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে যুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বলে কথিত একদল লোকের হাতে বীরযোদ্ধা কামেল মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া বাগেরহাট সদর, বিষ্ণুপুর, রঘুনাপুর প্রভৃতি এলাকায় গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা খুব কম ছিল।   
  
৫। রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় দু’হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। সেখানে আমাদের গেরিলারা স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য এক বামপন্থী নেতা অহিদুর রহমানের সাথে তাদের সংগাত হয়।   
  
৬। ফরিদপুরের বোয়ালমারী এবং মাদারীপুরের একটি অঞ্চলে নিয়ে সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে উঠেছিল।  
  
৭। চট্রগ্রাম শহর ও রাইজান এলাকায় শামসুল আলমের নেতৃত্বে কয়েকশত গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তিবাহিনী বা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় নি। এখানে আমাদের যোদ্ধারা প্রধানতঃ চট্রগ্রাম শহর এলাকায় গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করছিলেন।   
  
৮। নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চলে গড়ে ওঠেছিল কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ।  
  
আগেই বলেছিঃ কেবল সেই সব অঞ্চলেই গেরিলা ফৌজ গঠিত হয়েছিল যেখানে সরকারি মুক্তিবাহিনী (বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআরসহ) ছিল না কিংবা থাকলেও সংকীর্ণতার কারণে ওতে আমাদের কর্মিরা যোগ দিতে পারেনি। দেশের অন্যসকল এলাকায় কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন- কোন প্রকার দলীয় বিভেদাত্মক কার্যকলাপ তারা চালান নি। সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধ শেষে হিসেব অনুযায়ী যুদ্ধশেষে আমাদের সংগঠনের কর্মী সব মিলিয়ে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। দেশের অভ্যন্তরে একমাত্র শিবপুর এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুদ্ধকালে যে ক’জন সামরিক অফিসার সহযোগিতা করেছিলেন তারা হলেনঃ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশারফ, মেজর এম এ জলিল। এছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়তো। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তারা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন। মেজর জিয়ার জেড ফোর্সে আগস্টের দিক থেকে আমাদের প্রায় এক হাজার যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা দুটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলামঃ একটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ওপারে এবং অন্যটি কিশোরগঞ্জ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।  
  
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পক্ষে সরাসরি নেতৃত্ব বা যোগাযোগ প্রতিষ্টা করা সম্ভব ছিল না, ফলে যেখানে কমিটির যে সংগঠন বেশি শক্তিশালী ছিল সেখানে অন্য সংগঠনের সদস্যরা তার অধীনে মিলিতভাবে যুদ্ধ করতো। সংগঠন হিসাবে আমাদের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নিজেদের মধ্যে মোটামুটি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতো। যেখানে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সেখানে পূর্বঘোষিত নির্দেশানুযায়ী কর্মীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কোন পর্যায়েই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতধারার সাথে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। মাও সে তুঙ্গের চিন্তাধারা প্রেরণার অন্যতম উৎস হলেও যুদ্ধাকালে গনচীনের ভূমিকার আমরা তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। মার্কিন সম্রাজ্যবাদ ছিল আমাদের ঘোষিত শত্রু। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে ভারতের সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানালেও সে প্রশ্নে আমাদের সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। আমরা কোন পর্যায়েই চাইনি ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক। ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগীতা আমাদের উপকারে এসেছে। এই সাহায্য ছিল প্রধানত নৈতিক। অনেক সময় তাঁরা আমাদের আশ্রয় এবং খাওয়ার ব্যাবস্থা করেছেন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের ফলে শত্রুর হামলার কবল থেকে আমাদের জীবনও বেঁচে গেছে।

যুদ্ধ চলাকালে বাঙালি সামরিক অফিসারদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান,, মেজর খালেদ মোশারফ এবং মেজর আবুল মঞ্জুর আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের একাংশের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ। ভারতের সেনাবাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপও তাদের ক্ষুদ্ধ ও নিরুৎসাহী করতো বলে মনে হয়েছে।  
জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমদিকে মেজর জিয়া আমাকে সাথে নিয়ে জীপ চালিয়ে ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জ গিয়ে ফিরছিলেন। চার শ’ কিলোমিটার পথে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টাব্যাপী আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেনঃ “ভারত চায় না যে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হোক এবং এজন্যেই আমার মনে হয় ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কারণ ভারত একটি ব্যাপারে ভীত- গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্ভিত হলে তার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে না।  
  
মেজর জিয়ার এই আশংকার সত্যতার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই আগস্ট মাসে। এই সময় কলকাতার একটি হোটেলে আমার সাথে আলোচনা হয় মুজিব বাহিনীর দুই নেতা এবং আমার এককালীন বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের সাথে। মুজিব বাহিনী গঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছিলেনঃ “আমরা নিশ্চিত নই যে মুজিব বেঁচে আছেন কিনা, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা। যদি না আসেন তাহলে যে শুন্যতার সৃষ্টি হবে তার জন্যই মুজিব বাহিনী-যাতে (পরিহাসচ্ছলে) তোমরা কিংবা সামরিক বাহিনীর কোন বাঙালি অফিসার সে শুন্যতার সুযোগ নিতে না পারে। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা গিয়েছিল যে তাঁরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোন কোন কমান্ডার সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় কিংবা আশংকায় আছেন।  
  
ভারতসহ বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রগতিশীলরাও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছিলেন। বিশেষ করে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিরা এ ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ ভূমিকায়।

-কাজী জাফর আহমদ

মার্চ, ১৯৮৪



[সানজানা এস পায়েল](https://www.facebook.com/sanjana.shaibal)

<১৫,১৭,১৩৯-৪২>

# [ডঃ কামাল সিদ্দিকী]

১৯৭০ সালের মাঝামঝি আমি নড়াইলে এস, ডি, ও হিসেবে যোগদান করি। নড়াইলে আসার পর বিভিন্ন প্রশহাসনিক কাজকর্মের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্ব পালন করা অন্যতম ছিল। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে পরে, যেহেতু রাজনৈতিক কর্মীদের আমি সবসময় জামিনে মুক্তি দিতাম। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এটা চাইত না। এবং তাদের অনুরোধ বা উপরোধ উপেক্ষা করার ফলে তারা আমাকে শুভ নজরে দেখত না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমি নড়াইলেই ছিলাম। এই নির্বাচনকে সৎ নির্বাচন বলা যায় এবং আওয়ামীলীগ সামগ্রিকভাবে সমস্ত আসনে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে জয়লাভ হলেও পরিস্থিতি আমার কাছে ভালো ঠেকছিলো না। মার্চের প্রথমদিকে আমি ঢাকায় আসি এবং সামগ্রিক অবস্থা দেখে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তানিদের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা ব্যর্থ হবে। আমার এ ধারণা একক ছিল না। অনেকেরই এরূপ ধারণা ছিল। ৮ ই মার্চ আমি নড়াইলে ফিরে যাই। সেখানেও উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং বিভিন্ন মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাঙালিরা রাজপথে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করছিল।

১১ ই মার্চ একটি ঘটনা ঘটে যায়, ফলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়। ঐ তারিখে আমি ক্যান্টনমেন্টে কোন একটা কাজে গাড়ি নিয়ে যাই। আমার গাড়িতে কালো ফ্ল্যাগ ছিল। এই ফ্ল্যাগ দেখা মাত্র পাহারারত সৈনিক চিৎকার করে আমাকে নামতে বলে এবং গুলি করতে উদ্যত হয়। গাড়ি থামাবার পর সে আবার বলে কালো পতাকা নামাও। আমি উত্তর দেই যে আমি কিছুতেই কালো পতাকা নামাব না। সৈনিকটি তখন বলে কালো পতাকাসহ ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করা চলবে না। আমি বলি, কালো পতাকা ছাড়া ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে করতে পারি না এবং সেখান থেকেই ফিরে আসি। এ ব্যাপারে আমি প্রেসে একটি বিবৃতি দিই। তোফায়েল আহমদও এই ঘটনার ওপর একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

২৫ শে মার্চ একটি জরুরী কাজে আমি খুলনায় অবস্থান করেছিলাম। ২৫শে রাত্রির ঘটনার পর ২৬ তারিখে রূপসা নদী পার হয়ে আমি কালিয়ায় পৌঁছি। সেখানে একটি জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা দিই এবং বলি যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এখন লড়তে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

১৪ই মার্চ ঝিনাইদহে আমরা কয়েকজনে সরকারী কর্মচারী মিলিত হই। এর মধ্যে ছিলেন তৌফিক এলাহি চৌধুরী, শাহ ফরিদ, মাহবুব (পুলিশ) এবং অন্য কয়েকজন। এখানে আমরা শপথ নেই যে , প্রয়োজন হলে দেশের জন্য অস্ত্র ধারণ করবো।

২৭শে মার্চ নড়াইলে ফিরে এসে দেখি যে, অবস্থা বেশ খারাপ। নড়াইল কম-বেশি জনশূন্য এবং লোকেরা অত্যন্ত ভীত। আমি একটি মাইক নিয়ে শহরের রাস্তায় নেমে পড়ি এবং ৪ টায় একটি সমাবেশের আহবান করি। এই সমাবেশে আমি ঘোষণা করি, নড়াইল স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু রেডিওতে শুনেছিলাম জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সামরিক নেতৃত্ব দান করছেন আমরাও সৈনিক হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এই সভাতে কয়েকজন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি যুদ্ধ পরিচালনা কাউন্সিল গঠিত হয়। কয়েকজন আনসার এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। মানুষের মাঝে যে কি বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল তা বর্ণনা করা যায় না। নিম্নবর্ণের বেশ কিছু হিন্দু শুধুমাত্র তীর-ধনুক নিয়েই এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। যশোর এবং মাগুরা থেকে লোকজন এসেও এই গণবাহিনীর সদস্য হয়।

২১ শে মার্চ প্রায় চার লক্ষ লোকের এই বিশাল গণবাহিনী যশোর আক্রমণ করে।

*--এখানে একটা ভুল আছে, তারিখটা ২১ শে মার্চ হবে না, ২৮ বা ২৯ শে মার্চ হতে পারে।*

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য পাকিস্তানীদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা সহজেই বুঝেছিল যে, এই বিশাল জনস্রোতকে সামনাসামনি পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এক কথায় তারা ভীতি ছড়িয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায়। বহু পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এরই মধ্যে তারা লুটতরাজ ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছিল। বহু বিহারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদের অনেকেই আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে।

নড়াইলে ফিরে এসে আমরা জনগণকে সংগঠিত করার ভূমিকা গ্রহণ করি। সবাই এগিয়ে এসেছিল যার যা ছিল তা নিয়ে। খাদ্যদ্রব্যের প্রশ্ন তো বাদই দিলাম। জনগণের মধ্যে তখন একটাই ইচ্ছা ছিল এবং সেটি হচ্ছে মার্চ করে আক্রমণ করা।

কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে এত সহজেই হার মানানো সম্ভব নয়। তারা বিশাল কামান দিয়ে নড়াইলের ওপরে আক্রমণ চালায় এবং আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় তিনশত আনসার কামানের গুলিতে মারা যায়। এছাড়া বিমান বাহিনী প্রায় সারাক্ষণ নড়াইলের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আমি অন্যদের সঙ্গে সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করি। এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ শোনা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিচারে তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং কয়েকশত বন্দীকে গুলি করে এই দন্ড কার্যকর করা হয়।

আমরা পাকিস্তানী প্রশাসনযন্ত্রকে বিকল করে দিয়েছি, জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর ফলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন জনগণের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার কাজ। আমি সরকারি কর্মচারীদের ছয় মাসের বেতন দিয়ে বলি যে, অফিসে তারা যেন আর ফিরে না আসে। সক্ষম যোদ্ধাদের বলি সীমান্তের দিকে চলে যেতে যেহেতু নড়াইলকে আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এরপর আমি নড়াইল ত্যাগ করি। আমার ইচ্ছা ছিল বাবা-মার সাথে শেষবারের জন্য একবার দেখা করা এবং সে উদ্দেশ্যেই আমি এপ্রিল মাসের ৭/৮ তারিখে ঢাকায় আসি।

ঢাকায় আমাদের বাসার দিকে যখন রওয়ানা হচ্ছি তখনই আমার একজন পরিচিত লোকের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে জানান যে, নড়াইলের সব ঘটনার খবরই ঢাকায় এসে পৌঁছে গেছে। সেনাবাহিনী জানে আমি বহু পাকিস্তানী হত্যা করেছি। যদি বাসায় যাই, আমাকে তো ধরে হত্যা করা হবেই, বাবা-মাও আর বাঁচবে না। একথা শোনার পর আমি স্কুটার নিয়ে নয়ারহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং রাজবাড়ী হয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে যেতে থাকি। পথের মধ্যে লক্ষ্য করি সব জায়গাতেই বিহারীরা অত্যন্ত তৎপর। চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যখন নৌকা করে যাচ্ছি তখন একটি বিমান এসে নৌকার ওপর গুলি ছোড়ে। আমি পানিতে লাফ দিয়ে জীবন রক্ষা করি এবং শেষে কলকাতায় পৌছি।

কলকাতায় গিয়ে কীড স্ট্রিটে সমবেত হই। এখানে বহু এমপির সাথে সাথে দেখা হয় এবং ১৭ ই এপ্রিলের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথাও জানতে পারি। এর পরে পাকিস্তানী দূতাবাসের জনার হোসেন আলী এবং আনোয়ার করিম চৌধুরীর সাথে দেখা করি এবং সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিই। তাদের বক্তব্যও আমি শুনি। তবে আমার মনে হচ্ছিলো যে, কলকাতায় আমার অবস্থানের কোন প্রয়োজন নেই, এবং আমি তখন খুলনা সীমান্তের গজাডাঙ্গা ক্যাম্পে যোগদান করি। এই ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন।

মে এবং জুন মাস ট্রেনিং এবং ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনার মধ্যে কাটে। জুন মাসের শেষে জেনারেল ওসমানী এই ক্যাম্ম্প পরিদর্শনে আসেন এবং আমার খোঁজ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, মুজিবনগর সচিবালয়ে আমার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আমার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও করার কিছু ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। আমি কলকাতায় ফিরে আসি এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে সাধারন প্রশাষণ বিভাগের সচিব জনাব নুরুল কাদের খানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব যোগদান করতে আদেশ দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশতাকের সাথে এর পূর্বে আমার কোন আলাপ ছিল না। যাই হোক তাঁর সাথে আমি কাজ করতে শুরু করি। আমার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া যারা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করতে চাইতেন তাদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন আদেশ পৌছিয়ে দেয়া। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যে সকল আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব দেখা করতে আসতেন, তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেয়াও আমার কাজের অংশ ছিল। যেহেতু খন্দকার মোশতাক সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন, সেহেতু সংসদ সদস্যদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন সংসদীয় উপদল এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও আমার দায়িত্বের মধ্যেই এসে পড়ে।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দিকে খন্দকার মোশতাক মুজিবনগর সরকারের ভেতর কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ছিল যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। অতএব, যদিও জাতিসংঘ প্রেরিত প্রতিনিধিদলে তাঁর নেতৃত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তাকে বাদ দেয়া হয় এবং তাঁর স্থলে দলের প্রধান হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে খন্দকার মোশতাকের ভুমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। তিনি মুজিবনগর মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকলেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহলে তাঁর প্রভাব একেবারেই ছিল না। যখন থেকে এই অভিযোগ প্রচারিত হল যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরকারের অনুমতি ছাড়া যোগাযোগ করছেন তখন তিনি প্রায় গৃহবন্দি ছিলেন। একবার তিনি গঙ্গার পারে সান্ধ্য ভ্রমণের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেন।

সংসদ সদস্যদের ব্যাপারে আমার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল এবং সেই সূত্রে আমি জুলাই মাসে বাগডোগরায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা দেখে বিচলিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সদস্যরা নানাদলে-উপদলে বিভক্ত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সবার মনোভাব সমানভাবে সুদৃঢ় ছিল না। এমনকি অনেক সংসদ সদস্য ও নেতারা পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে আপোষ করার পক্ষেও মত প্রদান করেন। এইসব দেখে আমার মনে হচ্ছিলো যে এরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে হয়তো বা সবকিছু ভণ্ডুল করে ফেলতে পারেন। একক উদ্দেশ্যে সবাই কাজ করছিলেন না। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতীয় রণনীতির পাশে এইসব প্রশ্নের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে আসে।

বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিদের প্রতি আওয়ামি লীগের মনোভাব বৈরী ছিল। নীতি হিসেবে নয়, কিন্তু বহু আওয়ামী লীগ নেতা এদের বিরোধিতা করতেন। যেমন শিবপুর এলাকায় বামপন্থী নেতা মান্নান ভুঁইয়া একটি মুক্ত মঞ্চ গড়ে তোলেন। এটি অনেক আওয়ামী লীগের লোকজন সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে, বহু সদস্য সরকারের কাছে দাবি তোলেন যে, মান্নান ভুঁইয়াকে হত্যা করা হোক এবং তাঁর সংগঠন ধ্বংস করে দেয়া হোক। অন্য একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে, কিছু সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে ইসরাইলের অনুপ্রবেশের চেষ্টা। ইসরাইল সরকার ভারতীয় ডানপন্থী রাজনীতিকদের সাথে যোগাযোগ করেন। তারা আবার বাংলাদেশে কিছু সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ইসরাইলী সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই খারাপ ঠেকে এবং আমি সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব বহির্ভূত একটি কাজ করি। আমি তথ্যটি সিপিএম-এর পত্রিকায় জানিয়ে দিই এবং খবরটি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইসরাইলী লবীর তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় মাওলানা ভাসানীর সঙ্গেও আমার দেখা হয়। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তাঁর দেখা শোনা করার জন্য কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নি। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে তিনি কলকাতায় ছিলেন এক প্রকার বন্দির মত। আমি নিজে থেকেই তাঁর কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করি। একটি ব্যাপার বেশ মনে পড়ে। তিনি এসবের মধ্যেও তাল টুপির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি সারা কলকাতা খুঁজে তাঁর জন্য এই টুপি সংগ্রহ করি।

এছাড়া মাওলানা বাসানীর বিভিন্ন বক্তব্য আমি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতাম এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে খবর নিয়ে যেতাম। যথা- উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হওয়ার অনুরোধ খন্দকার মোশতাকের পক্ষ থেকে ভাসানির কাছে আমি বহন করি। খন্দকার মোশতাক অবশ্য চেয়েছিলেন যে, মাওলানা ভাসানি যদি এই পরিষদের সদস্য হন, তবে তাঁর নিজস্ব মতামত ভারতবিরোধী জাতীয়তাবাদ, আরও শক্তিশালী হবে। সে সময়ে অবশ্য খন্দকার মোশতাকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল।

ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পর সব জল্পনা-কল্পনা এবং কোন্দলের সমাপ্তি ঘটে। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হয় এবং ১৮ তারিখ আমি খুলনার ডি,সি হিসেবে যোগদান করি।

-ডঃ কামাল সিদ্দিকী

মার্চ, ১৯৮৪



[লিও](https://www.facebook.com/leo.amarblog), [অমিতাভ বড়ুয়া](https://www.facebook.com/amitav.barua.12?fref=ts), [আশফাকুল ইসলাম তন্ময়](https://www.facebook.com/pathorer.golpoker) এবং [মোঃ রাশেদ হাসান নোবেল](https://www.facebook.com/profile.php?id=100007677672028)

<১৫,১৮,১৪৩-৯৩>

# [ডঃ কামাল হোসেন]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আইয়ুব সরকার প্রচুর পাঞ্জাবি সেনা এবং এলাকা হারিয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীতে কোন অর্জন দেখাতে পারে নি। তাই পাকিস্তান আর্মির ভেতরেও তাঁর সমর্থন কমে গিয়েছিল। রাশিয়ার চাপে ইন্ডিয়ার সাথে শান্তির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত তাসখন্দ চুক্তি পাঞ্জাবিদের কাছে ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। এই চুক্তি করার পেছনে অবশ্য আইয়ুব নিজের অবস্থান জোরালো না করে বরং সামগ্রিক অবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং হারানো এলাকা ফিরে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। এই যুদ্ধের পিছে আইয়ুবকে উস্কানী দেয়া ভুট্টোও এ সময় নিজেকে আইয়ুবের পিছন থেকে সরিয়ে নেন এবং সবখানে এই চুক্তি বিরোধী বক্তব্য দিতে থাকেন। এভাবেই ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের ক্ষমতায়নের পর যে সকল পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদ রাজনীতির ময়দান থেকে পার্শ্বসারিতে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরাও একটি অসন্তুষ্ট আর্মির সাথে একজোট হয়ে আইয়ুবকে ধীরে ধীরে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ খুঁজে পান।

পূর্ব পাকিস্তানের জনতার মনোভাব ছিল পুরোই বিপরীতধর্মী। তাঁরা যুদ্ধকালীন নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ‘উন্মুক্ত’ এবং অরক্ষিত মনে করছিল। ভুট্টো বলেছিল যে ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তান আক্রান্ত হলে বন্ধুসুলভ চৈনিকেরা তা রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। তবে এটি ছোট্ট একটি স্বান্তনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই তাসখন্দ চুক্তিকে পূর্বাঞ্চলের প্রায় সকলেই আশির্বাদ হিসেবেই গণ্য করেছিল।

১৯৬৬ সালে পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদরা আইয়ুবের নিকট হতে রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং ‘জাতীয় সরকার’ প্রণয়নে জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে বাঙালিরা যদি এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে, তবেই শুধু তা সত্যিকার অর্থে সম্ভব। তাঁরা যে এতে শেখ মুজিবকে সংযুক্ত করতে চায়, তা প্রচারসংখ্যার শীর্ষে থাকা বাঙালি দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকের প্রভাবশালী সম্পাদক মানিক মিয়া (তফাজ্জল হোসেন) বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাবি বিরোধী দলীয় নেতাদের একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনে পাঞ্জাবি নেতারা একটি সাধারণ আইয়ুব বিরোধী জোট গঠনের জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং ‘নিশ্চিত’ ছিলেন যে আর্মি তাঁদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। তাঁরা চাইছিলেন মানিক মিয়া যেন শেখ মুজিবকে রাজি করিয়ে এই আইয়ুববিরোধী জোটে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু মানিক মিয়া জানতেন যে ঢাকায় সকলে তাঁকে প্রশ্ন করবেন যে, আইয়ুবকে সরিয়ে আরেক দল পাঞ্জাবি নেতাদের ক্ষমতায় বসালে কি বাঙালিদের সাথে চলে আসা অবিচার কমবে? তাই তিনি পাঞ্জাবিদের স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করলেন যে, তাঁরা রাজধানী কিংবা কোন একটি সরকারি সেবাখাতের হেডকোয়ার্টার পূর্ব-বাংলায় স্থানান্তর করতে কিংবা সংখ্যাসাম্য নয় বরং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতায়নে রাজি আছেন কিনা।

জবাবে তাঁরা বলেছিলেন, “আগে আইয়ুবের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিই, তারপর দেখা যাবে যে কিভাবে তা আমাদের মাঝে ভাগ-বটোয়ারা করা যায়।“

পাকিস্তানের প্রথম দশকে এঁদের সুচিন্তিতভাবে সংগঠিত বৈষম্যের কথা বাঙালি ভুলে নাই। বাঙালি ভালোভাবেই জানতো যে ‘এক-কেন্দ্র’ এবং ‘সংখ্যাসাম্য’-র নীতি এঁদেরই বুদ্ধি। তাই এই ধরণের জোট গঠনের ফলে পূর্ব-বাংলার সুবিধা বর্ধন নিয়ে কিছু সন্দেহের অবকাশ ছিল। কেন্দ্র ও প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক তথা বাঙালির দাবিকৃত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন সম্পর্কে যদি আগেই কিছু সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকতো, তবে এ ধরণের জোট গঠনে বাঙালিদের কিছু লাভ হতো বটে।

মানিক মিয়ার প্রত্যাবর্তনের পরেই জানুয়ারীতে আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। এসে তিনি বাঙালি বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান। তখনকার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব বাদে যে সকল নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাঁরা সকলেই ছিলেন সনাতনী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। যেমন নুরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী এবং অন্যান্য। আইয়ুবের সাথে মিটিঙের আগেই সেখানে পেশ করার জন্য কিছু সাধারণ দাবীদাওয়া নিয়ে একমত হওয়া প্রসঙ্গে ইনফর্মালি আলোচনা করার জন্য শেখ মুজিব অন্যান্য বাঙালি নেতাদের চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উনি সেখানে কিছু নির্দিষ্ট দফা অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেও চাপ দিলেন, যেগুলো স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রশ্নে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষা করবে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথমবারের মতো কাগজের বুকে দফাগুলো লেখা হয়েছিল। দলের তদকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ সেই দফাগুলো কাগজে লিখেছিলেন। শেখ মুজিব নুরুল আমিনকে তাঁদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য চাপ দিলেন। নুরুল আমিনসহ অন্যান্য সনাতন আওয়ামিপন্থিরা এত বেশি প্রথাবিরোধী স্বায়ত্তশাসন দাবী করার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা দ্বিধান্বিত ছিলেন যে এগুলো পেশ করলে আইয়ুব ক্ষেপে যাবেন এবং অন্যান্য ‘মধ্যমপন্থি’ দাবীসমূহ যেমন ‘সংবিধানের গণতান্ত্রিকীকরণ’, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং জাতীয় সরকারে বিরোধী জোট প্রভৃতি ঝুলে যাবে। তবে মুজিব অবিচল ছিলেন। বললেন, অন্যরা এই ৬ দফার প্রতি সমর্থন না জানালেও তিনি নিজেই এই দাবি তুলবেন। মিটিঙে হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন বাঙালি নেতাদের তরফ থেকে মনোনীত বক্তা। তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে শেখ মুজিব অস্বীকৃতি জানালেন। তাই আইয়ুবের সাথে মিটিং শুরু হয়ে সিরিয়াস কোন আলোচনা ছাড়াই শেষ হয়ে গেল।

পাঞ্জাবী বিরোধীদলীয় নেতারা ৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক বিরোধী দলীয় জাতীয় সম্মেলনে আহ্বান করেন। আমন্ত্রিত বাঙালি নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিব। মানিক মিয়ার অনুরোধে মুজিব সেখানে উপস্থিত হন। মানিক মিয়া বুঝেছিলেন যে, শেখ মুজিব সেখানে না গেলে পূর্ব-পাকিস্তানের সবচেয়ে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। তবে তিনি মুজিবকে স্বায়ত্ত্বশাসনের দফাগুলো পেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, সেগুলো আরেকটু নমনীয় করতে। যদিও শেখ সেই দফাগুলো উত্থাপনে অবিচল ছিলেন।

লাহোর কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মদ আলী। শেখ যখন দফাগুলো উত্থাপন করতে চাইলেন, তখন তিনি তা বাতিল করে দিলেন। এমনকি তিনি তা আলোচ্যসূচিতেও রাখলেন না। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে ৬ দফা আসলে সরকারের ‘সমর্থনেই’ উত্থাপন করা হচ্ছে যেন বিরোধী জোটের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।

সমাবেশে দাবীনামা উত্থাপন করতে দেয়া না হওয়ায় শেখ মুজিব ওয়াক-আউট করলেন এবং সরাসরি প্রেসে গিয়ে তা প্রকাশ করে দিলেন। সমাবেশে বিরোধী নেতারা ক্ষেপে গেলেন। তবে এ কথা বুঝলেন যে স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রশ্নে বাঙালির প্রতিনিধিত্বকারী শেখ কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদের সাথে থাকবেন না।

এভাবে লাহোর সম্মেলন ভেঙে গেল। বিস্তারমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিপেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীতে পাঞ্জাবি ও কিছু দুর্বল সনাতন আওয়ামী নেতাদের সাথে শেখ মুজিবের বিভেদটা প্রকট হয়ে উঠলো।

সরকার এই সুযোগটা কাজে খুব দ্রুত কাজে লাগালো। একদিকে পাঞ্জাবি বিরোধীদলীয় নেতাদের এই বলে দোষ দিতে লাগলো যে তাঁরা পূর্ব আর পশ্চিম বিরোধীজোটের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারেন নাই এবং শেখ মুজিবের সাথে সম্মিলিতভাবে পাঞ্জাবিদের সাথে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন। কারণ মুজিবের ৬ দফা পাঞ্জাবিদের স্বার্থে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। এইসব প্রচারের মাধ্যমে সরকার শাসক শ্রেণির উচ্চ পদাধিকার প্রাপ্ত বিভক্ত পাঞ্জাবিদের এবং বিরোধী জোটের দাবীতে নিজ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টায় লিপ্ত একটি অংশের মধ্যে পুনরায় ঐক্য ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

অবশ্য ভুট্টো ও আইয়ুবের আইনমন্ত্রী এস, এম জাফরসহ অনেকেই উল্টো সরকারকে দোষ দিতে থাকে এই বলে যে, মুজিবকে ৬ দফা পেশ করার জন্য সরকারের নিকটবর্তী কেউ ইন্ধন দিয়েছে যেন পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। অবশ্য এই দাবী দৃশ্যমানভাবে ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ পরবর্তীতে আইয়ুব সরকার ৬ দফার বিপরীতে প্রবল দমনপীড়ন চালায়।

৬ দফা ছিল একটি লিখিত দলিল। একে লাহোর সম্মেলনে উপস্থাপন করার কথা ছিল। এর শিরোনামে ছিল “৬ দফা-আমাদের বাঁচার দাবী, পেশকারীঃ শেখ মুজিবুর রহমান, ২৩ মার্চ ১৯৬৬”। এটিকে পেশ করা হয়েছিল একটি বিবৃতি হিসেবে, “দেশের আন্তঃপক্ষীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের সুনির্দিষ্ট সমাধানের মূলনীতি” হিসেবে। এখানে দাবীগুলোকে এই বলে জোর দেয়া হয়েছিল যে, “এগুলো আমার কিংবা অন্য কারো আবিষ্কৃত নতুন কোন দাবী নয়, বরং এগুলো বহু দশক যাবৎ চলে আসা অপেক্ষমাণ জনতার ও তাঁদের নেতাদের দাবী।”

সেই বিবৃতি থাকা ৬ দফাগুলো হলোঃ

১নং দফা

**ঐতিহাসিক লাহোর- প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে সংসদীয় সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।**

২নং দফা

**যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র-এই দুইটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।**

৩নং দফা

**মুদ্রা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবেঃ**

**(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে, অথবা**

**(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ অবস্থায় সংবিধানে এমন কার্যকর বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন করতে হবে।**

**৪নং দফা**

সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রসরকারের সে ধরণের ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনার নির্ধারিত অংশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে ব্যবহৃত হবে। প্রদেশগুলোর সংগৃহীত অর্থের নির্ধারিত পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হবে।

**৫নং দফা**

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) স্বদেশী দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

(৫) সাংবিধানিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানী করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

**৬নং দফা**

পূর্ব পাকিস্তানে একটি মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

১ নং দফাতে সংসদীয় সরকারের সেই মৌলিক দাবিটিই উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ১৯৬৬ এর প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এটি আলাদা গুরুত্ব পেয়েছিল। আইয়ুব যে সংবিধানের ভিত্তিতে সরকার চালাচ্ছিলেন তাতে প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির হাতেই সর্বময় ক্ষমতা ছিল। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেশন মূলক সরকার পদ্ধতির দাবী দ্বারা মূলত তুলে ধরা হয়েছিল যে লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর জন্য “সার্বভৌম স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা” সন্নিবেশ করা হয়েছিল। ফলে লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশসমুহের জন্য “সার্বভৌম” স্বতন্ত্র ষ্টেট প্রতিষ্ঠা করা তার ভিত্তিতেই ফেডারেশন সরকারের দাবী করা যায়। পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ একমাত্র অবাধে ও স্বেচ্ছায় যেভাবে চায়, ঠিক সেভাবেই একটি ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে একত্র হবে এবং ফেডারেশনের চরিত্র নির্ধারিত হবে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে- এমন রূপরেখা লাহোর প্রস্তাবেই অঙ্কিত ছিল। ‘আন্দাজে’ কোনো মডেল আরোপ করা হলে সেটা হবে নির্মম। ফেডারেল সরকারের এই আরোপণের ক্ষমতা তখনই থাকবে যখন সকল সাংবিধানিক একক সত্ত্বা ‘একমত হয়ে’ তাকে এই ক্ষমতা প্রদান করবে। স্বার্বভৌম এককসমূহ যত অল্পই হোক ফেডারেল সরকারকে মেনে চলতে পারবে এবং তাদেরকে নিজ নিজ সম্মতির বেশী অধিকার ছাড় দিতে বাধ্য করা যাবে না। ফেডারেশন সরকার গঠন পরিস্থিতি আগেকার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট, ১৯৩৫ এর মত হবে না। সেখানে কনস্টিটিউয়েন্ট একক সমূহের কিছু ক্ষমতা বিলোপ করে ইউনিটারি পদ্ধতিকে ফেডারেল হিসবে রূপদান করা হয়েছিল। বরং একটি ‘সত্যিকার ফেডারেশন’ গঠিত হবে যেখানে কনস্টিটিউয়েন্ট এককসমূহ সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে কিছু অধিকার ছেড়ে দিয়ে বা কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে ফেডারেল সরকার গঠন করবে।

১৯৪৭ এ দেশভাগের পর চব্বিশ বছরে সেই মৌলিক অবস্থানটি হয়তো ইচ্ছে করেই ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছিল। কনস্টিটিউয়েন্ট এককসমূহ কর্তৃক ফেডারেল সরকারকে ক্ষমতা অর্পণের কথা থাকলেও ফেডারেল সরকার কনস্টিটিউয়েন্ট এককসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করবে এমন একটি সংবিধান তারা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। সন্দেহ নেই যে ক্ষমতাধর সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী যারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রন নিতে পেরেছিল, তারা নিজেদের অবস্থান সুরক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট, ১৯৩৫ এর ছায়া বেছে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা জাতীয় ঐক্যের নামে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো সুসংহত করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। বস্তুত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্ট অনুযায়ী, কনস্টিটিউয়েন্ট একক সমূহ অধিবেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান (ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) প্রনয়ণ না করা পর্যন্ত এটি ‘সাময়িক’ সংবিধান হিসেবে কাজ করবে এবং এতে প্রদেশসমুহ এবং কেন্দ্রের সম্পর্কের কাঠামো নির্দেশিত ছিল। তবে এতে কনস্টিটিউয়েন্ট এককসমূহ যে নীতিগত ভাবে ‘সার্বভৌম’ এবং ‘প্রাদেশিক’ নয় তা কেন্দ্র কর্তৃক আবছা করে রাখা হয়েছিল। এতে ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আমল থেকে সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্র কর্তৃক প্রদেশসমূহকে ক্ষমতায়ন করা হতো।

২ নং দফা একটি দ্বি-বিষয় কেন্দ্রীক অথবা মুদ্রার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করলে বলা যায় তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৬ এর কেবিনেট মিশন প্ল্যান এ এর পটভূমি নিহিত আছে। এতে বলা হয়েছিল কেন্দ্রের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগের ৩ টি বিষয় থাকবে। সরকার বিরোধী একটি রাজনৈতিক মোর্চা “দ্য গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী অফ ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস” ও ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে ঢাকায় একটি ফেডারেশনের প্রস্তাব করেছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল ইউনাইটেড স্টেটস অফ পাকিস্তান। প্রস্তাবনা অনুযায়ী সেখানে কেন্দ্র শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ এই তিনটি বিষয় দেখভাল করবে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্ধী দল সমুহের গঠিত দ্য ইউনাইটেড ফ্রন্ট ১৯৫৪-এ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে তাদের ২১ দফা ইশতেহারের একটিতে বলেছিল যে, সংবিধানে এমন একটি ফেডারেশনের সংস্থান থাকবে যেন কেন্দ্রের কাছে শুধু তিনটি বিষয় থাকেঃ প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা। অতএব ছয় দফার দ্বিতীয় দফাটি সংবিধান সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের পুনরুচ্চারন মাত্র যা অন্যতম মৌলিক বিষয় হিসেবে পরিগ্রহ করা হয়েছিল অর্থাৎ তা ছিল ফেডারেল কন্সটিটিউশনের আওতায় কেন্দ্র এবং প্রদেশের ক্ষমতার বন্টন সংক্রান্ত বিষয়।

দফা ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর ছিল সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ব বাংলার, অর্থাৎ বাঙালিদের নিরাপত্তা সংরক্ষণে, তাদের সম্পদে নিয়ন্ত্রণে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার ব্যাপারে। পাকিস্তানের গোঁড়ার দিক থেকেই অনেকেই বোধ করছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পুর্ব বাংলা ‘ন্যায্য অধিকার’ পাচ্ছিলো না। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছিলো যে ফেডারেল ফান্ডের বরাদ্দ, বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টন এবং সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্য ঘটাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছিল যে পূর্ব বাংলাকে ন্যায্য হিস্যা দেয়া হচ্ছে না। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা তাদের লেখনীতে পারিসংখ্যানিক প্রমাণের সাহায্যে এই অভিযোগ তীক্ষ্ণ করে তোলেন। এসব লেখনীতে দুই পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুস্পষ্ট অসাম্য তুলে ধরে দেখানো হয়েছিল যে পক্ষপাতদুষ্ট এবং পদ্ধতিগত বৈষম্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানকে সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে বড় আকারে সম্পদ পাচারের প্রধান মাধ্যম বলে ধারণা করা হয়েছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ। তাই ছয় দফার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অর্থনীতির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা।

ছয় দফা অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই ১৯৬২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়, যার নাম ছিল ‘দা চ্যালেঞ্জ অফ ডিস্প্যারিটি’। এটি জোরকণ্ঠে বলেছিল যে, বৈষম্যের বাস্তবিক সমাধানের জন্য কতিপয় মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজন যার সংক্ষিপ্তসার এরূপঃ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন বিলুপ্ত করে দুটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা এবং অর্থ মন্ত্রনালয় দুই শাখা বিশিষ্ট করা। এটি এমনও পরামর্শ দিয়েছিল যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অঞ্চলভিত্তিক আলাদাভাবে নির্ণয় করা উচিত এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে বৈদেশিক সাহায্য নীতি নির্ধারনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। এসব সুপারিশমালায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আঞ্চলিকীকরণের বীজ বপন করা হয়েছিল যেমন করের ক্ষমতা, আর্থিক ও মুদ্রানীতি প্রনয়নের ক্ষমতা, সম্পদের পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রন এবং বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষমতা অঞ্চলসমূহে স্থানান্তর ।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে দেখা গেল যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদ স্থানান্তরের প্রধান অস্ত্র ছিল বৈদেশিক বানিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক সাহায্যে কর্তৃত্ব। পাটজাত পণ্য রপ্তানী হতে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে (শিল্পায়নসহ) ব্যবহৃত হতো। বৈদেশিক সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোর কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রজেক্ট সমূহ যেভাবে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হতো পুর্বপাকিস্তানের গুলো সেভাবে তুলে ধরা হতো না। সেচ, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক বিনিয়োগ দুই পাকিস্তানের অসাম্য বাড়িয়ে তুলেছিল।

এটি বুঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন থেকে ছয় দফা প্রস্তাব করা হয়েছিল তখন থেকে সবচেয়ে আপষহীন প্রতিরোধ হয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্য সংশ্লিষ্ট দফাটিতে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী যে হাতিয়ার দিয়ে অর্থনীতিতে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছিলো, তা ছাড়তে মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

তাই ছয় দফার প্রতি আইয়ুবের প্রতিক্রিয়া ছিল একে জোর পূর্বক দমন করা। তিনি ছয় দফাকে অভিহিত করলেন বিচ্ছিন্নতাবাদ অপচেষ্টা হিসেবে এবং ঘোষণা দিলেন যে অস্ত্রের ভাষায় তিনি এর জবাব দিবেন।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামীলীগ বাঙালিদের মনোভাব বুঝে একে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেলেন এবং এর সমর্থনে একটি গণআন্দোলন গড়ে উঠলো। এপ্রিলের ১৮ তারিখে শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন এবং ৯ই মে ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলে তাকে আটক দেখানো হল। ৭ই জুন, ১৯৬৬ তে ছয় দফার সমর্থনে একটি বিশেষ প্রতিবাদ দিবস পালন করা হল। আইয়ুব সরকার এটিকে বলপ্রয়োগে দমন করতে চাইলেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ হল, কয়েকজন নিহত হলো। পরবর্তীতে বিপুল সংখ্যক গ্রেফতার করা হলো এবং বাঙালিদের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক বাজেয়াপ্ত করে এর সম্পাদককেও গ্রেফতার করা হলো।

এমন নিপীড়নের মুখে আন্দোলন কিছুটা দমে গিয়েছিল। হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে আদালতে বিষয়টি নিস্পত্তির চেষ্টা করা হল।

১৯৬৭ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে পরিস্থিতি হঠাৎ অস্থির হয়ে নানারকম গুজবে বাতাস ভারী হয়ে উঠেলো। পূর্ব পাকিস্তানে সফররত আইয়ুব খানের কথা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ চন্দ্রঘোনার দাউদ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করবেন। তিনি অকস্মাৎ সেটা বাতিল করলেন। বলা হল গুপ্তহত্যা বা অপহরণ ছক আঁটা হয়েছে আন্দাজ করে সেটি বাতিল করা হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেল যে চট্টগ্রাম এবং চন্দ্রঘোনার পথে মোটরশোভা যাত্রার জন্য প্রস্তুত সজ্জিত রাস্তাঘাটে কোনো গাড়ী গেল না তখনি বোঝা গেল যে সফরটি বাতিল করা হয়েছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন আমার এক ব্যারিস্টার সহকর্মী আমিরুল ইসলাম থেকে জানা গেল যে জেলখানায় তিনি একজন মক্কেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তার অভিযোগ ছিল যে তাকে মারাত্মকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এবং নির্যাতনের চিহ্ন লোকটির শরীরে ছিল। লোকটি জানালেন যে নির্যাতন করে ষড়যন্ত্র মূলক মামলায় কয়েকজন ব্যক্তিকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। আমিরুল ইসলাম খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তার করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তাকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে বিষয়টি হাইকোর্ট এর দৃষ্টিগোচর করানোর জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং লোকটিকে পরীক্ষা করার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের জন্য তাগাদা দেওয়া প্রয়োজন। ঐদিন সন্ধ্যায়ই নির্যাতনের অভিযোগ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে পরীক্ষণের জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন চেয়ে হাইকোর্টে উপস্থাপনের জন্য একটি পিটিশন প্রস্তুত করা হলো। পিটিশনটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল এবং মেডিকেল বোর্ড গঠনের জন্য কোর্টকে আশ্বস্ত করা হল। ব্যক্তিটি ছিলেন কামাল উদ্দীন আহমদ যাকে পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী করা হয়েছিল।

কিছুদিন বাদে পরপর অনেকগুলো গ্রেফতার করা হল। আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রাহমান, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সকল সিনিয়র কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হলো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে আহমেদ ফজলুর রহমান সর্বপ্রথম আইনজীবির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাতে তিনি আমার নাম করেন। ১৯৬৭ এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ কিংবা ১৯৬৮ এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আমি জেলখানায় তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি জানালেন যে গ্রেফতারের পরপরই তাকে ঢাকায় বনানীস্থ নতুন আবাসিক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েকদিন ধরে তাকে সেখানে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা তার মাধ্যমে একটি ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েকজনকে জড়াতে চেয়েছিলেন। যতই এসব আটকের ঘটনা ঘটছিল, উত্তেজনা ততই বাড়ছিল। এমনকি গ্রেফতারকৃতদের আইনজীবীরাও গ্রেফতারের সম্ভাবনায় ছিলেন। ফজলুর রহমানের জন্য একটি হাবিয়াস করপাস (আদালতে বন্দী প্রদর্শন) আবেদন দাখিল করা হলো।

একই দিনে ব্যারিস্টার কে জেড আলম আমার কাছে এলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পক্ষে একটি আবেদন জমা দেওয়ার জন্য। তাকে বলা হয়েছিল যে প্রত্যেক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা আইনজীবী কাজ করার জন্য। কারণ একই আইনজীবী সকলের পক্ষে লড়লে অভিযুক্ত ব্যক্তিগনের মধ্যে ‘সম্পর্ক’ প্রতীয়মান হয় যা ‘ষড়যন্ত্রমূলক’ মামলার ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিৎ। পরে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমের মামলাটি ইশতিয়াক আহমেদ পরিচালনা করেন। রুহুল কুদ্দুসের শ্যালক কামালউদ্দীন হোসাইন রুহুল কুদ্দুসের মামলার ভার নেন। যখন পিটিশনটি উচ্চ আদালতে গেল তখন সরকারী উকিলেরা এসে বললেন যে এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলছে। জানুয়ারীর প্রথম দিকে প্রকাশিত প্রথম সরকারী প্রেসে অভিযুক্ত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রথম বার আসে জানুয়ারীর ২০ তারিখে প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক প্রেস রিলিজে।

পরবর্তী ৫ মাস অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পুরো মামলাটি রেখে দেওয়া হলো। অভিযুক্তদের অবস্থান সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হল না। এদেরকে জেল থেকে মিলিটারি জিম্মায় পাঠানো হয়েছিল। বিচার কার্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারী করা হলো। সেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট এর বিচারক এস এ রহমান, এবং হাই কোর্টের দুজন বাঙালি বিচারক এম আর খান এবং মাকসুমুল হাকিম। একেবারে শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে মামলাটি রাজনৈতিক। মামলাটির প্রধান প্রমাণ ছিল কয়েকজনের সাক্ষ্য যাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ ছিল এবং বিচারের সময় এরা ‘বিরূপ’ স্বাক্ষীতে পরিণত হচ্ছিলেন।

বিচার শুরু হবার কিছুদিন পর টম উইলিয়ামস কিউসি এমপি নামের একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টারকে লন্ডনস্থ বাঙালিরা ঢাকায় পাঠালেন বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর দলে যোগ দেবার জন্য। সালাম খানের নেতৃত্বে পুরো দলটি ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক করা হল যে টম উইলিয়ামস দু’একদিনের মধ্যে বিচারকার্যের ক্রস পরীক্ষণ করবেন এবং এরপর তিনি হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করবেন। আমি উইলিয়ামসের সাথে রিট প্রস্তুতিতে লেগে গেলাম এবং একটি খসড়া প্রস্তুত করা হলো। পিটিশনটি উইলিয়ামস পরিচালনা করলেন এবং হাইকোর্ট একটি রুল জারী করলেন। অবশ্য উচ্চ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিলেন না। ঐ সময়টায় উইলিয়ামস অভিযোগ করলেন যে তাঁকে পুলিশ এবং গোয়েন্দা লোক দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে আইয়ুবের নজরদারীতে রাখা হয়েছে। তার গাড়ি অনুসরণ করা হচ্ছিলো এবং সবচেয়ে খারাপ ঘটনার মধ্যে ছিল তার ঘরে অনুপ্রবেশ করে লাগেজ এবং কাগজ পত্র তছনছ করা। সপ্তাহখানেক কাটানোর পর তাকে আয়কর পরিশোধের নোটিশও দেওয়া হয়েছিল আর ভীষণ রকমের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। টম উইলিয়ামসের ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া উচিত বলে সবাই ঐক্যমত্য প্রকাশ করলেন। তার আগমন এবং মামলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য মিটে গিয়েছিল। টাইমস (লন্ডন) এর নতুন প্রতিনিধি পিটার হাজেলহার্স্ট এই মামলা এবং টম উইলিয়ামসের ভোগান্তির ওপর সিরিজ রিপোর্ট করে এতে সাহায্য করেছিলেন।

মামলার অগ্রগতি এবং বিচারকার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জনগণের কাছে প্রবল আগ্রহের বিষয় ছিল। আইয়ুব খান যদি ভেবে থাকেন যে এই মামলা শেখ মুজিবের জন্য অমর্যাদাকর হবে তবে ফল হয়েছিল ঠিক উল্টো। বাঙালির অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে শেখ মুজিব অত্যাচারিত হচ্ছেন বলে তিনি আরো সহানুভূতি পেতে লাগলেন। বাঙালির দুর্দশা ব্যাপক প্রচারও পেয়েছিল এবং এতে তাদের বঞ্চনার বোধও তীব্র হচ্ছিল।

১৯৬৮ এর শুরুর দিকে আইয়ুব মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং এতে প্রশাসনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কিছুটা কমে গেল। সম্ভাব্য উত্তরসূরি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। আর্মি কমান্ডার-ইন-চিফসহ ভূট্টোর মত পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা আইয়ুবের এই দুর্বলতাকে নিজেদের সুযোগ হিসেবে দেখতে লাগলেন।

১৯৬৮ এর শেষের দিকে এসে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার জন্য দুই পাকিস্তানেই ক্ষোভ যথেষ্ট পুঞ্জিভূত হয়েছিল। ’৬৮ এর নভেম্বরে পেশোয়ারে ছাত্রদের প্রতিবাদে পুলিশের একশনে বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। সে সময় রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থানরত ভুট্টো এই ঘটনাকে লুফে নেন এবং জনঅসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

১৯৬৮ এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী পরবর্তী দিন হরতাল আহবান করেন। সেই হরতালটি ভালভাবেই পালিত হয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনায় বসলেন এবং ১৩ই ডিসেম্বর গোটা প্রদেশে হরতাল ডাকা হল। ৮ই ডিসেম্বর মওলানার আহূত হরতাল সফল ছিল না। মিলিটারির পূর্ণ সহযোগিতায় চলমান জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র যখন সকল সামর্থ্য নিয়ে হরতাল বানচালে উদ্যোগী হয়, তখন এর সার্বিক সাফল্যে সরকারের চেয়ে বিরোধীদের জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। জনগণ অবশ্যই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ছাত্ররা ছিল সবসময়েই খ্যাপাটে আর সক্রিয়। তারা দ্রুতই পরিস্থিতি অনুযায়ী সাড়া দিয়ে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করে নেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান ছাত্রসংগঠন থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্টুডেন্ট একশন কমিটি গঠন করা হয়। ডাকসুর তখনকার সহসভাপতি হিসেবে তোফায়েল আহমেদ এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি সবার পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে। এই ১১ দফা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম দফার অধীনে “টিউশন ফি অর্ধেকে নামিয়ে আনা”, “পলিটেকনিক ছাত্রদের কোর্স সমৃদ্ধকরণ” ইত্যাদি থেকে শুরু করে “শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষায় পাঠদান চালুকরণ” এবং “অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যেকরণ” এরকম ১৫ টিরও বেশী উপদাবী ছিল। এগুলো পর ছিল সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কিছু দাবী। আওয়ামী লীগের ছয় দফার সারবস্তু এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে উপস্থাপনায় কিছু আকর্ষণীয় পরিবর্তন ছিল। এতে পূর্ববর্তী প্রদেশসমূহে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাবফেডারেশনের দাবীও ছিল। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিলোপের দাবী ছিল। ছিল নিবর্তমূলক আইনসমূহ বিলোপের দাবি এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। উল্লেখযোগ্যভাবে ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবী। পররাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেন্টো, সিয়াটো চুক্তি পরিত্যাগ এবং “পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক চুক্তি” বাতিলের দাবী করে “নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি” অবলম্বনের দাবী করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স এবং পাটসহ সকল বড় বড় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী ছিল। গরীব কৃষকদের জন্য কর এবং ভূমি খাজনা হ্রাসের দাবী তোলা হয়েছিল। তাদের বকেয়া খাজনা এবং ঋণ মওকুফ করে দিতেও বলা হয়েছিল। আঁটি প্রতি পাটের মুল্য নূণ্যতম ৪০ রুপি নির্ধারণ, শিল্পশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী এবং অন্যান্য কল্যাণ সুবিধা সহ ‘শ্রমিক বিরোধী বিভিন্ন কালো আইন’ দূর করার দাবী তোলা হয়েছিল। বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছিল। এভাবে ১১ দফা দাবীতে প্রকৃতপক্ষে সার্বিক চাহিদা তুলে ধরা হয়েছিল এবং একে সামনে নিয়ে এসে ছাত্ররা তাদের আন্দোলন শুরু করলো।

এমন একটি পূর্ণাঙ্গ দাবীর তাৎপর্য ছিল একাধিক। ছয় দফার অন্তর্ভূক্তিতে বোঝা গিয়েছিল যে এগুলো শুধু একটি রাজনৈতিক দলের দাবী ছিল না বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন এতে সমর্থন দেওয়ায় তা পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মৌলিক দাবী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দাবী ছুড়ে দিয়ে ছাত্ররা প্রমান করল যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সফল হতে হলে তাতে অবশ্যই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে হবে। পররাষ্ট্র বিষয়ক দাবী দেশের জন্য স্বাধীন এবং জোট-নিরপেক্ষ পথে আগানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

ঐ সময়টাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়ার উপায় সম্পর্কে নানা আলোচনা করছিলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিলেন। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের সামনের সারির নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতাদের সাথে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাঁধে। জানুয়ারীর ৬ তারিখ সফলভাবে হরতাল পালনের পর পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতারা ১০ তারিখে ঢাকায় একটি আলোচনায় বসেন। সেখানে ছিলেন আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (রিকুইজিশনিস্ট), কেএসপি, আওয়ামী লীগ (পিডিএম), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলাম, নিজাম-এ-ইসলাম এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের প্রতিনিধিগণ।

আমি করাচীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিল এর একটি মিটিং থেকে ফিরে দেখলাম যে নেতৃবৃন্দ তখনো সাধারন দাবীর বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। ঐক্যমত্যে প্রধান বাধা ছিল পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দের ছয় দফায় অস্বীকৃতি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারেরও চাপ ছিল। প্রস্তাবিত ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটিতে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে আওয়ামী লীগের দিক থেকে এসব অন্তর্ভূক্ত করার চাপ ছিল।

দুই পাকিস্তানের বিরোধীদলগুলোর এসব বিতর্ক থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে দুই ভাগের রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য ভিন্ন। এ পর্যায়ে ‘যুক্তরাষ্ট্রিয় সংসদীয় সরকার’-এর দাবী অন্তর্ভূক্ত করে এই বিরূপতা আড়ালে রাখা হয়েছিল। ছাত্রদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া ১১ দফা আন্দোলন শুরু হয়েছিল যাতে তারা ৬ দফাকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

আন্দোলনের মাত্রা ক্রমে বাড়ছিল। গঠিত হওয়া ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি জানুয়ারীর ১৭ তারিখকে “জাতীয় প্রতিরোধ দিবস” হিসেবে ঘোষণা করলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে প্রয়োজন হলে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর আইনের ১৪৪ ধারা বা অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করা হবে। বাস্তবেই ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির নেতৃবৃন্দ শহরের কেন্দ্র বাইতুল মোকাররমের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিকীভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল্বেন। এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ এই প্রথম সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নেতৃবৃন্দ ইচ্ছাকৃতভাবে আইন ভাঙলেন। আন্দোলনের রণোম্মুখ অংশ অর্থাৎ ছাত্ররা প্রতিকী প্রতিরোধে সন্তুষ্ট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বিরাট মিছিল বের হলো যাতে পুলিশ গুলিবর্ষণ করল। আসাদ নামক একজন তরুণ ছাত্র নিহত হলো। শহীদের রক্ত ছিল গণআন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্ধন। আসাদের শাহদানের পর ডিএসি’র নেতৃবৃন্দ প্রকারান্তে স্টুডেন্টস একশান কমিটির ওপর আন্দোলনের ভার ছেড়ে দিলেন। পূর্বপাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভ ঘণীভূত হলো এবং জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকলেও গণআন্দোলন এবং মিছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। পুলিশের গুলিতে আরো কয়েকজন প্রাণ হারালো এবং পুলিশকে সহায়তা করার জন্য সেনা মোতায়েন করা হলো। কার্যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রত্যেকটি নির্দেশই প্রতিরোধ করা হচ্ছিলো, জারীকৃত কারফিউ হরহামেশাই ভাঙ্গা হচ্ছিলো, কিছু ক্ষেত্রে আর্মির বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আর্মি নির্বিচারে গুলি চালালে অনেকেই মারা পড়ছিলো। যাদের মধ্যে ছিল মিছিলে থাকা একটি স্কুলবালক, বাড়ীতে থাকা একজন গৃহবধূ, মায়ের কোলে থাকা একটি শিশু, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে সরকার পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিলো। গ্রামের দিকে স্থানীয় সংগ্রাআম পরিষদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছিল। শহরাঞ্চলে উচ্চতর মজুরী এবং উন্নত পরিবেশ চাওয়া শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিরোধ মীমাংসায় ছাত্র নেতাদেরই ডাকা হচ্ছিলো।

পশ্চিমেও উত্তেজনা গতি পেয়েছিল। মাস কয়েক আগে আর্মির তত্ত্বাবধানে উন্নয়নের দশক উদযাপন করা আইয়ুব সরকার পরিষ্কারভাবেই সবদিক থেকে জনগণের দাবীদাওয়া পূরণের জন্য প্রবল চাপের মুখে পড়েছিলো।

সে সময়ে একটি মোকদ্দমা নিয়ে মনজুর কাদেরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। যিনি তখন আগরতলা মামলার চীফ প্রসিকিউটর হিসেবে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল দেখে আমি তাকে জোর দিয়ে বললাম যে, আইয়ুব সরকার জনগণকে ‘অনেক দেরীতে অল্প কিছু দেবার’ দায় না নিয়ে বরং দেয়াল লিখন গুলো পড়ুক আর জনগণের দাবী মেনে নিক। জবাবে তিনি আইয়ুবকে জনগণের দাবী মেনে নেবার জন্য চাপ দেবেন বলে জানালেন। তবে এরপর তিনি সংবিধানের ১৯৬২ সালের প্রতিরক্ষাকে টেনে আনলেন। তিনি নিজেই এর স্থপতি ছিলেন। চলমান উত্তেজনার সূত্রপাত হিসেবে তিনি ১৯৬২ সালের সংবিধানের কথা বলে নিজেই যেন গণজাগরণের কৃতিত্ব দাবী করলেন।

পরিস্থিতি দেখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ফার্স্ট-অফ-দ্য মান্থ সম্প্রচারে ঘোষণা দিলেন যে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সাথে আলোচনায় বসবেন। এই প্রস্তাবিত আলোচনার নাম দেয়া হল ‘রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স’। তিনি ডেমোক্রেটিক একশন কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে ১৯৬৯ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে আলোচনায় আহবান করে একটি চিঠি ইস্যু করলেন।

এ ঘটনা ছিল একাধারে গণ-আন্দোলন শক্তি এবং আইয়ুবের ক্রগাগত দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ। ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে মার্শাল ’ল প্রত্যাহার এবং সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাইলো। এ প্রেক্ষিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং শেখ মুজিবের মুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আওয়ামী লীগ পরিস্কারভাবে আলোচনায় বসার ন্যুনতম শর্ত হিসেবে মামলাটি প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি চেয়েছিলো।

ডেমোক্রেটিক একশান কমিটির পাঞ্জাবী নেতারা এবং প্রকৃতপক্ষে স্বনামধন্য কিছু প্রবীণ বাঙালি নেতারাও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য চাপ দিতে গড়িমসি করছিলেন। আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় তারা আইনগত জটিলতার বিষয় ইঙ্গিত করে বলছিলেন যে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহারের দাবি আলোচনা চলাকালীন সময়েও আদায় করা যাবে। শেখ মুজিব থাকলে যে কোন আলোচনায় ছয় দফাই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হবে এমন বুঝেই যে তারা বিরোধীতা করছিলেন, এটা পরিষ্কার ছিল। যা হোক, একসময় তারা বুঝতে পারল। বিশেষত অন্যান্য বাণাগ্লি নেতারা বুঝতে পারলো যে শেখ মুজিবের ছয় দফাকে এড়িয়ে যেই মীমাংসাই হোক না কেন বাঙালি তা মেনে নেবে না এবং এতে তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। আওয়ামী লীগও আলোচনার পূর্বে শেখ মুজিবের মুক্তি ব্যাপারে অনড় ছিল। এমন চাপে পড়ে ডেমোক্রেটিক একশান কমিটি আইয়ুবের কাছে বিষয়টি তুলে ধরলেন। আইয়ুব তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যেহেতু শেখ মুজিব বিচারাধীন রয়েছেন, তাই সেখানে “আইনগত জটিলতা” রয়েছে।

আমি বিরোধী দলীয় নেতাদের বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিয়াঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেই ছিলাম। ১৯৬৬ সালের জুনে যখন তাকে আটক করা হয় এবং ইত্তেফাক বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন থেকে বিষয়গুলো নিয়ে উচ্চ আদালতে আমিই নিযুক্ত ছিলাম। মানিক মিয়াঁর বাড়িটি ছিল বিরোধী দলীয় নেতাদের মিটিঙের স্থান, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং ছাত্র নেতাদের। মানিক মিয়াঁ শেখ মুজিবের মুক্তি এবং রাউন্ড টেবিলে তার থাকার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার সাথে আলোচনাকালে আমি জানালাম যে মামলাটি বন্ধ করার জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় যা করণীয় তা শুরু করা উচিত এবং এতে শেখ মুজিব কে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে চাপ বাড়বে।

এসব যখন চলছিল, তখন আমি একটি বার্তা পেলাম যে শেখ মুজিব আদালতে আমার সাথে দেখা করতে চান। আমি পরের দিন ত্বরিত আদালত ভবনে তাঁর সাথে দেখা করি। তিনি বিবাদী পক্ষের প্রধান পারিষদ আব্দুল সালাম খান, যিনি আওয়ামীলীগের ভাঙ্গা অংশ পিডিএম’র প্রতিনিধি ছিলেন, তার গৃহীত অবস্থান নিয়ে বেজার ছিলেন। সালাম খান শেখ মুজিবকে চাপ দিচ্ছিলেন রাউন্ড টেবিলে বসার পূর্বশর্ত হিসেবে মামলা প্রত্যাহার এবং তার মুক্তির ব্যাপারে জোর না করার জন্য। এমনকি তিনি প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছিলেন যে শেখ মুজিব এরকম ‘অনড়’ থাকলে তিনি মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না। শেখ মুজিব এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে তাগাদা দিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে মামলার দায়িত্ব নেওয়ার এবং মামলা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য। তিনি আরও জানালেন যে প্রয়োজন হলে আমি ইত্তেফাক মামলার কৌশলী এ কে ব্রহীর সাহায্য নিতে পারি। আমি নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করলাম।

আন্দোলন যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিলো, পুলিশসহ গভর্নর মোনায়েম খান আর তার বেসামরিক প্রশাসন ক্রমশ লুকিয়ে পড়ছিল। অদ্ভুতভাবে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জেনারেল মুজাফফরউদ্দীন ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হতে লাগলেন। ধারণা করা হচ্ছিল আর্মির কমান্ডার ইন চীফ ইয়াহিয়া তার জেনারেল অফিসার কমান্ডিং এর মাধ্যমে পরিস্থিতি সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাক্কে তদারক করতে চাইছিলেন। আমার স্মরণ আছে যে জানুয়ারিতে মানিক মিয়াঁর সাথে মুজাফফরউদ্দীনকে আলোচনা করতে দেখেছিলাম। ইয়াহিয়া খান তাকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য বলেছেন জেনে তা মানিক মিয়াঁর মনে রেখাপাত করেছিল এবং তিনি নিজেও মনে করেছিলেন যে রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালানো উচিৎ। ইয়াহিয়াকে কোন মতামত জানাবার থাকলে তিনি তা পৌছে দিতে পারবেন বলেও জানিয়েছিলেন। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ন ছিল যে কমান্ডার ইন চীফ ইয়াহিয়া একাই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছেন বলে দেখা যাচ্ছিলো। রাজনৈতিক নিষ্পত্তিমূলক আলোচনা শুরু করতে হলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মুক্ত করার গুরুত্ব এবং এটিই যে একমাত্র উপায় তা জেনারেল মুজাফফরউদ্দীন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন। জানা গিয়েছিল যে তিনি তার মতামত ইয়াহিয়াকে জানিয়েছিলেন এবং ইয়াহিয়া ইঙ্গিত করেছিলেন যে যদি আইনগতভাবে শেখ মুজিবের মুক্তির কোনো উপায় থাকে, তাহলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

এদিকে মানিক মিয়াঁ আমাকে চাপ দিতে লাগলেন মামলাটি বন্ধ করার জন্য আইনগত পদক্ষেপ নেবার জন্য। আমি ব্রহীর সাথে পরামর্শ করার জন্য করাচী গেলাম। পৌঁছুলাম ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে যেদিন সারা দেশজুড়ে হরতাল চলছিল। করাচীতে জীবন যাত্রা থমকে গেছে দেখে ভালই লেগেছিল যদিও হোটেল থেকে ব্রহীর বাড়িতে আমাকে হেটে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহী ট্রায়ালটিকে আইনগত আক্রমণ করার জন্য উপায় নির্ধারনে রাজী হয়ে গেলেন। তবে জানালেন যে কাগজপত্র এবং রেকর্ডকৃত প্রমাণাদি দেখার জন্য তাকে ঢাকায় আসতে হবে। আমি সেদিন সন্ধ্যাতেই আর ব্রহী পরের দিন সকালে ঢাকা চলে এলেন। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেল যে ট্রায়ালটিকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি শক্ত পয়েন্ট আছে। ততদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হলে ১৯৬২ এর সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের প্রবিধান কার্যকর হবে। সেটি হওয়া মাত্র ট্রায়াল সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করা যাবে যে আইনের চোখে সমান অধিকারের আলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল চলতে পারে না। এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি কারণ এটি আইনের চোখে নাগরিকের সমানাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে। সুতরাং মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে সরকারের জন্য একটি আইনি নোটিশ প্রস্তুত করা হল। ব্রহী এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে সেটি মনজুর কাদেরের নিকট হস্তান্তর করলাম। মনজুর কাদের উল্লেখিত পয়েন্টের সারমর্ম বুঝতে পারলেন এবং টেলিফোনে দ্রুত আইয়ুবের সাথে যোগাযোগ করবেন বলে জানালেন।

এ বিষয়ে যখন মনফজুর কাদেরের সঙ্গে আলোচনা চলছিল তখন তার কাছে একটি টেলিফোন আসে এবং কথা বলার সময় টেলিফোনে প্রাপ্ত খবর শুনে তাকে বিরক্ত দেখাচ্ছিল। তাকে এইমাত্র জানানো হল যে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে একজন মিলিটারী গার্ড গুলি করে হত্যা করেছেন এবং আরও দু’জন আহত হয়েছেন। তার উত্তেজনা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছেন। স্পষ্টতই এ খবর বাইরে ছড়ালে জনরোষ বাড়বে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই মর্মাহত ছিলাম কারন সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন আমার এক সহকর্মী এডভোকেট আমিনুল হকের ভাই যাকে মাত্র কয়েকদিন আগে কথা দিয়েছিলাম যে তার ভাইয়ের পক্ষে কোর্টে উপস্থাপনের জন্য কিছু যুক্তি প্রদান করব। প্রদত্ত নোটিশটি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে মনজুর কাদেরকে সচেতন দেখা গেল।

জহুরুল হকের দাফনের সময় ঠিক হল বিকেলে। পল্টনে জানাজা শেষ করেই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমি আজিমপুর কবরস্থানের দিকে গেলাম। অন্তত দুই ঘন্টা পেরিয়ে গেল কিন্তু লাশ তখনো এলো না। এতে উদ্বেগ বাড়তে লাগলো। জানা গেল যে মিছিলকারীরা মন্ত্রীদের বাসভবন এলাকায় যখন এক মন্ত্রীর বাগান থেকে ফুল ছিঁড়তে যান, তখন তাঁদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে মিছিলকারীরা ক্ষেপে যান এবং পরে তাঁরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রিসাইডিং জাজ ও মন্ত্রীদের বাসাসহ অন্যান্য সরকারি বাসভবনেও হামলা করেন এবং আগুন জ্বালিয়ে দেন।

দাফন হওয়া মাত্র আমি ব্রহীর হোটেলের দিকে এগুলাম এবং পথে যেতে যেতে দেখলাম বেশ কিছু বাড়ি জ্বলছে। ব্রহীর ওখানে আমি মনজুর কাদেরকেও পেলাম। তিনি বললেন যে রাওয়ালপিন্ডিতে তিনি কথা বলেছেন কিন্তু কোনো জবাব আসে নি। জহুরুল হকের মৃত্যুতে জনগণের আবেগ দেখে মনজুর কাদের এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে বিচারটি আর চলতে পারে না যেখানে প্রিসাইডিং জাজের বাসভবন পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মনজুর কাদের ব্যক্ত করলেন যে ট্রায়াল চালিয়ে নেয়া বাস্তবসম্মত হবে না। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বললেন, বিচারটির উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বুঝানো যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী এবং তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে জণগণ তাদের মত করে বুঝে নিয়েছে এবং তাদের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ‘দোষী নয়’ বরং “বীর” সেখানে বিচারটি চালানোর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। ঠিক করা হল যে ব্রহী এবং মনজুর কাদের দু’জনই পরের দিন সকালে রাওয়ালপিন্ডি ফিরে যাবেন এবং লিগ্যাল নোটিশটি আমলে নিয়ে মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে আশ্বস্ত করবেন। এরপর দুই দিন চলে গেল তবু কোনো খবর আসছিল না। ব্রহী করাচী চলে গেলেন এবং আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে নোটিশটি এখনো আইন মন্ত্রণালয় খুটিয়ে দেখছে।

স্বাভাবিকভাবেই ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স শুরু হল না এবং আমাকে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে শেখ মুজিবের মুক্তি আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে রাওয়ালপিন্ডি যেতে অনুরোধ করা হচ্ছিলো। কারাগার থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া তাজউদ্দীন আহমেদ, আমিরুল ইসলাম এবং আমি ফেব্রুয়ারীর ১৭ তারিখে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছুলাম। যেহেতু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল না এবং ফলস্বরুপ ডেমোক্রেটিক একশান কমিটিও আলোচনায় বসছিল না তাই সবদিকে একটা সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। অবস্থা জানতে বিরোধী দলের আইয়ুব মানজার বশির, একজন এডভোকেট, স্বপ্রণোদিত হয়ে আইন মন্ত্রী জাফর এর সাথে গভীর রাতে দেখা করতে গেলেন। একেবারে মধ্যরাতে কেউ আমাকে বলল যে তিনি পরের দিন সকালেও জাফরের সাথে দেখা করতে যেতে পারতেন। জাফর “আইনগত জটিলতা” জাতীয় কিছু চেঁচামেচি করলেন কিন্তু যখন তাকে লিগ্যাল নোটিশের জবাব দিতে বলা হল তখন তিনি জানালেন যে বিষয়টা শুধু আইনী নয় বরং উপর মহলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে।

তাকে বুঝানো হল যে আইনী নোটিশে একটি পরিষ্কার জবাব চাওয়া হয়েছে এবং এতে দেরী করা উচিত নয়। তিনি বললেন যে সেদিন সকালেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং দুপুরেই একটি জবাব তিনি আমাকে দিবেন। তিনি আরো একটি নোটিশ অথবা আগের নোটিশটির সামারীও চাইলেন। ১ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে আরেকটি নতুন নোটিশ দেয়া হলো। সাড়ে ১২ টার জাফর আমাকে টেলিফোন করে তার হোটেলে দেখা করতে বললেন। সেখানে তিনি আমাকে জানালেন যে সুদীর্ঘ আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয় না বোধক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অর্থাৎ নোটিশে প্রদত্ত চাহিদা তারা মেনে নিবেন না। শুনে আমি ক্রুব্ধ হলাম এবং সেখানে উপস্থিত মনজুর কাদেরকে আমার অনুভূতি জানালাম। তিনিও সরকারের এহেন আচরণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বিকেলে আমার সাথে কথা বলবেন জানিয়ে জাফর এর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

সেদিন বিকেলে মনজুর কাদের টেলিফোন করে আমাকে একই হোটেলে তার কক্ষে দেখা করতে বললেন। তিনি যখন রুমে ঢুকছিলেন তখনি জাফর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারা (মনজুর কাদের এবং জাফর) প্রস্তাব দিলেন যে সরকার একটি ঘোষণা করতে প্রস্তুত যে শেখ মুজিব ‘মুক্ত মানুষ’ হিসেবে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে পারবেন। যখন আইনী দিকটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম তখন জাফর কাচুমাচু হয়ে বললেন যে এই একটি মাত্র পথেই সরকারকে তিনি রাজী করাতে পারবেন। তারা আমাকে শেখ মুজিবের কাছে বার্তাটি পৌছে দিতে বললেন।

তাজউদ্দীন, আমিরুল ইসলাম এবং আমি লাহোর এবং করাচী হয়ে ঢাকা ফিরে এলাম। কারণ পরের দিন সকালে ঢাকায় আসার জন্য সেটাই একমাত্র পথ ছিল। লাহোর এয়ারপোর্টে আসগর খান এবং করাচীতে ব্রহীর সাথে আমাদের দেখা হলো। আসার আগে মনজুর কাদের আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি সন্ধ্যায় আইয়ুবের সাথে আবারো দেখা করে নোটিশের দাবী মেনে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে দেখবেন।

ফেব্রুয়ারীর ১৮ বা ১৯ তারিখের রাত। করাচী এয়ারপোর্ট থেকে মনজুর কাদেরকে একটা টেলিফোন করা হলো। মনজুর কাদের জানালেন যে আইয়ুবের সাথে দেখা করার জন্য তিনি সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন কিন্তু তাকে বলা হয়েছে যে আইয়ুব একটি মিটিঙে আছেন। মধ্যরাত পার হয়ে গেলেও আইয়ুবের মিটিং শেষ হচ্ছে না দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে শুধু সে বারই তিনি আইয়ুবের সাথে দেখা করতে চেয়েও পারলেন না। তিনি চুপিসারে বললেন যে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ন কোন মিটিং চলছে।

পরে জানা গিয়েছিল, সেটি ছিল একটি ভাগ্য নির্ধারনী মিটিং যেখানে আইয়ুব তার তিনজন সার্ভিস চীফকে ডেকেছিলেন। আইয়ুব তার সার্ভিস চীফদের মার্শাল ‘ল সমর্থনে প্ররোচিত করলেন এবং গণআন্দোলনকে মিলিটারী মোতায়েন করে দমন করতে বললেন। সার্ভিস চীফেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশ্যই আইয়ুবের রাজনৈতিক দায় ছিল এবং ঘটনাপ্রবাহে দেখা যাচ্ছিল যে ইয়াহিয়ারও নিজস্ব উচ্চাকাংঙ্ক্ষা ছিল। যদি জনগণকে দমন করার জন্য আর্মি ব্যবহার করা হয় সেটি আইয়ুবের ক্ষয়িষ্ণু সরকারের সাহায্যার্থে নয় বরং ইয়াহিয়া এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদেরই উদ্দেশ্য সাধন করবে।

আইয়ুব এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের সাথে ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কিত রিপোর্টে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টার স্বীকারোক্তিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

“১৯৬৯ এ আমি যখন ইয়াহিয়ার মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করি, তখন তার কাছ থেকেই জানতে পারি যে, ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারীতে আইয়ুব এবং সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের দফায় দফায় মিটিং হয়েছিল। জেনারেল আকবর এবং প্রেসিডেন্টের কতিপয় হাউজ স্টাফও এর সত্যতা প্রদান করেন যারা অনেক “ভেতরের খবর”-ও জানতেন। আর্মি, নেভি এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এবং তাদের সহযোগীগণ আইয়ুবের সাথে আলাদা আলাদাভাবে এবং যৌথভাবে মিটিং করেছিলেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন মিটিংটি ছিল মধ্য ফেব্রুয়ারীতে যেখানে তিন বাহিনী প্রধান (জেনারেল ইয়াহিয়া, এয়ার মার্শাল নূর খান এবং ভাইস এডমিরাল আহসান) আইয়ুবকে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার জন্য মিলিটারীর ওপর নির্ভর না করে ‘রাজনৈতিক নিষ্পত্তি’ নিয়ে ভাবতে বলতে নিয়েছিলেন। এই মিটিঙে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল, বসের নিকট এই অপ্রিয় সত্যটুকু কে বলবেন? সেখানে ইতস্তত বোধ এবং নীরবতা ছিল। নেভির আহসান এই উদ্যোগ নিলেন না কারণ তিনি তার নিরপেক্ষ ভাব ধরে রাখতে চান। ইয়াহিয়ার জন্য সময়টা কঠিন ছিল কারণ আইয়ুব তাকে কয়েকজন সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে কমান্ডার ইন চীফ করেছিলেন। শেষ মেশ দায়িত্বটি পড়ল স্পষ্টবাদী এয়ার ফোর্স চীফ নূর খানের ঘাড়ে। প্রশাসন কাজকর্ম চালিয়ে নেবার জন্য এবং ধারণাগতভাবে ভারতের মত বিদেশী শক্তি যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে তাই ন্যুনতম সংখ্যক সেনা মোতায়েনে আর্মি চীফ রাজী ছিলেন।“

রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার পরামর্শ আইয়ুবের কাছে নিঃসন্দেহে একটি অভিঘাত ছিল। বিগত ১৮ বছর ধরে (১৯৫০-৬৮) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান থাকায় সকলেই তাকে সম্মান করতেন। এ নিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে তিনি একবার বলেছিলেন যে “ওরা হয়ত আমার চেহারা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।“

যখন আইয়ুব এবং সার্ভিস চীফের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আলোচনা চলছিল আমি তখন শেখ মুজিবকে জানাবার জন্য রাওয়ালপিন্ডি থেকে খবর নিয়ে ঢাকায় আসছিলাম।

এয়ারপোর্টে নামামাত্র মানিক মিয়াঁ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমরা ক্যান্টনমেন্টে রাওনা দিলাম। যখন শেখ মুজিবকে জাফরের প্রস্তাব জানানো হল যে তিনি ‘মুক্ত মানুষ’ হিসেবে ঘোষিত হয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে যেতে পারবেন শেখ মুজিব তা অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা বলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, জহুরুল হককে যেখানে মেরে ফেলা হয়েছে সেখানে জিম্মা থেকে পলায়নপর অবস্থায় তিনি কিভাবে যাবেন যখন যে কেউ তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। তিনি বললেন, তাদেরকে মামলা নিস্পত্তির জন্য যে লিগ্যাল নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে সেটার উত্তর দিতে হবে। তিনি আরও বললেন যে অন্যদেরকে বন্দী অবস্থায় রেখে তিনি কিছুতেই যাবেন না।

যখন আমি জেনারেল মুজাফফরুদ্দীনকে এসব জানালাম, তখন তিনি বললেন, জাফরের সাথে তিনি টেলিফোনে কথা বলবেন। জাফরকে বলা হল যে তার দেওয়া ফর্মুলা শেখ মুজিবের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হয় তিনি নোটিশ গ্রহণ করবেন অথবা হাইকোর্টে কার্জক্রম চলবে এবং হাইকোর্ট হয়তো মুক্তির আদেশ দিবে। জাফর বললেন যে তিনি কিছু সময় পর টেলিফোন করবেন। তিনি টেলিফোন করে বললেন যে হাইকোর্টের প্রক্রিয়া সময়ক্ষেপণকারী এবং এর পরিবর্তে ট্রাইব্যুনালকে কার্যকর করে শেখ মুজিবের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মুক্তির আদেশ চাওয়া যেতে পারে। এটি হবে জামিন প্রকৃতির।

শেখ মুজিবকে এসব জানানো হল। তিনি বললেন, এখানে জামিনের প্রশ্ন অবান্তর। ইতোমধ্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দু’জন বাঙালি বিচারপতি এবং একজন প্রসিকিউটিং আইনজীবীকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হলো। তারা প্রস্তাব করলেন যে শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। যখন সহকর্মী আমিরুল ইসলাম শেখ মুজিবকে এটা জানালেন, তিনি তখন কঠোরভাবে জামিনে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আমিরুল যখন তার সাথে কথা বলছিলেন তখন শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া হচ্ছে মর্মে একটি রিপোর্ট সম্প্রচারিত হচ্ছিল। সেটা শুনে শেখ মুজিব রেগে আগুন হয়ে গেলেন।

শেখ মুজিব মুক্তি পেতে যাচ্ছেন শুনে হাজার হাজার মানুষ ঐদিন সন্ধ্যায় এয়ারপোর্ট রোড ধরে পায়ে হেঁটে ক্যান্টনমেন্টের দিকে আসতে লাগল। আর এদিকে শেখ মুজিবের জামিনে মুক্তিতে কঠোর প্রত্যাখ্যানের খবর পেয়ে একটি মিলিটারী গাড়ী লাউড স্পিকার নিয়ে জনগণের কাছে ছুটে গিয়ে জানাতে লাগলো যে ঐদিন সন্ধ্যায় কোনো মুক্তি হচ্ছে না। ইতোমধ্যে আইয়ুবের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খাজা শাহাবুদ্দীন এবং এডমিরাল এ আর খান ঢাকায় এসে পৌছলেন। শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের কাছে আমাদের রিপোর্টের কথা শেখ মুজিবকে জানিয়ে আমরা যখন ফিরছিলাম, তখন এডমিরাল এ আর খান এবং খাজা শাহাবুদ্দীনকে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলার জন্য প্রবেশ করতে দেখলাম।

এটা পরিষ্কার ছিল যে আইয়ুব বিপদে ছিলেন। স্পষ্টতই সার্ভিস চিফগণ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মিলিটারী অপশন তার কাছে খোলা ছিল না। তাই তাকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আপোষে আসতে হবে। এটি তখনি সম্ভব যদি শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে শেখ মুজিব ছাড়া কোনো সমঝোতা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পরের দিন সকালে সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা এক মাস আগে দেওয়া লিগ্যাল নোটিশের ফর্মুলাতেই গিয়ে ঠেকেছেন যে ট্রায়ালটি সাংবিধানিকভাবে অবৈধ এবং তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

শেখ মুজিব একজন জাতীয় বীর এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের প্রশ্নাতীত নেতা হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, ঢাকায় একটি জনসভা করে জনগণের মেন্ডেট নিয়ে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে রাউন্ড টেবল বৈঠকে অংশ নিতে যাবেন। দশ লাখের বেশী মানুষের সমাগমের এক বিশাল জনসভা তাকে তার ছয় দফার স্বায়ত্বশাসনে সমর্থন জানালো এবং তাকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধীতে ভূষিত করলো।

শেখ মুজিব এরপর রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে অংশ নেবার দায়িত্বভার নিলেন যেখানে তিনি বাঙালি জনগণের দাবিদাওয়া তুলে ধরবেন বলে জানালেন। তিনি জানালেন যে এসব দাবিদাওয়া যদি গৃহীত না হয় তবে তিনি ফিরে আসবেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবেন কিন্তু আপোষ করবেন না।

পার্টির নেতৃবৃন্দদের নিয়ে রাউন্ড টেবল কনফারেন্সের উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেবার জন্য রাওয়ালপিন্ডি রওনা দিলেন। আমাকে দলটিতে অংশ নেবার জন্য বলা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে, ভুট্টো এবং শেখ মুজিব লাহোরগামী প্লেনে একই বিমানে চড়েছিলেন। ভুট্টো এবং তার সহযোগীরা ছিলেন প্রথম শ্রেনীতে। আর শেখ মুজিব এবং তার প্রতিনিধি দল ছিলেন ইকোনমি শ্রেনীতে। এতে শেখ মুজিবের দল যে আমজনতার পার্টি এবং পিপলস পার্টি ‘বড় লোকদের পার্টি’ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার সুযোগ এসেছিল। ভুট্টো ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে তিনি রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে (আরটিসি) অংশ নেবেন না কারণ এটি বিফল হতে বাধ্য। এখানে উল্লেখ্য যে মওলানা ভাসানীও একই অবস্থান নিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ফেব্রুয়ারিতে মওলানা ভাসানী এবং নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর মিটিঙয়ে মওলানা যখন পুনর্ব্যক্ত করছিলেন যে তিনি আরটিসি তে যাবেন না, তখন তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি এটির সাফল্য কামনা করেন এবং এতে যদি ভাল কিছু হয় তার অংশীদার তিনি হবেন। তখন তিনি আরটিসির জন্য দু’হাত তুলে প্রার্থনা করেছিলেন।

লাহোরে ভুট্টো এবং শেখ মুজিব প্রতিনিধিদলগণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দুটো আলাদা দল এলো। শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানালেন এয়ার মার্শাল আজগর খান এবং জেনারেল আজম। ভুট্টো চাইলেন যে শেখ মুজিব তার সাথে একত্রে প্লেন থেকে নামুক। কিন্তু শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা লোকেরা তার বিরোধীতা করলেন। ফলে ভুট্টো প্লেন থেকে নেমে একটি ট্রাকে চেপে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করলেন। তার পেছনে মোটামুটি ভীড় ছিল। এরপর শেখ মুজিব এবং তার দল নেমে এলেন এবং বিশাল মিছিল নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলেন। একটি সংক্ষিপ্ত পথসভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

দলটি সেদিন সন্ধ্যায় রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছুল। ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির (ডিএসি) একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল বটে তবে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে সেটা কোন ফলপ্রসূ আলোচনা ছিল না। পরদিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স শুরু হলো। যেহেতু ঈদ উল আজহা সমাগত ছিল এবং অংশগ্রহনকারী দলগুলোর মধ্যেও পরামর্শের প্রয়োজন ছিল, তাই সকলের সম্মতিতে ১০ দিন মূলতবী নিয়ে মার্চের ১০ তারিখ পুনরায় বসার সিদ্ধান্ত হল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স শুরু হবার দু’দিন পূর্বে ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটি অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দেবার জন্য এবং সাধারন নেগোসিয়েশন অবস্থানে আসার জন্য সম্মিলিত হবে।

ঢাকা ফিরে শেখ মুজিব বললেন আমি যেন বিশেষজ্ঞদের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের (প্রধানত অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ) সাথে বসে ছয় দফার আলোকে সংবিধান প্রনয়নের জন্য প্রস্তাবনা নির্ধারন করি। ছয় দফা অকার্যকর এবং একে ঘিরে কোনো ফেডারেল কাঠামো তৈরি সম্ভব নয়, এমন সমালোচনার জবাব দেবার জন্য এটা দরকারী ছিলো। ওয়ার্কিং গ্রুপটির কয়েকটি মিটিঙয়ে সুনির্দিষ্ট সংবিধান প্রস্তাবনা এবং বিকল্প আলোচনার অবস্থান নির্ধারন করা হয়েছিল। সম্ভাব্য বিরোধীতা অনুমান এবং তার জবাব প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

৬ই মার্চ, ১৯৬৯ এ শেখ মুজিব তার সহকর্মীদের নিয়ে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আমাকে লাহোরে প্রতিনিধিদলে যোগদান করতে এবং রাওয়ালপিন্ডিতে উপদেষ্টা হিসেবে অংশ নিতে বলা হল। আরো মনে করা হয়েছিল যে ডঃ সারোয়ার মুর্শীদ এবং ডঃ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে প্রতিনিধি দলে অংশ নিতে অনুরোধ জানানো হতে পারে। লাহোরে পৌঁছে বুঝা গেল যে বিভিন্ন অংশ থেকে আগত প্রতিনিধি থাকার কারণে একটি সাধারন ফরমানে দাবী দাওয়া উত্থাপন করা বেশ কঠিন। কারণ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নেতৃবৃন্দের মাঝে ক্রমশ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

শেখ মুজিব ডিএসি মিটিঙে অংশ নেন নি, তিনি অসুস্থতা দেখিয়ে হোটেলেই ছিলেন। আসলে সাধারণ দাবীনামায় ছয় দফার অন্তর্ভূক্তিতে পাঞ্জাবী নেতাদের প্রবল বিরোধীতার কারণে তিনি আলোচনা থেকে দূরে থাকতে চাইছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ যুক্তি দেখালো যে ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির ঐকমত্যের আট দফার মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা ভাঙ্গার শর্ত অন্তর্ভুক্ত। কারণ ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি ‘ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার’ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। “ফেডারেল” চরিত্র মানে কী, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হল এবং এ উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং এক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিলোপন সম্পর্কে ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির নিজের অবস্থান পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল। একজন পাঞ্জাবী সাবেক উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বরাবরই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং এক-কেন্দ্র বিলোপের বিরোধীতা করে আসছিলেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, কমন চার্টারে “ফেডারেল” বলতে কী বুঝানো হয়েছে, তখন তিনি বললেন যে সবাই এর অর্থ জানে এবং দরকার হলে অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে এর অর্থ দেখা যেতে পারে! শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ, ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির সমর্থন নিয়ে গোঁ ধরে বসলো যে সাধারণ দাবীনামায় স্বায়ত্ত্বশাসন অন্তর্ভুক্ত না করলে তারা রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে অংশ নিবেন না। তারা দেখালেন যে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স আহবান করা হয়েছে গণআন্দোলনের মুখে। এই আন্দোলন ১১ দফাতে তাদের সংবিধান বিষয়ে দাবী পেশ করেছে। এতে ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিলোপনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটিতে এমন মেরুকরণের কারনে চেম্বার হাউজে তাড়াহুরো করে একটি ইস্ট পাকিস্তান রিজিওনাল ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির সভা আহবান করা হল। বাঙালি প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত এবং ১১ দফা আন্দোলনের গতিতে বাঙালিদের একটি সাধারন দাবী থাকা উচিত এবং সেটি হল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন। ঐক্যমতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটির নিকট পাঁচটি সুপারিশ দেওয়া হলো। এই পাঁচটি সুপারিশের মধ্যে ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন এবং এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবার দাবী। কেন্দ্রীয় ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এগুলো মেনে নেওয়া যায় কিনা, তা খুঁজতে লাগলো। তবে তা কার্যকর হয় নি। কারণ পাঞ্জাবি নেতারা ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের শক্ত বিরোধীতা করে আসছিলো। মেটাফিজিক্স এবং জুরিসপ্রুডেন্স দেখিয়ে তর্ক করা হল যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রশ্নে ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি কিংবা আইয়ুবের আইনসভা কোনোটারই সিদ্ধান্ত দেয়ার ‘এখতিয়ার’ নেই। এর বিপক্ষে যুক্তি এলো যে, যেহেতু প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনীগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক একশান কমিটি এবং আইয়ুবের আইনসভারএ খতিয়ার রয়েছে, তাই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন নিয়ে কাজ করার যোগ্যতাও তাদের রয়েছে।

ইতোমধ্যে আমি ভাবছিলাম যে আমাদের বিশেষজ্ঞ দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই দলে কিছু অর্থনীতিবিদ অর্ন্তভূক্ত করা দরকার। সেই লক্ষ্যে ইসলামাবাদের তৎকালীন অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আনিছুর রহমানকে লাহোরে আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানানো হলো। তার সাথে অধ্যাপক ওয়াহিদুল হক, যিনি ইসলামাবাদে ছিলেন এবং ইতোমধ্যেই ঢাকা থেকে আগত ড. মোজাফফর আহম্মেদ চৌধুরী পরের দিনই আমাদের দলে যোগ দিলেন।

৮ মার্চ সন্ধ্যায় সাব-কমিটির মধ্যে বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে মাওলানা মওদুদী, মমতাজদৌলতানা ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীসহ পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের কক্ষে আসলেন এবং বললেন যে, “ছয় দফা” স্বায়ত্বশাসনের দাবী আমাদের সাধারন দাবীনামার অংশ হওয়া উচিৎ নয়। শেখ মুজিব তাঁর দাবীতে অটল ছিলেন। তিনি এবং তাঁর দল “ছয় দফা” ফর্মূলার উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করতে না দিলে গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহন করবেন না। “ছয় দফা” ফর্মূলা অকার্যকর বলে যখন কিছু পাঞ্জাবী নেতা কথা বলছিলেন, তখন শেখ মুজিব বললেন যে, তিনি সাথে করে একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে এসেছেন। যারা তাদের (পাঞ্জাবী নেতাদের) নির্বাচিত যে কোন বিশেষজ্ঞ দলের সাথে ‘ছয় দফা’ ফর্মূলা প্রয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তখন আমাদের পাঠানো হলো। কারণ এই মুহূর্তটার জন্যেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ও শেখ মুজিবের বিশেষজ্ঞ দলের মাঝে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক শেষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, বিষয়টি তার জন্য ‘খুবই জটিল’ এবং ‘দুর্ভাগ্যবশত’ তাদের হাতে এত বিশেষজ্ঞ নেই।

একদিকে ‘ছয় দফা’-র ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী সাধারন দাবিনামার অংশ না করার সিদ্ধান্তে পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দ অনড়, অন্যদিকে শেখ মুজিব আপসহীন থাকায় একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, “ছয় দফা” সাধারন দাবিনামার অর্ন্তভুক্ত করা না হলে তিনি পরের দিন সকালে রাওয়ালীপিন্ডির গোল টেবিল বৈঠকে অংশ না নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাবেন। এদিকে পাঠান ও বেলুচ নেতারা ‘ছয় দফা’-কে সাধারন দাবিনামাতে অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে সমর্থন প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া সংক্রান্ত তাঁদের দাবীকে সমর্থন দেয়াতে বাঙালিদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এয়ার মার্শাল আজগর খানের মধ্যস্থতায় ৮ মার্চের সমস্ত বিকেল নিবিড় আলোচনার পর অবশেষে একটি আপস ফর্মূলা খুজে বের করা হয় যে, সর্বদলীয় কমিটি একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ দাবীনামা প্রস্তাব করবে। তবে প্রত্যেক দল তাদের নিজ নিজ দাবীগুলো পৃথকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পাবে। এর মাধ্যমে শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ তাদের দাবীগুলো গোল টেবিল বৈঠকে তুলে ধরার সুযোগ পাবে। এই শর্তে শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহনে সম্মত হলেন।

৯ মার্চ শেখ মুজিব বাস যোগে রাওয়ালীপিন্ডি রওয়ানার আগে আমাদেরকে ‘ছয় দফার’ উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত দাবীর একটি বোধগম্য বিবৃতি তৈরীর নির্দেশনা দিলেন। ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্ত বয়ষ্কদের ভোটে সরাসরি নির্বাচনের সাধারণ দাবীর প্রতি সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি ‘ছয় দফা’ ফর্মুলায় নির্দেশিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে সারা দিন কাজ করে খসড়া প্রনয়ণপূর্বক ৯ মার্চ সন্ধ্যায় খসড়াটি রাওয়ালীপিন্ডিতে নেয়া হয়। এই বিবরণীতে বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রণীত ‘ছয় দফা’ ফর্মুলার পয়েন্টগুলোর প্রত্যেকটি সবিস্তারে ও পুঙ্খনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়। এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে জনসংখ্যার অনুপাতে ‘এক লোক-এক ভোট’-এর মাধ্যমে ফেডারেল সংসদের জনপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের দাবীর পক্ষে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। আওয়ামী লীগের যৌক্তিক দাবীসমূহকে দরকষাকষির মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিব সব পক্ষ থেকে মনোনীত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলেন। যারা ‘ছয় দফা’ ফর্মুলার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রয়োগের যথার্থতা খুঁজে বের করবে। এরকম আলোচনার জন্য তার বিশেষজ্ঞ টিম পুরোপুরিভাবে তৈরী ছিল। বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও তদানীন্তন পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ইকনমিকস ডেভেলপমেন্টস এর পরিচালক ড. নজরুল ইসলামকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। যেন তিনি বিশেষজ্ঞ টিমের সাথে যোগ দিয়ে কমিটির আলোচনা চালিয়ে নিতে পারেন।

রাওয়ালপিন্ডি এসে দেখলাম যে এখানে মনজুর কাদেরও উপস্থিত। সে আমার সাথে যোগাযোগ করল এবং আমাকে অবহিত করল যে, আইয়ুব খান তাঁকে তার উপদেষ্টা হিসেবে রাওয়ালপিন্ডি ডেকে এনেছেন। তখন শেখ মুজিবের প্রস্তাব এবং সেটি বাস্তবায়নের কথা তাকে জানানো হলো। তিনি আনন্দের সাথে জানালেন যে এরকম একটা কমিটি গঠিত হওয়াই ভালো এবং সম্ভবত তিনি সেখানে সরকার পক্ষের একজন হবেন।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখা গেল, পাঞ্জাবীরা তাদের পূর্বের অবস্থানে অনড়। এমনকি তারা ‘ছয় দফা’ ফর্মূলা নিয়ে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাল। পাঞ্জাবের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খান ও তার আ্ইন মন্ত্রী জাফরের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করছিল। বস্তুতপক্ষে আইয়ুব খান নিজে আপত্তি উত্থাপনের আগেই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ‘ছয় দফা’ ফর্মুলার বিরোধীতা শুরু করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক এ্যাকশন কমিটির ফেডারেল সংসদীয় সরকারব্যবস্থার দাবী সংখ্যাসাম্যর ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন কিংবা এককেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়া নির্দেশ করে না। তিনি আরো বলেন, এ প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা হতে পারে না।

তদকালীন পাকিস্তানের প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী ড. নুরুল হুদা আ্ইয়ুব খানের বিশেষজ্ঞ টিমের একজন সদস্য ছিলেন। উনি আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন এবং সরকারি শিবিরে কী ঘটনা ঘটছে, সে সম্পর্কে কিছু ‘গোপনীয় তথ্য’ দিলেন। তার মতে উল্লিখিত বিষয়ে সরকারি শিবির দুই ভাগে বিভক্ত। যাদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। দোহার সমর্থনপুষ্ট জাফর এবং এ্যাডমিরাল এ, আর, খান যারা বাজপাখি (Hawks) বলে পরিচিত, তারা স্বায়ত্বশাসন ও এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গার দাবী কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়। এমনকি তারা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনেরও বিপক্ষে। ড. হুদা নিজে এবং মন্জুর কাদেরদের গ্রুপ, যারা ঘুঘুপাখি (Doves) নামে পরিচিত, তারা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের পক্ষে যার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে আলোচনা করা যায়।

আমি নিজেও মন্জুর কাদেরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলাম। ১১ মার্চ মন্জুর কাদেরের সাথে আমার যখন দেখা হয়, তখন তিনি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের বিষয়ের তার সর্থনের কথা জানান। তিনি আরো জানান যে, তিনি ‘ছয় দফা’ ফর্মুলা পরীক্ষা করে দেখছেন এবং একটি জটিলতা লক্ষ করছেন। সেটা হচ্ছে দুটি ভিন্ন মুদ্রার দাবী। তাকে জানানো হল যে সম্মেলনে দেয়া বিবৃতিতে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের অন্তর্গত একক মুদ্রার একটি বিকল্প প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কেবিনেট ডিভিশন থেকে প্রাপ্ত ট্রান্সক্রিপ্টে বিকল্প প্রস্তাবটির কথা উল্লেখ না থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি তাকে জানাই যে, শেখ মুজিব একটি লিখিত বিবরণী তৈরি করে তার কপি বিতরণ করেছেন। সুতরাং তাতে এমন একটা বড় ভুল থাকার সুযোগ নাই। তিনি হতাশা প্রকাশ করেন এবং তাকে শেখ মুজিবের লিখিত বিবরণীর একটি কপি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তখনই তা সংগ্রহ করে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ১১ মার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকার পক্ষ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের বিষয়ে জরুরী আলোচনা ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দিকে ঝুঁকেছিল। ১২ই মার্চে আইয়ুব খানের উদ্ধোধনী বক্তব্য দেয়ার কথা ছিল।

১২ মার্চ এর দিনে এডমিরাল এ আর খান এবং এয়ার মার্শাল আসগর খানের মধ্যে দীর্ঘ কথা কাটাকাটিতে উল্লেখযোগ্য আর তেমন কিছুই ঘটলো না।

১২ মার্চের সন্ধ্যায় ডঃ হুদাসহ অনেকে প্রচার করতে লাগলেন যে বাজপাখির দল নিয়ন্ত্রণ পেতে শুরু করেছে। পরবর্তীতে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে ১২ মার্চ রাতে স্বায়ত্বশাসনের বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ পাঞ্জাবী বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং সরকার পক্ষীয় বাজপাখির দল একটি মিটিং করেছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিলোপ এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত সকল নমনীয়তা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

মার্চ এর ১৩ তারিখে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারায় আইয়ুব একটি বিবৃতি পাঠ করলেন। যা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো যে তিনি বাজপাখির দলের মারাত্মক চাপে পড়েছেন। এই আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তার বরাতে জানা যায় যে আইয়ুবের কিছুই করার ছিল না। কারণ আড়াল থেকে ইয়াহিয়া এবং সেনাবাহিনী সমস্ত কলকাঠি নাড়ছিলেন। তাঁরা ততক্ষণে ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। আসল ক্ষমতায় আর্মির উপস্থিতি টের পেয়ে শেখ মুজিব ১২ তারিখে ইয়াহিয়ার সাথে একটি আলাদা সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ইয়াহিয়াকে অনুকূলে নিয়ে এসেছিলেন। ইয়াহিয়া ভাবভঙ্গি ঠিকই ছিল বরং তিনি আইয়ুব এবং মোনায়েম খানের উপর সুকৌশলে দোষ চাপাচ্ছিলেন যে তারা ছয় দফা দাবীকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে অস্ত্র দিয়ে জবাব দিতে চায়। কিন্তু ইতিহাসের আগাগোড়া দেখলে আপনি বুঝা যায় যে এই মিটিঙের মাধ্যমে ইয়াহিয়া রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বাহ্যিকভাবে সম্মেলনের সফলতা কামনা করলেও, তিনি আসলে চাইছিলেন যেন এটি ব্যর্থ হয়। এজন্য তিনি আর্মির পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করছিলেন। ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য এ ধরনের ব্যর্থ একটি অবস্থা তার কাছে আবশ্যক ছিল।

আইয়ুবের ঘোষণা ছিল এক পক্ষকে খুশি করার মতো। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পাঞ্জাবী নেতাদের সুরে তিনি তার সেই বিবৃতিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বা এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে একটি ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার গঠন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য তিনি ১৯৬২ সালের সংবিধানে পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা নিবেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন এবং এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মত মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা শুধুমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই করতে পারেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে দেখা গেল এই অবস্থান গ্রহন ছিল পুরোই একটি কৌশল। কারণ ২১ মাস পর একটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু আবারো সেই পাঞ্জাবীরা গোঁ ধরল যে বিষয়গুলো এতই মৌলিক যে জনপ্রতিনিধিগণ এটি নির্ধারিত করতে পারবেন না। এটি ঠিক হবে অন্যত্র গোল টেবিল বৈঠকে। আইয়ুবের এই বিবৃতিটি দেয়া মাত্র পাঞ্জাবী নেতারা তাকে তড়িঘড়ি করে অভিনন্দন জানালেন এমনকি গণতান্ত্রিক একশন কমিটির সদস্যদের আলোচনা করার আনুষ্ঠানিকতার সুযোগও দিলেন না। সেখানেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে স্বায়ত্বশাসন বিরোধীরা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য আলোচনার সব পথ বন্ধ করে দিতে সফল হয়ে গেল। শেখ মুজিব এ ভাষণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্মেলন কক্ষ ত্যাগের পর তিনি পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসলেন। বিকাল ৩ টায় একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হল এবং আমাকে বলা হল আইয়ুবের ভাষণ প্রত্যাখ্যানপূর্বক নিজেদের ডিএসি *(ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি)* থেকে প্রত্যাহার এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবার মর্মে সাংবাদিকদের জন্য একটি বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন রকম খবর আসছিল। একদিকে মঞ্জুর কাদের জানালেন যে আলোচনা পুনরায় শুরু করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে গুজব শোনা যাচ্ছিল যে মিলিটারি ক্ষমতা গ্রহন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে আওয়ামী লীগ ডিএসি *(ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি)* থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং গন-আন্দোলন চলবে। ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি সেদিন সন্ধ্যায় বিলুপ্ত ঘোষিত হল।

শেখ মুজিব ভেবেছিলেন আইয়ুবের ভাষণ প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন, তাতে গনসমর্থন পাবেন। তাই তিনি জনগণের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ঢাকায় টেলিফোন করলেন। বাঙালি জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল রোমাঞ্চকর। আইয়ুব, পাঞ্জাবী নেতা আর আইয়ুবের ভাষণকে স্বাগত প্রদানকারী বাঙালিদের বিরুদ্ধে এবং ছয় দফার সমর্থনে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। বাঙালির মুখপাত্র হিসেবে শেখ মুজিবের যথার্থতা এই বিক্ষোভে প্রমাণ হল।

আইয়ুব বুঝতে পারলেন যে পূর্বের দিকটায় অনান্য বাঙালি নেতাদের পাত্তা দেওয়াই বৃথা। কারন জনগণ কিংবা পরিস্থিতির ওপর তাদের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি সম্মেলন ভেঙ্গে যাবার পরপরই শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ছয় দফা মেনে নিতে পারবেন না বলে জানালেন এই অজুহাতে যে, সংবিধানের এই পরিবর্তন জাতীয় পরিষদে পাশ হবার জন্য যথেষ্ট সমর্থন পাবে না। শেখ মুজিব পাল্টা জবাব দিলেন যে সংবিধান সংশোধন বাঙালিদের মর্জিমতে হলে সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এরপর আইয়ুব অজুহাত পাল্টিয়ে বললেন যে এ ধরনের সংবিধানের সংশোধন অনেক সময়সাপেক্ষ। শেখ মুজিব তাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে সংশোধনের খসড়া তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রদান করা হবে।

সেই মিটিং থেকে ফিরে শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে তার উপদেষ্টামণ্ডলীদের ডেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতের নির্দেশনা দিলেন। ঢাকায় ফিরে সেই দলটি দিন রাত কাজ করতে লাগলেন, যাতে তিন সপ্তাহের মধ্যে ১৯৬২ সালের সংবিধানের একগুচ্ছ সংশোধনের খসড়া প্রস্তুতি শেষ করতে পারেন। যেখানে ছয় দফার প্রতিফলন থাকবে আর দূর হবে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে এ সমস্ত অন্তর্ভুক্ত করে আওয়ামী লীগ সদস্যরাই জাতীয় পরিষদে সংবিধান সংশোধনী বিল প্রস্তাব করবেন। কামরুজ্জামান সেই কপিগুলো রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে গেলেন এবং ২২ শে মার্চ তারিখে আইয়ুবকে এক কপি আগেভাগেই পৌঁছে দিলেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি জাতীয় পরিষদে ওঠার আগেই আইয়ুব পদত্যাগ করলেন। কারন হিসেবে তিনি দেখালেন যে দেশ বিভাগের এই অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। এদিকে আইয়ুবকে সরানোর প্রস্তুতি নিতে থাকা ইয়াহিয়া খান উঠে এসেই ১৯৬২ সালের সংবিধান স্থগিত করার পাশাপাশি সংসদ অবলুপ্ত করলেন এবং সামরিক শাসন ঘোষণা করলেন।

ইয়াহিয়ার প্রথম কাজ ছিল ক্ষমতার কাঠামো সুরক্ষিত করা, যা গন-আন্দোলনের ফলে হুমকির সম্মুখীন ছিল। মার্শাল ল’ জারি করে তিনি কিছু সময় নিলেন। তার প্রথম বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিবেন। অল্প সময় পরেই তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক শলাপরামর্শ শুরু করলেন। শেখ মুজিব প্রস্তাব দিলেন যে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংসদের কাঠামোবিশিষ্ট সংবিধানই একমাত্র সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাঙালিরা অন্য কোনরকম সংবিধান মেনে নেবে না।

বাইশটি বছর কেটে গেল। তবুও পাকিস্তানের জনগণ কিসের ভিত্তিতে একত্রে থাকবে সেটা ঠিক করতে পারল না। ব্রিটিশরা একটি সার্বভৌম সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে পাঞ্জাবী আর্মির হস্তক্ষেপে সেই সংসদ ভেঙ্গে যায়। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, তা গ্রহনকারীদের (আর্মি) কারণে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাম্য নিশ্চিত হবে কিনা সন্দেহ ছিল। তাছাড়া মার্শাল ল’ এর হুমকিতে তারা কেন্দ্র এবং অঞ্চলে তাদের ক্ষমতার বিশেষ বিন্যাস প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশে জারি হয়েছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে সংসদীয় আসনের দাবী ছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম; ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় যেটিতে তারা একতরফা ভাবে জিতেছিল। পাকিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের একত্রে বসবাসের ভিত্তিখানা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ধারণের সেই মৌলিক ইস্যুটি এখন আর এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছিলো না। পাকিস্তান শাসনে পাঞ্জাবী সেনাদের কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। বস্তুত তাদের এমন বিড়ম্বনাও ছিল যে, বাংলাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের কোন এক সময়ে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করেছিল যে ইয়াহিয়া জবরদখল করে ক্ষমতা নিয়েছিলেন এবং তা অসাংবিধানিক ছিল।

যে পাঞ্জাবী নেতারা আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে তর্ক করছিলেন যে শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের মত মৌলিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার রাখেন, তারা এখন সুর পাল্টে ফেলেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অল্পকিছু সংশোধন এনে ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহালের জন্য তাদের কেউ কেউ চাপ দিচ্ছিলেন। অন্যরা চাইছিলেন ১৯৬২ সালের মতো করে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান প্রবর্তিত হোক। সংখ্যালঘু হিসেবে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিষদে পাঞ্জাবীদের ঠাই না পাওয়ার আশঙ্কা পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই তাদের দুঃস্বপ্নের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। পাঠান, বেলুচ এবং সিন্ধুদের বড় অংশই যথাশীঘ্র এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবার জন্য ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলো।

ইয়াহিয়া বুঝতে পারলেন যে এই বিক্ষুব্ধ জনগণের সাথে প্রকাশ্য মিলিটারী শাসন অনন্তকাল চালানো যাবে না। দুই পাকিস্তানের চাপ সামলে তার শাসনকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার জন্য উপায় তিনি খুঁজছিলেন। তার মূল চ্যালেঞ্জ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উন্মাতাল বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং একজনমাত্র নেতার পেছনে গোটা জাতির একতা। শেখ মুজিব মুজিব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ডিক্রি জারির মাধ্যমে কোনো সংবিধান প্রবর্তন বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মতো কিছু তো একেবারেই নয়। একমাত্র সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংসদ কতৃক প্রণীত সংবিধানই বাঙালিরা মেনে নেবে। পাঞ্জাবী ক্ষমতাশালীরা নির্বাচনের রায়ের ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে আর্মির শরণাপন্ন হলেন। তারা যথার্থই ভয় পেয়েছিলেন যে নির্বাচিত সংসদ এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে, যা তাদের ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন কেন্দ্র, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে পারে। একই উদ্বেগে মিলিটারিও ক্রমাগত প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে চলছিল।

এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ইয়াহিয়াকে কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ২৮ শে নভেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন যে একটি নির্বাচিত সংসদ স্থপনের জন্য তিনি আইনগত কাঠামো প্রস্তুত করবেন। এক লোক –এক ভোট অথবা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের দাবিটি তিনি মেনে নিলেন। এতে জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৯ টি পূর্ব পাকিস্তানের হয়ে গেল। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবার ঘোষণাও তিনি দিলেন। স্পষ্টতই এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধুর এনডব্লিউএফপি এবং বেলুচিস্থানের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়ে নির্বাচনে বাঙালিদের সামনে এককভাবে দাঁড় করানো। এভাবে সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। এখানে অবশ্য ছোট্ট একটি ঝুঁকি ছিল যে প্রতিনিধিগণ বাঙালিদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা সম্বলিত সংবিধান পাশ করিয়ে ফেলতে পারে।

নিঃসন্দেহে এটাই ছিল ইয়াহিয়ার প্রধানতম চিন্তার বিষয়। ১৯৭০ সালের ২৮ শে মার্চে প্রণীত আইনি কাঠামোর মধ্যে কতিপয় প্রথাবিরুদ্ধ অনুবিধিতে এ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং সংখ্যালঘু শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণে আর্মির ভূমিকা সম্পর্কে এতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছিল। আইন কাঠামোটির ২০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান কাঠামোতে পাঁচটি মৌলিক নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যার চার নম্বরটি ছিল নিন্মরুপঃ

*“আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এরূপে বণ্টিত হবে যেন প্রদেশ সমূহ সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে অর্থাৎ তারা আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিকভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করবে। তবে বহির্বিশ্ব এবং আভ্যন্তরীণ যে কোন ব্যাপারে এবং স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষায় যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে।”*

২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা ছিল যে সংবিধান বিলটি প্রামাণ্যকরণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। আরও উল্লেখ ছিল যে, যদি প্রামাণ্যকরন প্রত্যাখ্যাত হয় তবে অধিবেশন অবিলম্বে বিলুপ্ত হবে।

বাঙালিরা দেখতে পেল, এসব অনুবিধিতে নির্বাচিত সাংসদগণের গৃহীত সিদ্ধান্তে পাঞ্জাবী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং আর্মির ভেটো ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। নির্বাচিত সংসদ স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাৎ শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, তিনি মনে করেন এক লোক-এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত কতৃপক্ষ হবে সার্বভৌম এবং তাদেরকে সংবিধান প্রনয়ণের ক্ষমতা প্রয়োগে ২০ এবং ২৫ নং অনুচ্ছেদের মতো অনুবিধি দিয়ে শৃঙ্খলিত করা যাবে না। তিনি এ সকল অনুবিধি বাতিল করার আহবান জানালেন এবং বললেন যে, যেভাবেই হোক না কেন জনগণের স্বার্বভৌমত্বের ওপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ বেআইনি এবং অযৌক্তিক।

ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তিনি সতর্কভাবে বেশ কিছু হিসেব নিকেশ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালিদের ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবীর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের একতাবদ্ধ করা। তিনি আরও ঠিক করে রেখেছিলেন যে যদি ১২০ দিনের মধ্যে সংসদ সংবিধানের রূপদান করতে পারে, তবে সেটি হবে পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় আইনী কাঠামো। যদি এ সময়ের মধ্যে করতে না পারে, তাহলে সংসদ অবিলম্বে বিলুপ্ত হবে। সদস্যগন সমঝোতা করবেন মর্মে সমঝোতা করবেন, এমনটা প্রত্যাশিত ছিল। আশা করা হচ্ছিলো সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী কিছুটা হলেও স্বায়ত্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। যদি সমঝোতা না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রামাণ্যকরণ প্রত্যাখান করতে পারবেন। এছাড়াও, ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারবে না। অন্যভাবে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং এতে করে তিনি ইচ্ছামতো এবং সুবিধাজনক ভাবে ছড়ি ঘুরাতে পারবেন। এই কৌশল পঞ্চাশের দশকে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল এবং ইয়াহিয়া সোৎসাহে ভেবেছিলেন তিনিও তা পারবেন। আওয়ামী লীগ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না বলে হামিদুল হক চৌধুরীর মত কতিপয় প্রবীণ বাঙালি রাজনীতিবিদের মন্তব্যও তাকে ভরসা দিয়েছিল।

যতই প্রাক নির্বাচনী প্রচারণা এগুচ্ছিলো, ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিলো যে আওয়ামী লীগ এককভাবে সার্বজনীন সমর্থনপুষ্ট একটি দল হয়ে উঠছে। অন্য দলগুলো অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারছিল যে আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে। ফলে, তারা নির্বাচন স্থগিত করার জন্য ছটফট করতে লাগলো।

আগস্টের দিকে বন্যা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সুযোগ পেয়ে গেল। তাঁরা ৫ই অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন পেছানোর জন্য চাপ দেয়া শুরু করলো। তারা মনে করেছিল নির্বাচন পেছালে হয়ত তারা তাদের ভীত কিছুটা শক্ত করতে পারবে। নির্বাচন পেছানোর প্রচেষ্টায় তারা সফল হলেন। নির্বাচনের তারিখ ৫ই অক্টোবরের পরিবর্তে ৭ই ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হল। এই মূলতবীকরন যদিও আওয়ামী লীগের কাজে লেগেছিল। বড় সময় পেয়ে শেখ মুজিব অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় ভ্রমন করতে পেরেছিলেন এবং বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষের নিকট যেতে পেরেছিলেন। এছাড়াও নভেম্বর মাসের ঘটে যাওয়া সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। এটি জনগনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল যা চুড়ান্তভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবান্বিত করেছিল।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এবং প্রাণহানির বিচারে এটি ছিল একটি বিপর্যয় যা বিশ্বজুড়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল। ইয়াহিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্ক্রিয়তা দেশের ভেতরে এবং বাইরে সকলেই লক্ষ্য করেছিলেন। সাইক্লোনের পরপর ইয়াহিয়া চীন হতে ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রাবিরতি নিয়েছিলেন। কিন্তু থেকে যান নি। সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম ছিল ধীর এবং অপর্যাপ্ত। এতে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বাঙালিদের ক্ষোভ প্রচার- দু’টোতেই নিজেদের প্রমান করার সুযোগ পেয়েছিল।

অন্যান্য দলগুলো আবারো নির্বাচন স্থগিতের জন্য আস্ফালন শুরু করতে লাগলো। আওয়ামী লীগ সর্বোতভাবে নির্বাচন স্থগিতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। বস্তুতপক্ষে, শেখ মুজিব বুঝালেন যে নির্বাচন স্থগিতের এই প্রচেষ্টা ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র এবং হুশিয়ার করে দিলেন যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড জনগন প্রতিহত করবে। তিনি বললেন যে দশ লক্ষ মানুষ ইতোমধ্যে মরেছে এবং যদি দরকার হয় আরও দশ লক্ষ আত্মত্যাগ করে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করবে এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য ক্ষমতা কেড়ে নেবে।

এমন অবস্থা দেখে, ইয়াহিয়া আর নির্বাচন পেছালেন না। শুধু সাইক্লোন উপদ্রুত এলাকাগুলোতে (১৭ টি আসনে) নির্বাচন পেছানো হল। অন্যান্য এলাকায় তফশীল অনুযায়ী ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

জাতীয় পরিষদের ৩১৫ টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১৬৯ টি। আওয়ামী লীগ এই আসনগুলো মধ্যে ১৬৭ টি-তেই জিতে গেল। শেখ মুজিবকে পরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া এই অভুতপূর্ব সিদ্ধান্তপূর্ণ নির্বাচনী ফলাফল ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ এবং ছয় দফার সমর্থনে স্পষ্ট রায়। এই ফলাফল ইয়াহিয়ার সম্পূর্ণ কৌশলকেই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলায় ফেলে দিয়েছিল। তিনি পূর্বে কিছু আসন পেয়ে বাধাহীনভাবে ইচ্ছামতো চালাতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন। এখন তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্মুখীন হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে পরিস্থিতি পুরোপুরি তার হাত ফসকে যাচ্ছে এবং দেশ চালানোর ক্ষমতা তিনি হারাতে বসেছেন। যেখানে তিনি নির্ভর করছিলেন পূর্বপাকিস্তানে কিছু আসন হলেও জিততে পারবেন বলে ধারণা করে তিনি ফলাফল হিসেবে পেলেন একনিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তার এই অনুমান শুধু পরিস্থিতির ওপর হিসেব নিকেশেই বদ্ধমূল ছিল না বরং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ আর ইয়াহিয়া যাঁদের উপর বিশ্বাস রাখতেন, সেই বহির্বিশ্বের নেতারাও তাকে এমন ধারণা দিয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনে ভুট্টো শুধু সিন্ধু আর পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মোট ১৩১ টি আসনের মধ্যে ৮৩ টিতে জয়লাভ করেন। ভূট্টোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মত। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাঁর একেবারে প্রথম বিবৃতি ছিল যে পিপলস পার্টির সম্মতি ছাড়া সংবিধানে কোনো পরিবর্তন আসতে পারবে না। তিনি সিন্ধু এবং পাঞ্জাবকে “ক্ষমতার কেন্দ্র” বলে দাবী করেন। এর পরে তিনি বলেন, “শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে জাতীয় রাজনীতি চলে না”। স্পস্টতই তিনি দেখলেন যে জাতীয় পরিষদে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল পরিষদের বাইরে তাকে মোকাবেলা করা। একমাত্র জায়গা যেখানে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী একটি শক্তির সাহায্যে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পেছনে ফেলতে পারবে, সেটা হল আর্মি। এই একই প্রক্রিয়াতেই ২৪ বছর ধরে পাকিস্তান চলেছে। যখনি কোনো গনতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে মোকাবেলা করতে চেয়েছে, তখনি তারা সামরিক শক্তির শরণাপন্ন হয়েছে। আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; ভুট্টোর দাবী মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল না। ইয়াহিয়া এখানে নগ্নভাবে আপস করতে এগিয়ে এলেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে এসে মনে হচ্ছিলো, আওয়ামী লীগকে ৬ দফা পরিবর্তনের জন্য ইয়াহিয়া স্বউদ্যোগে এবং প্রাথমিকভাবে চাপ দিতে লাগলেন যাতে অভিজাত শাসকশ্রেণী এবং আর্মির স্বার্থ রক্ষিত হয়। যদি তিনি সফল হতেন, তবে হয়তো অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কাছে ভিড়িয়ে ভুট্টোকে সম্পূর্ণ একা করে ফেলতেন।

ইয়াহিয়া যখন এসব ভাবছিলেন, তখন বুঝাই যাচ্ছিল যে ভুট্টো জেনারেলদের একটি অংশের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত। ইয়াহিয়ার একজন উপদেষ্টার প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা ভুট্টোর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সম্ভবত জেনারেল গুল হোসেন সহ আরও যারা একাত্তরের পরে ভুট্টোর নেয়া শুদ্ধি অভিযানে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারা এই গ্রুপেরই অংশ ছিলেন। ঢাকায় গভর্নমেন্ট হাউসে অনুষ্ঠিত জমকালো ডিনারে একজন জেনারেলের মন্তব্যে এদের সেসময়কার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য আরেকজন পাকিস্তানী অফিসারের বরাতে জানা যায় যে, মন্তব্যটি ছিল “চিন্তার কিছু নেই,... আমরা এই পিছিয়ে থাকা কালো লোকদেরকে আমাদের শাসনভার দেবো না।”

জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসলেন। এখানে ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে একটি প্রাথমিক মিটিং হয়েছিল যেখানে ইয়াহিয়া বাহ্যিকভাবে আপসের ভঙ্গিতে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৬ দফা সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। এভাবেই তিনি ৬ দফা সম্পর্কে ঐকমত্যে আসার জন্য আলোচনার শুরু করতে চেয়েছিলেন।

ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা জানলেন যে, ৬ দফার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইসলামাবাদে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং আসলেই ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল। সুতরাং ৬ দফা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে করা অনুরোধটি ছিল প্রকৃতই মার্জিত আলোচনার আহবান। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ এ ধরনের আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জুন মাসে শেখ মুজিবের উত্থাপিত ৬ দফা দাবীর ওপর সমর্থন যাচাইয়ের উপায় হিসেবেই নির্বাচনকে সূচিত করা হয়েছিল। জনগণের রায়ে তা সমর্থন পেল। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, “৬ দফা” এখন জনগণের সম্পত্তি এবং তিনি তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন আনার অধিকার রাখেন না। এই অবস্থান ঘোষণা করা হয় জানুয়ারির শুরুতে। জাতীয় এবং প্রাদেশিক অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের নিয়ে এক বিশাল জনসভায়। যেখানে তারা ৬ দফা নিয়ে কোন আপস করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। শেখ মুজিব এবং তার জ্যেষ্ঠ সহকর্মীবৃন্দ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে ইয়াহিয়া আলোচনায় বসেন। তারা ইয়াহিয়াকে বুঝাতে চাইলেন যে ৬ দফা পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং সংবিধান অনুযায়ী শুধু কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ কাজে প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করে বাকি ক্ষমতা এবং কার্যাবলী ছেড়ে দেয়া হবে। সেই সম্পদ দিয়ে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা যাবে। এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে সংবিধান মোতাবেক কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং রাজস্ব কেন্দ্র এমনিতেই পাবে এবং তার জন্য অঞ্চলসমূহের ছাড় দেওয়া না দেওয়ার উপর নির্ভর করতে হবে না।

এই আলোচনার পর শেখ মুজিব আমাকে পীরজাদার সাথে ৬ দফা ব্যাখ্যা করে আলাদাভাবে আলোচনা করতে বললেন। সেই মিটিঙে পরিস্কারভাবে বুঝা গেল যে, তাদের মূল উদ্বেগ ছিল কেন্দ্রের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং রাজস্ব বণ্টন নিয়ে। অঞ্চলগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্য নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কিছুটা উদ্বেগ তারা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হলো যে বৈদেশিক মুদ্রা এবং রাজস্বের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ করার কথা সংবিধানেই উল্লিখিত আছে। বৈদেশিক বানিজ্য এবং সাহায্য নিয়ে বলা হলো যে, এসব ব্যাপারে দেশের বৈদেশিক নীতির আলোকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলোই বিবেচনা করবে। আরও উল্লেখ করা হল যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ একাধারে পূর্ব পাকিস্তান এবং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক থাকবে, সেহেতু কোন সমস্যা হবে না। পীরজাদা কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছিলেন না, আরও বলছিলেন যে ইয়াহিয়া খানও এতে আশ্বস্ত হবেন না। ফলে আওয়ামী লীগ কে পিপলস পার্টির সাথে সমঝোতায় আসতে হবে। উনি বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ এবং পিপল’স পার্টির মধ্যে সমঝোতামূলক একটি সংবিধানই পরিষদে উঠার মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদলকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পীরজাদার কথাবার্তাতেই বুঝা যাচ্ছিল যে তার সাথে ভুট্টো এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশ রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে সরাসরি লারকানায় উড়ে গিয়েছিলেন। যদিও বলা হয়েছিল যে এটি একটি “শুটিং ট্রিপ” ছিল, তথাপি ক্ষমতাসীন জান্তার অধিকাংশ জেনারেলও সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, যা ভুট্টো তার ‘গ্রেট ট্র্যাজেডি’ নামক বইতে নিশ্চিত করেছেন। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বাঙালিদের স্তিমিত এবং হতাশ করাই তাদের কৌশল ছিল কিনা, তাতে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। ঘোষণা করা হলো যে ভূট্টো শীঘ্রই ঢাকা আসবেন। নওয়াব আকবর খান বুগতি, মৌলানা নুরানী এবং সরদার শওকত হায়াত খানের মত অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারাও ঢাকা আসছিলেন।

জানুয়ারীর ২৭ তারিখে ভুট্টো ঢাকা এলেন। শেখ মুজিবের সাথে ভুট্টোর বেশ কয়েক দফা আলোচনা হলো। সমান্তরালভাবে আওয়ামী লীগ টিমের সাথে পিপলস পার্টি টিমেরও আলোচনা চলছিল। সেখানে পিপলস পার্টির টিমে ছিলেন জে রহিম, শেখ আব্দুর রশিদ, হানিফ রামেয়, আব্দুল হাফিজ পীরজাদা এবং রাফি রাজা। আওয়ামী লীগের টিমে ছিলাম আমি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ আর এ এইচ এম কামরুজ্জামান। এই দুই দলের আলোচনায় আওয়ামী লীগের সদস্যরা ভেবেছিলেন যে ৬ দফার বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনা হবে। আওয়ামী লীগ পিপলস পার্টির নেতাদের আহবান জানালো ৬ দফার মধ্যে তাদের আপত্তিসমূহ জানাতে। তাদের বলা হলো যে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকটি দফার ভুল বোঝাবুঝি দূর করা সম্ভব। কিন্তু রহিমের নেতৃত্বে পিপলস পার্টি সুনির্দিষ্ট বিষয় তুলে না ধরে সমাজতন্ত্রের জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার অবতরণ করলেন। সমাজতন্ত্রে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের গুরুত্ব নিয়ে রহিম আলোচনা শুরু করলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রের উপস্থিতির প্রসঙ্গ টানলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা তাকে এ ধরনের তুলনা প্রাসঙ্গিক নয় বলে জানালেন। বরং তাকে ৬ দফার ওপর সুনির্দিষ্ট আলোচনার জন্য চাপ দিলেন। যতদূর মনে পড়ে, ৬ দফায় উল্লিখিত ইস্যুসমুহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা তাঁরা লক্ষ্যনীয়ভাবে এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিকল্প কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয় নি। সুতরাং আলোচনাটি ছিল একেবারেই কাঠামোবিহীন এবং প্রকৃতপক্ষে কোনো যোগাযোগই হচ্ছিলো না। আমি হাফিজ পীরজাদাকে খানিক তিরস্কার করলাম এই বলে যে, একজন আইনজীবী হিসেবে একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার গুরুত্ব তার বোঝা উচিৎ। তাকে তাগাদা দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি তার সহকর্মীদের বুঝিয়ে পয়েন্ট ভিত্তিক আলোচনায় নিয়ে আসেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে আপত্তির বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। যাতে সেগুলো সম্পর্কে উত্তর দেওয়া যায়। তিনি রসিকতার সাথে প্রত্যুত্তর দিলেন যে রহিম বুড়ো মানুষ। তাকে বুঝানো যাবে না এবং পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় পুরোদমে তারা প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। ভুট্টোর মূল চিন্তা ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে। উনি প্রেসিডেন্ট হলে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিনা এবং জোট গঠিত হলে তার দলকে আর কী কী পদ দেওয়া হবে।

জানুয়ারীর আলোচনার পর ভুট্টো ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন করে বললেন যে, “আমাদের সমস্যা সত্যিই বেশ জটিল এবং এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে হলে অন্তত পক্ষে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।” তিনি আরও বললেন যে, “সাংবিধানিক ভাবে অধিবেশন শুরু করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কারণ অধিবেশন শুরু হবার পরও আলোচনা চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।” বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ তার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে কিনা, এরকম প্রশ্নে ভুট্টো জবাব দিলেন এই বলে, “আইনগত দিক থেকে বলতে গেলে পারবে। কিন্তু হাউসকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই কি সংবিধান গৃহীত হবে, নাকি তার জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের ভৌগলিক অবস্থান বিচিত্র, তাই সংবিধান রচনা এবং তা গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

বিরতি নেওয়ার সময় ভুট্টোর দলের সদস্যগন ইঙ্গিত দিলেন যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যাচ্ছেন। এই আলোচনা শেষে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবারো আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্য তাঁরা ফিরে আসবেন।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারির ঘটনাপ্রবাহ এবং পিপলস পার্টির আচরণ এটাই পরিস্কার করে দেয় যে তারা সংলাপের জন্যে কাজ করছে না বরং সঙ্কট ঘনীভূত করতে ভূমিকা রাখছে, যা চলমান সঙ্কটকে সংঘর্ষের দিকে ধাবিত করছে।

একাত্তরের ২রা ফেব্রুয়ারী একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। লাহোরে দুজন তরুণের দ্বারা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটা বিমান ছিনতাই হয়। রারা নিজেদের কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করে। ভুট্টো এবং তার পিপলস পার্টি এই দু’জনকে বীরের বেশে লাহোরের রাস্তায় বরণ করে নেয়। এমনকি ভুট্টো নিজে হাতে তাদের ফুলের তোড়া দেন । ইন্ডিয়াতে এর তীব্র সমালোচনা হয়।

আমি স্পষ্টভাবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া মনে করতে পারি। ছিনতাই করার চেয়ে বিমানটির ধ্বংস হওয়া নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সন্দেহটি ছিল যে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করতেই এরকম পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে শেখ মুজিব এর নিম্নরূপ একটা বক্তব্য পাওয়া যায়ঃ

“সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে এরকম পরিস্থিতি এড়ানো যেত। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে এটা বুঝা উচিত ছিল যে এরকম অবস্থা আত্মঘাতী। আমি সরকারকে এই ব্যাপারে তদন্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলবো যেন কেউ এই ঘটনার সুযোগে পরিস্থিতি আরও অবনতি করতে না পারে ।“

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ দু’জনকে বীর হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। পিপলস পার্টি সাথে সাথে আওয়ামীলীগকে এই প্লেন ছিনতাই এবং ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় দোষী সাব্যস্ত করে । লাহোরে আওয়ামীলীগের অফিসে আক্রমণ করা হয়। তখন থেকেই বলা হচ্ছিলো যে, ছিনতাই নিয়ে দুই পক্ষের দু’রকম প্রতিক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে ৬ দফা অনুযায়ী একটা বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা কতটা কঠিন হবে।

ছিনতাইয়ের ব্যাপারে আওয়ামীলীগের কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা উচিৎ নয়, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব বলেন যে সরকার তাকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানায় নি, যদিও তিনি সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল দলের নেতা। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে, আলভি নামক অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ১ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ২ মার্চ শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে ছিনতাইয়ের ব্যাপারে জানানোর জন্যে অনুমতি চেয়েছিলেন। যেহেতু ২ মার্চ ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তাই তার সেই সুযোগ হয়ে উঠে নি।

এই ছিনতাইয়ের ফলে ইন্ডিয়া তার আকাশসীমায় পাকিস্তানের সকল ফ্লাইটের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান যাবার জন্যে একমাত্র ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে সিলন (*বর্তমান শ্রীলঙ্কা)* হয়ে আসতে হতো। যার ফলে দূরত্ব ও যাত্রার সময় প্রায় ৩ গুন হয়ে যায়, যা কিনা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ কঠিন ও খরচসাপেক্ষ করে দেয়।

ভুট্টোর আচরণ এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকতে গড়িমসি আচরণ এটাই প্রকাশ করছিল যে ইয়াহিয়া এবং সামরিক জান্তা অধিবেশন না করার জন্যে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছে।

তবে ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে বিমান চলাচলের নিষেধাজ্ঞার জন্যে সেনা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে, ফলে তাদের সেনার কার্যক্ষমতা কমে যাবে তাঁদের আশঙ্কা ছিল।

এটা মনে রাখা দরকার যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিব ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই তাঁর নেতাদের সাথে ভিতরে ভিতরে আলোচনা করছিলেন। সংসদ অধিবেশন নিয়ে গড়িমসিই এমনটা ভাবতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এরকম ঘোষণার ফলে মিলিটারি অ্যাকশনের ব্যাপকতা এবং জনতার প্রতিরোধ ও উত্তোরণ ক্ষমতাও ভালমতো বিবেচনা করা হচ্ছিলো। রয়ে যাওয়া সামরিক শক্তি নিয়েও কিছু হিসেব করা হচ্ছিলো। এটাও হিসেব করতে হচ্ছিলো যে ইন্ডিয়ার আকাশসীমা পাকিস্তানিদের জন্যে বন্ধ থাকায় মিলিটারিকে মানুষ ও মালামাল পরিবহনে কিরুপ সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

আমাকে একটা স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া লিখতে বলা হয়েছিলো। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার দলিলটিকে রেফারেন্স হিসেবে নেয়া হয়েছিলো যেখানে ব্রিটিশ রাজাদের অবিচারের ব্যাপারটাকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার কারণ হিসেবে সূচিত করা হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের দিকে শেখ মুজিবের হাতে একটা খসড়া তুলে দেয়া হয়েছিলো। যা তিনি সাথে রাখতেন। তাজউদ্দীন এই খসড়ার সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্য রূপরেখার কাঠামো তৈরি করেছিলেন। এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রধান শহরসমূহে বিশাল জনসমাবেশ ঘটানো, যেখানে শত-সহস্র জনতা রাস্তায় নেমে আসবে যা মিলিটারিকে অন্য দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করবে। যেন প্রধান লক্ষ্যসমূহ যেমন রেডিও স্টেশন, সচিবালয় এবং গভর্নরের বাসভবন দখল করা যায় এবং গভর্নর যেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাপ্তরিক ঘোষণা দেন।

এই সময়ে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্যে চাপ দিতে থাকে। আওয়ামীলীগের সব সদস্য যারা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলো এবং সেই সাথে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি মিটিং হয়েছিলো ‘ভবিষ্যৎ কর্মপরিধির’ ব্যাপারে। এটা বহুল প্রচলিত যে এই মিটিঙের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। আমার মনে আছে মিটিং এর আগে বিদেশী এক কূটনীতিবিদ জিজ্ঞেস করেছিলো যে “তোমরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেবে কি?”

মিটিং এর দিন সকালে যখন পাকিস্তানিদের গড়িমসির জন্যে সবাই রাগান্বিত, তখন ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন ১৯৭১ এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

এই ঘোষণার পর ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া সঙ্কটকে ঘনীভূত করে। ১৯৭১ এর ১৫ ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে তিনি বলেন, তার দল এই অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না যেহেতু ৬ দফা দাবির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত ‘ছাড় দেয়া না সংশোধনমূলক’ কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি । তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তার দলের সদস্যরা আরও সমস্যায় পড়বে এবং তিনি এমন কোন অবস্থায় পড়তে চান না যেখানে “ইন্ডিয়ার বর্বরতা এবং ৬ দফা মেনে না নেয়ার মধ্যবর্তী দ্বৈত বাধ্যতামূলক অবস্থানে” উনাকে পড়তে হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারী করাচিতে তিনি বলেন যে, “তার দলের ৩রা মার্চ এর অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত অবিচল এবং তা বদলাবে না।“

১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি করাচিতে বলেন, “বর্তমান অবস্থায় পিপলস পার্টির জাতীয় অধিবেশনে যোগদান করার কোন মানে নাই।“ তিনি আরও বলেন, তার দলটি আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিল, কিন্তু “এখন আর আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার কোন দ্বার খোলা নেই।” ৬ দফা নিয়ে তিনি বলেন, দাবিগুলোর মধ্যে বৈদেশিক নীতি এবং বৈদেশিক সাহায্য” নিয়ে সমঝোতা সবচেয়ে কঠিন ।

ভুট্টোর বক্তব্য তার কঠোর অবস্থানকে প্রকাশ করেছিল এবং জানুয়ারির শেষের দিকে দেয়া তার বক্তব্যের বিপরীত ছিল, যেখানে উনি বলেছিলেন, আওয়ামীলীগের সাথে উনি আরো আলোচনা করবেন। সেই আলোচনাগুলো জাতীয় পরিষদেও হতে পারে। কিন্তু এখন তিনি এরকম করতে অস্বীকার করছেন এবং আওয়ামীলীগের সাথে কোন আলোচনা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল সামরিক জান্তা অথবা সামরিক জান্তার একাংশ কঠিন কোন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে এবং ভুট্টো তাঁদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। প্রেসে ভুট্টোকে করা একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর পার্টির অধিবেশনে যোগদানের অস্বীকৃতি যে বর্তমান শাসকের সমর্থনপুষ্ট নয়, সেই বক্তব্য এরকমই আভাস দেয়। তিনি আরও বলেন, তার সাথে আর কারো “পর্দার অন্তরালে” কোন সমঝোতা হয় নি। এটা নিয়ে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ইয়াহিয়ার একজন উপদেষ্টার লেখা থেকে জানা যায়ঃ

“এই সময়ের মাঝে ভুট্টো নিজের দরকষাকষির শক্তিশালী জায়গা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তার সাথে সামরিক জান্তার একটা শক্তিশালী অংশ ছিল, যেটা ইয়াহিয়ার সাথে ছিল না। এর আগ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি স্বাধীন ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সামরিক জান্তা “অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ” করছিল যে ইয়াহিয়া দেশের একতা ধরে রাখার জন্য যে কোন ধরণের সাংবিধানিক বিষয়াদি অনুসরণ করছে কিনা। কিন্তু জানুয়ারির শেষের দিকে মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার ব্যর্থ আলোচনার পর তারা আর সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরোক্ষ ভূমিকায় থাকলো না এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ভূমিকা বদলে গেল। আহসানের মতো আমারও ধারণা, ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহিয়াও হামিদ দ্বারা পরিবর্তিত হবে এবং ইয়াহিয়া হয়তো এই বিষয়ে অখুশি হবে না। কিন্তু কোন একটা কারনে জান্তা ইয়াহিয়া কে বদলাল না। তাই ইয়াহিয়া এরকম অগ্রহণযোগ্য অবস্থাতেও তাঁর ভূমিকা পালন করে গেলেন।“

ফেব্রুয়ারির ৩য় সপ্তাহে দুর্যোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে ঢাকাতে মিলিটারির আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় এবং সংসদের সামনে একটি মেশিনগানের ছাউনি দেখা যায়। এই দেখে শেখ মুজিব দলের নেতাদের জরুরি সভা ডাকলেন। সেই সভায় কিছু ছাত্রনেতাও উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেখানে রিপোর্ট আসলো যে ক্যান্টনমেন্টে কিছু গতিবিধি দেখা যাচ্ছে এবং কোন ধরণের মিলিটারি হস্তক্ষেপ আসন্ন। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রাতের বেলায় কোন নেতা যেন বাসায় না থাকে এবং যদি সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তবে যেন তাঁরা ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায় এবং মানুষদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। যদিও এরকম কোন কিছু হয় নি, তথাপি পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত হচ্ছিলো।

২১ শে ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল এবং অনেকেই ধারণা করছিলেন যে সেদিন শহীদ মিনারের সভায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। কিন্তু জনসভায় তিনি বলেন বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ আছে এবং যদি তাদের দাবি মানা না হয়, তবে তারা রক্ত দিতে প্রস্তুত আছে।

একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি আলোচনার জন্যে ঢাকাতে এসেছিল। আলোচনাগুলোতে আওয়ামীলীগের অবস্থান ছিল এরকম যে, আওয়ামী ৬ দফার ভিত্তিতে একটা সংবিধান তৈরিতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু তাঁরা সব রাজনৈতিক দলের সাথে সেই সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য আলোচনায় বসতে চায়। এছাড়া ৬ দফার ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, এনডাব্লিউএফপি এবং অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি যৌথরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা সচল থাকার উপর কোন ধরণের প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকলে আওয়ামী তার ব্যাখ্যা দিতে চায়। ২৪ ফেব্রুয়ারির প্রেস রিলিজের মাধ্যমে শেখ মুজিব আওয়ামীর অবস্থান পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন। এটা ধারণা করা হয়েছিল যে একই সময়ে সামরিক জান্তার একটি মিটিং হয়। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা সেই মিটিং নিয়ে নিম্নরূপ বলেনঃ

“ভাগ্য নির্ধারণী লারকানার আলোচনার পর রাওয়ালপিন্ডিতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি জান্তারা অফিশিয়াল সভায় মিলিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, শেখ মুজিব যদি তার অনমনীয় অবস্থান থেকে সরে না আসেন, তবে কঠিন পদক্ষেপ নেয়া হবে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, ভুট্টোর আক্রমণাত্মক বক্তৃতা নিয়ে সেখানে তেমন কিছু বলা হয় নি। শাসক উচ্চশ্রেণির লোকদের মতো ভুট্টোকে তখন থেকে পাকিস্তানের “জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী” হিসেবে গণ্য করেন তার বিশ্বস্ত বন্ধু পীরজাদা, হামিদ, ওমর এবং গুল হাসানের মতো জেনারেলরা। এই সভাতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে। সেখানে লোকেরা আগেই ইলেকশনের পর থেকে চাপমুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ এর ৮ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত নেন তা না করার জন্য। কারণ তখনকার কিছু সদস্যের সাথে শেখ মুজিবের ভালো যোগাযোগ ছিল। এছাড়া বাকিদের কাছ থেকে তার কিছু সাহায্য দরকার ছিল। কারণ তখন কষ্ট করে হলেও সংসদ অধিবেশন নিয়ে কথা চলছে। কিন্তু এখন সামরিক জান্তার উপর ইয়াহিয়ার কর্তৃত্ব কমছিল। কারণ উনি শেখ মুজিবের উপর কোন প্রভাব রাখতে পারছিলেন না। তাই উনাকে এবং আহসান কে তিরস্কার করা হয়। আহসান চাপমুক্ত হতে চাইছিলেন। তাই তার পরিবর্তে লেফটেন্যান্ট জেনারেক টিক্কা খানকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৭ ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইয়াহিয়া আমিসহ আরও কয়েকজনকে তার উপদেষ্টা হিসেবে সচল থাকার জন্যে আমন্ত্রন জানান। তিনি মন্ত্রিসভার পরিবর্তে উপদেষ্টা সভা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। (কিন্তু সেই প্রস্তাবিত কাউন্সিলে বাঙালিদের মধ্যে আহসানুল হক ছাড়া বাকি সবাই সচল থাকতে অস্বীকৃতি জানান। পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে শুধু কর্নেলিয়াস থেকে যান।)

আওয়ামী লীগের সংবিধানিক কমিটি রাতদিন কাজ করছিলেন, যেন ১ লা মার্চের আগে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা যায়। ইয়াহিয়া ১ লা মার্চের আগে ঢাকায় পৌঁছবেন বলে কথা ছিল এবং আমরা শেখ মুজিবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলাম, যেন খসড়ার একটা কপি ইয়াহিয়ার কাছে ঐদিন পৌঁছে যায়।

যখন সংবিধানের খসড়া তৈরি করা হচ্ছিলো, একজন সিনিয়র বাঙালি সরকারি অফিসার খবর নিয়ে এসেছিলেন যে সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। শেখ মুজিব যেন দ্রুত গভর্নর আহসানের সাথে দেখা করেন এবং এই সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা করেন। তিনি ঐদিন সকালেই আহসানের সাথে দেখা করেন। খবর শুনে আহসান নিজেই আশ্চর্শ বোধ করেছিলেন। শেখ মুজিব বলেন, এরকম কিছু করা হলে বাঙালি তাদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে ধরে নেবে এবং পরিস্থিতি বিস্ফোরিত হবে। আহসান কথা দেন যে তিনি এই খবর ইসলামাবাদে পৌঁছে দেবেন। পরে তিনি জানান যে তিনি তা জানিয়েছেন কিন্তু উনারা সিদ্ধান্ত বদলায় নি। এমনকি তিনি নিজেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে অধিবেশন স্থগিত করা হলে যেন নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্যে করা হয়, অনির্দিষ্টকালের জন্যে নয়। ২৮ ফেব্রুয়ারির এক বক্তৃতায় শেখ মুজিব বলেন যে সাংসদদের কেউ যদি যুক্তিসঙ্গত কিছু বলেন, তবে তা মেনে নেয়া হবে। ঐদিনই এক প্রলম্বিত বক্তৃতায় ভুট্টো বলেন যে বৈদেশিক সাহায্য এবং বাণিজ্য নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যেকার সমস্যার সমাধানের পথে আছেন। তিনি এই বলে শেষ করেন যে, হয় অধিবেশন স্থগিত করতে হবে নতুবা ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার ব্যাপারটা সরিয়ে ফেলতে হবে।

ইয়াহিয়ার উপদেষ্টার ভাষ্যমতে ভুট্টো তখন মিলিটারি জান্তার সাথে যুক্ত হয়ে তাঁদের পক্ষে কথা বলছিলেন। তার রিপোর্ট অনুযায়ীঃ

“তো ইয়াহিয়া অনড় নীতিতে চলতে লাগলেন। ভুট্টোর হুমকির পর ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করা হলো। ১ লা মার্চে অধিবেশন স্থগিত করে ইয়াহিয়ার ঘোষণার চেয়ে উত্তেজনা উদ্রেককারী এবং দুঃখজনক ঘটনার আর হতে পারে না। ৫ই মার্চে এই ঘোষণার ব্যাপারে আমি তাকে যখন জিজ্ঞেস করি তখন উনাকে শুণ্য ও অসহায় লাগছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি শুধু সাইন করেছেন কিন্তু পেছনে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ। ভুট্টো এবং পীরজাদা এই ঘোষণার খসড়া লিখেছিলেন বলে জানা যায়। ইয়াহিয়া আগের মতো এটি প্রচার করেন নি। এটি শুধু রেডিওতে পাঠ করা হয়েছিলো ।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে করাচী যাওয়ার আগেই ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ঢাকায় যেতে রাজি করিয়েছিলেন, যেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে না যায়। তিনি আগেই ভুট্টোকে সেই অধিবেশনে উপস্থিত হতে রাজি করানোর জন্য আহসান, ইয়াকুব এবং পীরজাদাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভুট্টোকে কথা দিয়েছিলেন যে যদি মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ৬ দফা নিয়ে অধিবেশনে জোর দেন এবং যদি তাঁর সংবিধান সংশোধনের খসড়া দেশকে বিভক্ত করে দেবে বলে মনে হয়, তবে তিনি ঐ মুহূর্তে অধিবেশন স্থগিত করবেন। কিন্তু ভুট্টো তাতেও রাজি হন নি। যখন এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে অধিবেশনটিকে ভুট্টোর বয়কটের হুমকির ফলে বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি সাংসদরা অধিবেশনে থাকবেন না, তখন ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করে দেন। কিন্তু তিনি একটা বক্তব্য দিতে চেয়েছিলেন যেন পূর্ব পাকিস্তানে উত্তেজনা তৈরি না হয়। যদিও আমি তার মন্ত্রিসভার কোন সদস্য ছিলাম না, তবুও তিনি আমাকে একটি শান্তিকামী বক্তৃতা প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেন। আমি তাড়াতাড়ি সেই খসড়া তৈরি শুরু করি যা নিম্নরূপঃ

“পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যকার বিরোধের ফলে আমি ১৯৭১ সালের ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করছি। আমি এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, এই স্থগিত সর্বোচ্চ ২-৩ সপ্তাহের জন্যে বলবৎ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে আমি দেশের এই দুই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যবর্তী সমস্যা মিটমাট করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, পাকিস্তানের দু’পক্ষের মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন সংবিধান গঠন করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের জন্যে সব দলের অংশগ্রহণ জরুরি। এমনটি হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো। আমার পক্ষ থেকে আমি জাতিকে এই আশ্বাস প্রদান করছি যে এই ব্যাপারে সব ধরণের সহযোগিতাই করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী আমার সহযোগীদের এটুকুই অনুরোধ করবো। যেন তারা এখনকার অবস্থার গভীরতা বুঝেন এবং আমাকে একটি সমঝোতাপূর্ণ সমাধান তৈরির জন্যে এই দুই-তিন সপ্তাহের সময় দেন।

ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা সমাধান করে ফেলবো। কায়েদ-এ-আজমের কথা মনে রাখবেন, “পাকিস্তান টিকে থাকতে এসেছে।” আসুন আমরা নিজেদেরকে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে নিযুক্ত করি।“

আমি ব্যক্তিগতভাবে খসড়াটি ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে ইয়াহিয়াকে দিই। তিনি তখন করাচির পথে যাচ্ছিলেন। তিনি পরে তা পীরজাদাকে দেন, যিনি ভুট্টোর সাথে মিলে তা নাকচ করে দেন। আমি এখনো হতাশ অনুভব করি যে আমি ইয়াহিয়ার সাথে করাচি গেলাম না কেন। আমি যাই নাই কারণ আমি আর মন্ত্রীসভার সদস্য না এবং তার উপদেষ্টা হবার প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দেই। কিন্তু এখন আমি বুঝি যে ইয়াহিয়ার দুর্বলতা ছিল ব্যাক্তিত্বে। উনি আমার খসড়াটি অনুমোদন করেছিলেন কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ভুট্টো এবং পীরজাদা আরেকটা খসড়া উপস্থাপন করলে তিনি দুর্বল ব্যাক্তিত্বের কারণে সেই উত্তেজনা সৃষ্টিকারীটাকেই মেনে নেন। যদিও আমি প্রমাণ দিতে পারব না এবং মিলিটারি সেক্রেটারিসহ তার ব্যক্তিগত সহকারীর কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম, ইয়াহিয়া ভুট্টোর সাথে মিলে পীরজাদার করা খসড়াটি স্বাক্ষর করার প্রবল বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রবল চাপের কাছে তিনি এক পর্যায়ে নতি স্বীকার করে নেন ।

আহসান ইয়াহিয়াকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন, যদি অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হয় তবে পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটবে। ২৮ ফেব্রুয়ারীতেও মনে হচ্ছিলো, ইয়াহিয়া ১ লা মার্চে ঢাকায় আসবেন। প্রেসিডেন্ট আসার আগে স্বাভাবিকভাবে যে সকল কাজ করা হয়, তা করা হচ্ছিলো। যদিও ১লা মার্চে বিমান এসেছিল, কিন্তু তিনি আসেন নি। একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাতে জানা যায়, বিমানটিকে ২ বার করাচিতে দেরি করানো হয়েছিলো যদি ইয়াহিয়া আসেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত রয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং রিপোর্ট পাওয়া যায় যে, ঐদিন রাতে তিনি ভুট্টোর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সংবিধান খসড়া প্রনয়নের পূর্ণ কমিটি পার্টি অফিসে এসে খসড়াটি সম্পূর্ণ করতে কাজ করছিল। ১ মার্চ ডেডলাইন ধরে উনারা প্রায় কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। হঠাৎ একজন কর্মি এসে বললেন, দুপুর ১টায় রেডিওতে জরুরি একটা ঘোষণা দেয়া হবে। তখন সবাই একটু বিরতি নিয়ে সেটা শুনার অপেক্ষায় থাকলেন। শেখ মুজিব এবং আরও অনেকেই তখন তাঁদের সাথে ছিলেন। শুনার জন্যে একটা রেডিও আনা হয়েছিলো।

দুপুর ০১:০৫-এ একজন এনাউন্স করলো যে এখন ইয়াহিয়ার দেয়া বার্তা শুনানো হবে। মূল কথা ছিল “অনির্দিষ্টকালের জন্যে অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।” এটি একটি অসম্পূর্ণ ঘোষণা ছিল। কারণ হিসেবে ভবিষ্যৎ সংবিধানে সব দলের মতৈক্য হয় নি বলে বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের রাজনৈতিক সংঘাতের বিষয় তুলে ধরা হয়। বলা হয়, “পশ্চিম পাকিস্তানের এত এত নেতাবিহীন অধিবেশন যদি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতও হতো, তবে তা নিজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে যেত।“ আরও বলা হয়, “এটা দরকারী যে এখন রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কিছুটা সময় দেয়া হোক, যেন সংবিধান প্রনয়নের কাজে কিছুটা সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং এরপর অধিবেশন ডাকা হবে।“

অন্য কথায়, ইয়াহিয়া এটাই বলেন যে সংবিধান প্রনয়নের ব্যাপারে সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠির সাথে আগেই মতৈক্য হতে হবে। তা না হলে অধিবেশন হবে না। বাঙালিরা আসনসংখ্যায় বেশি হলেও সংসদে তাদের কর্তৃত্বকে এই ঘোষণার মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়।

ঘোষণাটি বাঙালি শ্রোতাদের মাঝে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালিদের প্রতি সুদীর্ঘ অবজ্ঞাই আরেকবার প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগ অফিসের নেতাদের প্রতিক্রিয়া মিনিটের মাঝেই জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে পরে। সচিবালয়সহ অন্যান্য সরকারি অফিস, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান খালি হতে শুরু করে। স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। রেডিও শোনামাত্র সকলেই সেখান থেকে বেরিয়ে পরে। স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদের জন্যে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে।

রেডিওটি শুনে শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, আওয়ামীর সব সংসদ সদস্য যেন দুপুর ৩টায় হোটেল পূর্বানিতে উপস্থিত থাকেন। সেখানে উনি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সবাইকে জানাবেন।

এই ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিল না আমাদের ইতিহাসের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সময় এসেছে। এটা পরিস্কার ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দিবে না এবং এভাবেই তারা একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। তাদের ট্যাঙ্ক ও বিমান বহরসহ প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী আছে। তাদের বিপক্ষে এদিকে আছে সাড়ে সাত কোটি জনতা যারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ছিল এবং যারা নতি স্বীকার করবে না। যদিও এরা সশস্ত্র নয় এবং সম্মুখ সমরে অনেক রক্ত ঝরবে ।

এটা পরিস্কার ছিল যে অসহযোগ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না বাঙালিদের সামনে। সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। যদিও কবে শুরু হতে পারে, সেটা বুঝা যাচ্ছিলো না। আমি যখন পূর্বানি হোটেলে, তখন বিক্ষুব্ধ জনতা লাঠিসোটা হাতে বিভিন্ন দিক থেকে হোটেলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো । তাদের মুখে একটাই কথা, “স্বাধীনতা চাই”।

এই অবস্থায় মানুষের এরকম প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ‘৬৯ এর গণঅভ্যুথানের সফলতা ভূপতিত হয়েছিল প্রথমত গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতায় এবং দ্বিতীয়ত সামরিক শাসনের পুনরাগমনে। এরপর ঘূর্ণিঝড়োত্তর সরকারের অসহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড দেখে ভোটের সময় মানুষ তাদের মতামত দিয়েছিলো। কিন্তু এরপরের এরকম কর্মকাণ্ড মানুষের মনে সামরিক সরকার কিংবা তাদের তাবেদার সরকার পাঞ্জাবী দফতরের প্রতি ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিলো । অধিবেশন স্থগিত করায় সরকার কিংবা পাকিস্তানের অখণ্ডতা কোনটার উপরেই মানুষের আর বিশ্বাস ছিল না। ৬৯ এর অভিজ্ঞতা তাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছিলো যে তারা ইতিহাস তৈরিতে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ রাখতে পারবে। তাই লক্ষ্য স্থির হয়েছিলো স্বাধীনতার জন্যে এবং রাজনৈতিক নেতাদেরকে তাঁরা তাদের সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের দাবি জানিয়াছিল।

আওয়ামী লীগের সাংসদরা ঐদিন ৩ টার সময় উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব ০৩.২০-এ এসে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি নাজুক ছিল। শ’খানেক আন্তর্জাতিক সাংবাদিক বাইরে জড়ো হয়েছিলো। তিনি ঘোষণা দিলেন...শুধু পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে যা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা এটুকুই বুঝি যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি এবং আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম।

তিনি ৬ দিনের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতালের পাশাপাশি ৭ মার্চ জনসভার ঘোষণা দেন।

প্রাথমিক প্রতিবাদ হিসেবে তাই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। এর মানে কোন বাঙালি ইয়াহিয়া কিংবা সেনাদের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করবে না। ২ রা মার্চে শেখ মুজিবের কথা ছিল, “প্রত্যেক বাঙালির (সরকারি কর্মচারী সহ) প্রধান কাজ গণবিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করা এবং সকল প্রকার শক্তি নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কূটচাল ভণ্ডুল করা।” এটাও ঘোষণা দেয়া হয়, “নির্বাচিতরাই এখন একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী। সকল পক্ষের এটা জেনে রাখা দরকার।“

এরপরের কিছুদিনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলায় প্রশাসন অচল করে দেয়া। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যের সরবরাহ এবং পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন যেন অটুট থাকে, টা নিশ্চিত করা।

এটা ঠিক করা হয় যে নির্দেশনা কেন্দ্রিয়ভাবে দেয়া হবে। আমি, তাজউদ্দীন এবং আমিরুল ইসলাম এই ৩ জনকে নির্দেশনার খসড়া তৈরির কাজ দেয়া হয় এবং শেখ মুজিব ও দলীয় নেতাদের অনুমোদনের পর তা বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রথম নির্দেশনা ২ রা মার্চ বলবৎ করা হয়েছিল। ৩-৬ মার্চ সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশব্যাপি সকল পর্যায়ে হরতালের ডাক। সচিবালয় , হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্ট, সরকারি এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত অফিস যেমন পোস্ট অফিস, রেলওয়ে এবং অন্যান্য যোগাযোগ ও পরিবহন খাত (সরকারি ও বেসরকারি), কারখানা, শিল্প, অর্থনৈতিক স্থাপনা এবং বাজার স্থবির হয়ে যায়। তবে এম্বুলেন্স, সাংবাদিকের গাড়ি, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, বিদ্যুৎ এবং পানির সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল।

প্রতি সন্ধায় মিলিটারি কারফিউ জারি করতো। কিন্তু তা মানা হত না। তাঁরা কারফিউ অমান্যকারীদের গুলি চালাতো এবং বেশ কিছু মানুষ মারা গিয়েছিলো। কিন্তু সেনা কমান্ডার জেনারেল ইয়াকুব আরও সৈন্য পাঠানোর কথা বললেন। কারণ গণমানুষের আন্দোলন থামানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।। তার এই ধীরে চল নীতির কারণে মার্চের প্রথম সপ্তাহে টিক্কা খানকে তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়। বেলুচিস্তানের জনসাধারণের উপর টিক্কা খানের নির্মমতা প্রসিদ্ধ ছিল।

৩ রা মার্চ ছাত্রদের ডাকা মিটিঙে শেখ মুজিব দাবি করেন, মিলিটারিকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। যদি স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি মানা না হয় এবং জনতাকে দমন করা হয়, তবে মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে না। তিনি একই সাথে ‘কর না দেয়ার কর্মসূচী’ চালু করেন।

একই সন্ধ্যায় ইসলামাবাদ থেকে রেডিওতে একটা ঘোষণা আসে। রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ১০ মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের একটা গোলটেবিল বৈঠক এর প্রস্তাব। সামরিক জান্তা আন্দোলনের প্রভাব আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করে। এই বৈঠকের প্রস্তাব ব্যাপারটাকে আরো উত্তেজিত করে তুলে। কারণ এই প্রস্তাব অনুযায়ী, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একটি গোল টেবিল বৈঠকে বসবে অন্যান্য দলের সাথে যাঁদের দাবি ও যথার্থথা সকল হিসেবেই প্রশ্নবিদ্ধ। একই সময়ে মিলিটারি কর্তৃক নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ চলছিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম, শেখ মুজিবের উপর এই বৈঠক প্রত্যাখ্যানের জন্যে চাপ ছিল। কিছু ফিসফিসানি চলছিল যে সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান না করে একটু সময় নিয়ে অবস্থা বুঝে এরপর সিদ্ধান্ত হবে। কেউ কেউ বলছিল পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নেন যে তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে। আমাকে ঘোষণাটির খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেয়া হল এবং বলা হল প্রস্তাবটি ‘নিষ্ঠুর হাস্যরসাত্মক’ তাই প্রত্যাখ্যান করা হল। সারাদেশের দৃষ্টি তখন ৭ মার্চের সমাবেশের দিকে নিবদ্ধ হল। বিদেশীরা বলতে লাগলো, স্বাধীনতার ঘোষণা সম্ভবত ঐদিনই দেয়া হবে।

একই সময়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং আন্দোলনের মাঝে এটা অনুভূত হলো যে আন্দোলন দীর্ঘায়িত করার জন্যে জরুরি সরবরাহ এবং কিছু জরুরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রাখতে হবে, যেন মানুষের কষ্ট বেশি না হয়। যেহেতু ১ লা মার্চেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেহেতু অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারিই তাঁদের বেতন তুলতে পারেন নাই। যারা চেকের মাধ্যমে বেতন পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বেতন ক্যাশ করতে পারেন নাই। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধানের জন্য দেশের সকল প্রান্ত থেকে জনতা সেই অসহযোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

উদ্ভূত নানা সমস্যার মোকাবেলায় মার্চের ৪ তারিখে আরো কিছু বিস্তারিত নির্দেশনা এলো। এসব নির্দেশনাসমুহ ছিল অনেকটা গঠনমূলক অর্থাৎ জনগণকে কোনো কোনো কাজে নিরস্ত থাকার জন্য শুধু আদেশই নয় বরং আওয়ামীলীগের প্রদর্শিত পথে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কাজ করা বা কোনো দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। পুর্ব পাকিস্তানে কার্যত সরকার পরিচালনাকারী হিসেবে এটাই ছিল আওয়ামীলীগের প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে ৪ই মার্চ পরিষ্কার নির্দেশনা এলো যে সরকারী অফিসসমূহে যেখানে কর্মচারিদের বেতনভাতা তখনো পরিশোধ করা হয় নি, সেগুলো শুধু বেতনভাতার অর্থ প্রদানের জন্য বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকবে। আরও নির্দেশ এলো যে, অনুর্ধ্ব ১৫০০ রূপির বেতনভাতার চেকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন লেনদেনের জন্য বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে।

যেহেতু আশঙ্কা করা যাচ্ছিলো যে, ব্যাংক খুললেই পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচার হতে পারে, সেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দেয়া হলো যে বাংলাদেশের বাইরে অর্থপ্রেরণ সংক্রান্ত কোনো লেনদেন কার্যকর হবে না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে সকলের নিকট স্পষ্ট করা যায় যে অফিসসমূহ সকালে স্বাভাবিক নিয়মে খুলছে না বরং আওয়ামীলীগের নির্দেশে এবং আওয়ামীলীগের প্রদর্শিত নিয়মেই সেগুলো কাজ করছে। এছাড়া ডাক্তার, সাংবাদিক, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় ও দূরবর্তী টেলিফোনকল প্রভৃতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এসব নির্দেশনা কঠোরভাবে পরিপালন করা হয়েছিল এবং তদুদ্দেশ্যে অফিস ও ব্যাংকসমুহ বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪ টা ৩০ মিনিট পর্যন্তই কাজ করেছিল। তাছাড়াও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে খাদ্যগুদামসমূহ বিলি-বন্টনার্থে প্রয়োজনে ৪ টা ৩০ মিনিটের পরও খোলা থাকতে পারবে।

কতিপয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য অনুযোগ জানালো যে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কিছু ক্ষেত্রে একই বিলে মজুরী পরিশোধ করা হয় বলে চেকের অর্থ ১৫০০ রূপীর চাইতে বেশ বড় অঙ্কের হয়ে যায়। যার ফলে তাদের নগদে পরিশোধ করতে হচ্ছিলো। এসব ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর জন্য নির্দেশনা শিথিল করে বলা হলো, ১৫০০ রূপীরও বেশী অর্থের চেক পরিশোধ করতে হলে সর্বমোট অর্থের পরিমান নির্দেশিত মজুরি রেজিস্টার চেকের সাথে উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবে, এতে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় পরবর্তীতে নির্ধারিত হয় যে সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্যয়ন থাকলেই ১৫০০ রুপীর চেয়ে বড় চেক পরিশোধ করা যাবে।

মার্চের ৬ তারিখে সানাউল হকের নেতৃত্বে বেসামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল আমার সাথে দেখা করে জানালেন যে তারা একজোটে শেখ মুজিবকে সমর্থন ঘোষণা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা এটা জানাতে তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলেন যে, এখন থেকে তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ মোতাবেকই কাজ করবেন। আমি একটি সাক্ষাতের আয়োজন করলাম যেখানে সানাউল হক বেসামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা আওয়ামীলীগের নির্দেশনার প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য ঘোষণা করেন। আমার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য শেখ মুজিব তাদের নির্দেশনা দিলেন এবং যে তিনজন বিশ্বস্ততার সাথে নির্দেশনাসমূহ তৈরির দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদেরকে প্রতিদিনই এদের সাথে বসার জন্য পরামর্শ দিলেন। সামনের দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের কাজকর্ম চালানোর জন্য এটিই প্রশাসনের নিউক্লিয়াস হয়ে উঠলো।

মার্চের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় কেমন অবস্থান দেখানো হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ৬ই মার্চ শেখ মুজিবের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং আহবান করা হলো। দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যাশা ছিল যে ৭ই মার্চ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা আসতে পারে। বস্তুতপক্ষে, ছাত্রসমাজ এবং তরুণরা এমন একটি ঘোষণা খুব করে চাইছিলো। প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চ আসতে আসতে পরিস্থিতি এমন হলো যে, ছাত্রসমাজ, তরুণেরা এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন জনতার বড় একটি অংশ স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যতীত অন্যকিছু মেনে নেবে কিনা, সেই সন্দেহ পার্টির সদস্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে শেখ মুজিব এবং পার্টির ওপরই ছিল এই গুরুভার বহনের দায়িত্ব। ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল।

একমুখী স্বাধীনতার ঘোষণার ফলে পুর্ন সামরিক শক্তির আক্রমন হতে পারে। এতে যে তারা শুধু বলপ্রয়োগের ছুতা খুঁজে পাবে তাই নয় বরং জোড়পূর্বক অভিপ্রায় সিদ্ধিতে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে। নিরস্ত্র জনতা কি এমন প্রচণ্ড আক্রমন সহ্য করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে? বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া কি হবে? পাকিস্তান সরকার কি স্বাধীন বাংলাদেশকে সহজেই স্বীকৃতি দিবে? তেমন একটি স্বীকৃতির আদায় না হওয়া পর্যন্ত একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল মিলিটারী আক্রমনের সামনে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার কি টিকে থাকতে পারবে? এছাড়াও, নানারকম বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার স্বার্থ বিবেচনায় সকলেই কি স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় মেনে নেবে? আরও অনেক প্রশ্নের সাথে এসব প্রশ্নগুলোও উদ্বেগের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনায় শেখ মুজিব বিভিন্ন সদস্যদের প্রদত্ত স্বতন্ত্র মতামত শুনলেন। আলোচনায় নানান দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসছিল। আলোচনা চলাকালে ইয়াহিয়ার একটি বিবৃতি সম্প্রচারিত হল। এটি ছিল আগাগোড়া উস্কানিমূলক এবং বাঙ্গালী অনুভূতির প্রতি মারাত্মক অবমাননাকর। এতে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য শেখ মুজিব এবং আওয়ামীলীগকে দায়ী করা হয়েছিল। বিবৃতিটিতে প্রচ্ছন্ন হুমকির স্বর ছিলঃ

“পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনা মোতায়েন করে পরিস্থিতিকে বেশ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে জেনেও লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং খুনোখুনির মাদ্ধ্যমে আইনলঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য পূর্বপাকিস্তানে আমি একেবারেই ন্যূনতম সংখ্যক ফোর্স ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি...

সবশেষে, আমি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, যত যাই ঘটুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাকিস্তানী আর্মির নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আছি, পাকিস্তানের পূর্ন এবং নিঃসন্দেহ অখণ্ডতা আমি নিশ্চিত করব। এই ব্যাপারে যেকোনো সংশয় বা ভুল বোঝাবুঝি থাকা চলবে না। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই দেশ টিকিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব। তারা এটাই আমার কাছ থেকে আশা করে এবং আমি তাদের হতাশ করব না। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ লক্ষ লক্ষ নিরীহ পাকিস্তানির জন্মভূমিকে ধ্বংস করবে, তা আমি বরদাস্ত করব না। পাকিস্তানের একতা, সংহতি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই দায়িত্ব পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এবং এ দায়িত্ব পালনে তারা কখনো ব্যর্থ হয় নি।”

অনুবাদকৃত ভাষার চাইতেও দাম্ভিক স্বরের ইশারায় বুঝা গিয়েছিল, ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে মিলিটারি দিয়ে পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব এবং তিনি “পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য” যেকোনো পদক্ষেপ এবং মাত্রাহীন বলপ্রয়োগের জন্য নিজেকে ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এখতিয়ারধারী বলে মনে করতেন।

বার্তাটির ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। সম্প্রচার শেষ হয়ে গেলে শেখ মুজিব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে মিটিংটি সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতবী করলেন। ঐ সময়ে তিনি তিনি পরের দিনের বক্তব্য নিয়ে ভাববেন।

সিদ্ধান্ত নেবার গুরুদায়িত্বটি ছিল তাঁর একার কাঁধে। শেখ মুজিব দলের তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মুশতাক, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান প্রমুখ সিনিয়র নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল। সুনির্দিস্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাদানের ভালমন্দ দিক সমূহ সতর্কভাবে দেখতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এমন একটি ঘোষণা সেনাবাহিনীকে তাদের প্রার্থিত সামরিক আগ্রাসনের সুযোগ এনে দেবে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে এমন সুযোগ তাদের করে দেয়া যাবে না। পাশাপাশি আন্দোলনের বেগ ধরে রেখে ইয়াহিয়াকে চাপ দিতে হবে যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমাদের বিবেচনা ছিল, যদি আন্দোলনের বেগ এবং জনতার ঐক্য ধরে রাখা যায়, তবে ইয়াহিয়া এবং মিলিটারী জান্তা বুঝতে পারবে যে সামরিক বলপ্রয়োগে কোনো লাভই হবে না। তাই সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট দাবী তুলে ধরার ছিল, এসব দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে নেয়াই ছিল লক্ষ্য যার শেষ পরিণতি ছিল “স্বাধীনতা”। এসব দাবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, পশ্চিম থেকে পূর্বপাকিস্তানে অধিকতর সেনা প্রবেশ বন্ধ করা এবং হত্যাকান্ডের তদন্ত করা। শেখ মুজিব বললেন, দুটো দাবীর ওপর জোর দেয়া হবে, প্রথমত মার্শাল ল’ প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয়ত, অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এ অবস্থান তুলে ধরে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো, যেটি ৭ই মার্চ এর জনসভা শেষে প্রেসে দেয়া হবে। ভাষণের গুরুত্ব দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে একটি লিখিত সারাংশ তৈরি করে রাখা দরকার, যাতে শেখ মুজিবের বলা শেষ হলে মার্চের ৭ তারিখেই তা প্রেসে ছাড়া যায়। ঐদিন সন্ধ্যাতেই মূল বক্তব্যের একটি খসড়া তৈরী করা হলো। খসড়াটিতে মার্শাল ল’ প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা তুলে ধরা হয়েছিল এবং শেষ প্যারায় বলা হয়েছিলঃ

“বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে মার্শাল ল’ প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে।”

শেখ মুজিব বললেন, লেখাটি তাজউদ্দীনের হেফাজতে রাখতে এবং সত্যিকার ভাষণের আলোকে প্রয়োজনে যেকোন সংশোধন করে তিনি সেটি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল মাত্র ১৯ মিনিটের। ঐ ভাষণে কার্যকারী বাক্যটি ছিল: “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। এছাড়াও অনতিবিলম্বে মার্শাল ল তুলে নিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়। তাজউদ্দীন সাহেব কর্তৃক তদানুসারে সংশোধিত লিখিত প্রজ্ঞাপনেও দুটি পয়েন্ট সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং, যদিও স্বাধীনতা একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, শেখ মুজিব একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ঠিক আগমুহূর্তে থেমে থাকেন কারণ পরিষ্কার ভাবে লক্ষ করা যাচ্ছিলো যে, স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ আঘাতের জন্য শহরের সুবিধজনক স্থানসমূহে আর্মি নামানো হয়েছে। এখানে মনে হয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আগের দিন রাতে (৬ মার্চ) ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে একজন ব্রিগেডিয়ার ফোন করে বলেন যে তিনি (ইয়াহিয়া) খুব শীঘ্রই ঢাকা আসবেন এবং এমন সমঝোতায় পৌঁছানোর আশা প্রকাশ করেন যেটা বাঙালিদের সন্তুষ্ট করবে। কৌতুহল উদ্দীপক এই যোগাযোগটাকে ৭ মার্চের সম্মেলনে শেখ মুজিবের অবস্থানকে প্রভাবিত করার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এই বার্তাটিকে ইয়াহিয়ার নিজেকে নির্দোষ রাখার একটা চক্রান্ত হিসেবেও দেখা হয়; কারণ, যদি স্বাধীনতার ঘোষণা করা হতো তাহলে ইয়াহিয়া বিশ্ববাসীর দিকে ফিরে বলতে পারতো যে- সে ঢাকায় গিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু শেখ মুজিব ইউডিআই *(ইউনিল্যাটেরাল ডিক্লেরেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স)* ঘোষণা করে বল প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। ৭ই মার্চে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা না দেওয়ার পিছনে এটাও শেখ মুজিবের আরেকটি বিবেচনার বিষয় ছিল।

পরবর্তী সপ্তাহের একটি নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল। ট্যাক্স না দেয়ার কর্মসূচী চলমান রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক লেনদেন চালু রাখতে অন্যান্য দায়মুক্তি এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ঘোষণা করা হয়েছিল মার্চের ৭ তারিখে এবং ৯ তারিখে। রেলওয়ে এবং পোর্ট কার্যকর রাখার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু তা যদি জনগণকে চাপে রাখার জন্য পাক আর্মি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে সহযোগিতা না করার নির্দেশনা ছিল। ৮ মার্চের নির্দেশনা ছিল ব্যাংকগুলোর প্রতি সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা। এগুলো বাঙালি ব্যাংকারদের সাথে একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, যারা সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছিল যা বিভিন্ন পক্ষ মোকাবেলা করছিল। এই নতুন নির্দেশনায় চালু মিল সমূহের জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংকের লেনদেন অনুমোদিত ছিল এবং নির্ভেজাল ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ১০০০ রুপি উত্তোলনের অনুমোদন দেওয়া হয়। অপরিহার্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন সার এবং সেচের পাম্পের জন্য ডিজেল সরবরাহে সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিস সমূহ খোলা রাখা হয়। আরো নির্দেশনা ছিল যে খাদ্য, ইটভাটার জন্য কয়লা সরবরাহ এবং পাট ও ধানের বীজ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

কিছু সারিবদ্ধ নির্দেশনা কার্যকর করার জন্য পরবর্তীতে এ কে এন আহমেদ, করাচী থেকে আগত একজন জ্যেষ্ঠ বাঙালি স্টেট ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ব্যাংকারদের সাথে আরো মিটিং করা হয়...

মার্চের ১৫ তারিখে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসে।। শেখ মুজিব ১৬ই মার্চ সকালে তার সাথে দেখা করেন। বৈঠকটি প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। শেখ মুজিব ফিরে এসে সিনিয়র নেতাদের ডাকেন। আমাকেও ডাকা হয়। এই প্রক্রিয়াটা পরবর্তী সপ্তাহগুলোতেও চালু ছিল। ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টাদের সাথে প্রতি বৈঠকের পর সিদ্ধান্তগুলো পুনঃবিবেচনা করার জন্য এমন মিটিং ডাকা হতো। শেখ মুজিব বলেন যে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধানের সাফাই গাওয়া দিয়ে শুরু করেছে। শেখ মুজিব তাকে এই চরম ভুল সিদ্ধান্ত নেবার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তার (শেখ মুজিবের) সাথে আলোচনা না করার জন্য দোষারূপ করেন। ইয়াহিয়া তারপর বলে যে সে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজতে চায়। এ প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব তাকে বলেন যে, যা কিছু ঘটেছে তার উপর এবং জনতার আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখলে, ৭ই মার্চে যে দাবী সমূহ তোলা হয়েছে তার থেকে কিছু কম মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। স্পষ্ট করে বললে দ্রুততম সময়ে মার্শাল ল তুলে নিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই যথেষ্ট। ইয়াহিয়া তারপর বলেন যে, তাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে মার্শাল ল তুলে নেয়ার ব্যাপারে আইনি জটিলতা রয়েছে। এ কথার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি তার আইন বিশেষজ্ঞদের বলবেন ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং কোন আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে না এই মর্মে তাদের আশ্বস্ত করবেন।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব আমাকে তথাকথিত আইনি জটিলতার ব্যাপারে আলোচনার জন্যলে. জে. পীরজাদার সাথে ঐদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে নির্দেশ দেন। আমি ঐদিন সন্ধ্যায় পীরজাদার সাথে দেখা করি এবং বলি যে তারা অনৈতিকভাবে অধিবেশন বাতিলের দায়ে দোষী। যে ভাবে এটি করা হয়েছে, তা সমগ্র বাঙালি জাতি একটি অপমান হিসেবে গ্রহণ করেছে, এ কথাটিও তাকে জানিয়ে দেই। সে অস্বস্তিতে ছিলেন এবং রক্ষণাত্মকভ অবস্থানে ছিলেন। তারপর সে অনতিবিলম্বে মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে আসেন। তিনি এই বলে যুক্তি দেখান, যদি সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে মার্শাল ল তুলে নেওয়া হয় তবে একটি আইনি শূন্যতার সৃষ্টি হবে। আমি তৎক্ষণাৎ এই যুক্তির প্রতিবাদ করে বলি, মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং একটি সংবিধান প্রণয়নের অন্তর্বর্তীকালীন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতার আদেশ (একটি অস্থায়ী সংবিধান) জারী করা যেতে পারে। এটা রাষ্ট্রপতি / প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জারী করতে পারেন, সেই একই আদেশ দ্বারা যা দিয়ে তিনি মার্শাল ল জারী করেছিলেন। এই যুক্তি স্পষ্টভাবে আসন্ন আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছিল।

পরদিন সকালে, মার্চ ১৭, শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন এবং মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী পুনর্ব্যক্ত করেন। ইয়াহিয়া আবারো আইনি জটিলতার কথা বলে এবং জানান যে বিচারপতি কর্নেলিয়াসকে ডাকা হয়েছে। এ সকল প্রশ্ন বিবেচনার জন্যযে কিনা এখন তার আইন উপদেষ্টা। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সাথে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক প্রস্তাব করা হয়। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং আমি নিজে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা মণ্ডলী পীরজাদা, কর্নেলিয়াস এবং কর্নেল হাসানের (জাজ এডভোকেট জেনারেলের) সাথে বৈঠকে বসি। বৈঠকে পীরজাদা তার পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু করেন যে সকালে শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার আলোচনা এমন দিকে অগ্রসর হয়েছে যে ইয়াহিয়াকে একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে হবে। সে কিছু মৌলিক উপাদানের দিকে নির্দেশ করেন যা এমন ঘোষণার সাথে যেতে পারে। সেগুলো আলোচনাগুলো থেকে উঠে এসেছে। তার ভাষ্য মতে, শেখ মুজিব প্রস্তাব করেছেন যে পূর্বের জন্য আলাদা করে সংবিধান রচনা করবে পূর্বের সদস্যরা এবং পশ্চিমের জন্য সংবিধান রচনা করবে পশ্চিমের সদস্যরা। পরে তারা সকলে একত্রে বসে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনা করবে। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল ছিল যে পূর্বে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হবে। পশ্চিমের প্রদেশগুলো ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী স্বায়ত্ত্বশাসন উপভোগ করবে এবং অতিরিক্ত ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রে থাকবে। কর্নেলিয়াস বলেন যে, এমন একটা ইন্সট্রুমেন্ট-একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান- প্রণয়ন জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হতে পারে। এরপর প্রস্তাব করা হয়েছিল এমন একটা ইন্সট্রুমেন্টের খসড়ার কাজে হাত দেয়ার পূর্বে দুই পক্ষের উপদেষ্টাদের শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার সাথে একটা পরিকল্পনা মিটিং করলে ভাল হবে, এতে মূল দিকনির্দেশনাসমূহ তাদের কাছ থেকে নেওয়া যাবে।

মার্চ ১৭ তারিখে পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। কারণ একটা মার্শাল ল রেগুলেশনের খসড়া ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেখানে মন্ত্রীদের কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে যা প্রদেশের গভর্নরদের উপদেশ দেবে অথবা এমন কোন রেগুলেশন যা মার্শাল ল কে পিছনের দিকে ঠেলে দিবে। আলোচনা মূলত হয়েছিল উপরে উপরে এবং বেশীরভাগ সময় তা পীরজাদা এবং কর্নেলিয়াসের করা আইনি শুন্যতা সৃষ্টির প্রশ্নে অতিবাহিত হয়। পাল্টা যুক্তি হিসেবে একটা ঘোষণার প্রস্তাবনা আনা হয়, যা মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং নতুন সংবিধান গ্রহণের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করবে।

এটা এখন দলিলে আছে যে ১৭ই মার্চের বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে বলে- ‘গেট রেডি’ এবং সে অনুযায়ী ১৮ই মার্চের সকালে মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা ও রাও ফরমান আলি সমগ্র প্রদেশের উপর মিলিটারি আগ্রাসনের নীল নকশা আঁকে যা ২৫ মার্চ হতে কার্যকর হবে। কোড নেম- ‘অপারেশন সার্চলাইট’।

১৯ মার্চ সকালে, শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে আরেকটি মিটিং করেন এবং একমাত্র সমাধান হিসেবে মার্শাল ল তুলে নেওয়া এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপর জোর দেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারী করা যেতে পারে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য। এমন একটা অধ্যাদেশ প্রেসিডেন্ট জারি করতে পারেন। সেদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের সাথে বসেন।

পাকিস্তানী সরকারের শ্বেতপত্রে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা সত্য নয়। সে অনুযায়ী আওয়ামী লীগের দাবীসমূহ ‘আইনতভাবে যতটা করা সম্ভব ততটা’ পূরণ করতে প্রেসিডেন্টের টিম একটি মার্শাল ল নীতিমালা প্রস্তাব করেছিল।

মার্শাল ল নীতিমালা সংক্রান্ত এমন কোন খসড়া নথি পত্র নেই। তথাপি ঐ দিন সকালে অনেকটা সময় ব্যয় করা হয় আইনি শূন্যতা নিয়ে কথা বলে, এরপর এমন কোন নীতিমালা লেখার প্রস্তাব আসে নি।

২০ মার্চ সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। এই দিন তিনি সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনছুর আলী, খোন্দকার মুশ্তাক আহমেদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং আমাকে সাথে নিয়ে যান। ইয়াহিয়ার দিকে পীরজাদা, কর্নওয়ালিস এবং কর্নেল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

আগের দিন যখন আর্মি ট্রাক টঙ্গী অতিক্রম করছিল, তখন তারা জনতার আক্রমণের মুখে পড়ে এবং আর্মির সাথে জনতার গুলি বিনিময় ঘটে। এটাকে আর্মির বিরুদ্ধে জনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধও বলা যায়। শ্বেতপত্রে আরও বলা আছে যে ‘এম ভি সোয়াত’ জাহাজ থেকে আর্মির সাধারণ পরিবহন খালাশে জনতা বাঁধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আদতে বাঙালিদের জন্য তা ছিল গণহত্যার জন্য খালাশকৃত অস্ত্র। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। উত্তেজনার বশে ইয়াহিয়া বলে যে, যদিও সে আলোচনার জন্য এসেছে এবং আর্মিকে সংযত থাকতে বলেছে কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ আর্মির চলাচলে বাঁধা দিলে তা সে মেনে নেবে না। শেখ মুজিবও শক্ত জবাব দেন। তিনি বলেন, যখন আলোচনা চলছে তখন আর্মির উচিৎ ছিল ব্যারাকে থাকা। ইয়াহিয়া জবাবে বলেন, তারা ব্যারাকেও থাকলেও আর্মি রসদ অবশ্যই চালু থাকতে হবে। শেখ মুজিব তারপর বলেন, ঐভাবে আর্মিদের ট্রাকে করে চলাচল মানুষের কাছে উস্কানিমূলক লেগেছে। কারণ ইতিঃপূর্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন আর্মি নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে। এই কিছুদিন আগে জয়দেবপুরের খুব কাছেই এমন একটা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে যেখানে সাধারণ নিরস্ত্র তরুণদের উপর আর্মি গুলি চালিয়েছে। এ সকল কারণে সাধারণ মানুষের অনুভূতি তিক্ত হয়ে আছে। শেখ মুজিব বললেন, জনতার এমন মানসিক অবস্থায় আর্মির মোটেই উস্কানি দেওয়া উচিৎ হয় নি। তিনি আরও বলেছিলেন, আপনার জানা উচিৎ যদি সাধারণ নিরস্ত্র মানুষ গুলি খেতেই থাকে, তবে তাঁরাও একসময় অস্ত্র তুলে নিয়ে পাল্টা গুলি করতে বাধ্য হবে। তাই একটা রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য এবং এতে আর কোন রক্তপাত হবে না।

শেখ মুজিবের এই কড়া জবাব সম্ভবত ইয়াহিয়ার উপর কিছু প্রভাব ফেলে এবং সে রাজনৈতিক সমাধানের প্রসঙ্গে ফিরে আসে এই বলে যে, সে একজন সাধারণ মানুষ। ইতোমধ্যে সে শেখ মুজিবের দাবীসমূহ নীতিগতভাবে মেনে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাকে এই বিশেষজ্ঞরা বলেছে যে সংবিধানের আগে মার্শাল ল বিলুপ্ত হলে আইনি শূন্যতা দেখা দিবে। কর্নওয়ালিস এই পয়েন্ট ধরে বসে সংবিধানের আইন এবং একটা আইনি কাঠামোতে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে একটা ছোটখাটো লেকচার পড়ে শোনান। আমি সাথে সাথে এর জবাব দিই এই বলে যে, এমন কোন শূন্যতা আসবেই না যদি ইয়াহিয়া একটা অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতা আদেশ হিসেবে একটি ইন্সট্রুমেন্ট ঘোষণা করেন যা নতুন সংবিধান গ্রহণ পর্যন্ত বহাল থাকবে। এই বিষয়ে পাল্টাপালটি যুক্তি চলতেই থাকবে বুঝে আমি ভাবলাম যে এই পয়েন্টে একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করালে হয়ত কোন সমাধান পাওয়া যাবে। যেমন এ কে ব্রহি যার পরামর্শ ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি জানতাম ব্রহি ঢাকাতে আছেন এবং তার সপরামর্শ আওয়ামী লীগের পক্ষে যাবে এ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। কারণ এটা আইন সঙ্গত। আমি আরও জানতাম কর্নওয়ালিস ব্রহিকে সম্মান করেন এবং তার পরামর্শ মেনে নিবেন। আমার এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়। কর্নওয়ালিস বলে যে এমন মতামত সাহায্যকারী হবে। আমি এই মতামত নেয়ার এবং যথাস্থানে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করি। শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার দিকে ফিরে বলেন, “রাজনৈতিক অচালবস্থা নিরসনের পথ বিশেষজ্ঞরা তখনি বের করতে পারবেন যখন আমরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তাদের প্রদান করব।“

এরপর প্রস্তাবিত নথির মূল বিষয়গুলো লিখে রাখার প্রস্তাব করা হয়। এগুলো খসড়া প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

ক) মার্শাল ল তুলে নেওয়া

খ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর

গ) পূর্বে বর্ধিত স্বায়ত্তশাসন (এটা ছয় দফার আলোকে করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়)

সেদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সাথে বসে এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করবেন মর্মে সকলে রাজি হন।

ইয়াহিয়া তারপর বলে যে তার উচিৎ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা করা। শেখ মুজিব বলেন যে এটা শুধু তার নিজের ব্যাপার এবং নিজের ইচ্ছামতো এ বিষয়ে আগানোর ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইয়াহিয়া বলে তার পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা নেয়া দরকার। তা না হলে এটা তার জন্য খুব বড় দায়িত্ব হয়ে যাবে। সে আরো বলে যে সকল রাজনৈতিক দল তাকে রাষ্ট্রীয় ঘোষণা দিতে বলছে, তাদের সেটা লিখিত দিতে হবে।

ইয়াহিয়া তারপর বলে সে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতে চায়। বিশেষ ভাবে ভুট্টোকে। শেখ মুজিব বলেন, প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন এবং এটা তার ইচ্ছা। তবে শেখ মুজিব বলেন যে তিনি ভুট্টোর সাথে সরাসরি দেখা করবেন না। তবে ইয়াহিয়া আলাদা করে দেখা করতে পারেন। প্রায় ছয় সপ্তা আগে এক আলোচনার আগে ও পরে ভুট্টো ও তার দলের আচরণের কারণে এমন অভিব্যক্তি তিনি ব্যক্ত করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল এই যে, দেখা যাচ্ছিল ইয়াহিয়া আর ভুট্টো মূলত একই রকম কথা বলছিল। তাই তাদের আলাদা আলোচনা করতে দিলে আলোচনায় এগিয়ে থাকা যাবে।

আমি সরকারী দিক থেকে খসড়া নথি প্রস্তুত করার প্রস্তাব করি যেহেতু তারা আইন মন্ত্রণালয়ের সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। মন্ত্রণালয়ের আইনি খসড়াসম্যান খসড়া করবে বলে পরামর্শ দেয়া হলো। খসড়ার একটি কপি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের কাছে তৈরির সাথে সাথে প্রেরণ করতে হবে।

২১ মার্চ সকালে আমি শেখ মুজিবের খোঁজে যাই। সে এবং তাজউদ্দীন একটা আলোচনার মাঝে ছিলেন। তিনি আমাকে তার একটা দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানালেন যে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন এবং তার মতে জনতার চাহিদার কথা চিন্তা করলে অনতিবিলম্বে শুধু প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকে আওয়ামী লীগের জোর দেওয়া উচিৎ। কেন্দ্রের ক্ষমতা এখনই দখল উচিৎ হবে না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আসার পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিলঃ

১. ছাত্র সমাজ গণজাগরণের সাথে কোন রকম সমঝোতার বিপক্ষে ছিল এবং শুধু ক্ষমতার জন্য যেন আওয়ামী লীগ দাবীসমূহ থেকে সরে না আসে সেই পক্ষে ছিল। কেন্দ্রের ক্ষমতা গ্রহণ সমঝোতা হিসেবে দেখা হতো। এমনকি কিছু ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে এ বিষয়ে জোর করেন।

২. একটা সংবিধানের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা গ্রহণ করলে আওয়ামী লীগের পক্ষে কেন্দ্র পরিচালনায় অচালবস্থা সৃষ্টির ঝুঁকি থাকে এবং নতুন সংবিধান প্রণয়নের আগেই এটা তাদের জন্য অসম্মানের ব্যাপার হবে ।

৩. শুধু প্রদেশের ক্ষমতা গ্রহণ একটা ফর্মুলা হিসেবে কাজ করবে যেখানে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রের দায়িত্ব নেয়ার আগেই তার অবস্থান শক্ত করতে পারবে। আমলাতন্ত্রে এবং আর্মিতে পাঞ্জাবীদের আধিক্যের কথা বিবেচনা করলে কেন্দ্রের দায়িত্ব তাদের জন্য পালন করা কঠিন হবে ।

৪. এটা আওয়ামী লীগকে প্রাদেশিক সরকারের সম্পদসমূহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দিবে যা আলাদা করে পুলিশ এবং ইপিআর বাহিনীকে সশস্ত্র সংঘাতের জন্য প্রস্তুত করবে। যে সংঘাতের সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে।

মনে হলো, ইয়াহিয়া নিজেই এই ফর্মুলার প্রতি সমর্থন জানাবে কারণ এর মাধ্যমে তিনি কেন্দ্রে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবেন। এই প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দীন দ্রুত ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠকের আবেদন করেন। তাঁরা ইয়াহিয়াকে বললেন যে, এমতাবস্থায় শুধু প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

এই সময়ে ব্রহি একটা বিস্তারিত মতামত লিখে স্বাক্ষর করেন। এটা কর্নেল হাসানের কাছে পৌঁছানো হয়। পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র এই মর্মে স্থূল মিথ্যা বলার দায়ে দোষী যে, আওয়ামী লীগ খসড়া ঘোষণাপত্রের আইনি যথার্থতার সমর্থনে কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ আনতে পারে নি।

মার্চের ২১ তারিখে শোনা যায় কর্নেল হাসান রাষ্ট্রপতির একটা লিখিত অধ্যাদেশ তৈরি করেছেন। সেটা সংগ্রহ করতে একজনকে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা এই খসড়া পরীক্ষা করে দেখেন। দেখে বোঝা যায় যে এটা খুব দ্রুত তৈরি করা হয়েছে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা পূর্ব এবং পশ্চিমের সদস্যদের আলাদা আলাদা কমিটির কথা বলে। এটাতে আরও লেখা ছিল যে, যেদিন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নেবেন সে দিন থেকেই মার্শাল ল বাতিল হয়ে যাবে। এই খসড়ার যথার্থতা যাচাইয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা দেখতে পান যে এটা অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ এবং অনির্দিষ্ট। প্রথমত, তাদের দৃষ্টিটা এমন যেন মার্শাল ল প্রত্যাহারের ব্যাপারটা খুব দ্রুত হবে এবং এর কোন দীর্ঘসূত্রিতা হবে না। মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের সাথে সাথে যা কার্যকর হবে। কিন্তু এটা এমন একটা পদ্ধতি যা দীর্ঘ করা সম্ভব। কারণ পাঁচটা প্রদেশ এখানে জড়িত। এটা ধরে নেয়া হয়েছিল যে ঘোষণা আরও দ্রুত কার্যকরি হবে। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা একটা ফর্মুলা প্রস্তাব করেন, যেখানে ঘোষণা কার্যকর হবে প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়োগের মাধ্যমে অথবা ঘোষণা দেওয়ার ৭ দিন অতিবাহিত হবার পর, যেটা আগে হয়।

এই সময়ে ভুট্টো ২১ মার্চ বিকালে এসে উপস্থিত হয়। আমার মনে আছে, যখন সংশোধিত খসড়াটি উপস্থাপন করা হয়, তখন কর্নেলিয়াস বলতে বাধ্য হন যে এটা প্রকৃতপক্ষে অনেক উন্নত এবং আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি সাথে সাথে বলি যে এটাকে আওয়ামী লীগের খসড়া বলে বর্ণনা করা যাবে না। খসড়া করার সম্পূর্ণ কার্যটি একটি যৌথ প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে গণ্য করা উচিৎ। এরপর সংশোধিত ঘোষণাপত্রের প্রতিটি বিধি পড়ার কাজ শুরু হয়। পীরজাদা বলেন যে তিনি ভুট্টোর উপদেষ্টাদের সাথে দেখা করবেন এবং সংশোধিত খসড়ার একটা কপি ভুট্টোর কাছে পাঠানো হয়েছে।

ভুট্টোর নিজের ভাষায় তাঁর অবস্থানঃ

“ঐদিন সন্ধ্যা ৭.৩০ -এ আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে দেখা করি। প্রেসিডেন্ট আমাকে ১৬ থেকে ২০ শে মার্চ শেখ মুজিবের সাথে টানা আলোচনার ব্যাপারে অবহিত করেন এবং ১৮ তারিখের একটা সংবাদ সম্মেলনের কথা বলেন যেখানে তিনি বলেছেন যে আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। ফলস্বরূপ আওয়ামী লীগের এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত সাংবিধানিক আয়োজনের ব্যাপারে আলোচনায় বসেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে আওয়ামী লীগ নেতাদের তৈরি করা প্রস্তাবনার ব্যাপারে জানান।

ঐ প্রস্তাবনার মূল অংশগুলো হলো এই যে, অনতিবিলম্বে মার্শাল ল তুলে নেয়া হবে এবং কেন্দ্রিয় সরকারকে প্রভাবিত না করে পাঁচ প্রদেশের কাছে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা চলে যাবে। প্রস্তাবনামতে প্রেসিডেন্ট বর্তমানের মত কেন্দ্রীয় সরকার চালু রাখতে পারবেন। অথবা তিনি চাইলে এমন উপদেষ্টাদের সহযোগিতা নিতে পারবেন যারা জনপ্রতিনিধি নয়। এটাও প্রস্তাব করা হয়েছে যে জাতীয় পরিষদ দুইটি কমিটিতে ভাগ হবে। একটা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এবং অন্যটি বাংলাদেশের জন্য ঢাকাতে। কমিটি দু’টি নির্ধারিত সময়ের ভিতর পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে এবং জাতীয় পরিষদে তাদের প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করবে। এরপর জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দুই কমিটির প্রস্তাবনার উপর আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে একসাথে বসবাসের পথ বের করা। ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির মাধ্যমে এটি প্রণয়ন করা হবে। যেখানে পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে ৬ দফার ভিত্তিতে এবং পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষমতা পাবে ১৯৬২ সালের সংবিধান মতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের ভিত্তিতে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রদেশসমূহ নিজেদের স্বায়ত্ত্বশাসনের পথ করে নিতে পারবে। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের আকারে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হবে।“

ভুট্টো তারপর বলেনঃ

“প্রস্তাবনাটি বর্ণনার পর, ইয়াহিয়া আমাকে (ভুট্টো) বলেন যে সে শেখ মুজিবের কাছে এটা স্পষ্ট করেছেন যে তার সম্মতি প্রাথমিকভাবে ভুট্টোর সম্মতির উপর নির্ভর করবে। তবে তিনি আরো সন্তুষ্ট হবেন যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারাও তাদের সম্মতি দেন।“

২২ মার্চ সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে পুনরায় আলোচনা শুরু করার জন্য আহ্বান করেন। তখন দুই পক্ষ লিখিত ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। শ্বেতপত্রে লেখা হয়েছে ইয়াহিয়া ভুট্টোকে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করাতে রাজি করিয়েছেন। এটি সত্য নয়। সত্যি কথা বলতে শেখ মুজিব যখন ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করতে যান, তখন ভুট্টোকে উপস্থিত দেখে তাকে একপাশে নিয়ে যান কথা বলার জন্য। শেখ মুজিবের ভাষ্যে তিনি ভুট্টোকে বলেন যে তাদের জন্য বারান্দায় গিয়ে কথা বলা উত্তম যেন তাঁদের কথা অন্য কেউ না শুনে।

ভুট্টোর নিজের ভাষায় এই বৈঠকে যা হয়েছিলঃ

“২২ তারিখ সকালে আমি নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে প্রেসিডেন্ট হাউজে উপস্থিত হই। মুজিবুর রহমান ঠিক ১১টার সময় আসেন। আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি এবং কিছু আনুষ্ঠানিক কথা বলি।

এরপর আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আরেকবার সেখানে আনুষ্ঠানিক সৌজন্য বিনিময় হয়...

মুজিবুর রহমান এরপর প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরেন এবং বলেন যে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে তিনি তার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন কিনা। প্রেসিডেন্ট মনে করিয়ে দেন যে এতে আমারও সম্মতির প্রয়োজন এবং সে কারণেই আমি আলোচনাতে উপস্থিত ছিলাম। এই ব্যাপারে শেখ মুজিব বলেন যে প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্ট বরাবর পেশ করা হয়েছে এবং আমাকে রাজি করানো প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারের মাঝে পড়ে এবং একইসাথে বলেন যে ভুট্টো সাহেব প্রস্তাবসমূহের মৌলিক বিষয়াদিতে রাজী হয়েছেন। তাঁরা আনুষ্ঠানিক আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তারপর আলোচনাগুলোলো অনানুষ্ঠানিক দিকে চলে গেল এবং শেখ মুজিব চলে যাবার পর প্রেসের কাছে গিয়ে বললেন যে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন। সেখানে ভুট্টোও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে এটা যথেষ্ট নয় কিন্তু শেখ মুজিব অনড় ছিলেন...“

বের হয়ে যাবার পথে যখন আমরা প্রতিরক্ষা সচিবের রুমে ঢুকি, শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেনারেল মুহাম্মদ উমর, প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ইসহাক এবং প্রেসিডেন্টের নেভাল এইডে-ডি-ক্যাম্প অর্থাৎ যারা ঐ রুমে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বের হয়ে যেতে বলেন। কারণ তিনি আমার সাথে কথা চান। তার এই আকস্মিক আচরণ পরিবর্তনে আমি একটু অবাক হই। তিনি আমার হাত ধরে তার সামনে বসান। তিনি বলেন অবস্থা খুবই নাজুক এবং তিনি অবস্থার উন্নতির জন্য আমার সাহায্য চান। এই অবস্থায় রুমে আড়িপাতা হতে পারে চিন্তা করে আমরা বারান্দা ধরে বাড়ির পিছে প্রেসিডেন্টের আচ্ছাদিত আঙ্গিনায় গিয়ে বসি।

শেখ মুজিবুর রহমান আমার আগের কথাগুলো বললেন। এবং আরো বললেন যে ব্যাপারগুলো অনেক দূর গড়িয়ে গেছে এবং এখন আর পিছনে ফেরা সম্ভব না। তার মতে আমার জন্য সর্বোত্তম পথ হবে তার প্রস্তাবনা গুলো মেনে নেওয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আর কোন বিকল্প নেই। তিনি আমাকে বলেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন পিপলস পার্টিই পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি এবং অন্য পার্টিগুলো তার সময় নষ্ট করছিল। তিনি আমাকে জানান যে খান আবদুল ওয়ালি খান যার পার্টি অন্তত একটা প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাকে ছাড়া বাকি সব পার্টিকে তিনি বাদ দিয়েছেন যখন তারা তাকে ডাক দিয়েছে। তিনি বলেন তিনি এখন এ বিষয়ে আশ্বস্ত যে তার এবং আমার একমত হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমাকে বলেন যে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে যা খুশী করতে পারি এবং তিনি আমাকে সমর্থন দিবেন। এর বিনিময়ে আমি যেন পূর্ব-পাকিস্তানে ছেড়ে দিই এবং আওয়ামী লীগের প্রস্তাব বাস্তবায়নে তাকে সহযোগিতা করি। তিনি পরামর্শ দেন যে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি এবং তিনি পূর্বপাকিস্তানের দায়িত্ব নিবেন। তার মতে এটাই একমাত্র সমাধানের পথ। তিনি আমাকে মিলিটারিদের ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং ওদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন; যদি ওরা তাকে ধ্বংস করে তবে ওরা পরে আমাকেও ধ্বংস করবে। আমি উত্তরে বলি, আমি ইতিহাসের কাছে ধ্বংস হবার থেকে মিলিটারির কাছে ধ্বংস হবো। তিনি আমাকে দুই কমিটির প্রস্তাবনা শুরু থেকে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন...

আমি তাকে বলি যে আমি স্বাভাবিকভাবে তার প্রস্তাব অত্যন্ত মনোযোগের সাথে চিন্তা করব এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসার জন্য যা করা সম্ভব সব করবো। যাই হোক, প্রস্তাবনার চূড়ান্ত রূপ যেমনই হোক না কেন, সেটা অবশ্যই জাতীয় অধিবেশনে পাশ হতে হবে, জরুরী হলে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ আকারে পাশ হবে। আমি তাকে আরও জানাই যে, অধিবেশনের বাইরে প্রস্তাবনার ব্যাপারে আমি কোন রকম নিশ্চয়তা দিতে প্রস্তুত নই...

মুজিবুর রহমান অধিবেশনের ব্যাপারটা একেবারেই বাতিল করে দেন। এমনকি সংক্ষিপ্তভাবেও অধিবেশনের কোন প্রয়াস তিনি বিবেচনায় আনলেন না। যে রকমেরই সমাধানে তিনি যাবার জন্য মন স্থির করেছিলেন না কেন, সেখানে সমগ্র দেশের জন্য বসা জাতীয় অধিবেশনের কোন স্থানই ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি জানানোর পর তিনি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। আমি তাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেই এবং একে অন্যকে বিদায় জানাই। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের নেতার সাথে আমার শেষ বৈঠক।“

ভুট্টোর উদ্ধৃতি শেখ মুজিবের মূল অবস্থান নিশ্চিত করে, যা তিনি বজায় রাখছিলেন। যদিও এখানে প্রস্তাবনা যে জাতীয় পরিষদে পাশ করাতেই হবে, ভুট্টোর এমন গোঁ ধরে থাকাটা অনুপস্থিত। এই আলোচনার পর রাজনৈতিক সমাধানের আলো কিছুটা হলেও জ্বলছিল। এমনকি, শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ টীমের কাছে এই ঘটনার রিপোর্টে বলেন যে তার মনে হচ্ছে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো অনুধাবন করেছে যে তাদের জন্য প্রস্তাবনা মেনে নেওয়াই উত্তম পন্থা হবে। তাদের অবস্থান অন্তত পশ্চিমে নিরাপদ আছে। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন, ভুট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধুর ক্ষমতা পাবে এবং যেহেতু পশ্চিমের সংবিধান পশ্চিমাদের নিয়ে কমিটির মাধ্যমে হবে। সেহেতু ভুট্টোর দল সেটাকে প্রভাবিত করতে পারবে। আমার মনে আছে কিছু বিদেশী সাংবাদিক বলাবলি করছিল যে পশ্চিমে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করার জন্য ‘দুই কমিটি’ -কে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো সমর্থন করবে। ২২ তারিখটি ছিল সমঝোতার জন্য সম্ভাবনাময় একটা দিন।

২২ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে আমার অফিসে বসেন। সেখানে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য পার্টি মেম্বাররা আসেন এবং পুরো ড্রাফটা মনোযোগ সহকারে পড়া হয়। কারণ এমন একটি খসড়াই হয়তো ঘোষণাপত্র আকারে আসবে। খসড়ার কাজ শেষ করতে ২২ মার্চের সারা রাত অতিবাহিত হয়।

মার্চ ২৩ ছিল একটা অসাধারণ দিন। আগে এই দিনটা ‘পাকিস্তান দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। এটা ছিল সেই দিন যেদিন হাজার হাজার বাংলাদেশী পতাকা বিক্রি হয়। আমার মনে আছে, ভোর ৬ টা সময় খসড়ার কপি সমেত অফিস থেকে বেরোবার পথে আমি নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং থেকে একটা বাংলাদেশের পতাকা কিনি। সকাল ৭ টার দিকে আমি খসড়ার কপি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় উপস্থিত হই। অল্প সময়ের মাঝে অসংখ্য মিছিল সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং তার বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমনকি বেশীরভাগ বাড়ী এবং গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়।

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল সেদিন সকাল ১১.৩০ টা নাগাদ বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজে এসে উপস্থিত হন। প্রেসিডেন্ট হাউজে মিলিটারি অফিসাররা সেই পতাকা দেখে প্রতিকূল আচরণ করে।

যখন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল প্রবেশ করেন, তখন তাদেরকে বলা হয় যে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য এমএম আহমেদসহ আরো কিছু অর্থনীতিবিদকে সরকারের পক্ষ থেকে আনা হয়েছে। এম এম আহমেদ এই বলে শুরু করেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে ছোট কিছু বিষয় যোগ করার মাধ্যমে ৬ দফা কার্যকর করা সম্ভব। পীরজাদা প্রস্তাব করেন যে এম এম আহমেদ আওয়ামী লীগের অর্থনীতিবিদদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান এবং অন্যরা অর্থনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক বিধিবিধান নিয়ে প্রতিদিন নুরুল ইসলামের বাড়িতে বৈঠক করছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সংশোধিত চূড়ান্ত খসড়ায় উল্লিখিত অর্থনৈতিক বিধানে তাদের সম্মতি দেওয়া ছিল। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল আবার অর্থনৈতিক বিধান নিয়ে আলাদা বৈঠকের পক্ষে ছিল না। কারণ তাদের কাছে এ সবই সময় নষ্টের অজুহাত বলে মনে হচ্ছিলো। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল বুঝতে শুরু করে যে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিটি অংশ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছিল। ২৩ মার্চের সন্ধ্যার বৈঠকে এম এম আহমেদ আওয়ামী লীগের চুড়ান্ত খসড়া প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী ও অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য কিছু লিখিত খসড়া প্রস্তুত করেন। এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্যের ব্যাপারেও এম এম আহমেদ কিছুটা নমনীয়তা দেখান। তিনি বলেন, বৈদেশিক বাণিজ্য কোন ঝামেলা ছাড়াই পূর্বে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। সাহায্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, যদি তা কেন্দ্রের বৈদেশিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে ঝামেলা এড়ানো সম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনর্গঠনের ব্যাপারে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঢাকা ব্রাঞ্চ বাংলাদেশের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ব্রাঞ্চের মাধ্যমে অর্জিত সকল বৈদেশিক মুদ্রা দ্বিভাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত অংশ আলাদা করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু সংগৃহীত কর দ্বিখণ্ডন করা খুব ঝামেলার হয়ে দাঁড়ায় এবং মেনে নেওয়া হয় যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল অন্তর্বর্তী সময়ের ভিতর এই সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান নিয়ে আসবে।

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বাড়ীতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগ দেন। এম এম আহমেদের করা সংশোধনীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং যত্নের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক সাহায্যের বিধিবিধানগুলো সরকার পক্ষের কাছে ঐদিন সন্ধ্যায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

২৩ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল এ সকল অর্থনৈতিক বিধানসমূহ নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু করার জন্য ফিরে গিয়ে জানতে পারেন যে ইয়াহিয়া সারাদিন প্রেসিডেন্ট হাউজের বাইরে আছেন। পীরজাদা ক্যান্টনমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলেন এবং পরবর্তী আলামত সমূহ নির্দেশ করে যে ২৩ তারিখই সেই দিন, যে দিন ‘জেনারেলরা’ বৈঠক করেছিলেন। এখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে এই দিনই অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত অনুমোদন পায় এবং দুইজন মূল পরিকল্পনাকারী হেলিকপ্টারে করে ২৪ মার্চ ঢাকার বাইরে তাদের বিশ্বস্ত ব্রিগেড কমান্ডারদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য উড়ে যায়। এম এম আহমেদের সাথে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সাথে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হচ্ছিলো মূলত ‘মিলিটারি সমাধানের’ জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। ২৪ শে মার্চ সকালের ভিতর আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল সকল প্রকার আলোচনা এবং ঘোষণাপত্রের খসড়ার প্রশ্নবোধক জায়গাগুলো বিশ্লেষণ করা শেষ করেন। যখন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল সন্ধ্যার সেশনের জন্য চলে যাচ্ছিলেন, তখন শেখ মুজিব নির্দেশ করেন যে দেশের নামের ক্ষেত্রে আমরা প্রস্তাব করব ‘কনফেডারেশন অফ পাকিস্তান’। তিনি ইঙ্গিত দেন যে এটা দেশের মানুষের আবেগের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দরকার। প্রস্তাবটি আংশিকভাবে স্বাধীনতার জনপ্রিয় ইস্যুকে প্রতিফলিত করে, যা তরুণদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিরাট গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

যখন এই প্রস্তাব সরকার পক্ষের কাছে দেওয়া হয়, তখন তারা এর তীব্র বিরোধিতা করে এই বলে যে, এটা আমাদের মৌলিক অবস্থানের পরিবর্তনের নির্দেশ করছে। আমরা বলি যে নামের পরিবর্তন মৌলিক অবস্থানের পরিবর্তন নির্দেশ করে না। কারণ এখানে বাস্তবসম্মত অন্যান্য সকল বিধান ঠিক থাকছে যা একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য দরকার। কর্নেলিয়াস যুক্তিতর্ক মেনে নিলেন বলে মনে হলো। তবে তিনি ‘কনফেডারেশন’ শব্দের পরিবর্তে ‘ইউনিয়ন’ শন্দটির কথা বলেন। জবাবে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল বলেন যে, এই এক শব্দের বিষয়টা শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার কাছে দেওয়া হবে চূড়ান্ত খসড়া যখন তাদের অনুমোদনের জন্য যাবে তখন।

আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল এটাও আঁচ করতে পারছিল যে বাইরের অবস্থা খুবই গুরুতর। কারণ আর্মি চট্টগ্রামে এম ভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে যাচ্ছিলো এবং হাজার হাজার জনতা তাঁদের বন্দরে যাবার পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছিল। রংপুর থেকে মিলিটারি অপারেশনের খবর এসেছিল। ঢাকাতে এমন খবরও পৌঁছাচ্ছিল যে মিলিটারি আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কারণে মনে হচ্ছিলো যে ২৪ তারিখের মিটিংটাই শেষ মিটিং হতে যাচ্ছে। সেখানে আলোচনা সমাপ্তির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া উচিৎ এবং কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করার আর সময় নেই।

সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ খসড়া পড়ে শেষ করা হয়। আমি পীরজাদাকে অস্থির ভাবে জিজ্ঞেস করি যে কখন খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে? আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয় আমি যেন কর্নেলিয়াসের সাথে সেই রাতেই বসে খসড়াটি চূড়ান্ত করি। যেন পরদিন তা শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার সামনে পেশ করা যায়। কর্নেলিয়াস রাজি ছিলেন কিন্তু পীরজাদা বলেন যে, “না, আজ সন্ধ্যায় আমাদের কিছু আলোচনা করতে হবে। আপনারা কাল সকালে দেখা করেন।“ আমি পরদিন সকালে একটা সময় নির্দিষ্ট করার কথা বললে পীরজাদা আবারো বাঁধা দেন এবং বলেন যে এটা ফোনে ঠিক করা যাবে এবং সে ফোনে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। তারপর পীরজাদা আমার দিকে তাকান এবং বলেন, “কখন ঘোষণা দেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?” আমি বলি, এটা গত পরশুদিন দেওয়া উচিৎ ছিল। যেভাবে ঘটনা প্রবাহিত হচ্ছিল (আমার মাথায় চট্টগ্রাম এবং রংপুরের ঘটনাগুলো ছিল, যেখানে আর্মিরা সাধারণ মানুষ ও পুলিসদের উপর গুলিবর্ষণ করছিল)। হাতে একদমই সময় নেই। এই প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন যে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল মনে করেন যে সকল বিষয় আলোচনা হয়ে গেছে এবং আর কিছু আলোচনার বাকি নেই। যা বাকি আছে তা হলো, শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার সামনে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য খসড়াটি পেশ করা। একবার অনুমোদন হয়ে গেলে ঘোষণাটি জারি করা যাবে। তাজউদ্দীনের এই বক্তব্য শ্বেতপত্রে বিকৃত করে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন আওয়ামী লীগ আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল। সত্যিকার অর্থে, এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে আলোচনা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছিল এবং শুধু শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার অনুমোদন বাকি ছিল। অবিশ্যম্ভাবী ২৫ তারিখের সারাটা দিন আমি একটা টেলিফোন কলের জন্য অপেক্ষা করি। সেই কল আর কোনদিন আসে নি। যখন আমি রাত ১০.৩০ এর দিকে শেখ মুজিবের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ফোন কল এসেছে কিনা প্রশ্ন করেন। আমি তাকে কনফার্ম করি যে, আমি কোন কল পাই নি। সেই রাতেই আর্মি বাঙালির উপর গণহত্যার এবং রক্তস্নাতের আক্রমণ শুরু করে। এগুলো পরিহার করা এবং রাজনৈতিক সমঝোতা করাই ছিল আলোচনা শুরুর মূল উদ্দেশ্য।

-ডঃ কামাল হোসেন

১৯৭৪।



[হৃতহৃ ইসলাম](https://www.facebook.com/profile.php?id=100005843262936&fref=ts)

<১৫,১৯,১৯৩-৯৮>

# [খন্দকার আসাদুজ্জামান]

যদিও সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তবুও অনেকের মতো আমার মনেও দ্বিধা ছিল যে আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আদৌ ক্ষমতা লাভ করবে কিনা। বিশেষ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পরেও যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে পাকিস্তানিরা বিভিন্ন অজুহাতে গড়িমসি করতে লাগলো, তখন এই ধারণা আমার মনে আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। সবই মনে হচ্ছিলো একটা সাজানো ব্যাপার, একটা সুদৃশ্য চালবাজি, যার মাধ্যমে গভীর কিছু ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

আমি সে সময় রাজশাহীর জেলা প্রশাসক ছিলাম। ৫ ই জানুয়ারীর পরে আমাকে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ- বিভাগের যুগ্ম-সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আমি ঢাকায় এসে সার্কিট হাউসে উঠি এবং চারিদিকে খোঁজ খবর রাখতে থাকি। বাইশে ফেব্রুয়ারী যখন মন্ত্রিসভা ভেংগে দেয়া হয় তখন আমার আশংকা আরো ঘনীভূত হয় যে অবস্থা হয়তো বা খুব খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং সবই হচ্ছে তারই পূর্বপ্রস্তুতি। যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত করা হয়, তখন বলা যায় আমরা এক প্রকার নিশ্চিত যে দূর্যোগ সামনেই রয়েছে। এই সময় যে গণআন্দোলনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিলো, তাতে প্রায় সকলেই শামিল হয়। সবাই চাইছিল কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে। আমরা যারা সরকারি চাকুরি করতাম এবং একই সাথে দেশ-সচেতন নাগরিক ছিলাম, তাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করতে থাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ।

একটা সভায় আমরা একসাথে মিলিত হই এবং আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত এবং ঐকমত্যে উপনীত হই। আসন্ন দূর্যোগ যে অভাবনীয় কিছু সেটা সবাই ধারণা করে এবং বুঝতে পারে এই চক্রান্তের পিছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে-সেটি হচ্ছে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে শেষ করে দেয়া। যেভাবেই হোক অসহযোগিতা বা প্রতিরোধ করতেই হবে। দেশ ও জাতির সংকট এমনই তীব্র যে সরকারী-বেসরকারী ছাপ প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। সমস্যা এবং বিপদ গোটা জাতির। আমাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় জনাব সানাউল হকের বাসায়। জনাব সালাউদ্দিন, জনাব মুজিবুল হক এবং আরো কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ঘটনার গতিধারা পর্যালোচনা করতে থাকি। খুব সহজেই অনুমিত হয় যে প্রস্তুতি পর্ব চরমে উঠেছে। এম ভি সোয়াতে অস্ত্র এসে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল যে ভয়াবন কিছু ঘটার শুধু বাকি। যখন জয়দেবপুর, চাটগাঁ এবং আরো কয়েকটি জায়গায় সেনাবাহিনী মানুষ হত্যা করেছে তখন ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তা পরিষ্কার হতে থাকে।   
  
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ২৩ তারিখে আমার গ্রামের বাড়ি টাংগাইলের উদ্দেশে রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সাথে আলাপ হয়। ২৪ তারিখে আমার শ্যালিকা ঢাকা ছেঁড়ে আসে এবং আমাদের জানায় যে, ঢাকা এখন একটা ভয়ের শহরে পরিণত হয়েছে। ২৫ তারিখে আলোচনা ভেংগে যায়। ২৬ তারিখে ঢাকার ঘটনা আমরা জানতে পাই। এই ঘটনা শোনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা একত্রিত হন এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন আগামী কর্মসূচীর। আমাকেও এই সভায় যোগদান করতে আহ্বান করা হয় এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আমি উক্ত পরিষদের পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান করি। জনাব বদিউজ্জামান এই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হন। ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমরা সর্বাত্মকভাবে লড়বো।   
  
আমি আমার বক্তব্য রাখি এবং বলি, যে সব মানুষ এলাকায় আছে তাদের দু’টি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যথা- ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ট্রেনিংবিহীন। এছাড়া আমরা পুলিশ ও আনসারদেরও যোগদান করতে অনুরোধ জানাই। এইভাবে বিভিন্ন কর্মীশিবির খোলা হয়। মূল সমস্যা অবশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে অস্ত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ডি সি এবং পুলিশ অফিসার উভয়ই অনুপস্থিত। তাদেরকে সংবাদ দেয়া হয় এবং তাঁরা এসে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এদিকে ট্রেজারীর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি বলেন যে তাঁর নিজের অবস্থা বাঁচানোর জন্য একটা কিছু লিখিত দেয়া উতিচ। ওই এলাকার সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি তাঁকে লিখিতভাবে আদেশ দেই। চারদিকে সাড়া পড়ে যায় এবং সবাই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইচ্ছে পোষণ করে। এক কথায় সবাই জড়িয়ে পড়ে কোন না কোন কাজে। এই অত্যন্ত আনন্দজনক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হলেও নিয়মশৃংখলার সমস্যা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। আমরা যতদূর সম্ভব সুসংগঠিত এই আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। আমি বুঝেছিলাম যে সরাসরি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা না করলে অথবা অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার না হলে অবস্থা অসুবিধাজনক হতে পারে। এই সময় টাংগাইলের ছাত্রনেতা কাদের সিদ্দিকী আমার সাথে দেখা করেন এবং বলেন যে তিনিও কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং আমাকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। খবর নিয়ে জানা যায় যে জেলা সদর দপ্তরে বি ডি আর ক্যাম্প আছে এবং সেখানে প্রচুর অস্ত্র আছে। আমরা তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি।

তারা জানান, কোনভাবে তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র নেয়ার চেষ্টা করলে তাঁরা শুধুই দেবেনই না বরং সংগ্রামেও যোগদান করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের উপর একটা ভুয়া আক্রমণের ব্যবস্থা করি। প্রায় সাথে সাথেই বিডিআর সৈন্যরা পাকিস্তানীদের বন্দি করে এবং আমাদের সাথে যোগদান করে। এই ঘটনাটি ঘটে ২৮শে মার্চ তারিখে। আমরা সে সময় শুনতে পাই যে মেজর শফিউল্লাহ জয়দেবপুর থেকে বাঙালী সৈন্যদের নিয়ে বের হয়ে গেছেন এবং ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সিরাজগঞ্জ থেকে উক্ত এলাকার কর্মকর্তা জনাব শামসুদ্দীন আসেন। তিনি জানান যে সাঙ্গগঠনিক দিন থেকে তাঁরা অনেক এগিয়েছেন কিন্তু তাঁদের কোন অস্ত্র নেই। আমরা জানাই যে আমরা ৫০ টা রাইফেল তাদের দিতে পারি।   
  
আমাদের নিজেদের এলাকায় আমরা আমাদের সীমিত সংখ্যক অস্ত্র বিলি করি। যতদূর সম্ভব সেইভাবে আর যেখানে যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে একটা দুটো করে অস্ত্র দেয়া হয়। এই সময়ে ময়মনসিংহের অবস্থা জানার চেষ্টা করি। আমরা জানতে পারি যে, সেখানকার ইপিআর বাহিনীও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শহর প্রায় জনশূন্য। অবশ্য সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের বাসায় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসান আহমদ এবং সিরাজুল্লাহ ছিলেন এই এলাকার সরকারী কর্মকর্তা। উক্ত সভায় রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া এবং সৈয়দ আব্দুস সুলতান উপস্থিত ছিলেন আমাদের সাথে। আমরা তাদেরকে জানাই টাংগাইলে কি ধরণের কর্মতৎপরতা চালানো হচ্ছে। আলোচনার পর ঠিক হয় যে যদি প্রতিরোধের প্রশ্ন আসে তবে আমরা মধুপুরেই প্রতিরোধ করবো যেহেতু রণকৌশলের দিক থেকে এই জায়গা আমাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হয়। সমস্যা অবশ্য তখনও একটাই ছিল অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে।   
  
টাংগাইল এসে খবর পাই যে পাক সেনারা টাংগাইল অভিমুখে আসছে। পরে আবার খবর আসে যে মির্জাপুর পর্যন্ত এসে তারা ফিরে চলে গেছে।   
  
ই পি আর –এর কিছু সৈন্য নিয়ে আমি মির্জাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়না হই। আমরা কালিহাতিতে এসে থামি এবং মির্জাপুর গিয়ে সংসদ সদস্য শওকত আলী খানের সাথে দেখা করি। তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং একমত হন যে প্রতিরোধ করলে মির্জাপুরের আগেই করতে হবে। এরপর মেয়েদেরকে কুমুদিনী কলেজ এবং হোস্টেল থেকে চলে যেতে বলা হয়। কালিয়াকৈর পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। ঠিক হয় পাক-সেনাদের গতিবিধির ওপর চোখ রাখা হবে। ৩ রা এপ্রিল গোলাগুলির আওয়াজ পাই। নাটিয়াপাড়া নামে একটা জায়গায় পাকিস্তানীরা আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক ঘন্টা যুদ্ধ হয় এবং আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে গেলে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ এবং গ্রাম পোড়ানো। আমি টাংগাইল-এর আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম আক্রমণ হলে কোথায় যেতে হবে।   
  
আমাদের প্রধান কাজ ছিল অস্ত্র হেফাজতে রাখা। কাদের সিদ্দিকী এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। গিয়ে দেখি তিনি দুটো ট্রাকে অস্ত্র বোঝাই করেছেন। নতুন সদর দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, আমার পরিবারকে গ্রামের বাড়িতে রেখে আসবো, এক সাথে থাকবো না। এখানো বলা যেতে পারে যে, এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায় আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। খবর পেলাম টাঙ্গগাইল পাকিস্তানীরা দখল করে নিয়েছে। তখন ঠিক করি যে জামালপুর যাবো। সেখানে এম পি নিজামউদ্দীনের সাথে দেখা হয়। অস্ত্রের অভাব পুনর্বার প্রকটভাবে জানতে পারি। এরপর আমি নিজ পৈতৃক নিবাসে যাই। গিয়ে দেখি ডাইনামাইট দিয়ে সেটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং জানতে পারি যে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেই সিরাজগঞ্জ যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। সিরাজগঞ্জ আমাদের গ্রামের ঠিক উল্টো দিকেই অবস্থিত। আমরা হেঁটেই পার হয়ে যাই। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। ডি, সি-র স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাবার ধারণা ছিল সেটাই ভালো হবে। পথিমধ্যে তাঁরা গোপালপুরে এসে জানতে পারেন যে কারফিউ জারি করা হয়েছে। রাত্রে ওখানকার ও সি এসে জানায় যে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রয়েছে এবং আমাকে পেলে পাকসেনারা হয়ত সবাইকেই হত্যা করবে। আমরা আবার সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। জানতে পারি পাকিস্তানীরা আরিচা পর্যন্ত এসে গেছে। তখন আমরা বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এর মধ্যে নগরবাড়ীর পতন ঘটে ১১ই এপ্রিল।   
  
উল্লাপাড়ায় গিয়ে দেখি বি ডি আর – এর সৈন্যরা ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বগুড়াত চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শহর প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ রিক্সায় জনাব গাজিউল হককে দেখি। আরো কিছু অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়। বগুড়া তখনও মুক্ত। এরই মধ্যে পাকিস্তানীদের সাথে দুটো সংঘর্ষ হয়েছে। এখনে সংগ্রাম পরিষদ সব দায়িত্ব পালন করছিল। তবে কতদিন এই প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখা যাবে তা নিয়ে সবাই বিচলিত ছিল। এম আর আখতার মুকুলের সাথে দেখা হয় সেখানে। তিনি ঢাকার খবর দিলেন। তিনিও আমাদের সাথে জয়পুহাটের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে আমাদের পরিবারের লোকজনকে রেখে আমরা কয়েকজন ১৬ই এপ্রিল হিলি উপস্থিত হই ভারতীয় সীমান্তে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজনদের সাথেও সেখানে দেখা হয়। অস্ত্রের প্রকট অভাব সহজেই পরিলিক্ষিত হয়।   
  
আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ করি এবং অস্ত্রের সাহায্য কামনা করি কিন্তু সে সময় কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাঁদের কাছে নাকি কোন আদেশ ছিল না আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে। অবশ্য আমরা নিজেরাও জানতাম না যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে।   
  
এমন সময় খবর এলো যে জয়পুরহাট দিয়ে পাকিস্তানীরা আসছে হিলির দিকে। সেখানে মুকুল সাহেব ছিলেন, খবর পাঠালাম আমার এবং তাঁর নিজের পরিবারসহ্ন হিলি চলে আসতে। কিন্তু খবর পাঠানোর বহুক্ষণ পরও কাউকে না আসতে দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। তখন কিছু লোক এবং অস্ত্র নিয়ে জয়পুরহাটের দিকে যেতে থাকি। পথিমধ্যে পাঁচবিবির কাছে হঠাৎ জীপ গাড়ির আলো দেখি এবং তারপরই সবার সাথে দেখা হয়। জানতে পারি যে মুকুল সাহেবকে যে কোন কারণেই হোক পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং অন্যদেরকে বিহারী মনে করা হয়। তাদেরকে থানাও নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ও সি-র কথায় জনতা তাদেরকে মুক্তি দেয়। রাত ১২ কি ১ টার দিকে আমরা সীমান্ত পার হই। আমার মানসিক অবস্থা যে কি ছিল তা বলার নয়। ভীষণ মন খারাপ। এভাবে যে দেশ ছাড়তে হবে তা কোনদিন ভাবিনি। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের কোন সংবাদ আমি তখনও জানতাম না।   
  
মালদাহ পৌঁছে ডি সি-র সাথে দেখা করি। শুনলাম অন্য কয়েকজনও এসেছেন এই পথ দিয়ে। তাঁর কাছে কোন নির্দেশ আসেনি তবে তিনি আমাকে মুজিবনগর সরকারের সংবাদ দিলেন। পরের দিন মুকুল সাহেবের সাথে কোলকাতায় উপস্থিত হই এবং জনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ও কামরুজ্জামানের সাথে দেখা করি। তাঁদের সাথে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা হয়। জনাব নুরল কাদের খানের সাথে কথা হয় এবং আমাদের দুজনকে একটি সরকারের কাঠামো তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিছুদিন পর আমাদেরকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।   
  
এর কয়েকদিন পরই জনাব হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। আমি অর্থ সচিব হিসেবে নিয়োজিত হই এবং দূতাবাসের একটি কক্ষে আমার দপ্তর স্থাপন করি।   
  
আমদের অর্থের মূল উৎস ছিল বিভিন্ন ট্রাজারি থেকে লব্ধ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয় হোসেন আলী সাহেবের নিয়ন্ত্রণাধীন দূতাবাসের টাকাগুলো। একাউন্ট রক্ষা করার এবং সরকারী অর্থের অডিট করা আমার বিভাগের প্রধান কাজ ছিল।   
  
মুজিবগর সরকারের কাজ ছিল প্রধানত দুটি- এক. যুদ্ধ করা দুই. শরণার্থীদের দেখাশোনা করা। আমাদের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এই সাহায্য ছিল প্রধানত ভারতীয়। কিন্তু রিলিফ ক্যাম্পগুলো ছিলো আওয়ামীলীগ নেতাদের হাতে।  
  
আমরা মাঝে মাঝেই এই শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেতাম। সেখানকার অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। তবে ভারতীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এই দুরবস্থা কিছুটা লাঘব করার জন্য বহু কাজ করেছে।   
  
সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল ‘মুক্তিফৌজ’ গড়ে তোলা। ছেলেদের প্রশিক্ষণ দান ছিল এই কর্মসূচীর প্রধান অংশ। এই লক্ষ্যে “যুব নিয়ন্ত্রণ বোর্ড’ গঠিত হয়। উইং কমান্ডার মীর্জা এর প্রধান ছিলেন। ফ্লাইট লেঃ রেজা তাঁকে সহায়তা করতেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। লাখ লাখ তরুণ ও যুবক এসে তাতে যোগদান করে। এই যুবশিবিরগুলোকে মুজিবনগর সরকারের অর্থে চালানো হতো। শিবির এলাকা থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করা হলো কিন্তু সব খরচ ‘ফাইনানসিয়াল রুল’ অনুযায়ী হতো। একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার যে নিয়মে তাঁর টাকা বরাদ্দ ও খরচ করে, আমরা যতদূর সম্ভব, সেইভাবেই করতাম। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। যুদ্ধের খরচের ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতেন মন্ত্রী পরিষদ। এটি আমাদের বিষয় ছিল না।   
  
জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আঞ্চলিক প্রশাসনিক এলাকাগুলো যেমন সেই এলাকার সব দায়িত্ব বহন করতো তেমনি এদের প্রায় সামগ্রিক অর্থ যোগানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের বিভাগের। তবে আমরা খুব টেনে খরচ করতাম যেহেতু আমাদের অর্থ ছিল কম এবং কেউ বলতে পারতো না যুদ্ধ কতদিন চলবে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার আমাদের সব হিসাবের সঠিক হিসাব গ্রহণ করে।   
  
কিছু কিছু মুক্ত এলাকায় সীমিতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালু করা হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল শত্রুকে জানানো যে আমরা ক্রমে প্রশাসন দখল করে নিচ্ছি। এছাড়া বেসরকারী কোন সংগঠন বা কোন দলের হাতে ক্ষমতা যাতে না যায় সে জন্যও। এই সব কাজেও আমাদের দপ্তর সাহায্য করতো ও নিয়ন্ত্রণ রাখতো।   
  
মুজিবনগর সরকার একটি প্লানিং বোর্ড স্থাপন করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা যেতে পারে আগামী বাংলাদেশের একটি প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যে সব পরিকল্পনা এখানে তৈরী হয় তা ছিল সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলক। বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা তৈরী হয় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিকল্পনাগুলো ছিল স্বাধীন দেশের জন্য সেই স্বাধীনতা যত দ্রুতই আসুক কিংবা দীর্ঘকাল পরেই আসুক।   
  
অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে একটা পরিষ্কার করা যেতে পারে। জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলগুলোকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হতো অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। একই সাথে এটাও লক্ষ্য করা তাঁদের দায়িত্ব ছিল যে অন্য কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যেন চাঁদা সংগ্রহ অভিযান না চালায়। কেবলমাত্র তাদের চাঁদা সংগ্রহই বৈধ ছিল এবং তারাই সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।   
  
তবে আমরা এটাও জানতাম যে বিচ্ছিন্ন যেসব মুক্তি এলাকা ছিল বা যেখানে যোদ্ধারা ছিল সেখানে চাঁদা ওঠানো হবে। আমরা খবর পেতাম যে চাঁদা সংগ্রহ হতো খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। সাধারণ মানুষরা এই সব ক্ষেত্রে নিজেরাই এগিয়ে এসেছে সব ধরণের সাহায্য নিয়ে। জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল- এর ব্যাপারে আর একটা বলা যায়। সেটা হচ্ছে এই বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হতো তাঁদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য। কেননা এই ব্যবস্থা ছাড়া তাদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না। প্রায় সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদের ছিল। আমরা মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করতাম সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর। আমাদের সঙ্গে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক এবং প্রয়োজনভিত্তিক।   
  
সরাসরি কোন যোগাযোগ খুব কমই হতো। লিয়াজোঁ অফিসারের মাধ্যমে আমাদের কাজ সমাধা হতো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান করা হতো।   
  
আমরা জানতাম মুক্তিযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীই প্রধান ভূমিকা পালন করবে তবে আমরা একই সাথে সচেষ্ট ছিলাম একটি সক্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। যাতে প্রয়োজনের সময় আমরা একটি কার্যকরী সরকার তৎক্ষণাৎ চালু করতে পারি। প্রায় সব টাকা-পয়সা প্রদান করা হতো চেকের মাধ্যমে। এখানে বলা যায় যে সমগ্র মুজিবনগর সরকারের অধীনে এক হাজারেরও বেশী কর্মচারী ছিল। আমাদের টাকা-পয়সা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকেও রাখা হতো- যদিও সরকার হিসেবে আমাদের কোন আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কিত গোপনীয়তা চরমভাবে রক্ষা করা হতো। খুব কম লোকেই জানতো যুদ্ধ কখন শুরু হতে পারে যদিও সবার কম-বেশী ধারণা ছিল যে যুদ্ধ বাধবেই। যেমন আমরা ১৯৭২ সালের বাজেটও প্রস্তুত করি যা পরে প্রয়োজন হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের কাছে যে অর্থ ছিল তা আমাদের হিসাবে দু’বছর পর্যন্ত সরকার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর অবশ্য নতুন অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন আসতো। আমরা অবশ্যই চাইছিলাম সমস্যার দ্রুত সমাধান। আমাদের মনে হতো যে, মুক্তিবাহিনী একা যুদ্ধ করলে কয়েক বছর লাগবে এবং এ যুদ্ধ ভারতীয় সাহায্য নিয়েই করতে হবে। যদি যৌথ কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধ হয় তবে তা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং কম ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ। এটা ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা।   
  
উপসংহারে বলা যায় সময়টা ছিল একেবারেই বিশেষ ধরনের। নিজেদের শুধুমাত্র সরকারী চাকুরে বলে কখনই মনে হয়নি। আমরা ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ। কোন কষ্টই বড় কষ্ট ছিল না। কোন ত্যাগের প্রশ্নে ছিল না দ্বিধা। কখনও ভাবিনি আমাদের কি হবে। একটা কথাই কেবল মনে হতো-কাজটা যে করেই হোক সমাধা করতে হবে। তাঁর জন্য যা করার দরকার সবই করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম অন্য সবার মত।   
  
-খন্দকার আসাদুজ্জামান   
মার্চ ১৯৮৪



[গুরু গোলাপ](https://www.facebook.com/hemlok1)

<১৫,২০,১৯৮-২০৪>

# [জয় গোবিন্দ ভৌমিক]

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আমি তখন ঢাকায় জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার কোয়ার্টার ছিল পুরোনো সার্কিট হাউস চত্বরে। আমার বাসার কাছেই কাকরাইলে অবস্থিত সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস। সেখানে স্থাপিত হল পাক বাহিনীর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার।

২৬শে মার্চ রেডিও মারফত ফরমান এলো থানায় বন্দুক জমা দাও। পায়ে হেঁটে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক হাতে নিয়ে গেলাম রমনা থানায়।

২৮শে মার্চ সবাইকে ১০টায় নিজ নিজ অফিসে অবশই হাজির হতে হবে। পুরাণো সার্কিট হাউস চত্বর থেকে ঢাকা কোর্টের দুরত্ব ৪/৫ মাইল। গাড়ি ঘোড়া চলছে না। লোকজন প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চলে পায়ে হেঁটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পায়ে হেঁটে জীবনকে হাতে নিয়ে আমিও চললাম পুরানো ঢাকার জর্জ কোর্ট চত্বরে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে। আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই ব্যাচম্যাট তৎকালীন ঢাকাস্থ এডিশনাল জেলা জজ আতিয়ার রহমান সাহেব। আমরা আদালত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম বহু কষ্টে, কারন দারোয়ান বা নাইট গার্ডরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তার ঠিকানা নেই। তৎকালীন নেজারত থানায় আগুন লাগানো হয়েছে। ফলে অনেক মূল্যবান দলিল পুড়ে গেছে। আমরা বহু কষ্টে মূল্যবান মামলার রেকর্ডগুলি সরিয়ে এনে একটা টেবিলে জমা করি। কোন ঘরে আমরা প্রবেশ করতে পারিনি, কারন দারোয়ানরা তালা লাগিয়ে পালিয়েছে। পরে বহু চেষ্টায় কাঁচের জানালা ভেঙ্গে দু'একটি অফিসকক্ষে প্রবেশ করি। মুন্সেফ, সাব জজ, এডিশনাল জজ সাহেবরা সকালে একটি কাগজে তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিয়ে অফিসের হাজিরার দায়িত্ব পালন করেন।

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। পথের হয়রানি লেগেই আছে। পাক সৈন্যরা সবার কাছে পরিচয় পত্র চায় - আমরা পাকিস্তানের দুশমন কিনা জানতে চায়। তাই সবার নামে একটি করে "আইডেন্টিটি কার্ড" প্রদান করতে হল যাতায়াতে যাতে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু প্রধান হিসেবে আমার নাম দস্তখত করলাম অস্পষ্টভাবে, পাক সেনারা যাতে জানতে না পারে যে আমি একজন হিন্দু। কারন তাদের ধারণা হিন্দুরা কাফের এবং তারাই যত অনিষ্টের মূল। কোর্ট কাচারি তখন নামেই চলছিল। মক্কেল নেই, লোক জন প্রাণের ভয়ে কোর্টে আসতো না। আমার ছোট একটা ফিয়েট মোটর কার ছিল। ঐটায় তখন কোনমতে কোর্টে আর বাসায় যাতায়াত করতাম। গাড়ির ভেতর রাখতাম "জিন্নাহ ক্যাপ" যাতে কেউ টের না পায় আমি একজন হিন্দু জজ। আর কাগজে লিখে নিয়ে তিন-চারটা কালেমা মুখস্ত করে আওড়াতাম যাতে আমি পাক সেনাদের বোঝাতে পারি আমি একজন সাচ্চা মুসলমান।

পাক সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ভয়ে ভীত অবস্থায় কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলাম কোন মতে। এর মধ্যে একদিন তৎকালীন জুনিয়র এডভোকেট বি.এ খান এসে বলেন 'স্যার শীঘ্র ঢাকা থেকে অন্যত্র চলে যান। আপনার নাম মিলিটারী জান্তার তালিকায় ৩নং এ দেখলাম। ওরা "কম্বিং অপারেশন" শুরু করতে যাচ্ছে।

মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। ঠিক এই সময় এডভোকেট আলী আমজাদ শাহেবের শ্যালক এম, এ সরোয়ার (খোকন) এসে হাজির। তিনি বললেন কোন ভয় নেই, গারি রেডি আছে, পথঘাট সব ঠিক আছে, বৈদ্যের বাজার দিয়ে কুমিল্লা হয়ে আগরতলা পৌছাতে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার মাত্র,বেলা ১০টায় রওয়ানা হলে সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌছে যাচ্ছি, অতি সহজ ভাষায় বলে ফেললেন। আমিও তার কথা সহজভাবেই বিশ্বাস করে মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম।

কয়েকটা হাত ব্যাগের মধ্যে সোনা দানা, টাকা পয়সা, কয়েকটা মূল্যবান কাপড় পরে নিয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ঢাকা ছাড়ার সংকল্প করলাম। আশেপাশের অফিসাররা জানতে পারলে সমূহ বিপদ হবে। তাই কাউকে কিছু বলিনি। খোকন মিয়ার প্ল্যান অনুযায়ী আমি বেলা ১০টার আগেই আমার মটর কারে জজ কোর্ট চলে গেলাম। আমার পরিবারবর্গ খোকন মিয়ার কোন বন্ধুর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ১০- ১৫ মিঃ-এর মধ্যে অপর একটি মটর কার এসে হাজির, যেটি তাদেরকে ডেমরা ঘাটের নিকট পৌছে দিল। আর আমি ১০টা ৩০ মিঃ মধ্যে ঢাকা জজ কোর্ট হয়ে রওয়ানা হলাম ডেমরা ঘাটের দিকে। ড্রাইভার সাহাবউদ্দিনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে খোকন মিয়ার সাহায্যে আমার গাড়ি নিয়ে ডেমরার দিকে ছুটলাম। অফিসে রেখে গেলাম ৬ দিনের "ক্যাজুয়াল লীভ"-এর দরখাস্ত। প্ল্যান মত ডেমরায় গিয়ে পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হলাম। গাড়ি দুটিকেই ফিরিয়ে দিলাম।

বহু কষ্টে স্কুটারে করে আমরা গিয়ে বৈদ্য্যের বাজার পৌঁছাই। তখন বেলা ৪টা। খোকন মিয়ার কথা কথানুযায়ী কোথায় সন্ধ্যার আগেই গিয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছাবো। তা না হয়ে বৈদ্য্যের বাজারেই পড়ে রইলাম বিকাল অবধি। চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লাম। সমূহ বিপদের ঘনঘটা দেখতে পেলাম। এখন উপায়?

অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছি। প্রায় না খেয়েই রওয়ানা দিয়েছি কোন সকালে। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। খাবার জিনিসের মধ্যে পেলাম কিছু লিচু। তাই কিনে নিলাম। বেলা ৫টার দিকে দেখলাম, দুর থেকে একটা লঞ্চ আসছে। তাতে লোক ভর্তি, স্থান হবেনা। লঞ্চটি তীরে ভীড়লো না। আমরা একটি ছোট ডিঙ্গিতে উঠে আস্তে আস্তে লঞ্চের কাছে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কোন মতে শরীরকে ঢুকিয়ে দিয়ে কেবিনের ভেতরে প্রবেশ করলাম। রাত ৮-৩০ মিনিট নাগাদ যখন কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর আসলাম, তখন লঞ্চের সারেং বলে উঠলো, যারা হিন্দু আছেন, তারা যেন সেখানে নেমে যান। তাদেরকে আর নেয়া যাবে না। তখন অনেকে সেখানে নেমে গেল। আমরা নামলাম না, কারন আমরাতো হিন্দুর পরিচয় দিচ্ছি না। যখন রামকৃষ্ণপুর পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে ন’টা। একটা বন্দরের মতো জায়গা। সর্বত্র গভীর নিঝুম অন্ধকার। দু’একটা কুপি বাটি দোকানের মাঝখান থেকে জ্বলছে। আমরা নেমে পড়লাম। খোকন মিয়া আমাদের গাইড করছেন। আমরা সবাই ভয়ে কাঁপছি। কিন্তু খোকন মিয়া আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, কোন ভয় নেই। একটা বুড়ো মাঝিকে ডেকে বললেন, “এই মাঝি, কামাল্যা গ্রাম চেনো? ঐ গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে যাবো, তাঁদের ইষ্টি কুটুম ঢাকা থেকে এসেছেন। সে কুমিল্লা জেলার কামাল্যা গ্রামের চৌধুরী বাড়ি চেনে।

আমাদের নৌকার ছৈ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চললো। সামনে একটা কুপি বাতি জ্বলছে টিপ টিপ করে। ভয়ে আমরাআ জড়সড়। কখন যে ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। দু’একটা হাঁকডাকও কানে গেলো। কিন্তু আমরা নিশ্চুপ।

যখন কামাল্যা গ্রামে এসে পৌছালাম তখন রাত প্রায় ১টা। ক্ষিধেয় আধমরা হয়ে গেছি। চৌধুরী বাড়ি গিয়ে উঠলাম। খোকন মিয়া কানে কানে বলে দিল, ঢাকার জজ সাহেব। একটা অল্প বয়সী ভদ্রমহিলা সেই রাতেই আমাদের জন্য দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দিলেন। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তা খেলাম। রাত ভোর হতে বেশী বাকি ছিলনা। আমরা একটা ভাঙ্গা বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিলাম এবং কোনমতে একটু চোখ বুঝলাম। পরদিন যাব, কিন্তু কোন নৌকা মিলল না। তাই সেদিন কামাল্যা গ্রামেই থাকতে হল। খুব ভোরে রওয়ানা হব। কিন্তু খোকন মিয়ার কোন তাগিদ নেই। তিনি গ্রামে কানাঘুষা শুনেছেন, আমরা হিন্দু, কয়েক সের সোনাদানা এবং বহু টাকা পয়সা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছি। কিন্তু তিনি এ খবর চেপে গেছেন, যাতে আমরা ঘাবড়িয়ে না যাই। তিনি শুধু বলে উঠছেন, চা নাস্তা না খেয়ে যাচ্ছি না। যাক, বেলা ৭-৩০ মিঃ দিকে নৌকা যোগে রওয়ানা হলাম আগরতলার দিকে। কিন্তু দু'মাইল পথ না যেতেই আলগি গ্রামের একদল দুষ্কৃতকারী শোরগোল করে ছুটে এলো নৌকার দিকে লাঠি হাতে। আমাদের কাছে।যা কিছু টাকা পয়সা সোনাদান ছিল, তা প্রায় লুট হয়ে গেল। এখন উপায়? ঢাকায় ফিরলেও তো মৃত্যু অবধারিত। তাই এগিয়ে চললাম, সামান্য কিছু পথের সম্বল নিয়ে যা আমার স্ত্রীর কাছে একান্ত গোপনে রাখা ছিল।

নৌকার মাঝি ৪/৫ মেইল যাওয়ার পর আর এগুতে সাহস পেল না। সামনে নাকি পাক সেনার আস্তানা। কুমিল্লার একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার নিকট নামিয়ে দিল। কিছুই চিনি না। জানলাম সেখান থেকে মুরাদনগর থানার অধীন বাংগুরা গ্রাম নাকি বেশি দুরে নয়। তখন খোকন মিয়া একই কায়দায় সাহস দিয়ে বলে দিল, কোন ভয় নেই। বাংগুরার চেয়ারম্যান যে তার এক আত্মীয় কথাটা আদৌ হয়তো সত্য নয়। তারপরও ভরসা পেলাম। তারপর সেখান থেকে ৩/৪মাইল পথ বহুকষ্টে পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠলাম বাংগুরার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাসায়। সেখানে আমার পরিচয় গোপন রাখলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বয়স্ক মুসলম লিগ নেতা। তিনি সর্বদা পাকিস্তানের খবর শুনছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আতিথেয়তার ত্রুটি করেননি বিন্দু মাত্র। তাঁর এক ছেলে সেখানকার হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি একটা নৌকা ঠিক করে দিলেন এবং একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুরুব্বিমত লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন, যাতে পথে কোন অসুবিধা না হয়।

সেখানে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা হলাম। কিছুদুর যাওয়ার পর আবার গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। কিন্তু ঐ মুরুব্বিটা লোকটা চেয়ারম্যানের লোক বলায় কোন মতে রক্ষা পেলাম। এমনিভাবে দুর্গম বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে আমরা কোনমতে পাহাড়ি পথ ধরে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম বহুলোক পায়ে হেঁটে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে ভারতে প্রবেশ করছে। ঐ ভারত সীমান্তে আমাত পরিচয় দিয়ে নাম শরণার্থীদের তালিকাভুক্ত করে জীপযোগে রওয়ানা হলাম আগরতলায় - সেখান থেকে ১০/১২ মাইল দুরে। আগরতলায় বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। অনেক পরিচিত নেতা এবং অফিসারদের সাথে দেখা হল। মনে কিছুটা স্বান্তনা অনুভব করলাম।

প্রায় ৩ দিন ৩ রাত আগরতলায় 'বিবেকানন্দ' হোটেলে কাটিয়ে সকালে রওয়ানা হলাম ধর্মনগরের দিকে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বাসযোগে প্রায় ১২৫ মেইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম ধর্মনগর রেল স্টেশনে। সেখানে জয় বাংলার লোকে লোকারণ্য। সবাই ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। রাত ৮ টায় ট্রেন ছাড়ে। কোনমতে এক দালালের সাহায্যে জানালার ফাঁক দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করলাম। বসবার কোন স্থান নেই। লোকের চাপে জীবন যায় যায়। তবু জীবন যায় নি। ঐ ট্রেনে চেয়ে এগোতে লাগলাম। 'জয় বাংলার' কোন লোকই টিকেট কাটে না। আমরাও বিনা টিকেটে রওয়ানা হলাম। কেউ আমাদের কাছে টিকেট চায় নি। লামডিং ও শিলিগুড়িতে ট্রেন বদল করলাম। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে, তিন দিন তিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছালাম শিয়ালদহ স্টেশনে। মনে হলো জীবন ফিরে পেয়েছি। পড়ে লোকাল ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কলকাতায় এসে আমাদের হাইকমিশন ভবনে উপস্থিত হলাম। একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, স্যার আপনি এসেছেন, শীঘ্র আপনার বায়োডাটা ফরমটা পূরণ করুন। দেখলাম দলে দলে লোক বায়োডাটা ফরম পূরণে ব্যস্ত। আমিও আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঐ ফরম পূরনের মাধ্যমে রেকর্ড করলাম। পরে আমার পরিচিত খন্দকার আসাদুজ্জামান (প্রাক্তন সি,এস,পি) ও আরোও কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও এমপির সাথে দেখা হল। তাঁরা আমার আগেই এসে মুজিব নগর সরকারের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। আমাকে দেখে তাঁরা খুব খুশি হলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের সংকল্প দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে সে দিনের মতো বিদায় নিলাম।

এক সপ্তাহ পর আবার কলকাতায় আসলাম বাংলাদেশ হাইকমিশন চত্বরে। অনেক চেনা মুখ পেলাম এবার। আমাদের দেশের অনেক অফিসার, ডাক্তার আর উকিলের সমাগম। সবাই প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে এসেছেন, অনেকেই চাকরির আশায় সেখানে ঘোরাফেরা করছেন। একজন ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, শীঘ্র আমাদের ট্রেজারি অফিসার জনাব মাখনলাল মাঝির (তৎকালীন ই,পি,সি,এস) সাথে দেখা করুন, আপনি কিছু এলাউন্স পাবেন। পকেট শুন্য। কিছু প্রাপ্তি যোগের কথা শুনে মনটা মেতে উঠলো। গেলাম মাখনলাল মাঝির সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, আমার নাকি ২৫০ টাকা প্রাপ্য। যারা মুজিব নগরে সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত নাই, অথচ 'পূর্ব পাকিস্তানে' সরকারি চাকরীতে নিয়োজিত ছিলেন তারা সর্বোচ্চ ৫০০শত টাকার অর্ধেক (অথবা পূর্বে ৫০০টাকার কম বেতন পেলে তার অর্ধেক) এলাউন্স হিসেবে পাবেন। তাই তিনি ২৫০ টাকা গুনে আমার হাতে তুলে দিলেন। টাকা গুলি কিন্তু সব পাকিস্তানি মুদ্রায় দেয়া হল। ঐ গুলি ভারতীয় মুদ্রায় বদল করে নিতে হবে। পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার হার তখন প্রায় এক পর্যায়েই ছিল। টাকা গুলি ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে ফিরে এলাম কৃষ্ণনগরে। যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুজিবনগর সরকারের হাতে অনেক পাকিস্তানী মুদ্রা জমা পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য। অনেক অফিসার ও সংগ্রামী জনতা পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ব্যাংক, ট্রেজারী থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ঐ সরকারের হাতে জমা দেয়। সেই জমাকৃত টাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কিছুদিন অফিসারদেরকে এলাউন্স হিসেবে দেয়া হত। তারপর মে মাসের মাঝামাঝি কি জুনের প্রথম দিকে, পাকিস্তান সরকার ১০০ ও ৫০০ টাকার পাকিস্তানি নোট অচল ঘোষণা করেন। ফলে মুজিবনগর সরকারের নিকট জমাকৃত অনেক নোট অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সনের মে মাসের শেষের দিক। মুজিবনগর সচিবালয় থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এলো আমার নামে, বায়োডাটায় দেয়া কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়। আমাকে অতি শীঘ্র সচিবালয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। সেই মতে পরের দিনই কলকাতায় চলে আসলাম। ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সচিবালয়। সেখানে গিয়ে দেখি তৎকালীন সচিবালয়ের সচিব জনাব নুরুল কাদের খান আগরতলায় ট্যুরে গেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান সাহেব সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে জানলাম তদকালীন মন্ত্রীবর্গের ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা। আমার মতামত পেলে তাঁরা আমাকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগদান করবেন। আমি এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে, সানন্দে মত দান করলাম। কয়েকদিন পর ভারতীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এবং সমগ্র রিলিফ অপারেশন প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনার সুবিধার্থে পদটিকে সচিব হিসেবে আখ্যায়িত না করে রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ফলে রিলিফ কমিশনারকে একদিকে যেমন সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হত, অন্যদিকে আবার রিলিফ অপারেশনের দিকটাও দেখতে হত।

পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বাংলাদেশের ১ কোটি শরনার্থীকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ভারতে। এই এক কোটি জনগোষ্ঠীর ত্রাণকার্য্য পরিচালনা করা সহজ সাধ্য নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রচেষ্টায় এই লোকদের থাকা-খাওয়ার ব্যাবস্থা করতে হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খাদ্য, বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে। মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের সাথে আমার সংযোগ রক্ষা করা এবং ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির গুলিতে যাতে যথাযথ ভাবে পৌছে যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় তার দিকে লক্ষ রাখা। এ ব্যাপারে আমাকে বিভিন্ন ক্যাম্প(শিবির) পরিদর্শন করতে হয়েছে। তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিয়ে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বৈঠকে বসতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের তৎকালীন সচিব মিঃ কলহান ও অতিরিক্ত সচিব মিঃ লুথরা-র নাম উল্লেখ করতে চাই।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও অসহায় শরণার্থীকে তাৎক্ষণিক বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রী জনাব এ এইস এম কামরুজ্জামানের পরামর্শক্রমে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

জনাব মোঃ হোসেন আলী সাহেব ছিলেন তৎকালীন কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার। তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তনান দূতাবাস কর্মীদের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তিনিই বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার হিসেবে কলকাতায় নিয়োজিত হন।

প্রথম অবস্থায় তাঁরই সহায়তায় মুজিবনগর সচিবালয়ের পত্তন হয় কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে। অল্পকিছুদিন পরেই সচিবালয়টি স্থানান্তরীত করা হয় ৮নং থিয়েটার রোডের একটি বড় বাড়িতে। প্রধানত এখান থেকে মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ের কাজ পরিচালিত হত। এখানেই বসতেন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর আলী, পররাষ্ট্র খন্দকার মুশতাক আহমেদ এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান সাহেব। শেষ পর্যায়ে সচিবালয়ের কর্মচারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্থান সংকুলানের জন্য সচিবালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় কালিগঞ্জ এলাকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোডের একটি বড় বাড়িতে।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর সন্তানদের প্রতিদিনের কৃতিত্বের কথা আমাদের সচিবালয়ে প্রতিদিন সরবারহ করা হতো। মাঝে মাঝে ক্যাবিনেট মিটিং বসতো এবং মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমরা পর্যালোচনায় বসতাম। এদিকে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় তাজউদ্দীন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঐ সময় দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেয়া ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসেন এবং পরে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হন।

যখন ভারত সরকার ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন না, তখন অনেকের মধ্যেই হতাশা ও বেদনার সুর লক্ষ করেছি। তারপর ৬ ই ডিসেম্বর সত্য সত্যই যখন ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশ স্বীকৃতি দান করে তখন আমরা সবাই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

এরপর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের জরুরী বৈঠক ডাকা হয় সকাল ১০টায় কলকাতাতে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন একজন ঊর্ধ্বতন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট মিঃ আর গুপ্ত। সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বহু ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব রুহুল কুদ্দুস, নুরুল কাদের খান, খন্দকার আসাদুজ্জামান, আমি নিজে এবং আরো কয়েকজন। সভা চলাকালীন আনুমানিক বেলা ১২টার দিকে হঠাৎ বৈঠক কক্ষের টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

মিঃ গুপ্ত টেলিফোনটি ধরলেন এবং সবার সামনে টেলিফোনের বার্তা জানিয়ে দিলেন - বললেন আপনাদের জন্য শুভ সংবাদ, পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এ সংবাদে আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশে গিয়ে কী কার্যক্রম গ্রহণ করবো, সেই বিষয় নিয়ে অল্প কিছু সময় আলোচনার পর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

এই বৈঠকের পর পরই আমরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সঙ্গে সচিবালয়ে তারঁ কক্ষে গিয়ে মিলিত হই। আমাদের পক্ষে পাক আর্মির আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কাকে ঢাকায় পাঠানো যায় এই নিয়ে জল্পনা হল। আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন, স্যার' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনারই উপস্থিত থাকা উচিৎ। পরে সিদ্ধান্ত হলো, সেনা বাহিনীর এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা উচিৎ একজন মিলিটারী অফিসারের। তখন জেনারেল ওসমানীকে পাঠানোর কথা উঠলো। কিন্তু তিনি যে তখন কলকাতার বাইরে। তৎক্ষণাৎ আমাদের বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমাণ্ড জনাব এ,কে খন্দকার এয়ার ভাইস মার্শাল সাহেব বলে উঠলেন, "স্যার আমি প্রস্তুত আছি।"

তারপর দুপুরে তাঁকে এক বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠানো হল আত্মসমর্পণের সে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারতীয় একটি বিমানযোগে আমাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর স্ত্রী জহুরা তাজউদ্দিন ও অন্যান্যসহ আমি দমদম বিমানবন্দর থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

১ লা জানুয়ারি ১৯৭২ সনে আমি ঢাকায় এসে সচিবের মর্যাদায় বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবেই কাজে যোগদান করি।

মুজিব নগর সচিবালয়ে যারা মুখ্য সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের প্রধান কয়েকজনের নাম হলোঃ

জনাব নুরুল কাদের খান, সেক্রেটারি জেনারেল, এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান, সচিব, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রণালয়; জনাব তৌফিক ইমাম, সচিব, সন্ত্রীপরিষদ; জনাব ডঃ টি হোসেন, সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; জনাব হান্নান চৌধুরী, সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব আবদুল খালেক, পুলিসের ডিআইজি; জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব মামুনুর রশিদ, ডেপুটি রিলিফ কমিশনার; জনাব সাদাত হোসেন, পি এস, ফাইন্যান্স মিনিস্টার; জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, পি এস, ফরেন মিনিস্টার; জনাব কাজী লুৎফুল হক, পি এস, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি; জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী, ডি এস, ফাইন্যান্স; জনাব আকবর আলী। ডি এস; জনাব আহমদ আলী, ডি এস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়,; জনাব মাখন লাল মাঝি, ট্রেজারি অফিসার; ধীরাজ নাথ, পি এস, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী; জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, (আরও অনেকে)।

শেষ পর্যায়ে রুহুল কুদ্দুস সাহেব (প্রাক্তন সিনিয়ার সি, এস, পি) মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদান করেন। কিছু দিনের মধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল পদটি তুলে দিয়ে তাঁকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তখন নুরুল কাদের খান সাহেব শুধু সংস্থাপন বিভাগের সচিব থাকেন।

জেনারেল এডোমিনিস্ট্রেশনে যারা বিভিন্ন জোনে মূখ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের প্রধান কয়েকজনের নাম হলোঃ জনাব ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, জনাব এস, এ সামাদ, জনাব সামছুল হক, জনাব কাজী রফিক উদ্দিন, জনাব বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, জনাব আবদুল মোমেন (আরও অনেকে)।

সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেককেই মন্তব্য করতে শুনি যে যারা মুজিবনগরে গিয়ে চাকরিতে নিয়োগ লাভ করেছেন, তারা মহাসুখে দিন কাটিয়েছেন। তাদের না ছিল সুস্থ থাকার পরিবেশ, না ছিল আর্থিক সংগতি। মন্ত্রী থেকে প্রথম শ্রেণীর সব অফিসার পর্যন্ত সবাইকে দেয়া হত সর্বমোট ৫০০/- টাকা, মাসিক এলাউন্স হিসেবে। তাই দিয়ে অফিসারগণ কোনমতে তাদের পরিবারসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। মন্ত্রীবর্গ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জন্য অবশ্য থাকা-খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা ছিল। সবার সঠিক খবর বলা কঠিন। তবে একান্ত ব্যাক্তিগত হলেও আমি বলতে চাই বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিশেবে নিয়োজিত থাকাকালীন আমি আমার এক পুত্র সমেত ৯৩/এ বৈঠকখানা রোডে এক মেসে এক সীটে থাকতাম। মাসিক ভাড়া ৮ টাকা। কোনমতে কলকাতার মত স্থানে নিজেকে চালিয়ে বাকি টাকা পরিবারের জন্য পাঠাতে হতো। কষ্ট করেছি কম নয়। তবু এ কথা বলবো, আমরা অনেকের চেয়েই ভালো ছিলাম। আমাদের মনে বুকভরা আনন্দ ছিল। দেশকে স্বাধীন করবো। স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ ক’জনের ভাগ্যে জোটে? তাই আমরা ধন্য।

-জয় গোবিন্দ ভৌমিক

জুন, ১৯৮৪



[আমিনুল হক পলাশ](https://www.facebook.com/aminul.hoque.polash?fref=ts)

<১৫,২১,২০৪-০৫>

# [দেওয়ান ফরিদ গাজী]

৭ ই মার্চ থেকে এপ্রিলের ২৮ তারিখ পর্যন্ত আমি সিলেটের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদ গঠন, সেচ্ছাসেবক, আনসার, সাবেক ই,পি,আর, পুলিশ, ছাত্রলীগকর্মীদের সহযোগে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করি। সিলেট শহর, গোলাপগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনায় সম্মুখ অংশ নেই।   
  
মেঘালয়ের করিমগঞ্জে অবস্থানকালে আমি প্রায় ৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত করে তাদের থাকা খাওয়া ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। আমি বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করি। যুদ্ধ পরিচালনা ও জনমত তৈরি প্রভৃতি দায়িত্বও পালন করি। উত্তর-পূর্ব জোনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করি। মিত্রবাহিনী সহযোগে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি স্থানসমূহ একের পর এক দখল করে আমরা দখলকৃত বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং প্রতিটি জায়গায় বেসামরিক প্রশাসন গঠন করি।   
  
গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর এলাকা খান সেনারা সম্পূর্নরুপে বিধ্বস্ত করে এবং সদর থানার উত্তরাঞ্চলও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২৬ শে মার্চ খান সেনারা সিলেট শহরে ত্রিশজনেরও অধিক লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুতুবউদ্দিন, আবদুল মুসাব্বির, পঞ্চা বাবু ও পাচু সেন। নয় মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেরপুরে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজের সাহসিকতা। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজ মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে খান সেনাদের একটা বিরাট বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ সাতদিন ধরে প্রাণপন যুদ্ধ করেন।

-দেওয়ান ফরিদ গাজী

গণপরিষদ সদস্য

(সাবেক এম, এন, এ, সিলেট-৮)

২৪ জুন, ১৯৭৩



[হৃতহৃ ইসলাম](https://www.facebook.com/profile.php?id=100005843262936&fref=ts)

<১৫,২২,২০৫-১৩>

# [দেবব্রত দত্ত গুপ্ত]

১৯৭১ সনের ২৩শে মার্চ পর্যন্ত আমি নোয়াখালীর চৌমুহনী কলেজে অধ্যাপনা করেছি। ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তৎকালীন কিছু স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ হতে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কুমিল্লা শহরে চলে আসি এবং ২৫শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অব্যাহতির পরেই , শহর ছেড়ে কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চুড়লিয়া গ্রামে চলে যাই। গ্রামে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ শেষ করে ১৫ই এপ্রিল’৭১ কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছুসংখ্যক যুবক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বুড়িচং থানার নাইঘর নয়নপুর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগরে গিয়ে পৌঁছি। তারপর বক্সনগর হতে সোনামুড়া হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে যাই এবং সেখানে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ মিশন ও প্রশাসনিক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করি। সে সময় বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক প্রশাসনিক দপ্তর ছিল আগরতলা কৃষ্ণনগর এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একতি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন আগরতলা শহরের ‘কুঞ্জবন’ এলাকায় এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই অবস্থান করতেন আগরতলার গোলবাজারের ‘শ্রীধর ভিলায়’।

যেহেতু আমি অধ্যাপনা জীবনে বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম সুতরাং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক ও অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আমাকে ডঃ হাবিবুর রহমানসহ পূর্বাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনার দায়িত্বের সাথে জড়িত থাকতে অনুরোধ করেন। আমিও এই ধরণের একটি পবিত্র সুযোগের সন্ধানেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সুতরাং সুযোগ যখন এল, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সানন্দে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সময়টা ছিল তখন ১৫ই মে, ১৯৭১ ইং।

১৯৭১ সনের মার্চ মাসে, দেশের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কৃষক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে, হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে, সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ভৌগলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সীমান্তের অবস্থান অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী এবং সহজগম্য। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীগণ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল হতে এই অঞ্চল দিয়ে অতি সহজেই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বনাঞ্চলে এবং গ্রামে, আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান, রাস্তা-ঘাটের দুর্গমতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই অঞ্চলে আগমন করতে উৎসাহিত করেছিল। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতেই পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন লিবারেশন কাউন্সিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করার সাথে সাথে বাংলাদেশ ভেতর হতে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক যুবকদের জন্য ৩ ধরণের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. অভ্যর্থনা কেন্দ্র ( Reception Camp)

২. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ( Youth Training Camp)

৩. সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ( Army Training Camp)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শ্রেনীর যুবকদের মধ্যে যে সব যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে নি বা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুকও নয়, সে সব যুবককে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে , যুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গড়ার সৈনিকরূপে ‘ ভিত্তি ফৌজ’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি স্কীম প্রণয়নের দায়িত্ব তৎকালীন গণপ্রজাতন্তী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলঃ

জনাব ড. হাবিবুর রহমান ওরফে ড. আবু ইউসুফ (যুদ্ধের সময় ডঃ হাবিবুর রহমান, যুদ্ধের সময় ডঃ আবু ইউসুফ, এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন), জনাব মাহবুব আলম, জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত।

উপরোক্ত এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেছেন ড. হাবিবুর রহমান। ড. রহমান স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে তিতাস গ্যাসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের গ্যাস, ওয়েল ও মিনারেল রিসোর্সের ১৯৭৫ সব পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আলম যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ সচিব, স্বনির্ভর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ঠাকুর যুদ্ধের সময় এম, এন, এ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন পরিচালক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ( মুজিব নগর ) একটি ‘ইয়থ ট্রেনিং কন্টোল বোর্ড’ গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মুজিবনগর, পূর্বাঞ্চল (ত্রিপুরা রাজ্যকেন্দ্রিক) ও পশ্চিমাঞ্চলের ( পশ্চিম বঙ্গকেন্দ্রিক ) এই দুইটিই ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট গঠন করা হয়েছিল। তবে, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন কারণে তেমন ‘শক্ত’ এবং ‘মজবুত’ হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। পশ্চিম অঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আহমদ রেজা।

ইয়থ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিলঃ

ক্যাম্প প্রধান (১)

উপ-ক্যাম্প প্রধান (১);

ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ক (২);

ছাত্র প্রতিনিধি (২);

স্বাস্থ্য অফিসার(২);

পলিটেকিলে মটিভেটর (৪);

ফিজিকেল ইনস্ট্রাকটর (৪)।

তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট যে সব ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল, তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করা হলঃ

সর্বজনাব মাহবুব আলম , প্রকল্প সমন্বয়কারী; ড. হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ); অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, এম,এন,এ; জনাব মুজাফফর আহমদ, এম,পি,এ; জনাব খালেদ মুহম্মদ আলী, এম,এন,এ; জনাব বজলুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা; অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত, উপ-পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী; জনাব মোশারফ হোসেন, হিসাব রক্ষণ অফিসার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত কার্যকরম, পরিচালনা ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক নীতি-পদ্ধতির মধ্যে পরবর্তীকালে কিছুটা কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছিল। কিন্তু সে সব পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না।

১। [অভ্যর্থনা কেন্দ্রঃ](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%83) (Reception Centre)   
  
স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল-বিলসহ দুর্গম রাস্তা-ঘাট পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে অতিক্রম করে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় যখন হাজার হাজার যুবক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত, তখন এই সমস্ত রিসিপশন ক্যাম্পের মধ্যে যুবকদেরকে ৭ দিনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এই সময় যুবকেরা বিশ্রাম, খাওয়া, সাধারণ পোশাক, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করত। এইসব ক্যাম্পের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সাধারণত বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তবে, অধিকাংশ দেশেই বাংলাদেশের পক্ষ হতে একজন এম,পি-এ/এম,এন,এ-কে, ক্যাম্প প্রধান/উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হত।  
  
২। [যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3_%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%83) (Youth Training Camp):  
  
অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোতে ৭ দিনের বিশ্রাম, খাওয়া ও চিকিৎসার পর একটি সুনির্দিষ্ট প্রোফরমার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে ইচ্ছুক যুবকদেরকে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ  
  
ক। [পলিটিকেল মটিভেশনঃ](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%83) (Political Motivation):  
  
এই ধরনের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক যুবকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা।   
  
খ। [উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রশিক্ষণঃ](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%93_%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%83) (Base work Training):  
  
এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় সম্পদ, শক্তি ও সঙ্গগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপনাসহ উৎপাদন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দেশের যুবশক্তি কি ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা। তাছাড়া, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে যাতে বাঙালী একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে নিজস্ব সম্পদ , শক্তি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, কর্মপ্রচেষ্টা, ও কঠোর শ্রমের দ্বারা আপাতত শহুরে অর্থনীতি বাদ দিয়ে ( যেহেতু শহরগুলো শ্ত্রুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ) নিজেরাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়াও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।   
  
গ। [হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণঃ](https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%83) (Light Arms training):  
  
এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রশিক্ষণার্থী যুবকদেরকে পি,টি, করানো, ‘গ্রেনেড’ নিক্ষেপ, দেশের ভিতরে শত্রুদের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ‘মাইন’ পোঁতা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ‘গেরিলা’সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামী যুবক, সৈনিক, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য পর্যায়ের লোকদের সাথে গোপন এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগসহ তত্ত্ব এবং তথ্য সরবরাহের কাজে ( রেকি এবং ওপি করা) সহযোগিতা করা ইত্যাদি।   
  
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটা জনযুদ্ধ। সুতরাং এই জনযুদ্ধের প্রধান শক্তির উৎস ছিল দেশের আপামর সাধারণ মানুষ। যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন কারণে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিলাম সুতরাং এই যুদ্ধে দেশের জনগণের সক্তিয় সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। কারণ জনতা হলো ‘পানি’ এবং গেরিলারা হলো ‘মাছ’। সুতরাং পানি দূষিত হলে যেমন মাছ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি জনতার সহযোগিতা না পেলেও ‘গেরিলা’ পদ্ধতির জনযুদ্ধ কোন অবস্থাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের সাধারণ মানুষ, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের গেরিলারূপী দামাল ছেলেদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতা প্রদান করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ ছিল এই দেশের সাধারণ মানুষ।

ভিত্তি ফৌজ ( V.F ) এবং যুব প্রশিক্ষণ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, দেশের ভিতর হতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক ও কৃষকেরা যখন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোওতে উপস্থিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণেই শিবিরে অবস্থানকারী সব শ্রেনীর লোকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া বিদেশে থেকে যেমন এক বিপুলসংখ্যক অস্ত্র প্রার্থীর জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল, তেমনি Arms without command and control-অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, এইসব ধারণায় ভাবান্বিত হয়ে সবাইকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ না দেবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।   
  
যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা পদ্ধতির ছিল সুতরাং কোন অবস্থাতেই *গতানুগতিক আর্মির* সাথে সরাসরি মোকাবেলা করা যুদ্ধ-বিজ্ঞান সম্মত হতো না। দ্বিতীয়ত, একটি যুবককে হালকা (লাইট) এবং মাঝারি ধরনের অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হলেও কমপক্ষে ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী, সব যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এর সময় দেয়া আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত এইসব সমস্যা ব্যতীত তৎকালে অন্যান্য বহুবিধ রাজনৈতিক,প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শগত সমস্যা এবং কারণ ছিল, যার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানকারী সব মানুষকে ‘অস্ত্র’ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন মনে করেননি। সুতরাং ‘অভ্যর্থনা শিবির’ হতে যে সমস্ত যুবককে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রিক্রুট করা হত, সে সব যুবকের মাঝ থেকে একমাত্র তাদেকেরি ‘সামরিক’ প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো যাদের শিক্ষাসহ শারীরিক, মানসিক ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা ছিল। এই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যে হাজার হাজার যুবকজের সরাসরি সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হতো না, সে সব যুবকদের ওপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ‘ভিত্তি ফৌজ’ ( সামরিক ও অর্থনৈতিক ) হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হত। এখানে ‘ভিত্তি’ বলতে মাটিকে এবং ফৌজ বলতে সামজিক চেতনা সম্পন্ন এবং তৎকালে ভিত্তি ফৌজকে দেশের ভিতরে ও বাহিরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য যে আইডেন্টিটি কার্ডের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

**বিপদের আশংকায় নষ্ট কর**

**বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর নির্দেশ পত্র**

**এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নাম................. বয়স.............. পিতা .................. গ্রাম .................... থানা............... জিলা................. কে বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর ............... নং স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে গ্রহুণ করা হইল।**

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অপর নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্বাবলম্বী- কর্মশৃংখলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মুক্তিকামী জীবন যাপন (ও) সমাজ শৃঙ্খলার দূর্গ গঠনের প্রশিক্ষণ নির্দ্দেশ এই কর্মীকে দেওয়া হইল।**

**মোহর বাংলাদেশ মুক্তি পরিষদের পক্ষ হইতে**

**স্বাক্ষর...............................**

**তারিখ..............................**

**যুব অভ্যর্থনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান**

|  |  |
| --- | --- |
| **প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম** | **স্থান** |
| ১। ইছামতি ওয়াই/টি | দূর্গা চৌধুরী পাড়া অঞ্চল |
| ২। একীনপুর ওয়াই/টি | ঐ |
| ৩। বিলুনিয়া ওয়াই/টি | বিলুনিয়া মহকুমা |
| ৪। সাবরুম ওয়াই/টি | সাবরুম |
| ৫। সোনার বাংলা ওয়াই/টি | হাঁপানিয়া |
| ৬। মড়াটিলা ওয়াই/টি | ঐ |
| ৭। মাছিমা ওয়াই/টি | সোনামুড়া মহকুমা |
| ৮। বঙ্গবন্ধু ওয়াই/টি | হাঁপানিয়া |
| ৯। কাঁঠালিয়া ওয়াই/টি | সোনামুড়া মহকুমা |
| ১০। বঙ্গশার্দ্দুল ওয়াই/টি | হাঁপানিয়া |
| ১১। কৈশাশহর ওয়াই/টি | কৈলাশপুর মহকুমা |
| ১২। রাজনগর ওয়াই/টি | উদয়পুর মহকুমা |
| ১৩। যমুনা ওয়াই/টি | হাঁপানিয়া |
| ১৪। বড়মুড়া ওয়াই/টি | সোনামুড়া মহকুমা |
| ১৫। হাতীমাড়া ওয়াই/টি | ঐ |
| ১৬। গোমতী ওয়াই/টি | দুর্গা চৌধুরী পাড়া |
| ১৭। পালাটোনা ওয়াই/টি | উদয়পুর মহকুমা |
| ১৮. শ্রীনগর ওয়াই/টি | বেলুনিয়া মহকুমা |
| ১৯। শীল ছড়া ওয়াই/টি | সাররুম মহকুমা |
| ২০। সোনাক্ষিরা ওয়াই/টি | করীমগঞ্জ মহকুমা |
| ২১। \*হারিমা ওয়াই/টি | বেলুনিয়া মহকুমা |
| ২২। বক্সনগর ওয়াই/টি | সোনামুড়া মহকুমা |
| ২৩। তিতাস ওয়াই/টি | হাঁপানিয়া |
| ২৪।\* বিজনা ওয়াই/টি | ঐ |
| ২৫। ব্রক্ষপুত্র ওয়াই/টি | ঐ |
| ২৬। গোমতী ওয়াই/টি | ঐ |
| ২৭। \*চড়াই লাল ওয়াই/টি | উদয়পুর মহকুমা |
| ২৮। \*গকুল নগর ওয়াই/টি | সদর মহকুমা |
| ২৯। ১ নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প | দুর্গা চৌধুরী পাড়া |
| ৩০। ২ নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প | ঐ |
| ৩১। ৩ নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প | ঐ |

***\* তারকা চিহ্নিত ক্যাম্পগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করে, এক একটি ভাগের নামকরণ বিভিন্ন নদীর নামে করা হয়েছিল।***

**যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে সরাসরি জড়িত এম,পি**

**ও এম, এস\* , এদের নাম**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক ক্যাম্পের নাম** | **স্থানের নাম** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত এম পি এ এবং এম এন এ –দের নাম** |
| **১। গোমতী-২** | **দূর্গা চৌধুরী পাড়া** | **জনাব আমীর হোসেন, এম পি এ** |
| **২। বিজনা** | **ঐ** | **জনাব সৈয়দ এমদাদুল বারী, এম পি এ** |
| **৩। ইছামতি** | **ঐ** | **জনাব জামাল উদ্দিন আহমদ, এম পি এ** |
| **৪। ব্রক্ষ্মপুত্র** | **হাঁপানিয়া** | **জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া , এম পি এ** |
| **৫। তিতাস** | **ঐ** | **জনাব কাজী আকবর উদ্দিন, এম পি এ** |
| **৬। গোমতী-১** | **ঐ** | **জনাব আলী আজম, এম পি এ** |
| **৭। মুনা** | **ঐ** | **জনাব সফীউদ্দিন , এম পি এ** |
| **৮। সোনার বাংলা** | **ঐ** | **জনাব শামসুল হুদা, এম পি এ** |
| **৯। বঙ্গ সারদুল** | **ঐ** | **জনাব দেওয়ান আবুল আব্বাস , এম এন এ** |
| **১০। এম এ আজিজ\*** | **হরিণা** | **জনাব মির্জা আবুল মনসুর, এম পি এ** |
| **১১। হরিনা ওয়াই/সি** | **ঐ** | **জনাব এম এ হান্নান, সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ** |
| **১২। পালাটোনা** | **উদয়পুর** | **ক্যাপ্টেন মুহম্মদ সুজাত আলী, এম এন এ** |
| **১৩। রাজনগর** | **রাজনগর** | **অধ্যাপক এ হানিফ, এম এন এ** |
| **১৪। বড়মুড়া** | **কাঁঠালিয়া** | **জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ, এম পি এ** |
| **১৫। চড়ইলাম-১** | **চড়ইলাম** | **জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ, এম পি এ** |
| **১৬। চড়ইলাম-২** | **ঐ** | **জনাব ওয়ালি উল্লাহ নওজোয়ান, এম এন এ** |
| **১৭। পদ্মা** | **গকুল নগর** | **জনাব এস হক, এম পি এ** |
| **১৮। কৈলাশহর** | **কৈলাশহর** | **জনাব তৈবুর রহীম, এম পি এ** |
| **১৯। আশারাম্বাড়ি** | **খোয়াই** | **জনাব মোস্তাফা শহিদ, এম পি এ** |
| **২০। ধর্মনগর** | **ধর্মনগর** | **জনাব তাইমুজ আলী, এম পি এ** |
| **২১। এম এ আজিজ ওয়াই/সি-২** | **হরিণা** | **জনাব মোশাররফ হোসেন, এম পি এ এ** |
| **২২। চোতাখোলা** | **বিলোনিয়া** | **জনাব এ বি এম তালেব আলী এম, পি,এ** |
| **২৩। মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প** | **ডি সি পাড়া** | **জনাব সিরাজুল ইসলাম, এম, পি, এ**  **জনাব রফিক উল্লাহ, এম পি এ** |
| **২৪। কাঁঠালিয়া** | **কাঁঠালিয়া** | **জনাব আলহাজ আলী আকবর, এম পি এ** |
| **২৫। একীনপুর** | **একীনপুর** | **জনাব মোঃ আঃ সোবহান, এম পি এ** |
| **২৬। পালাটোনা-২** | **উদয়পুর** | **জনাব আবদুল্লা আল হারুন, এম পি এ** |
| **২৭। মনু** | **খোয়াই** | **জনাব মোঃ ইলিয়াস, এম পি এ** |
| **২৮। বাগাফা** | **বিলোনিয়া** | **জনাব আবু নাসের চৌধুরী, এম পি এ** |

***\* তারকা চিহ্নিত ক্যাম্পগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করে, এক একটি ভাগের নামকরণ বিভিন্ন নদীর নামে করা হয়েছিল।***

**প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত ‘ছদ্ম নামে’র তালিকাঃ**

স্বাধীনতা যুদ্ধাকালে, বিশেষত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে, এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম, অবস্থান, কর্মতৎপরতা এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর খবরাখবর কিছুটা শত্রুপক্ষের গোচরীভূত হয়ে পড়ে। ফলে কিছু সংখ্যক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ‘ছদ্মনাম’ ধারণ করতে হয়। নিম্নে যে সব যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে ‘ছদ্মনাম’ ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক** | **পুরাতন নাম** | **স্থান** | **নতুন নাম** |
| ১। | পদ্মা | চড়ইলাম | ক্রিকেট |
| ২। | মেঘনা | ঐ | গলফ |
| ৩। | গঙ্গা | গকুল নগর | টেনিস |
| ৪। | যমুনা | ঐ | হকি |
| ৫। | মুহুড়ী | হরিণা | ফুটবল |
| ৬। | তিস্তা | বিজনা | পলো |
| ৭। | কল্যাণপুর | খোয়াই | সুইমিং |

*\*বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাম্পগুলোর ‘ছদ্ম নাম’ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদনদীর নামানুসারে রাখা হয়েছিল।*

*\*মরহুম জনাব এম, এ আজিজ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁর নাম অনুসারে দু’টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল।*

**যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেসব**

**কর্মকর্তা সরাসরিভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের নামঃ**

ব্রিগেডিয়ার মাস্টার-সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা; ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং- সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা; মেজর সুব্রামননিয়াম- সহকারী পরিচালক, সেন্ট্রাল রিলিফ; ক্যাপ্টেন বিভুরঞ্জন চ্যাটার্জী- চড়াইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; মেজর মিত্র- তত্ত্বাবধায়ক; ক্যাপ্টেন ডি পি ধর- কল্যাণপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন আর পি সিং – গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন এস কে শর্মা- চড়ইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন ডি এস মঈনী- বাগাফা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন জি এস রাওয়াত – গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন নাগ- চোতাখোলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

**যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত ভারত সরকারের**

**বেসামরিক প্রতিনিধিদের নামঃ**

ড. শ্রী ত্রিগুনা সেন, শিক্ষামন্ত্রী (ভারত); শ্রী সচীন্দ্রলাল সিং, মুখ্যমন্ত্রী (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী কে পি দত্ত, পরিচালক, শিক্ষা দপ্তর, (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী মনুভাই বিমানী, বাংলাদেশ এসিস্টেন্স কমিটি (ভারত)।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে একসাথে সাধারণত পাঁচশত থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত যুবককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সর্বমোট প্রায় এক লক্ষ যুবককে প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার যুবকদেওরকে প্রয়োজনীয় সময়। অর্থ, সম্পদ ও উপকরণের অভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয় নি।

**যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সামরিক**

**কর্মকর্তাদের নামঃ**

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ইসলাম – ১নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম- ১নং সেক্টর; মেজর আবদুল মতিন- ১নং সেক্টর; মেজর খালেদ মোশাররফ- ২নং সেক্টর; মেজর সফিউল্লাহ- ৩নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান-৩নং সেক্টর; মেজর সি আর দত্ত-৪ নং সেক্টর।

**প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দঃ\***

জনাব আ স ম আবদুর রব, প্রাক্তন সহ –সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন, জনাব শেখ ফজলিল হক মনি, তৎকালীন যুব নেতা; জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব সৈয়দ রোজউর রহমান, ছাত্র নেতা, কুমিল্লা, জনাব মাইনুল হুদা, ছাত্র নেতা, কুমিল্লা, শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরী, যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র নেতা, নোয়াখালী।

\*এখানে উল্লিখিত বাংলাদেশী সামরিক কর্মকর্তাগণ ব্যতীত আরও যে সব সামরিক অফিসার যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা বিবরণ দাতাদের কাছে না থাকার দরুণ এখানে উল্লেখ করতে পারেন নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

জড়িত বাংলাদেশের ব্যক্তিবর্গের নামঃ

জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এন এ ( চট্টগ্রাম), অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, এম এন এ (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ (দিনাজপুর), প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি; অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এম এন এস (কুমিল্লা), অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, এম এন এ (কুমিল্লা); জনাব এহমদ আলী, এম এন এ (নোয়াখালী), জনাব নুরুল হক, এম এন এ (নোয়াখালী) জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, এম এন এ ( নোয়াখলী), জনাব লুৎফুন হাই সাচ্চু, এম এন এ ( ব্রাক্ষ্ণণবাড়ীয়া), জনাব আলী আজম, এম এন এ ( ব্রাক্ষণবাড়ীয়া), জনাব মুহাম্মদ রাজা মিয়া, এম পি এ ( কুমিল্লা), জনাম মোঃ আবদুল আউয়াল, এম এন এ (কুমিল্লা) , জনাব হাজী আবুল হাসেম এম পি এ (কুমিল্লা), জনাব আবদুর রউফ, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা), জনাব মুহাম্মদ আফজাল খান, রাজনৈতিক নেতা,(কুমিল্লা),জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম, এম এন এ (কুমিল্লা), ফ্লাইট লেফটেনান্ট এ বি সিদ্দিকী, এম পি এ (কুমিল্লা), জনাব খাজা আহমদ, এম এন এস (নোয়াখালী), জনাব আবদুল মালেক উকিল, এম এন এ (নোয়াখালী), জনাব আবদুল করিম বেপারী (মুন্সিগঞ্জ), এডভোকেট হামিদুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া); কর্ণেল আবদুর রব, জনাব এইচ টি ইমাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি, জনাব রকিব উদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন এস ডি ও (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), জনাব এম আর সিদ্দিকী, এম এন এ (চট্টগ্রাম); জনাব সাইদুর রহমান, সমাজকর্মী,(কুমিল্লা), জনাব আবু মিয়া, সমাজকর্মী, নেপোরমা, কুমিল্লা, শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য, সরকারী কর্মচারী, বাংলাদেশ সরকার, ডা. আবদুছ ছাত্তার এম পি এ, জনাব জাবেল আলী মোক্তার (চাঁদপুর), জনাব মকবুল আহমদ এডভোকেট (চাঁদপুর); জনাব মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা); জনাব আমীর হোসেন এম পি এ (কুমিল্লা), জনাব বিসমিল্লাহ মিয়া, এম পি এ (নোয়াখালী), জনাব শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার এম পি এ (নোয়াখালী), জনাব জালাল আহামদ, এম পি এ (কুমিল্লা), অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ, এম পি এ (চট্টগ্রাম), ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম, এম পি এ (চট্টগ্রাম), জনাব মীর্জা আবুল মনসুর, এম পি এ (চট্টগ্রাম) , জনাব আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এ পি এ; ড. এ কে হাসান, আঞ্চলিক প্রশাসক, মুজিব নগর, জনাব মোশারফ হোসেন চৌধুরী, উপ-পরিচালক (একাউন্টস); জনাব গোলাম রফিক, (শিল্পী), জনাব শহীদ কাদরী, প্রোগ্রাম অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব আলোয়ার হোসেন স্তাফ অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব মুকতুল হোসেন, পিয়ন, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব শাহাব উদ্দিন, ড্রাইভার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব আজিত কুমার নন্দি, হিসাব রক্ষক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব সঞ্জীব কুমার রায়, স্টেনোগ্রাফার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনাব গাজী গোলাম মোস্তাফা, রাজনৈতিক নেতা, শ্রী সুখলাল সাহা ( পলিটিক্যাল মটিভেটর) , জনাব আজিজুল হক, সমাজ কর্মী (কসবা), জনাব অহীদ মিয়া, ড্রাইভার, অধ্যাপক আবু আহমদ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), জনাব কুতুবুর রহমান, ছাত্র নেতা।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মাটিতে থেকে আরম্ভ করা সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। এতদসত্ত্বেও বীর বাঙালীরা এবং তাঁদের অকুতোভয় সন্তানেরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সামান্য কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। সুতরাং বাঙালি জাতির ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শ্রমের তাৎপর্যকে বেঁচে থাকা দেশের অবশিষ্ট মানুষগুলো গভীরভাবে উপলদ্ধি করুক, ইহাই বোধ হয় শহীদানের আত্মার একমাত্র আকুতি।

-দেবব্রত দত্ত গুপ্ত

অক্টোবর,১৯৮২



[ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu) এবং [আলিমুল ফয়সাল](https://www.facebook.com/alimul.faisal?fref=ts)

<১৫,২৩,২১৩-২২২>

# [মণি সিংহ]

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগার বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৯ সালের মহান গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি দেশের আনাচে-কানাচে ধ্বনিত করে তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা মুক্তি পাই।

কিন্তু সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর বন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙ্গে আমাকে বের করে নেয়ার আগ পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লিখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগনের রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি যোগ দিতে পারিনি। তবে আমাদের পার্টির তখনকার ভূমিকা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বের করা হয়। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশরুপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬-দফার পক্ষে রায়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙালি জাতির আত্ননিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠানকে নায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ আত্ননিয়ন্ত্রণের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা আরও দেখছিলাম যে আওয়ামীলীগ কেবল "পূর্ব পাকিস্তানের " জনগণেরই সর্বাত্নক সমর্থন পায় নি, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গোটা পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকারও লাভ করেছে। কিন্তু আমরা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং এই শাসকদের মদদকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবে না এবং তা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষত ৬-দফার সঙ্গে ছাত্র সমাজের ১১-দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১-দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পূঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছিল, ফলে তাঁর ঐ নির্বাচনের দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। এ-কারনে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমতাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টর এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাবলী সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ‘৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষনা অনুযায়ী ৩রা মার্চ হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ২৫ শে ফেব্রুয়ারী আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবী হিসেবে ঘোষনা মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্ননিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিসম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রনয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঐ শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবী উত্থাপন করে। সে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে না দেয়া হলে বাংলাদেশের জনগনের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালিদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনের নীটি অনুসারে ঐ সংগ্রামে শরিক থাকা এবং ঐ নিতি অনুসারে সমস্ত গনতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না - এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ঐ দিন জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্নক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

আমাদের পার্টি বেআইনী এবং আত্নগোপনে ছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গনতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যতটুকু যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ছিল তা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নামোল্লেখ না করে আমরা ' একতা ' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম তার মাধ্যমেও আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমরা সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত করে তুলেছিলাম।

১লা মার্চের পর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স এর জনসমাবেশ থেকে "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম " বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধীতা করাকে আমরা যুক্তিসংগত মনে করি নি, কিন্তু আমাদের পার্টির মূল্যায়ন ছিল যে ঐ আলোচনায় কোন অপসরফা হবে না কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরূক রাখার জন্য এবং আসন্ন যেকোন ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকাসহ সম্ভব মতো দেশের সব জায়গায় স্বেছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী প্রগতিশীল সংগঠন " পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন "-এ আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ’ইউ ও টি সি'র- সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং এবং কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল। ডেমরা এলাকার কিছুসংখ্যক শ্রমিককেও আমরা স্বেচ্ছাসেবক করে এ-ধরনের ট্রেনিং-এ যুক্ত করেছিলাম। এ-সব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে উদ্ধুদ্ধ ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। এক কথায় ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। এক কথায়, ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শিক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫শে মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে অবস্থা ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ই মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির উপযুক্ত ও ছিল না। সে পরিস্থিতিতে ২৫ শে মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে, জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষত সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম-পাকিস্তানে ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙালিদের জাতীয় অধিকারের দাবির সঙ্গে ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি হওয়ায় পাকিস্তানে একটা সরকার গঠন এবং বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অবস্থা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা খুব দ্রুত করতে হবে।

সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের আরও একটা দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছেঃ আমরা সচেতন ছিলাম যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতগুলি দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরের জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের সংগঠন শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আমরা অনিবার্য ঘটনা-ধারায় পিছনে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায় ঐ দুর্বলতাগুলো কাটানো প্রয়োজন বলেই তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, ২৫ শে মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করাও প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমন শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-স্বেচ্ছাসেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তাঁরা আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনের সমর্থক ও ইচ্ছুক তরুণদেরও সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং -এর জন্য ভারত যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবারও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী শহরেই ইপিআর এর ক্যাম্প ছিল। পাকবাহিনীর ক্যাম্প ও ছিল। ২৫ শে মার্চ পাক বাহিনী ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে। ই পি আর প্রতিরোধ করে। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু গোলাগুলি জেলখানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মাঝে পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকল এসে আমাকে বলে যে আপনি ডি আই জি -কে বলুন জেলের গেয় খুলে সকলকে মুক্তি দিতে। ডি আই জি বললাম, কিন্তু তিনি রাজি হন না। তখন বন্দীরা সিদ্ধান্ত নেয় জেল ভেঙ্গে বের হবে। বাইরে জনতাও জেল ভাঙ্গা সমর্থন করে। বন্দী ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতাই আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ওপারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে, আমরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি। কারন পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময়ে জেলের ভেতরের বিচিত্র কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারন ঘটনা ছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ডাক দেয়ার পরে ঐ ভাষণ ও ঘোষণার জন্য আমি বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিগ্রাম করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, "আপনি তো টেলিগ্রাম করতে পারবেন না, কারন আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাম পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে। " আমি বললাম, " তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন।" তাঁরা বলল যে, " এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। " পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্নগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল। বিশেষত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশী। অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুই পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগীতায় কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপের (এবং ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেক স্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আইয়ূব-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগীতামূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে আওমী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগীতা তাঁর জন্য মূল্যবান হবে, কেননা আওয়ামী লীগের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিতে স্মরণ করে আমি বলতে চাই যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পেরেছি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষনা করার পরই দেশের ভেতর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমন্ডলীর উপস্থিত সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার কথা ঘোষনা করে। আমাদের পার্টির ঐ প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি বিদেশে সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশ-বিদেশে জনগণ জানতে পারে। আমাদের পার্টির বহু সদস্য সমর্থক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গঠন করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননদের দলের সঙ্গেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরন করলেও ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও আওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্র সম্পর্কে এঁদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভুত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরাসহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামীলীগ কে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে আমরা বিভেদাত্নক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখান করি এবং আওয়ামী লীগসহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রু বলে চিহ্নিত করি।

২৫ মার্চের পড়ে জেল ভেঙে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মীসহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয় একথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভিতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারি নি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫ মার্চের পর সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করেন নি। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেতর থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক আবদুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী সাইফউদ্দিন মানিক, মনজুরুল আহসান খান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাতো থানার রায়পুরায় ঘাঁটি করে অবস্থা করেন। কিছু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকা পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জ সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নেতৃবৃন্দ দেশ থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাঁদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাকবাহিনীর আক্রমন, নির্বিচার গনহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু কর্মী সমর্থক ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসেব অনুযায়ী আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক, কর্মীগন ও তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে ৬ হাজার নরনারী ভারতের পশ্চিমবংগ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা এই তিনটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে গোটা পার্টি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলায় দেশের মাঝে আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্যে আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ভেতরে বাহিরে সকল পার্টির সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা, সংগঠন গুছিয়া নেয়া, এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা সহ অত্যন্ত দুরুহ কাজ পার্টির সামনে ছিল। আমরা নেতা-কর্মীদের সবকিছু হাসিমুখের সাথে সহ্য করা, অসম সাহসিক প্রয়াস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের ফলে অতি অল্প সময়ে আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি। এ পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার ধারাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকের সহায়তায় ভারতের তিনটি রাজ্যে তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা।

খ) দু ধরনের ক্যাম্প ছিল- পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গের আশ্রয়ের জন্যে এবং তরুনদের যাদের লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে।

(গ) ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহন এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুনদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং এ প্রেরণ।

(ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ, ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিং প্রদানে প্রভূত ‘টেকনিক্যাল’ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন সম্ভব হয়।

(ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কলকাতায় কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় গঠন করে কাজ করা।

(চ) আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে দেশের ভেতরে যুদ্ধে পাঠানো।

(ছ) দেশের ভেতরে কমরেডদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও গেরিলাদের সহায়তা প্রদান।

(জ) আমাদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটী কতৃক ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরনার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ও দেশের ভেতর প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুনকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হয়। এছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা আরো ১২ হাজার তরুনকে সংগ্রহ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতে পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুন মুক্তিযোদ্ধাকে যুদ্ধের জন্যে সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এদের অনেকেই লেখাপড়া, চাকরি, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিল না।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে প্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি, ও শত্রু-মিত্র সম্পর্কে একটি দলিল গ্রহন করেছিল। ঐ দলিলে পাকিস্তানের ঐপনিবেশিক শাসন-শোষনের স্বরুপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্যে জনগনের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের প্রধান শক্তি। এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও স্বাধীনতা, গনতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের বন্ধু ও অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করেছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলেই প্রমানিত হয়েছে।

মে মাসের পরেও মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে। যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মাঝে ছড়িয়ে থাকায় তা কষ্টসাধ্য ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় তিনটি রাজ্যেই সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প ছিল। দু ধরনের ক্যাম্প ছিল। পার্টির বয়স্ক সসস্যদের পরিবারবর্গসহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্যে তরুনদের 'ইয়ুথ ক্লাব'।

দেশ থেকে যাওয়ার সময়ে আমাদের কমরেডদের সাথে যে সামান্য অর্থসম্পদ ছিল,তাই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক কমিটি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল।

এছাড়া ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকেরা অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃসংসতা ও বাংগালীদের সাহসিক যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়াময় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা আমাদের কমরেডরা সমন্বিত করে পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুনদের অধিকাংশকেই যেহেতু মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়া হত, তাই খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভেতরে এসে জনগনের সহায়তায় আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করত।

আওয়ামীলীগের সাথে আমাদের কিছু সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। সবিচেয়ে বড় ঐকমত্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশ্নে আমরা একমত ছিলাম।

আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয় নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি হিশেবে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের দৃষ্টিভংগিগত কিছু পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহন ও কার্যকরের মাধ্যমে ভবিষ্যত বাংলাদেশের মডেল জনগনের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম ও ঐ রকম রণকৌশলের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেবল সাধারন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না। মেহনতি মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাং্খা থেকে স্বাধীনতা চাইত। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালী রুপে সংগঠিত হওয়ার লক্ষ সামনে রেখেছিলাম। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারলে সারা দেশের মেহনতি মানুষ আরও উতসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসত। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করার উপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামীলীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামীলীগের একাংশের তরুনদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে পৃথক একটি বাহিনী হবার পর তাদের সংগে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সংগে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিত। এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে পরে একটি কোওর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামীলীগের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কমিউনিস্টরা সবসময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিশেবেই যে কোন জাতির ন্যায্য সংগ্রাম- জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে বস্তুত আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গনহত্যা এবং প্রায় এককোটি ছিন্নমূল নারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহন ইত্যাদি ভারতের জনগনের মাঝে বাংলাদেশের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তারা, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরনার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবিধার সম্মূখীন হয়েছিলেন তা হাসিমুখে আওহ্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার জন্যে অবদান রেখেছে। ভারতের বিরোধী দক্ষিনপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশ এর স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোন কোন প্রশ্নে কংগ্রেস এরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশ এর পক্ষে সিপিআই এর ভূমিকা দ্বারা আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি ২৫শে আগেই আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর কাছে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তায় জন্যে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাবার পর মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত জানানোর সুযোগ গ্রহন করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

সকলেই জানেন যে রণক্ষেত্র থেকে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের টেবিল পর্যন্ত প্রতিবেশী ভারত ব্যাতীত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি ও শান্তির শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়্ব্র একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টিই এপ্রিল মাসে উদ্যোগি হয়ে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারন সম্পাদক রমেশ চন্দ্রেএও সাথে যোগাযোগ করে তার সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশ পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামীলীগের আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন), এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডা: সারোয়ার আলী। এই শান্তি প্রতিনিধিদল ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গনহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। তখন পর্যন্ত কোলকাতা ছাড়া বিদেশের কোথাও বাংলাদেশ সরকারের মিশন গঠিত হয় নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে বিদেশে এমনকি প্রগতিশীল মহলেও নানারকম প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল। বিদেশে পাকিস্তানীদের মিথ্যা প্রচার খন্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগনের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তরপরতা' নয় ও জনগনের ব্যপক সমর্থনপুষ্ট ন্যায্য সংগ্রাম এই কথাও বিদেশে প্রচাররের প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশ এর স্বাধীনতা সংগ্রামকে "মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাংগার জন্যে অন্য দেশের ষড়যন্ত্র" বলেও বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে এইসব ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবার কিছুকাল আগে থেকেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যাতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্ব এর সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়া চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বিশদ চিঠি পাঠানোর এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সকল প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার জন্যে ও অন্য সকল সম্ভাব্য পন্থার জন্যে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাক বাহিনীর গনহত্যা শুরু হবার আগে ১৪ই মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সহ দুনিয়ার প্রায় সকল কমিউনিস্ট পার্টির নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের পার্টির সে চিঠি হতেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থনকারী শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং গনতান্ত্রিক জনগন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারনা পেয়েছিল। এটি বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠায় ও আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গনমাধ্যপমে প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগে বলেছি সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল ২২টি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলন এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে।আমরা বলতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এর পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উদ্যোগ গ্রহন করেছিল, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভূমিকা সুসংহত করতে আমাদের পার্টির অবদানই সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যে একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল সমগ্র জাতির একতা এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষত আওয়ামীলীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এইসব রাজনৈতিক দল সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্ব জনমত ও ভারতের জনমত ও বাংলাদেশের নিকট এরুপ জাতীয় ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাচ্ছিল। আওয়ামীলীগ এ ধরনের জাতীয় ঐক্য গঠনের গুরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশাপাশি কয়েকটি মাওবাদী উপদল আওয়ামীলীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত 'বামপন্থী ফ্রন্ট' এর নামে বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধেই আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথমদিকে কার্যকর হয় নি। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুকাল পরে আওয়ামীলীগ,ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেস এর প্রতিনিধি ও ব্যাক্তিগতভাবে মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি 'পরামর্শদাতা' কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিড়িতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গুরুত্ব ছিল এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহ দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয় নিয়ে ঐ কমিটি দেশের ভেতরে জনগন ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উতসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আমাদের পার্টি ' পরামর্শদাতা কমিটি' গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ঐ কমিটি তেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে নি এবং ঐ ঐক্যের উচ্চতর কোন বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানত গুরুত্ব উপলব্ধি তে আওয়ামীলীগ এর দুর্বলতা ও অনুতসাহ ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত একটি পৃথক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতির সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল আমাদের পার্টির বর্তমান সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এর উপর। আমাদের গেরিলা টিম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার খোদ রাজধানী, রায়পুরা, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুর সহ উত্তরবঙ্গ এর কতেকটি স্থানে আমাদের গেরিলা টিম একশন করেছে এবং আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং এরাই ভারত থেকে আগত গেরিলাদের একশনে সাহায্য করেছিলেন। এখন বয়সের কারনে কোন সময়ে কোথায় কোথায় আমাদের টিম কিরুপ একশন বা লড়াই করেছিল তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা এবং বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় সাধ্যমত সারাদেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচুপর্যায়ে নয়, উচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। ছোটখাটো গেরিলা একশন ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা- চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাকবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

-মনি সিংহ

(বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি

মার্চ, ১৯'৮৪



[রিফাত আহমেদ](https://www.facebook.com/mohammadkausar.ahmed)

<১৫,২৪,২২৩>

# [মনসুর আলী]

অসহযোগ আন্দোলন এর র্পূবেই আমরা খুলনাতে একটা আন্দোলন গড়ে তুলি এবং ৩রা মার্চ সভা শেষ করে একটা মিছিল বের করি। এ মিছিলে পাকবাহিনী গুলি চালায় এবং গুলিতে আজিজুল হক,খালেদসহ আরো কয়েকজন নিহত হয়। গুলির প্রতিবাদে ৫ই মার্চ মিছিল বের করি। পাকবাহিনী এ মিছিলেও গুলি চালায়। দুজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আমরা অসহযোগ আন্দোলন শুরি করি। প্রত্যহ সকাল ১০টায় খুলনা পার্কে আমরা জমায়েত হতাম এবং বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। ১৪ই মার্চ তেরখাদায় একটি সভা করি এবং এখানে একটি হাসপাতাল স্থাপন করি। তাছাড়া এখানে গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। খুলনার অন্যান্য থানায়ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। থানার পুলিশরা ট্রেনিং প্রদান করতো, এভাবে প্রায় ১০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত করা হয়।

২৬শে মার্চ থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রূপসাঘাট, সেনের বাজার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করা হয়। এখানে পাক সৈন্যদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। ১লা এপ্রিল আমি তেরখাদায় চলে আসি। এ সময় আমরা খুলনার সাথে যশোরের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধকরি। ৬ই এপ্রিল সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্ব থানার ওসি সাহেবের কাছে প্রদান করে আমি ভারতের উদ্দেশ্য রওনা দেই। ৭ই এপ্রিল কলকাতায় অবস্থান করি এবং সেখানে আওয়ামীলীগ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করি। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করি। ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে নিজ এলাকায় ফিরে আসি। এ সময় পাক বাহিনী আমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে। ১৩ই মে প্রথমে পাকসেনারা তেরখাদা আক্রমণ করে। ৪ঠা আগস্ট তেরখাদায় রাজাকার, পাঞ্জাবী পুলিশ ও পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের যুদ্ধ হয়। প্রায় ৫৭ জন লোককে পাকবাহিনী হত্যা করে। তবে ছাগলদা, ছাছিয়াদহ, চরকুরিয়া, চুকখোলা প্রভূতি ইউনিয়ন সমূহ যুদ্ধের সময় নিরাপদ ছিল।

৯ই আগস্ট আমি শেষবারের মত ভারত চলে যাই। টেট্যা যুব ক্যাম্পের ২০০ জন যুবকে গেরিলা ট্রেনিং এর জন্য চাকুলিয়া প্রেরণ করি। এ সময় তেরখাদা থানার ভিতরে পতলাতে একটি নতুন থানা স্থাপন এবং নিরঞ্জন সেন নামক একজনকে ওসি নিয়োগ করি এবং একটি স্টিমার নিমজ্জিত করা হয়। ডাকবাংলোতে শান্তি কমটির মিটিং চলাকালে গ্রেনেড চার্জ করা হয়। পাওয়ার হাউজেও আমরা একটি অভিযান চালাই এবং পাকসেনাদের একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেই। এ সমস্ত যুদ্ধ ছাড়াও ৭টি গেরিলাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন সেলিমসহ ৫৫ জন পাকসেনা এবং প্রায় ১০০ রাজাকার ও আলবদর মারা যায়। ইদ্রিস ও কালু নামে দুজন মুক্তিযোদ্ধা এবং রতন, খোকন, মোহাম্মদ ও খোকাসহ আরো ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

পাকবাহিনী আমার এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ছাচিয়াদহ বাজারে ১৩২টি তেরখাদায় ২০০টি সহ সম্পূর্ণ এলাকায় ৩০০০ বাড়িঘর তারা লুট করে এবং পুড়িয়ে দেয়। প্রায় ১৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। এদের মধ্য তেরখাদা কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি সরফরাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। ১৪ই আগস্ট পাকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়।শোনা যায়, প্রথমে তাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বলে। এতে তিনি রাজী না হওয়ায় তার বাম হাতে গুলি করা হয়।এতেও তিনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে রাজী না হওয়ায় তার অন্য হাতে গুলি করা হয়। সবশেষে তাকে একেবারে হত্যা করা হয়।

আমার এলাকার বোরহান উদ্দিন, ফহম উদ্দিন, আব্দুল ওহাব, শামসুল হক শেখ সেকান্দার আলী, নূরুল হক, আবু তালেব, প্রফুল্ল কুমার প্রমুখ নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষভাবে কাজ করেন।

-(ড:মনসুর আলী) সাবেক এম,পি,এ

খুলনা, ২৬ অক্টোবর, ১৯৭২



[রিফাত আহমেদ](https://www.facebook.com/mohammadkausar.ahmed) এবং [অনয়](https://www.facebook.com/Farhan.Tanvir.Chowdhury)

# [মমতাজ বেগম]

২৫ শে মার্চের রাত্রে আমি ঢাকার দীননাথ সেন রোডে ছিলাম। এখানে থেকে ১লা এপ্রিল কুমিল্লায় যাত্রা করি। কয়েকদিন আমি কসবায় অবস্থান করি। এখানে অবস্থানকালে জনসাধারণকে স্বাধীনতা পক্ষে উৎসাহিত করি এবং আনসার ও স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে মেজর বাহার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হতে পালিয়ে প্রাক্তন সৈনিক, ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের একত্রিত করে বাংলাদেশের জন্য একটি সৈন্যদল গঠন করার চেষ্টা করেন। এ সময় আমাদের কিছু সদস্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য একটি সরকার গঠন করার প্রয়োজন পড়ে। ১০ এপ্রিল যখন সরকার গঠন করা হয় তখন সেখানে মহিলা সদস্যদের মধ্যে শুধু আমিই উপস্থিত ছিলাম। পরে সেই সরকার মুজিবনগর ( কুষ্টিয়ার আম্রকাননে) শপথ গ্রহণ করে।

১২ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর নেতৃত্ব আমার ছোট ভাই আজিজ, ফজলু, কদ্দুস, কসবা ছাত্রলীগের সভাপতি কাইউম, দোদুল ও আরো কিছু সংখ্যক ছেলে ইলিয়টগঞ্জ পুল ও কোম্পানিগঞ্জ পুল ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেয়। উক্ত দলটি ইলিয়টগঞ্জ ধ্বংস করতে সক্ষম হয় কিন্ত কোম্পানীগঞ্জ পুল ধ্বংস করা যায় নি।

১৩ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশারফ আমার সাথে যোগাযোগ করেন। পরের দিন অতর্কিত পাকবাহিনী কসবা এসে পড়লে আমরা আগরতলার দেবীপুরে চলে যাই।

আগরতলায় পূর্বের মতোই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করার কাজে সহায়তা করি। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দেবীপুরে (আগরতলা) অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গাফফার ও তার বাহিনীর সহযোগিতায় শালদানদীর খাদ্য মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের সামরিক শিক্ষার জন্য এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের দেশের অভ্যন্তরে কুমিল্লায় খাদ্য আশ্রয় ও চিকিৎসার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিতেও সচেষ্ট ছিলাম। আমরা মহিলাদেরকেও মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্ভৃত করি। তাই 'মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাহানারা হক এই সংগঠনের সভানেত্রী ও ফরিদা মহিউদ্দিন সেক্রেটারি মনোনীত হন। এখানে মেয়েদের নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যও পরিচালনা করি।

চৌদ্দগ্রাম থানা, কোতোয়ালির বৃহৎ অংশ, বুড়িচং, মুরাদনগরের অংশ বিশেষ, কসবা, আখাউড়া কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্যস্থল ও পাকবাহিনীর দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। সে সময় ঘরবাড়ি, মানুষ, রাস্তাঘাট ও যানবাহন ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। কসবা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লালমাই ও লাকসামে বেশ কয়েকটি গণকবর রচিত হয়।

প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে কুমিল্লা পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। রামমালার আনসার বাহিনী ও প্রতিরোধ যুদ্ধে অবর্তীণ হয় ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে। লালমাই স্টেশনের সন্নিকটে কিছু সংখ্যক ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু লোক প্রায় ৫ দিন পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, বুড়িচং, কসবা ও আখাউড়া সর্বাধিক নারী নির্যাতন হয়। আমার কসবাস্থ বাসস্থান বোমাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পাক সামরিক জান্তা বিনষ্ট করে।

যুদ্ধকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে যাওয়ার সময় কর্ণেল এম এ জি ওসমানী আমাদের কসবাস্থ বাসভবনে দুদিন অবস্থান করেন। প্রথম দিকে অবশ্য তাকে আমরা চিনতে পারি নি। কেননা তিনি পরিচয় গোপন রেখেছিলেন এবং তার সু-পরিচিত গোঁফ ছিল না। পরে তাকে চিনতে পারি এবং ভারত যাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করি। পথে এক জায়গায় তাঁকে পাঞ্জাবী মনে করে কয়েকজন মারতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্ত আমার এক আত্নীয় সনাক্তকরণের ফলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

-মমতাজ বেগম

গণপরিষদ সদস্য

( সাবেক এম, এন, এ; মহিলা আসন-৬)

৩০ জুন, ১৯৭৩



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

<১৫,২৬,২২৫-২৭>

# [মোশাররফ হোসেন]

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই আমি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও এক্সপ্লোসিভ যোগাড় করতে থাকি। ২৪শে মার্চ কর্ণফুলী নদীতে অবস্থানরত 'সোয়াত' জাহাজ হতে শেল নিক্ষেপ করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট হতে বাঙালি সৈন্যর একটি দল ক্যাপ্টেন রফিকের অধীনে কুমিরার দিকে যাত্রা করে। ২৫শে মার্চ রাত্রিতে চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলি বিনিময় হয়।  
  
ইতিমধ্যে আমি ও আমার সঙ্গীরা শুভপুর ব্রিজটির আংশিক ক্ষতিসাধন করি। অন্যদিকে চট্রগ্রামের দিকে আসার সময় লোকদিগকে রাস্তায় গাছপালা, ইটপাটকেল ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দেই। ২৬ তারিখ চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক সেনাদের সঙ্গে কুমিরার ক্যাপ্টেন রফিকের দলের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেন সহ অনেক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যায়। পরে মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে আরেক দল বাঙালি সৈন্য কালুরঘাটের দিকে যাত্রা করে।  
  
এদিকে সমস্ত চট্রগ্রাম আমাদের অধীনে চলে আসে। এম, এ হান্নান সাহেব সহ আমি অনতিবিলম্বে কালূরঘাটস্থ চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হই। এবং আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করি। হান্নান সাহেবই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বক্তা এবং তিনি বেলা দেড় ঘটিকার সময় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।  
  
২৬ তারিখ রাত্রে 'সোয়াত' জাহাজ হতে চট্রগ্রাম শহরে অবিরাম গুলিবর্ষণ হয়। আমরা চট্রগ্রাম শহরে ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাওকৃত বাঙালি সৈন্যদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালাই। তখন সমস্ত যুদ্ধব্যবস্থা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন চলতে থাকে। ২৯ শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'Head of State' *(রাষ্ট্রপ্রধান)* এবং নিজেকে 'Supreme Commandar of the Bengali Armed forces' *(বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক)*  ঘোষনা করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের তৃতীয় দিনের মধ্যে চট্রগ্রাম শহরের কিছু কিছু অংশ ব্যতিত সবটুকুই পাক সেনাদের অধীনে চলে যায়। আমরা তখন কালুরঘাট ছেড়ে রামগড়ে চলে যাই। আমাদের অবস্থান আরো দৃঢ় করার জন্য এখানে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। চট্রগ্রাম শহর দখল করেই পাক সেনারা চট্রগ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ৭ই এপ্রিল কালুরঘাটের পতন হয়।  
  
ঢাকা-চট্রগ্রাম রোডে তখন ক্যাপ্টেন শমসের মবিনের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ চলছিলো। অন্যদিকে পার্বত্য চট্রগ্রামে বাঙালি ও পাক সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। সীতাকুন্ডে পাক বাহিনীর সঙ্গে একটি যুদ্ধ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন মবিনের সৈন্য বাহিনী চিনকি আস্তানায় চলে যায়। বাঙালি সৈন্যবাহিনী এরপর মিরেশ্বরাই ব্রিজের ক্ষতিসাধনের জন্য এখানে সমবেত হয়। এপ্রিলের প্রথম দিকে আমাদের সৈন্যবাহিনী এক সপ্তাহ যাবৎ পাক হানাদারদের মোকাবেলা করেছিলো। ১৭ তারিখে ব্রিজ হতে দুরে বাঙালি ও পাক বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। দুটি কনভয় সহ প্রায় ৪০০ জন পাক সৈন্য ধ্বংস হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙালি সৈন্যরা বেলা দুটার মধ্যে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একজন বাঙালি সুবেদার মৃত্যুবরণ করেন এবং দুজন সেপাই আহত হন।  
  
ঐদিন রাত্রেই আমরা মীরেশ্বরাই থেকে সামান্য উত্তরে মোস্তান নগরে ওৎ পেতে থাকি। ১৮ তারিখে পাক সেনাদের সাথে একটি খন্ডযুদ্ধ হয়। এতে প্রায় ৩০/৪০ জনের মতো পাক সৈন্য নিহত হয়। ১৮ তারিখ সন্ধ্যায় ঐ স্থান ছেড়ে বাঙালি সৈন্যরা করেরহাট চলে আসে এবং হিংগুলি ব্রিজটির ক্ষতিসাধন করে। মোস্তান নগর যুদ্ধের পর পাক সেনারা আর বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। তারপর আমাদের সৈন্যরা রামগড় রাস্তার ওপর তুলাতুলি ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়। এদিকে শুভপুর, তুলাতুলি, খাগড়াছড়ি ও ফটিকছড়ি প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ চলছিল এবং ক্রমান্বয়ে পাক সেনারা রামগড় ঘিরে ফেলে। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে সাবরুমে চলে যাই। পরে হরিণাতে গিয়ে একটি Army Camp *(আর্মি ক্যাম্প)*  ও 'Youth Camp' *(যুব ক্যাম্প)*  গঠন করি। উক্ত ক্যাম্পে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তারা বিভিন্ন গেরিলা দলে বিভক্ত হয়ে অপারেশনে চলে যায়।  
  
অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের চাকুরিয়া ট্রেনিং সেন্টারেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অক্টোবরের ১৫ তারিখ হতে নভেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত মীরেশ্বরাই, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম শহর পর্যন্ত স্পেশাল কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে অপারেশনে লিপ্ত ছিলাম। বাকী সময়টুকু হরিণা সেক্টর নং ১, হেডকোয়ার্টারে ছিলাম।  
  
মীরেশ্বরাই থানার করেরহাট ও হিংগুল ইউনিয়ন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখানে পাক সেনাদের হেডকোয়ার্টার ছিলো। ঐ স্থানগুলি সীমান্তের কাছেই ছিলো। প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্র হিসেবে এখানে বহু হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। মীরেশ্বরাই থানার Wireless Station *(ওয়্যারলেস স্টেশন)* এর পাশে সবচেয়ে বেশী হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত লোকদিগকে এখানে আনা হতো এবং বিভিন্ন পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হতো। এখানে আজহারুস সোবাহান নামে এক ব্যক্তি জবাই করতো এবং প্রতি জবাইতে পাঁচটি করে সিকে পয়সা পেতো। এখানে আনুমানিক ৫০০ জনকে হত্যা করা হয়। ওসমানপুর ইউনিয়নে একসাথে ৫ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। হিংগুলি ইউনিয়নেও একসাথে ১০ জনকে হত্যা করা হয়।  
  
মাতবর হাটে আমাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের হেডকোয়ার্টার ছিলো। ইছাখালী ইউনিয়ন, কাঁটাছোড়া, ওসমানপুর, মিঠানালা ও মগাদিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নে আমাদের অবস্থান দৃঢ় ছিলো। এসমস্ত স্থান হতে আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাতাম।  
  
**মিয়াজান ঘাটের যুদ্ধ(জুন/জুলাই)**

ওসমানপুর ইউনিয়নে মিয়াজান ঘাটে ১৮ ঘন্টা ধরে এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানের একজন মেজর ও তিনজন সেপাই প্রাণ হারায়। মাত্র ১৫০ জন সৈন্য নিয়ে শেষ অবধি তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।  
  
**দারোগার হাট বাজারের যুদ্ধ(এপ্রিল/মে)**

কাঁটাচড়া ইউনিয়নের দারোসা বাজার হতে কিছু দুরে মাইন ফাটিয়ে মুক্তিবাহিনী পাক বাহিনীর একটি গাড়ী উড়িয়ে দেয়। মাইন ফাটলে প্রায় ৬ জন পাক বাহিনীর লোক মারা যায়। এরপর এখানে প্রায় ৬ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ হয়। পরে ওরা পিছু হটতে শুরু করে এবং পলায়ন করার সময় কয়েকজন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে হাজী দুলাল মিয়া অন্যতম।  
  
মিঠানালা কমিউনিটি সেন্টার, দূর্গাপুর হাইস্কুল ও আবু তোরাব হাইস্কুলে অবস্থানরত রাজাকার ও পাক বাহিনীর সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালিয়ে উৎখাত করা হয়। এসমস্ত অভিযানে আমাদের মুক্তিবাহিনীর লোকও মারা যায়। দূর্গাপুর হাইস্কুল অভিযানে ফরিদ আহমেদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাক সেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ার সময় হঠাৎ প্রতিপক্ষের একটি বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়।  
  
**হাদি ফকিরের হাটের যুদ্ধ(নভেম্বর)**

শাহ আলমের অধীনে এক প্লাটুন মুক্তিবাহিনী একটি রাজাকার দলকে আক্রমণ করলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রচন্ড আক্রমণে ৭ জন রাজাকার মারা যায়। পরে রাজাকারদের সাহায্যার্থে পাক বাহিনী চলে আসে। পাক সৈন্য আসলে ওদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এবং মুক্তিবাহিনীর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শাহ আলম এক ধান ক্ষেতে আত্মগোপন করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী শেষ অবধি তাকে ধরে ফেলে হত্যা করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।  
  
**বাংলা বাজারের(আগের পাকিস্তান বাজার) যুদ্ধ(মে/জুন)**

জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা বাংলা বাজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীর দলটিকে অতর্কিত হামলা করে এবং ১০ জনকে হত্যা করে। যুদ্ধ চলাকালে মুস্তাফিজুর রহমান বুলেটবিদ্ধ হন।  
  
**তেতুইয়া, তেমোহনী ও আবুর হাটের যুদ্ধ(অক্টোবর)**

পাক বাহিনী উপরোক্ত মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সেন্টার আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ প্রায় দই দিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রধান যুদ্ধকেন্দ্র মাতার হাট পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। প্রধান গেরিলা সেন্টার ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পিছু হটে যেতে হয়েছিলো। পরে প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী বাহিনী মাতার হাট ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষের কিছু লোক আহত ও নিহত হয়।  
  
আবুর হাটে একজন সাধারণ পানের দোকানী দেশ স্বাধীন করার অদম্য এক নজির স্থাপন করেছেন। পাক বাহিনী বাংলাদেশে হানা দেয়ার পাক বাহিনী বাংলাদেশে হানা দেয়ার প্রথম দিকে আবুর হাটের দিকে আসতে শুরু করলে লোকজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত দোকানদার তফাজ্জল হোসেন পাক সেনাদের সম্মুখে গিয়ে কয়েকটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। গ্রেনেড লক্ষ্যবস্তুতে না পড়াতে কয়েকজন পাক সৈন্য আহত হয়।  
  
২৬ শে মার্চ পাক বাহিনী যখন চট্রগ্রামের দিকে আসছিলো তখনা তারা রাস্তার দুপাশের বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বড় তাকিয়া বাজারে উপস্থিত হয়ে পাক বাহিনী লুট ও অগ্নসংযোগ করে। এ সময় এক সাহসী যুবক দা ও লাঠি নিয়ে একজন পাকসেনাকে আক্রমণ করে। তারপর পাকসেনারা তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে।  
  
চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক বাহিনী সীতাকুন্ডে পৌঁছেই লোহাগড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। ১০/১২ জন পাক সৈন্য একটা মেয়েকে ধরে আনে এবং একটা পুকুর পাড়ে এনে উপর্যুপুরি ধর্ষণ করে। মেয়েটি কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিলো, তারপর সে মারা যায়।

-মোশাররফ হোসেন  
গণপরিষদ সদস্য

(সাবেক এমপিএ চট্রগ্রাম)   
১২ জুন, ১৯৭৩



[ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<১৫,২৭,২২৭-২৯>

# [মোহাম্মদ আজিজুর রহমান]

২৪ শে মার্চ আমি ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনীর কয়েকজন সুবেদার ও হাবিলদারের সঙ্গে গোপনে আলাপ করি এবং তাদের উপদেশ দেই পাক অফিসাররা তাদের অস্ত্র জমা দিতে তারা যেনো অস্ত্রগার দখল করে নেন। এতে তারা রাজী হন।

দিনাজপুর ইপিআর বাহিনীর একজন সুবেদার যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই অস্ত্রাগার লুন্ঠন এবং পাক সৈন্যদের হত্যার জন্য আমার এবং জেলা আওয়ামিলীগ সেক্রেটারি অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছে অনুমতি চান। কিন্তু আমরা তার এ প্রস্তাবে রাজী হই নি।

২৫ শে মার্চ রাত প্রায় ১১ টা পর্যন্ত স্থানীয় আওয়ামিলীগ নেতৃবর্গ এবং অবাঙালি বিহারীদের মধ্যে মিটিং হয়। এই মিটিং-এ বিহারীরা শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিহারী বাঙালি ভাই ভাই প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।

২৫ শে মার্চের মধ্যরাতেই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। চারিদিক থেকে 'জয় বাংলা' র প্রভৃতির শ্লোগান ও কানে ভেসে আসে। ভোর পর্যন্ত এই রকম ধ্বনি শুনতে পাই ।

২৬ শে মার্চ সকালে ফজরের নামাজান্তে আমার বাসার সামনে একটি হালকা কামান বসানো দেখতে পাই। পাঞ্জাবী সামরিক কর্মকর্তা আমাদের ডেকে নিয়ে যান এবং তাদের কথামতো কাজ করতে চাপ দেন। তারা আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাদের কথা না শুনলে যে কোন দণ্ড তারা দিতে পারেন। এখান থেকে বাসায় না গিয়ে আওয়ামি লীগের এক নেতার বাসায় চলে যাই। ইতিমধ্যে শহরে কারফিউ জারি হয়ে গেছে ।

২৭ শে মার্চ সকালে দু'ঘন্টার জন্য কারফিউ তুলে নেয়া হয়। এ সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থির হয় দিনাজপুর ইপিআর ৮ম বাহিনীর বাঙালিদের দায়িত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন নজরুল হক এবং ৯ম বাহিনীর দায়িত্বে থাকবেন সুবেদার মেজর আব্দুর রউফ। আর আমি বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবো। ঐ দিন পাক বাহিনী আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। আমি কাঞ্চন নদী পেরিয়ে গ্রামে এক আত্নীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেই।

২৮ শে মার্চ এখানে থেকে ঠাকুরগাঁয়ের ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য রওয়ানা হই।

২৯শে মার্চ ঠাকুরগাঁ পৌঁছি। সেখানেও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। এখানে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন এবং ঠাকুরগাঁ আওয়ামিলীগ নেতাদের সঙ্গে একত্রে কাজ চালিয়ে যাই। সুগার মিলের জীপ নিয়ে দিনাজপুর ৯নং ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ২৯ তারিখেই রওয়ানা হই।

৩০শে মার্চ দিনাজপুরের কাঞ্চন নদীর ঘাটে মুক্তি বাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছে। ঐ দিনই দিনাজপুর ইপিআর ঘাঁটির সব অস্ত্র আমরা লাভ করি। এসব অস্ত্রপাতি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র এবং মুজাহিদদের সহায়তায় কাঞ্চন নদীর পশ্চিমে এক গ্রামে রেখে দিই। এখানে রফিক সাহেব, ফয়েজ সাহেব, নাজিম ভুঁইয়া, জজ, আব্দুল হান্নান চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন নজরুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। ভারতীয় বন্ধুগণ এখানে আমাদের রসদ সরবরাহ করতো।

৩১ শে মার্চ ঠাকুরগাঁ ঘাঁটি আমাদের দখলে আসে। রাত দশটায় আমরা অস্ত্রগারের অস্ত্র নিজেদের অধিকারে আনি। ঠাকুরগাঁ আওয়ামি লীগের সহসভাপতি আবুবকর খানও এই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি শহীদ হন। ঐ রাতেই ঠাকুরগাঁ থেকে একটু দূরে আমাদের ঘাঁটি ও ট্রেঞ্চ বসাই।এ সময় স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের সর্বাত্নক সহায়তা করে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করে। এ সময় ভারতীয় সীমান্ত থেকে কিছু অস্ত্র এবং ওয়ারলেস সংগ্রহ করি। আমি ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় এলাকার দায়িত্ব পালন করি। রেল লাইন অচল করে দেই এবং প্রাক্তন উইং কমান্ডার জনাব মির্জার সঙ্গে পরামর্শ করে শিবগঞ্জ বিমান ঘাঁটি নষ্ট করে দেই। ক্যাপ্টেন নজরুলের দেয়া অস্ত্রসহ আমরা এলাকাব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও সংগঠনে তৎপর হই।

২রা এপ্রিল সীমান্ত পার হয়ে অস্ত্রের জন্য ভারতে যাই। সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সুবেদার কাজিম উদ্দিনকে পাঠিয়ে আমি ঐ তারিখে গভীর রাতে আবার দেশে ফিরে আসি।

৩রা এপ্রিল দিনাজপুরে আমাদের যুদ্ধঘাঁটি পরিদর্শন করি। ঐদিনই দিনাজপুরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আশরাফকে ঠাকুরগাঁয়ে ডেকে পাঠাই এবং মিটিং করে সৈয়দপুর ঘাঁটি আক্রমনের পরিকল্পনা নিই। ৫ই এপ্রিল আমি সেতাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জ ঘাঁটি অভিমুখে রওনা হই। ৬ই এপ্রিল রাতে ভারতে যাই এবং কংগ্রেস নেতা বাবু আর দত্ত এম এন এ - এর সঙ্গে আলাপ করি। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, মিজানুর রহমান, মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গেও সেখানে সাক্ষাৎ হয়।

১৩ ই এপ্রিল দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ফিরি এবং দিনাজপুর শহর উপকণ্ঠে প্রবেশের চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় পাক বাহিনী দিনাজপুরে প্রবেশ করে প্রবল গুলিবর্ষন করে। রাত্রে ক্যাপ্টেন নজরুল হক, সুবেদার মেজর রউফ, ওসমান গণী সাহেবের সঙ্গে ভারত সীমান্তে সাক্ষাৎ হয়। এ সময় রাধিকাপুর স্টেশনে ভারতগামী হাজার হাজার শরণার্থী দেখতে পাই। এখান থেকে বি এস এফ ক্যাম্পে চলে যাই এবং সেখানে অবস্থান করি।

১৯ শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীসহ পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমন করি। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করি। শরণার্থী ক্যাম্পের যুবকদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং স্থাপন করি। আমার সঙ্গে এ সময় দিনাজপুরের জজ, ডাঃ নইম উদ্দিন, ছাত্রনেতা আজিজুল ইসলামও ছিলেন। মুজিবনগর সরকার এবং ভারতীয় বাহিনী আমাদের এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। এ সময় বাংলাদেশ সীমান্তে এমএনএ, এমপিএ-এর দের এক সম্মেলন হয়। আমাকে মুক্তিবাহিনীর ৬নং সেক্টরের বেসামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি এ দায়িত্ব পালন করি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ যুবশিবির, ইসলামপুর, গংগারামপুর, হামজাপুর, বালুঘাট প্রভৃতি যুবশিবির পরিদর্শন করে যুবকদের অনুপ্রাণিত করি এবং উৎসাহ দেই। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। যুবশিবিরে যুবকদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে তাদের বাছাই করে যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যাবস্থা করি। শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে তাদের অবস্থা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করি। পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী বাবু সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করি।

৫ই ডিসেম্বর আমি ভারত থেকে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁও-এ প্রবেশ করি। এখানে বেশ কয়েকদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। ইতিমধ্যে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা দিনাজপুরে স্বাধীনতা উৎসব পালন করি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের নয় মাস আমাদের দিনাজপুর জেলায় পাক বাহিনী অসংখ্য নারী নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা চালায়। ১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী দিনাজপুর শহর পুনর্দখলকালে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। দিনাজপুর শহরের টেলিফোন ভবনে অনেক লোককে হত্যা করা হয়। পীরগঞ্জে ডাঃসুজাউদ্দিন, আওয়ামি লীগের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ও একজন অধ্যাপককে পাক সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সেতাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ তমিজউদ্দিন চৌধুরী, মুনিরউদ্দিন, দিনাজপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক শাহ সুলেমান তৈয়ব পাক সেনাদের গুলিতে শহীদ হন। ঠাকুরগাঁও খানকা শরিফের পীরসাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রকেও তারা হত্যা করে। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আবু বকর খানকে দালালদের সহায়তায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পাক সেনারা তেঁতুলিয়া ও বালিয়াডাংগীতেও অকথ্য অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়।

-মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

গণপরিষদ সদস্য (সাবেক এম, এন, এ)

দিনাজপুর

২৭ অক্টোবর, ১৯৭২



[আলিমুল ফয়সাল](https://www.facebook.com/alimul.faisal?fref=ts)

<১৫,২৮,২২৯-৩২>

# [মোহাম্মদ আজিজুর রহমান]

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা সিলেটে গণআন্দোলন গড়ে তুলি। মূলতঃ ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে আমরা বহুমূখী কর্মসূচী ও আন্দোলনের মাধ্যমে পাক স্বৈরাচার সরকারের বিরোধিতা করি এবং বৃহৎ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকি।   
  
২রা মার্চ পথসভা ও মশাল মিছিল, ৩রা মার্চ হরতাল, ৪ঠা মার্চ মশাল মিছিল, ৫ই ও ৬ই মার্চ হরতাল, ১০ই মার্চ গণসমাবেশ ও মিছিল বের করি।   
  
১১ই মার্চ আমাকে আহবায়ক করে মৌলভীবাজার মহকুমাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।   
  
১২ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন, জনসভা, মিছিল ও কর্মীসভা আরো প্রবলভাবে চলতে থাকে।   
  
২৫শে মার্চ বিকেল ৩ টায় শ্রীমঙ্গল থানার ভৈরববাজার স্কুল মাঠে শ্রমিক সমাবেশে আমি ভাষন দেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানাই। প্রায় ২ হাজার শ্রমিক লাঠি, তীর-ধনুক সহ উক্ত জনসভায় উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই লাঠি উচু করে শত্রুদের প্রতিরোধের শপথ নেয়। সভাশেষে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে দেশের সার্বিকি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়, এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত থাকার সিদ্ধাবত নেয়া হয়। এরপর রাত ১১ টায় আমি মৌলভীবাজার নিজ বাড়িতে চলে যাই।  
  
২৬শে মার্চ ভোর ৪টায় তদকালীন অবাংগালী এসডিও এবং এসপিডিও আমার বাড়িতে আসেন এবং থানায় নিয়ে যান। থানা থেকে আমাকে ব্যোমকেশ ঘোষ বাবুর বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তাকে সংগে করে আমাদের ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউজে বন্দী করে রাখে। এখানে অবাংগালী ও খানসেনারা আমাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার চালায়। ২৭শে মার্চ আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাসায় চলে আসি। ঐ দিন বিকেলে কার্ফু ভংগ করে হাজার হাজার জনতা মৌলভীবাজারের দিকে আসতে থাকে। পাক বাহিনী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কার্ফু ভংগের মিছিলে রোদন মিয়া, ছওমন ঠাকুর, তারা মিয়া ও অজ্ঞাতনামা ৫ জন শ্রমিক শহীদ হন এবং বহু লককে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ তারিখ রাতেই পাক ক্যাপ্টেন আবার আমাকে গ্রেফতার করে রেস্ট হাউজে নিয়ে যায় এবং লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে বেদম প্রহার করে। বহু নিরীহ বাঙালিকে কার্ফু ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করে পাক সেনারা অমানুষিক নির্যাতন করে। রাতে পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার বাঙালিদের চিৎকার শুনতে পেয়েছি। সৈন্যরা রাত ১১ টায় ব্যোমক্যাশ বাবু, গিয়াসনগর চা বাগানের ম্যানেজার এবং আমাকে সিলেট সার্কিট হাউজে বন্দী করে রাখে।  
  
২৮শে মার্চ সকালে কর্ণেল সরফরাজ আমাকে ইন্টারোগেশন করেন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের কে কোথায় আছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সমর্থন আছে কিনা এসব প্রশ্ন করে। আমি কর্ণেলের কোন প্রশ্নের উত্তর না দেয়ায় আমাকে ভেতরের এক কক্ষে নিয়ে গিয়ে ৩ জন খান সেনা একযোগে ভীষন প্রহার করেন। তাদের প্রহারে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে আসলে আমাকে আমার কর্ণেলের সামনে হাজির করা হয় এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার জন্যে চাপ দেয়, আমি তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৯শে মার্চ বেলা ১টায় আমাকে সিলেট সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ৫ই এপ্রিল জেলের ভেতরে থেকেই সিলেট শহরের চারিদিকে গুলির শব্দ শুনতে পাই এবং দুপুরের পর কম করে হলেও তিনবার সিলেট শহরের উপর বিমানহামলে চলে। ব্রাশের শেলের কয়েক টুকরা আমাদের কক্ষে এসে পড়ে। ৬ই এপ্রিল জেলের পূর্ব-উত্তত দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও দক্ষিন-পশ্চিম দিক থেকে পাকবাহিনীর মাঝে তুমুল লড়াই চলে। ঐদিন প্রায় ৮বার পাক বিমান মুক্তিফৌজের ওপর হামলা করে। ঐদিন জেলের সাধারন কর্মীরা বিমান হামলার ভয়ে বাইরে রাখার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কতৃপক্ষের সাথে কাটাকাটি হলে গুলি ছোড়া হয়। আমাদের জেলের দিকে প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। সারারাত ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রক্ষা পাই।  
  
৭ই এপ্রিল খবর পাই মুক্তিবাহিনী শহরের বেশ কিছু অংশ মুক্ত করে নিয়েছে। ২টার সময় দুজন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে সাক্ষাত করে এবং ৫টায় সিলেটের সিরাজ সাহেব আমদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। সন্ধ্যা ৬টায় মানিক চৌধুরী, এম এন এ কর্ণেল রেজা, ও মেজর দত্তের সাথে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন করি।   
  
৮ থেকে ১০ই এপ্রিল ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামে থাকার পর আমি মৌলভীবাজার আওয়ামীলীগ নেতাদের সংগে এক সভায় মিলিত হই।   
  
১২ই এপ্রিল নিম্নোক্ত ব্যাক্তিদের নিয়ে সিলেট জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করা হয়।   
  
১. দেওয়ান ফরিদ গাজী, এম এন এ জেলা প্রশাসক  
২. মোঃ ইলিয়াস, এম এন এ মৌলভীবাজার মহকুমা প্রশাসক  
৩. মোস্তফা আলী, এম এন এ হবিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক  
৪. মাসুদ চৌধুরী, এম এন এ সিলেট সদর মহকুমা প্রশাসক  
৫. জনাব আবদুল হক, এম এন এ সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক  
  
উল্ল্যেখ্য যে, মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে সিলেট থেকে কর্ণেল রব ও মানিক চৌধুরীকে ভারতে প্রেরণ করা হয়।  
  
১২ই এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ চলতে থাকে। এইসব যুদ্ধে প্রধান ঘাটি স্থাপিত হয়। এই ঘাটির দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল রব, কর্ণেল রেজা, মেজর সি আর দত্ত। সিলেট জেলার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে তারা এ ঘাটি থেকে সেনা পরিচালনা করতেন। শেরপুর মুক্তিবাহিনীর ঘাটির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আজিজ। ২৫শে এপ্রিল রাতে ক্যাপ্টেন আজিজ আহত হলে তাকে কালীঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐদিনই শেরপুর সেক্টরের পতন ঘটে।   
  
২৬শে এপ্রিল রাতে প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী এবং ইলিয়াস সাহেবের ওপর মৌলভীবাজার সোনালী ব্যাকংকের সমস্ত টাকা নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেন। ভারতীয় ডেমোলিশন পার্টির এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্যাংকের স্ট্রং রুমের দরজা খুলতে গেলে সমস্ত রুম বিধ্বস্ত হয়। ব্যাংক থেকে ২ কোটি ৫ লাখ ৩ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা আগরতলা ৯১ নং বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এম আর সিদ্দিকী ও কর্ণেল রবের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়। এ অভিযানে ইলিয়াস সাহেব ছাড়াও মানিক চৌধুরী ও মেজর জামান অংশগ্রহন করেন।  
  
২৮শে এপ্রিল মৌলভীবাজার শহর পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়।   
  
২৯শে এপ্রিল আমরা শ্রীমঙ্গল হতে কয়েক হাজার ব্যারেল পেট্রল, ৩০লাখ সিগারেট, কয়েক হাজার মন চাউল, ২৫০টি ট্রাক্টর, ৩০০টি ট্রাক, ২০০ জীপ ও মটরকার বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে নিয়ে যেতে সক্ষম হই।  
  
আমি ভারতের কৈলাশ্বরে অবস্থানকালে ক্যাম্পে পৌছিয়ে দেয়া ও মুক্তিফৌজে ভর্তি করার ব্যাবস্থা করি। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ যোগানোর জন্যে কৈলাশ্বর মুক্তিফৌজ হতে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি, মোজাফফর সাহেব ও সুবেদার চৌধুরী মাঝে মাঝে পাক বাহিনীর ক্যাম্প গুলোতে আক্রমন করতাম। কইলাশ্বরে ভগবাননগরে যুব ক্যাম্প আমি স্থাপন করি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি।   
  
সেপ্টেম্বর মাসে চাতলাপুর হতে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প টিলাবাজারে স্থাপিত হয়। তখন আমাদের ৪ নং সেক্টরে দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল সি আর দত্ত এবং উক্ত সেক্টরের রাজনৈতিক লিয়াজো ছিলেন দেওয়ান ফরিদ গাজী। আমাকে কইলাশ্বর ও ধরমনগরের রাজনৈতিক লিয়াজো অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে চীফ অব স্টাফ কর্ণেল রবকে চেয়ারম্যান এবং ডক্টর হাসানকে প্রশাসনিক ফইসার নিয়োগ করে হবিগঞ্জ জেনারেল কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে ২২ জন যুবককে আমার নেতৃতবে ট্রেনিং করার জন্যে পাঠানো হয়, আমি তাদেরকে ট্রেনিং শেষে কলকাতা হয়ে কইলাশ্বর পাঠিয়ে দেই। এ সময় আমি, মোজাফফর আহমেদ, মেজর জেনারেল কে বি কেশব রাও- এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করি। আমি প্রত্যক্ষভাবে মেরলীচড়া পাক ক্যাম্প, আলীনগর পাক ক্যাম্প, চাতলাপুর বিওপি ইত্যাদি ক্যাম্পে বিভিন্ন সময় আক্রমন করি।  
  
২রা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে সমরেশনগরে আক্রমন করে। ভীশন যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে মেজর গুরুমসহ বেশকয়েকজন মৈত্রীসৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।   
  
৩রা ডিসেম্বর সকালে তৈয়াবুর রহীম এম্পি সহ আমি চাতলাপুর বিওপি ও সমরেশনগর স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। এ সময় ভারতের মুক্তিছড়া থেকে মেজর আনোয়ারুজ্জামানের নেতৃত্বে ৩টি বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী কমলাগঞ্জের থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। তাদের আমি ২০ জন গাইড সংগ্রহ করে দেই।   
  
৪ঠা ডিসেম্বর বিকেলে সিএনসি স্পেশাল ব্যাচ ও মুক্তিযোদ্ধা সহ কড়াইয়াহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার প্রধান ক্যাম্পে এসে যোগ দেই।   
  
৫ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সৈয়দ মহসীন আলীর নেতৃত্বে এক কোম্পানী মুক্তিবাহিনী এসে যোগ দেয় এবং মুন্সিবাজার (কমলাগঞ্জ) পাক বাহিনীর ক্যাম্পে হানা দেয়। যুদ্ধে পাক বাহিনীর পতন ঘটে এবং পাক বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়।   
  
৬ই ডিসেম্বর রাজনগরের তেরকপাশা স্কুলে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিফৌজের কোম্পানীকে রাজনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।   
  
৯ই ডিসেম্বর মৌলভীবাজার আসি। ঐদিন মৌলভীবাজারে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। তৈয়াবুর রহীমকে মৌলভীবাজারের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়।   
  
২০শে ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারী বিদ্যালয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে এক দুঃখজনকি ঘটনা ঘটে। একটি মাইন বিস্ফোরনের ফলে ক্যাম্পের কমান্ডার সহ ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। সৌভাগ্যক্রমে আমি বেচে যাই।   
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুলাউড়া থানার শরীফপুর ইউনিয়নের ১০হাজার লোকের বসতিপূর্ণ অঞ্চল মুক্ত ছিল এবং এ অঞ্চলে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রশাসন চালানো হয়েছিল। প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন তুয়াবুর রহীম এমপি সাহেব। মুক্তিবাহিনী সবসময় এ অঞ্চলে অবস্থান করত এবং পাক বাহিনী কখনও এ অঞ্চল অধিকার করতে পারে নি।  
  
বর্বর পাকবাহিনী যুদ্ধকালে সিলেটে অনেক নির্যাতন চালিয়েছে। শুধুমাত্র মৌলভীবাজারে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ৪০০ নিরীহ মানুষকে পাক-বাহিনী হত্যা করে। ৪-৫ হাজার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। যুদ্ধচলাকালে আমরা হারিয়েছি মুকিত, সহীদ, রানু, সুদর্শন, নরেশ, অরুন, খোকা, কাজলসহ নাম না জানা আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

-মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম, পি, এ) সিলেট

২২ অক্টোবর, ১৯৭৩



[সানজানা এস পায়েল](https://www.facebook.com/sanjana.shaibal)

<১৫,২৯,২৩২>

# [মোহাম্মদ আবদুর রব, মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত]

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আমি এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করি। ১০ই এপ্রিল ভারতে যাই এবং আগরতলা অবস্থান করি। ইস্টার্ন জোনের এক থেকে চারটি সেক্টরের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। এখানে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করি। ভারতে জেনারেল মানেক শা, জেনারেল অরোরা, জেনারেল গিল, জেনারেল সরকার, জেনারেল কালকাট প্রমুখ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। ৭ই মে তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমি মুক্তিবাহিনী ইপিআর-দের নিয়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে অপারেশন চালাই। হবিগঞ্জ থেকে শুরু করে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, শমসের নগর, শেরপুর, সিলেট প্রভৃতি স্থানে প্রতিরধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। পাক বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আমাদের দু'জন সৈন্য শহীদ হয়। অন্যদিকে পাক বাহিনীর ১৫/২০ জন সৈন্য মারা যায়।

পাক বর্বর বাহিনী মাখালকান্দি, জিলুয়া, কাটাখালী, আরিয়ামুগুর, বদরপুর, রাজেন্দ্রপুর, রুমিয়া প্রভৃতি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা মাখালকান্দি গ্রামটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। পাক বাহিনী আমার এলাকায় প্রায় ৫০০ জন লোককে হত্যা করে। শুধুমাত্র মাখালকান্দিতেই ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১০/১৫ জন নারীকে পাক বর্বররা ধর্ষণ করে। তাছাড়া পাক বাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েও অনেক লোকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।“  
  
-আবদুর রব, মেজর জেনারেল (অবঃ)   
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম,পি,এ),

সিলেট ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২।



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

<১৫,৩০,২৩২-৪৪>

# [অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অধ্যাপক]

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (তদানীন্তন জিন্নাহ এভিনিউ) -এর আলফা ইনস্যুরেন্স অফিসের দোতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খাস কামরায় বসে আছি। আরো আছেন রাজশাহীর জনাব কামারুজ্জামান এম, এন, এ সাহেব এবং বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী। মধ্যমণি বঙ্গবন্ধু নিজে। আলোচ্য বিষয় দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। হালকা পরিবেশ। বেলা তখন প্রায় ১০টা। টেলিফোন বেজে উঠলে শেখ সাহেব ধরলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আলাপ করছেন। প্রায় ২/৩ মিনিট পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, এপিপি থেকে ফোন এসেছিলো। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। ভারতীয় সেনা লাহোর শহরের উপকণ্ঠে শালিমার বাগান পর্যন্ত এসেছে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ফ্রন্টেরও কিছু কিছু প্রাথমিক খবর। তিনি বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সব রকমের যোগাযোগ বন্ধ। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপরেই বলে উঠলেন 'দেশটাকে বাঁচানো যায়'। একটা বড় সুযোগ এসে গেছে। 'আমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষনা করে দেই' বলে তিনি কিছুক্ষন থামলেন। যাহোক, তিনি খুবই উত্তেজিত অথচ পরিবেশটা এই আলোচনার উপযুক্ত নয়। হেনা ভাই (কামারুজ্জামান) আমার চোখের দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব বাথরুমে গেছেন। তিনি বললেন যে, নেতা খুবই উত্তেজিত, কথাবার্তা অসংলগ্ন হচ্ছে। তাকে এখান থেকে সরাতে হবে। শেখ সাহেব ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হেনা ভাই এবং আমি উঠে দাড়িয়ে তাকে প্রায় একরকম জোর করে নিচে নিয়ে এলাম। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তার জিপে ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীতে এসেই তাজউদ্দিন সাহেবকে ফোনে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। আমরা মোট চারজন। তাকে আমরা তিনজনই বুঝাতে চেষ্টা করলাম আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি কিন্তু এরকম একটা কাজ করতে যাওয়ার আগে অনেকগুলো দিক খুবই গুরত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে। তবে মনে হয় এখন তার উপযুক্ত সময় নয়। দেশবাসী এটার জন্য প্রস্তুত নয়। এটাই বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা আমি প্রথম শুনতে পাই।  
  
১৯৬৬ সাল। পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা। ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের চলাচল বন্ধ। শ্রীলংকা ঘুরে বিমান ঢাকা-করাচী সংযোগ রক্ষা করছে। ২রা এপ্রিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা মোট ৬ জন যাচ্ছি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করতে। তাসখন্দ ঘোষণার পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতারা ডেকেছেন এই সম্মেলন। আলোচ্য বিষয় তাসখন্দ ঘোষণা জাতীয় স্বার্থকে মারাত্মকভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে। আমাদের জোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়লাভ করেছিলো আইউব খাঁ আলোচনার টেবিলে তা লাল বাহাদুর শাস্রীকে দিয়ে দিয়েছেন। যাহোক আমরা শ্রীলংকা ঘুরে সকালের দিকে করাচী গিয়ে পৌঁছলাম। বিমান বন্দরে হাজার হাজার বাঙালি বঙ্গবন্ধু ও এবং তার দলকে অভ্যর্থনা জানালো। দলের মধ্যে (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (২) তাজউদ্দিন আহমেদ, (৩) আব্দুল মালেক উকিল, (৪) আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, (৫) এবিএম নূরুল ইসলাম এমএনএ এবং (৬) আমি নিজে। সব বাঙালির একটাই প্রশ্ন 'মুজিব ভাই', আমাদের বাঙালীদের কি হবে'। তিনি সবাইকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে বললেন, "দেখ বাঙালি জাতির দাবি তো ন্যায্য দাবী। আমরা পথ খুঁজে পাবই"।   
  
আমরা গিয়ে উঠলাম মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মান বেবীর বাসা বিখ্যাত " লাখাম হাউসে"। সেখানেও সারাদিন বহু লোকের আনাগোনা। বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে। সবারই একই প্রশ্ন এই সংকট উত্তরণের পথ কি? এর মধ্যে দুপুরের আহারের পর শেখ সাহেব আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন এবং বললেন আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু জরুরী আলোচনা আছে। তারপর তিনি সঙ্গে নিয়ে আসা '৬ দফার' কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বের করলেন। আমরা পড়লাম। তিনি আমাদের বিশদ বুঝানোর চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমি বললাম, 'আপনি আমাদের নেতা, বহু দিক বিবেচনা করার পর আপনি এই ৬ দফা প্রনয়ণ করেছেন এবং দেশবাসীর সামনে তা দিতে যাচ্ছেন। মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষ করে পাঞ্জাব এই ৬ দফা মানবে না"। আমি এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলার চেষ্টা করলাম, "এই ৬ দফা যদি অমননীয় হয় তাহলে এটা সরাসরি এক দফার দিকেই চলে যাবে, আমরা কী এর জন্য তৈরী হয়েছি"? প্রায় সবাই একই মত প্রকাশ করলাম। তাজউদ্দিন ভাই মুচকি মুচকি হাসছিলেন। জানি না নেতার সঙ্গে পূর্বে তার এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কি-না। বঙ্গবন্ধু অনেক দিক দিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বললেন, " আজ হোক কাল হোক পূর্ব পাকিস্তানকে একদিন আলাদা হতেই হবে। এরকম কৃত্রিম ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্ন অবস্থা নিয়ে দুটো অংশ কতকাল দাড়িয়ে থাকবে। এটা সত্য কথা যে, আমরা দেশবাসীকে এখনো তৈরী করার কাজে হাত দেইনি। তবে বাঙালীরা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। সংগঠনের মাধ্যমে তা করা যাবে। এরপর লাহোরের সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা হলো এবং আমরা কোন লাইন গ্রহণ করবো তাও তিনি জানিয়ে দিলেন।   
  
এর পরের কথা- পরদিন আমরা লাহোরে গেলাম সরাসরি সম্মেলনস্থলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনের সামনের বিরাট লনে এই সম্মেলনের আয়োজন। নেতাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হলো। আমরা বসলাম। সম্মেলন তখনো শুরু হয়নি। সময় সকাল ৯টা ৩০মিনিট। সাবজেক্ট কমিটির সভা শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু মালেক ভাইকে পাঠালেন সাবজেক্ট কমিটির সভায়। তিনি সেখানে বক্তব্য রাখলেন- এটা যেহেতু জাতীয় সম্মেলন সেহেতু জাতীয় সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমেই এখানে প্রতিফলিত হবে। তাসখন্দ ঘোষনা ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বন্যা, অর্থনৈতিক শোষণ, চাকুরীক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, মারাত্মক বেকার সমস্যাগুলি আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং এগুলো এই সম্মেলনে আলোচিত হবে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রবেশেরও অনেক সমস্যা আছে। সেগুলোও কেনো এখানে আলোচনা করা যাবে না!   
  
কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর যুক্তি হলো- এতগুলো সমস্যা আলোচনা করতে গেলে মূল আলোচ্য বিষয়(তাসখন্দ ঘোষণা) গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সমস্যারই আলোচনা হবে না।   
  
এই কথার পর আওয়ামী লীগের অনমনীয় মনোভাবের ফলে সাবজেক্ট কমিটিতে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ওয়াক আউট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সম্মেলন ত্যাগের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার কাগজপত্র আমাদের হাতে দিলেন বিলি করার জন্য। বিখ্যাত ৬ দফা এভাবেই লাহোরে প্রথম জনগণের হাতে গিয়ে পৌঁছলো। সম্মেলনস্থলের অনতিদূরে মালিক গোলাম জিলানী সাহেবের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমরা সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রায় ৩/৪ শত পশ্চিম পাকিস্তানী, অবশ্য অধিকাংশই আমাদের আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের ধাওয়া করে। আমরা দ্রুত জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম। মালিক জিলানী এবং আজম খান এই দুজন শেখ সাহেবের দুই পাশে দেহরক্ষীর কাজ করেছিলেন।   
  
জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছার পর আর এক দৃশ্য। আসোলে আমরা সকাল থেকে কেউই চা নাস্তা করিনি। অনেক সকালে উঠে করাচী বন্দরে ছুটতে হয়েছিলো লাহোরগামী বিমান ধরার জন্য। আমরা পাশের ঘরে চা খাচ্ছি তখন ভীষণ গোলমালের শব্দ কানে আসে। ব্যাপার কি? জিলানী সাহেব এসে বললেন ৩/৪ শত লোক এসেছে বঙ্গবন্ধুর কাছে। তাদের প্রশ্ন আপনি এত বড় একটা সম্মেলন কেনো বানচাল করে দিলেন এবং এর দ্বারা আপনি বিরোধী দলগুলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্মেলন নষ্ট করে পরোক্ষভাবে কেনো আয়ুব খানকেই সাহায্য করলেন। তারা খুবই উত্তেজিত, বিক্ষুদ্ধ এবং বিশৃঙ্খল ছিলো। পরে অবশ্য তিনি সবার বক্তব্য শোনার পর তার বক্তব্য দিলেন। এক ঘন্টাব্যাপী এই বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানে এবং সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশে নিপীড়িত বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের যে করুণ এবং মর্মান্তিক কাহিনী ব্যক্ত করলেন তা শুনে অনেকেই কেঁদে ফেললেন। বিশেষ করে বেলুচিস্তান এবংসীমান্তের কিছু নেতা বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তুমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নেতা নও, আমাদেরও নেতা। আমাদের কথা কেউই তো সাহসের সাথে এমন করে কোনদিন বলেনি। তারপরও তিনি ৬ দফার উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে ৬ দফা নিয়ে ঝড় উঠতে শুরু করলো।   
  
১৯৬৬ সালের জাতীয় সম্মেলনের শীতকালীন অধিবেশন বসেছে ঢাকায়। আমার একটা প্রস্তাব(Resolution) গৃহিত হলো আলোচনার জন্য। বিষয়বস্তু 'পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আমদানী নীতি'(Separate Import policy for East Pakistan)। আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের উপর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, দুই অঞ্চলের অবস্থা বিশেষ করে বললাম দুই রোগীর জন্য একই প্রেসক্রিপশন চলতে পারে না। এর উপর আলোচনার ঝড় উঠলো। আর তার চেয়েও বেশী ঝড় উঠলো পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোতে। Pakistan Times তো সম্পাদকীয়তে বলেই ফেললো, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আওয়ামী লীগের লোক। আওয়ামী লীগ ৬ দফার মাধ্যমে দেশকে দ্বিখন্ডিত করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। প্রস্তাবটি ভোটে হেরে গেলেও আমরা পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টায় মোটামুটি সফল হয়েছি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জা, খায়ের বক্স মারী, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল সহ বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী এমএনএ এই কথা স্পষ্ট করে আমার কাছে বলেছেন যে, ইনসাফ কায়েম করতে না পারলে চিরদিনের জন্য একটা জাতিকে এভাবে রাখা সম্ভব নয়।  
  
এরপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিব যখন ঢাকা সেনানিবাসে আটক তখন আমরা কয়েকজন প্রত্যেকদিন তার সাথে দেখা করতে যেতাম। অফিসার্স মেসে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতো। কর্নেল এ,বি নাসেরের উপরে দ্বায়িত্ব ছিলো আমাদের মেহমানদারীর। সেখানে প্রায় দিনই নাসেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতো। শেখ সাহেব বলতেন, নাসের! দেখো, মামলায় আমার কি হবে জানি না কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি। দেশের দুই অংশের সম্পর্কটাকে তোমরা এত বেশী নাজুক করে তুলেছো যে যত বেশী টানবে তত শীঘ্র ছিড়ে যাবে।  
  
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নির্বাচনে আমি পার্টির চীফ হুইপ হই। অন্য দুইজন ছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম। ৩রা মার্চ থেকে পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। স্বভাবতই চীফ হুইপ হিসেবে পরিষদ ভবনে সংসদ সদস্যগণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমি খুবই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু সংসদ সদস্য ঢাকায় পৌঁছে গেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নেতা আমাকে তার ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। ঐ বাড়ীতে সব সময় লোকজনের অসম্ভব ভীড়। আমি আসার পরেই গাজী গোলাম মোস্তফা আমাকে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরী রুমে পৌঁছে দিলেন। সেখানে দরজা বন্ধ রেখে বঙ্গবন্ধ আরেকজনের সাথে নিচুস্বরে আলাপ করছিলেন। আমি ঢুকতেই তিনি গাজী সাহেবকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বললেন। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন আলী সাহেব। কোলকাতায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনার। তাদের মধ্যে যা আলোচনা হবার তা পূর্বেই হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সালাম জানিয়ে চলে গেলে নেতা আমাকে বললেন, বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ আলোচনা করে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ওরা সবকিছু সহজভাবে এগিয়ে যেতে দিবে না। হয়তো একটা চরম পরিণতির দিকেই আমরা অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই জন্যই আমি হোসেন আলী সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছি। যদি সেরকম একটা অবস্থার উদ্ভব হয় তার চিন্তা ভাবনা এবং ব্যবস্থা তো আগে থেকে কিছু করে রাখতে হবে। তারপর তিনি আমাকে অন্যান্য প্রস্তুতি কতদূর কি হলো জানতে চাইলে আমি তাকে গৃহিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলাম।  
  
২৪শে মার্চ সকাল ৬টা। বাসার টেলিফোন বেজে উঠলো। দিনাজপুর সদর এসডিও আবদুল লতিফ সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। বাঙালিদের মেরে শেষ করে দিচ্ছে।  
  
এর কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা দেশে একটা থমথমে ভাব। একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন অন্যদিকে আলোচনা চলছিল বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে। উত্তেজিত ফেটে পড়ছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে হঠাৎ সৈয়দপুরে বাঙালি বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হলে তা আমাদের ইস্পিত লক্ষ্যকে আরো দূরে ঠেলে দিবে। আমি ফোন করলাম জিলা আনসার কমান্ডার শরীফুল ইসলাম সাহেবকে। তাকে বললাম রাইফেল ক্লাবে কি কি অস্র এবং গুলি আছে তা খুব তাড়াতাড়ি বের করে আনুন। বেশ কয়েকটি রাইফেল এবং কয়েক কার্টন গুলি নিয়ে এসডিও সাহেবের জীপে এগিয়ে চললাম সৈয়দপুরের দিকে। সৈয়দপুরের কাছাকাছি যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ আমাদের জানালো যে আসলে বাঙালি বিহারী দাঙ্গা নয়। সেনানিবাসের মিলিটারীরা সাদা পোশাকে বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং ইতিমধ্যে তারা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহতাব বেগ, তার পুত্র এবং আরো অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। বুঝলাম উচ্চতর মহলে যতই আলোচনা চলুক আসোলে মিলিটারীরা দেশে একটি বিশৃঙ্খলা ও জঙ্গী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় বা দেশকে আর্মি এ্যাকশনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।  
  
দিনাজপুরে ফিরেই টেলিফোনে শেখ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাকে ব্যাপারটা জানালে তিনি বললেন ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করছে আলোচনা পন্ড করার জন্য। যাহোক তোমরা চেষ্টা করো যাতে সৈয়দপুরের অবস্থা দিনাজপুরে সংক্রমিত না হয়। আমি প্রতিদিনই ঢাকায় তার সাথে যোগাযোগ করে জানবার চেষ্টা করতাম আলোচনার অগ্রগতি এবং ঢাকার অবস্থা। সেদিন জানতে চাইলে তার মনের হতাশা কিছুতেই চাপা থাকলো না।  
  
২৪ এবং ২৫শে মার্চ সারাদিন আমরা কয়েকজন মিলে দিনাজপুর শহরের বিহারী এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম যেনো বাঙালি-বিহারী সম্প্রীতি কিছুতেই ক্ষুন্ন না হয়। ২৫শে মার্চ বিকেলে ইপিআর সেক্টর কমান্ডার তারেক রসুল কোরেশীর সাথে ফোনে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি অবস্থা শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য।  
  
২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পর আমি বাসা থেকে বেরোচ্ছি আওয়ামী লীগ অফিসে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ বাইরের ঘরে ফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধুর সেই ভারী গলা। তিনি দিনাজপুরের অবস্থা জানতে চাইলে সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম ঢাকার কি অবস্থা। তিনি বললেন, মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করো। আরেকবার ঢাকার কথা জানতে চাইলে তিনি আবার বললেন 'সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাবে'। এটা বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য দিন অন্তত দ'এক কথায় ঢাকার অবস্থা তিনি জানাতেন কিন্তু আজ কেনো জানি কিছুই বললেন না ভেবে মনটা আশংকায় দুলে উঠলো। এরপর আওয়ামী লীগ অফিসে কয়েকজন বসে আছি। অনিশ্চিত ও থমথমে অবস্থা। একটু আগেই নিউ টাউন থেকে ফিরেছি। সেখানকার অবাঙালী নেতাদের খুব উদ্ধত মনে হলো অথচ ইতিপূর্বে কতই না বিনয়ের সাথে আমার সঙ্গে বরাবর ভালো ব্যবহার করেছে। যাহোক, রাত তখন ঠিক ১২টা ৩ মিনিট। হঠাৎ গুলির শব্দ। কখনো মনে হয় নিউ টাউন জিলা স্কুলের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলির শব্দ আরো প্রবল হলো। আওয়ামী লীগ অফিসে থাকাটা আমরা নিরাপদ মনে করলাম না। সবাই আপন আপন বাড়ীর দিকে দ্রুত রওয়ানা হলাম। বাসায় এসে মোটর সাইকেলটা রেখে টেলিফোনের কাছে এলাম। ভাবলাম এসপি'র কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি প্রকৃত ব্যাপারটা কি। ফোন তুলেই দেখি লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে থানার দিকে পায়ে হেটে এগিয়ে গেলাম। অতিরিক্ত এসপি,কে পেলাম। তিনিও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু এইটুকু বললেন, মিলিটারীরা ট্রাকে করে বেরিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করে বেড়াচ্ছে। এমনকি জিলা স্কুলের কাছে রাত্রিকালীন পাহারারত পুলিশের গাড়ীর দিকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি!! আরো ধাঁধায় পড়ে গেলাম।  
  
বড় অস্বস্তির মধ্যে ঘুমহীন রাত কেটে গেলো। ভোর রাতে আজানের পরপরই মাইকে প্রচার শুনলাম বেলা ১১টা থেকে কারফিউ। দিনটা ছিলো শুক্রবার।  
  
সকাল সাড়ে সাতটার সময় বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় ডিসির একজন পিয়ন সালাম জানিয়ে আমার হাতে একটা স্লিপ দিলো। তাতে ডিসি (ফয়েজউদ্দিন সাহেব) লিখেছেন আমার বাসায় আমার সঙ্গে চা খেলে আমি খুব খুশি হবো। আমি ৮টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে ভোর বেলায় আমার মা বলেন যে, তিনি রাতে খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। রাস্তায় রাস্তায় কুকুর মানুষের লাশ ছিড়ে খাচ্ছে। সুতরাং সবাইকে নিয়ে তখুনি গ্রামের বাড়ি চলে যেতে চান। কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করে যাই। তাই আমি, আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ মেয়েটি বাদে বাসার সকলেই গ্রামের বাড়িতে চলে গেলো।  
  
বাসা থেকে বেরিয়ে থানার কাছে গিয়ে ওসিকে বললাম ডিসি'র বাংলোয় যেতে হবে কিন্তু যানবাহন তো নেই। এমনিতেই শুক্রবার দোকান-পাট বন্ধ, তার উপর কারফিউ ঘোষণা। এমন সময় অতিরিক্ত এসপি গাড়ী নিয়ে থানায় ঢুকলেন। তিনি বললেন, আমার মনটা কিন্তু সায় দিচ্ছে না যে আপনি ডিসি'র বাংলোয় যান। কারণ পাশেই সার্কিট হাউস। মিলিটারীদের অস্থায়ী হেড অফিস। দেখাই যাক না কি হয় এই মনে করে তার গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়। ডিসি'র বাংলোর গেট বন্ধ, পাশের সার্কিট হাউজের গেট খোলা। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গেটের পাহারাদার সৈনিক এমন অভদ্র এবং কর্কশভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলো যাতে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। গাড়ি বারান্দায় বেশ কয়েকজন মিলিটারী অফিসার। এক পাশে ডিসি। তিনি এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়ে শান্ত স্বরে বললেন আপনি কেনো এলেন? বলেই মুখ ফিরিয়ে আরেকদিকে চলে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! পরে অবশ্য ডিসি আমাকে বলেছিলেন যে অস্ত্রের মুখে তিনি স্লিপটা লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। একটু পরে আরো ২/১ জন আওয়ামী লীগ নেতা আসলো। লেঃ কঃ তারেক রসুল আমাদের নিয়ে বসলেন। তাকে সাহায্য করলেন মেজর তারিক আমিন। কোরেশী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঢাকায় আপনাদের শেখ সাহেব প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপে রয়েছেন। আলাপের ফলাফল যাই হোক না কেনো, ইতিমধ্যে দেশের বৃহত্তম স্বার্থেই সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি, আপনার লোকজনকে জানিয়ে দিন, তারা যেন আমাদের সাথে সহযোগীতা করেন। বলেই তিনি অন্যান্যদের চলে যেতে বললেন কিন্তু আমাকে থাকতে বললেন। মিলিটারী অফিসাররা সবাই উঠে চলে গেলে আমি একাই চুপচাপ বসে আছি। পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে থাকতে বললেন কি আরো কিছু আলাপ করার জন্য নাকি চা খাওয়ানোর জন্য। এই মেজর আর কর্নেল যে কতদিন আমার বাসায় চা খেয়েছে, কত সহজ ব্যবহার করেছে অথচ আজকের ব্যবহারের সঙ্গে তার কত প্রভেদ। আজকে মনে হচ্ছে তারা যেন চিনেই না।  
  
যাক, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। ১১টা থেকে কারফিউ। কারো কোনো পাত্তাই নেই। ভাবছি উঠে চলেই যাব কিনা। একবার উঠেই দাড়ালাম অমনি দরজায় স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটি ভাঙা গলায় হুকুম করলো "বয়ঠো"। কি মুশকিল! তার মিনিট পাঁচেক পরে কোরেশী এসে বললো, "আপনি বাসায় চলে যান। বাসাতেই থাকবেন"। তাকে বললাম ১১টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী, রিকশা পাবার কোনো আশা নেই। দয়া করে তোমার গাড়িতে করে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলে বলতেই সরি বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো। ব্যবহার দেখে তো আমার অবাক হবার পালা। আমি দ্রুত বেরিয়ে হেটে বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। পরে ক্যাপ্টেন নজরুলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছি। নজরুল বাঙালী। তিনি পাশের ঘরেই অসুস্থ বলে মুখে কাপড় ঢেকে শুয়ে ছিলেন। ঘটনাটি ছিলো আমাকে নিয়ে কি করা হবে। ৪/৫ জন মিলিটারী অফিসার কিছুতেই একমত হতে পারছিলো না। মেজর জিলান নামে একজনের মত ছিলো ঝামেলা করে লাভ নেই। এখন রেখে দিয়ে রাতে শেষ করে দেয়া হোক। কর্নেল তারেক রসুল কোরেশীর মত ছিলো সৈয়দপুরের সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হোক। যা করার সেখানেই আজকে রাতের মধ্যে করা যাবে। অথচ ইনিই আমার বাসায় চা খেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী! শুধু মেজর তারিক আমিনের মত হলো আমরা তার সম্পর্কে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাই নি, তাই এখন অন্য কিছু না করে বাসায় অন্তরীণ করে রাখা হোক (অথচ কয়েকদিন আগে ছাত্রদের একটা মিছিলের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার প্রচন্ড বাদানুবাদ হয়েছিলো)। লেঃ দুররানী নামে একজন অফিসার তাকে সমর্থন করে এবং এই দুররানীকেই দ্বায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য।  
  
বাসায় আছি। কারফিউ। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। সামনে দিয়ে কয়েক মিনিট পরপর মিলিটারী টহল। একটা অসহ্য অবস্থা। এর মধ্যেও যতটুকু সম্ভব আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলাম। আমি বিশেষ করে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম ইপিআর'এর সুবেদার মেজর রউফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কারণ বেশ কয়েক মাস বিশেষ করে নির্বাচনের পর থেকেই তার সঙ্গে আমার বহু গোপন বৈঠক হয়েছে। ইপিআর-এ যদিও কিছু বাঙালি অফিসার ছিলো কিন্তু কেন যেন আমি তাদেরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই কারণে সুবেদার মেজর রউফ এবং তার মাধ্যমে দিনাজপুর ও রংপুর একই সেক্টরের অধীনে ছিলো এবং দিনাজপুর ছিলো সেক্টর হেড কোয়ার্টার। এই অবস্থাতেই বাসার পেছনের দিক দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাড়োয়ারী পট্টিতে এক বাসায় তার সাথে আমার সংক্ষিপ্ত আলাপ হলো। আমি শুধু জানতে চাইলাম আমাদের পূর্বপরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা এবং সেই মোতাবেক কাজ করতে কোনো বিশেষ অসুবিধা আছে কিনা। তিনি জানালেন সব ঠিক আছে। তখন সময় ২৬শে মার্চ রাত ৯টা। সিদ্ধান্ত হলো ২৮শে মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করবো। ইতিমধ্যে আমার করণীয় সম্পর্কেও তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমার কাজ ছিলো দিনাজপুর জিলার পশ্চিম সীমান্তের ইপিআর ফাঁড়ি থেকে বাঙালি ইপিআর-দের উপরোক্ত সময়ের পূর্বেই এক জায়গায় জমায়েত করা। বাসায় ফিরেই আমার স্ত্রীকে বললাম আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় অথচ আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব বাইরে চলে যেতে হবে।

সকাল হলো। বাইরের রাস্তায় মিলিটারী টহল। আমি বেলা ৯টার দিকে আমার স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বাসার পিছনের প্রাচীর টপকে রাস্তায় একটা রিকশা নিলাম। রিকশা দ্রুত চালাতে বললাম। প্রথমে যেতে বললাম মুন্সিপাড়া। এই চরম দুর্দিনে জগলু এবং আব্দুর রহীম সাহেবের খোজ নেয়া প্রয়োজন। হঠাৎ রিকশাওয়ালা আমাকে উর্দুতে বললো প্রফেসার সাহেব, আপনি যত শীঘ্র পারেন টাউন ছেড়ে চলে যান। আমি জানি আপনার খুবই বিপদ। এতক্ষণ এদিকে খেয়ালই ছিলো না যে রিকশাওয়ালা অবাঙালি অথচ সে-ই আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরে যেতে বলছে। যাহোক, জগলু এবং রহীম সাহেব নেই। তারা শহর ছেড়ে চলে যেতে পেরেছেন। তারপর শাহ মাহতাবের বাসায় যাই। তাকে আরেক বাসা থেকে খুজে নিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললাম কাঞ্চন ঘাটের দিকে যেতে। সে বললো কাঞ্চন কলোনী এবং কাঞ্চন ঘাটে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। তখন সে এক বাঁধের কাছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করে নদী পাড় হতে বললো। আমি রিকশাওয়ালার দিকে তাকালাম। সে বললো আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন।  
  
বাঁধ পার হতেই দেখি নদীর পশ্চিম পাড়ে ২/৩ হাজার লোক লাঠিসোটা বল্লম ইত্যাদি নিয়ে জড় হয়েছে। ওরা আমার গ্রামের ও তার আশে পাশের লোক। ওরা শুনেছে আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছে। আমাকে আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার জন্যই ওরা সমবেত হচ্ছে। তাও আবার লাঠি-বল্লম নিয়ে মিলিটারীর মোকাবেলা। মনে মনে হাসলাম। আমাকে দেখেই ওরা আনন্দে উত্তেজনায় যেনো পাগল হয়ে গেলো। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষন সইল না। হঠাৎ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ৫/৬ জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। আর দুইজন গুরুতর আহত। বেশ দূরে একখানা জীপ থেকে নেমে আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি। আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু আমারই জন্য কয়েকটা অমূল্য প্রাণ চলে গেল।  
  
এদিকে আমি চলে যাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই টের পেয়ে যায় যে আমি যেভাবেই হোক বাসার বাইরে চলে গেছি। তখনই তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমার খোজে। বিশেষ করেআমার গ্রামের বাড়ি যাবার রাস্তায় কাঞ্চন ঘাটের কাছে যখন আমার সন্ধান পেল তখন আমি কয়েক হাজার লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্যাপারটা আঁচ করতে জীপ থেকে নেমে কয়েক রাউন্ড গুলি করেই তারা চলে যায়। নদী পার হতে সব কাপড় ভিজে গিয়েছিল। ভেজা কাপড়েই কয়েক মাইল হেঁটে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছি। পৌঁছেই প্রথম কাজ হলো কয়েকজন লোককে মোটরসাইকেলে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করা। সেতাবগঞ্জের রউফ চৌধুরীকে লিখলাম তুমি সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের সব ক'টা ট্রাক বিভিন্ন ইপিআর শিবিরে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে নিয়ে রাতের মধ্যে আমার গ্রামের কাছে সমবেত হও। রাত ২/৩ টার মধ্যেই ২/৩ খানা ট্রাক ভর্তি ইপিআর দেওয়াদিঘী হাটখোলায় হাজির। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হলো। তারা সকালের পূর্বেই কাঞ্চন ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে গ্রামের আড়ালে পজিশন নিলো।

২৮শে মার্চ রবিবার। সেই বিশেষ মুহুর্তটি উপস্থিত হলো যার জন্য কয়েক মাস কত গোপন আলোচনা, শলাপরামর্শ উত্তেজনা। বেলা তিনটা বাজার পূর্বে প্রথমেই ৬ পাউন্ডার এর গুলির শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে ঝড় সৃষ্টি হলো যেন। আসোলে অপারেশন শুরু হয়েছে বেলা ২টা থেকেই। কুঠিবাড়ি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যত অবাঙালি ইপিআর জওয়ান এবং অফিসার ছিল তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে শেষ করতে হয়েছে। কারণ গুলির শব্দ হলেই কয়েক শত গজ দূরে অবস্থান গ্রহণকারী মিলিটারীদের কাছে খবর পৌঁছে যেত। ইপিআর-দের টার্গেট ছিলো সার্কিট হাউজের পাশের ময়দান এবং এবং বড় ময়দানের মাঝখানে অবস্থিত অফিসার্স ক্লাব। এগুলোতেই মিলিটারীরা অবস্থান নিয়েছিলো। কিন্তু বিপদ হলো সেখান থেকে গুলি কুঠিবাড়িতে আসছিলো আরো দুটি স্থান থেকে। উপরোক্ত স্থান ছাড়াও রাজবাড়ীর কাঁটাপাড়া এবং সুইহারী ডিগ্রী কলেজের ছাদের উপরেও যে মিলিটারীরা পজিশন নিয়েছিলো সেটা ইপিআর-রা জানতে পারেনি। তিন দিকের গুলির আক্রমণে তারা অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেলো। তখন তারা নতুন একটা কৌশল গ্রহণ করলো। কুঠিবাড়ির পশ্চিম পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে তারানদীর বালুর উপরঅবস্থান নিয়ে সেখান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। এটা মিলিটারীরা টের পেলো না। এসময়ে কাঞ্চন ঘাট, বাইশাপাড়া, কাঞ্চন রেলওয়ে ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে উঁচু লাইনের দু'পার্শ্বের নিচু জায়গায় হাজার হাজার উল্লসিত মানুষের ঢল। তাদের মাথার উপর দিয়ে গোলাগুলি ছুটছে অথচ তার মধ্যেই নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে নদী পার হয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঠিবাড়ির ভিতর। সেখান থেকে অস্রশস্র গোলাগুলির ভারী বাক্সগুলি কয়েকজনে মিলে অনায়াসে নদী পার করে পশ্চিম পাড়ে এনে জমা করেছে। সেখানে গোলাগুলিতে ক'জন লোক নিহত হয়। এ যেন জীবনকে বাজী রেখে মহাল্লোসে মেতে উঠার তীব্র প্রতিযোগীতা। সেখান থেকে রাতের মধ্যে খোশালডাঙ্গা হাটে সব অশ্রশস্র ও মালপত্র এনে জড়ো করা হলো।

এর মধ্যেও শহরের কয়েকটি লক্ষ্যে বিশেষ করে উপশহরে(নিউ টাউনে) গোলা নিক্ষেপ চলতেই থাকে। কারণ মিলিটারী ও অবাঙালি ইপিআর'রা পিছিয়ে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। সারা রাত ব্যাপী গোলাগুলি চলে।

পরের দিনই দুটো ঘটনা ঘটলো। দিনাজপুর শহরের অমিয় কুটিরে সিকিউরিটি সহ মেজর রাজা থাকতো সপরিবারে। তার স্ত্রী কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নেতা জনাব সাদ আহমদ সাহেবের বোন। মেজর রাজা যখন ওয়্যারলেস সেটের সামনে বসে করাচী এবং অন্যান্য স্থানে খবর পাঠানোর চেষ্টা করছিলো ঠিক সেই সময়েই ইপিআর'রা তাকে ধরে নিয়ে আসে এবং দিনাজপুর হেমায়েত আলী হলের সামনে গুলি করে হত্যা করে।

মেজর তারিক আমিন সকাল বেলা ডিসি'র বাংলোয় এসে তার কাছে দেখা করে প্রাণ ভিক্ষা চায় এবং আশ্রয় চায়। অবশ্য ডিসি'র পক্ষে সেই পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব ছিলো না। তার একদিন পরেই শহরের উপকণ্ঠে কসবা এলাকায় নদীর তীরে তাকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। লেঃ কর্নেল তারেক রসুল কোরেশী জনৈক স্থানীয় চেয়ারম্যানের(পরবর্তীতে রাজাকার হিসেবে তাকে কারাগারে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছিলো) সহায়তায় মোহনপুর ব্রীজ পার হয়ে আমবাড়ী দিয়ে রাতের অন্ধকারে পার্বতীপুর পৌঁছে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়। তারপর কয়েকদিনের জন্য কাঞ্চন ঘাট থেকে ২ মাইল পশ্চিমে ভবানীপুরে আফতাবউদ্দিন সরকার সাহেবের বাড়িতে সাময়িকভাবে জিলা সদর স্থানান্তরিত হয় এবং জিলা কর্মকর্তাগণ সেখান থেকেই সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় যতটা সম্ভব সরকারী কাজকর্ম নির্দেশনামা জারী করতে থাকেন।

৩১ তারিখে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(ক) অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী।   
(খ) গোলাম রহমান।   
(গ) এএমআই জেড ইউসুফ এবং   
(ঘ) গুরুদাস তালুকদার- এই ক'জনের নামে একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করতে হবে।

প্রচারপত্র অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের দাবি করা হবে এবং জনগণকে সশস্র যুদ্ধের জন্য আহবান জানানো হবে। এই প্রচারপত্র ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এই সপ্তাহেই কোলকাতা থেকে প্রচারিত দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

এই সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে অবিলম্বে কয়েকটি কাজ করতে হবে। সেগুলি হচ্ছে, ভারতে গিয়ে ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলাদেশের অবস্থানকে তুলে ধরা। বাংলাদেশের অন্যান্য নেতার সঙ্গে সম্ভব হলে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং আমাদের ইপিআর, পুলিশ, আনসারসহ যুদ্ধরত জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় অস্রশস্র সংগ্রহের চেষ্টা করা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি ২রা এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করি। এর পূর্বে দিনাজপুরের ডেপুটি কমিশনার আমার কাছে কিছু নির্দেশ চাইলে আমি তাকে নিন্মলিখিত নির্দেশাবলী দেই।

কোনো অবস্থাতেই কোন ব্যাংকের স্ট্রং রুম থেকে যাতে নগদ অর্থ এবং সোনা রুপা গয়না লুটতরাজ না হয়; প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা না করা; দেশের ভিতরে সীমান্তের কাছাকাছি খাদ্যশস্য মজুদ করা যাতে যুদ্ধরত লোকদের খোরাকীর কোনো অসুবিধা না হয়। অতঃপর আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।   
  
সীমান্তের ওপারেই অবস্থিত রাধিকাপুর ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানান পশ্চিম দিনাজপুর জিলার রায়গঞ্জ মহকুমার পুলিশ অফিসার। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জিলা সদর বালুর ঘাটে। সেখানে এসপির অফিসে দীর্ঘক্ষণ সার্বিক পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের সঙ্গে পাক সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের কৌশলগত দিক এবং বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। অতঃপর এসপি মিঃ হ্যারিস জেমস পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী মহাশয়ের একটি বার্তা আমাকে দেন। ঐ বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অবিলম্বে কলকাতায় পৌঁছে তার সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি পরদিন স্থানীয় কংগ্রেস এমএলএ'র সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছে সরাসরি কংগ্রেস অফিসে যাই। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানান শ্রী অরুণ মৈত্র(পরবর্তীতে পশ্চিম বাংলা কংগ্রসেস প্রেসিডেন্ট)। অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় এবং কিছু আলাপ আলোচনার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৪ ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির" অফিস কক্ষে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা তাদের প্রধান সমস্যার কথা বললেন। বাংলাদেশের কোনো সংবাদই তারা ভালভাবে পাচ্ছেন না। বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত কিছু সংবাদের উপর ভিত্তি করে তারা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারছেন না।

সেই অবস্থায় এই অসুবিধা খুবই স্বাভাবিক কারণ আমাদের পক্ষেও পুরোপুরি বলা সম্ভব ছিলো না বাংলাদেশের কোথায় কী ঘটছে। সব রকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে সেই দিনগুলিতে আমি ছিলাম দেশের দূরতম এক সীমান্ত জিলা দিনাজপুরে। আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অব এমেরিকার দেয়া সংবাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমাদের জানার ছিলো না। তবু এর মধ্যে এই সহায়ক সমিতি একটি অফিস করেছেন এবং কিছু চাঁদা আদায় করে বালুঘাট বেনাপোল সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সাহায্য পৌঁছাচ্ছেন। এই সহায়ক সমিতি সর্বদলীয় ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিলো। অর্থাৎ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিলো এবং ১৯৭১ সালের শেষ পর্যন্ত এই সমিতি আমাদের প্রচুর সাহায্য সহযোগীতা দান করেছিলো। প্রথম দিনই অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মুখ্যমন্ত্রী আমার কাছে তার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, দু তিন দিন আগে বাংলাদেশের দুইজন নেতা তার সঙ্গে দেখা করে দিল্লী চলে গেছেন। তারা তাদের আসোল পরিচয় না দিয়ে দুটি ছদ্মনাম, মাহমুদ আলী ও রহমত আলী বলে চলে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা উপরোক্ত দ'জন নেতা প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছেন। পরে জানতে পারি তারা ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম। শ্রী অজয় বাবু ছাড়াও এই সমিতিতে ছিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রী সন্তোষ রায়, ডাঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র, কংগ্রেসের অরুণ মৈত্র, গোপালপুর কমিউনিষ্ট পার্টির স্বাধীন গৃহ এবং শ্রী বিজয় সিংহ নাহার প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।  
  
আমার থাকার জায়গা তাঁরা করে দিলেন কীড স্ট্রীটের এমএলএ ভবনে। তারপর চেষ্টা চললো নেতৃবৃন্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের। প্রথম দেখা হলো জনাব কামারুজ্জামান সাহেবের সাথে বালিগঞ্জ এলাকার রাজেন্দ্র রোডের নর্দার্ন পার্কের একটি বাড়িতে। পরবর্তীতে জানা গেলো বাংলাদেশ থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য এই বাসাটি সংরক্ষিত ছিলো। বাসাটির তিন তলায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার যন্ত্র ছাড়া যোগাযোগ স্থাপনের অন্যান্য উপকরণ দ্বারাও এটি সজ্জিত ছিলো। এর পরে তাজউদ্দিন সাহেব ফিরে এলেন দিল্লী থেকে। পরপরই এলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ সাহেব। প্রথম দিকে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিলো ১০, লর্ড সিনহা রোডে।   
  
ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা, এমএনএ, এমপিএ কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে ১০নং লর্ড সিনহা রোডেই নেতৃবৃন্দ এবং অনেক এমপিএ, এমএনএ'দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর সরকার ও মন্ত্রীসভার কাঠামো এবং সদস্যগণের নাম ঠিক করা হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকতার রূপ গ্রহণ করে। সেখানেই স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর আমি মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে শপথ পাঠ করাই। শতাধিক দেশী বিদেশী সংবাদ সংস্থার বেতার টেলিভিষন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রথম আইনানুগ আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সরকারের মাধ্যমেই সারা বিশ্বের জনগণের নিকট আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য সহানুভুতি ও সক্রিয় সমর্থন কামনা করা হয়।

এরপরে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয় ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা সপরিবারে থাকেন সিআইটি রোডে আশু বাবুর বাড়িতে। অবশ্য মন্ত্রী সাহেবরা বরাবর থিয়েটার রোডের অফিসে বসতেন। কোলকাতা মিশন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর সেখানে খন্দকার মোশতাক সাহেবের পররাষ্ট্র বিষয়ক অফিস বসে। আর বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে আমাকে সেখানে বসতে হত। বিদেশী চাঁদা ও সাহায্যের সমন্বয় করতেন মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলী। হোসেন আলী সাহেব ও তার স্ত্রী এই মিশন থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন।

কোলকাতায় ফিরে একটি নতুন দুশ্চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করলো। চিন্তা করলাম মুজিবনগরে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠের সংবাদ শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে নয়, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদটি পাক সেনারা কিভাবে গ্রহণ করবে? আমি জানি না এই মূহুর্তে আমার পরিবারের লোকজন কে কোথায়! গ্রামের বাড়ী থেকে আসার সময় শুধু মা এবং স্ত্রীকে বলে এসেছিলাম "যাচ্ছি" । কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরবো, আদৌ ফিরতে পারবো কিনা সে মূহুর্তে এই চিন্তার করার অবকাশ একেবারেই ছিল না। শরীরের কোনো স্থান কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হয় না, হয় পরে। ঠিক তেমনই, সেই সময় এই চিন্তা আমাকে ভীত ও আতংকিত করে তুললো। কামরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারও একই অবস্থা। আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক অশোক বাবু তার গাড়ী এবং কিছু পথখরচ আমার হাতে দিলেন। আমি এবং হেনা ভাই (কামরুজ্জামান সাহেব) রওয়ানা হলাম আপন আপন পরিবারের সন্ধানে ২০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে। রাতে এসে পৌঁছলাম কৃষ্ণনগর ডাক বাংলোয়। সেখানে শুরু হল ঝড় বৃষ্টি। মনে ভীষণ অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা। বাইরে দুর্যোগের রাত। সেখানেই মধ্যরাতে আমাদের কাছে এসে পরিচয় দিয়ে দেখা করলেন চুয়াডাংগার আওয়ামী লীগ নেতা এবং একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আসহাবুল হক। তার সাথে প্রায় সারারাত ব্যাপী আলোচনা হলো পশ্চিম সেক্টরের যুদ্ধের কথা। বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দিয়ে আমরা পরদিন সকালে রওয়ানা হলাম। মুর্শিদাবাদ জিলার 'ভাবতা' নামক স্থানে হেনা ভাইয়ের পরিবারের সবারই খোজ পাওয়া গেলো। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমার অবস্থা!! পরদিন বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির আমরা পরিদ্শন করলাম। পরিদর্শন মানে উদ্বাস্তুদের দুঃখ এবং সর্বনাশের করুণ কাহিনী শোনা। পরদিন পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এসে আমরা রাধিকাপুর ও ডালিমগাঁও উদ্বাস্তু শিবিরে যাই। দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনার অনেক নেতার সাথে দেখা হলো সেখানে। স্থির হলো ১লা মে তারিখে বেলা ১০ টায় রাধিকাপুর প্লাটফর্মে আমরা সকলে মিলে সভা করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। ইতিমধ্যে খোজ পেয়ে গেলাম আমার পরিবারের। রায়গঞ্জ শহরে এক বারান্দায় পেলাম আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের। ছেলে দুজন সেখানে ছিলো না। তারা সীমান্তের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। এরা কি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়দিনে কত দুঃখ দুর্গতির মধ্যে দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার কাহিনী শুনলাম। তবে অনেক পরিবারের বুকফাটা কাহিনীর তুলনায় এ আর কতটুকু!

পরদিন ১লা মে তারিখে গেলাম রাধিকাপুরে সভা করতে। গিয়েই শুনলাম এক শিবিরে এক বৃদ্ধা মরণাপন্ন। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটু দেখতে চায়। এদিকে সভার সময় হয়ে গেছে। তবুও গেলাম মৃত্যুপথযাত্রীকে শেষবারের মত দেখতে। ঠিক বেলা ১০টায় যখন সভা অনুষ্ঠানের কথা ছিলো তখন আমি শিবিরে। ১০টা ১৫ মিনিটের সময় সীমান্ত থেকে পাক সৈন্যরা শেলিং শুরু করলো। টার্গেট আমাদের সভাস্থল। তারা বোধহয় পূর্বাহ্ণেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। রাধিকাপুর ষ্টেশন ঘরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল এবং কয়েকজন লোকও মারা গেলো। সেখানে ঐ সভার নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ে, উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিই বিশেষ গুরুত্বলাভ করলো। অনেক সশস্র মুক্তিযোদ্ধা সেই সভায় উপসথিত ছিলেন তাদের জন্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া, অস্র ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  
  
দুই তিন দিন পর ফিরে গেলাম কোলকাতায়। সেখানে একটা যোগাযোগের অফিসের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভুত হচ্ছিলো। মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রচেষ্টায় ৩/১ ক্যামাক স্ট্রীটে অফিস ঘর পাওয়া গেলে। আমি সেই অফিসের দ্বায়িত্ব নিলাম। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন ব্যারিষ্টার বাদল রশিদ। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে এটাই সর্বপ্রথম সংযোগ রক্ষাকারী অফিস। ক্যামাক স্ট্রীটে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ৪৫ প্রিন্সেস স্ট্রীটে অফিস স্থানান্তর করা হয়। আমাকে তখন দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান সাহেব। আমি অনারারী মহাসচিব। আমাদের সহায়তা করার জন্য এই অফিসেই বসতেন সর্বজনাব আব্দুল মালেক উকিল, মোঃ সোহরাব হোসেন, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ব্যারিষ্টার বাদল রশিদ ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।  
  
এই মন্ত্রনালয়ের অধীনে যুব অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হলো। এগুলির কাজ ছিলো সীমান্ত অতিক্রম করে আসা যুবকদের জন্য আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্লাস নেয়া, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য পিটিসহ অন্যান্য শারীরিক কসরত ও হালকা অস্র পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া। ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মোটিভেটর নিয়োগ, তাবু বিছানা বালিশ, কাপর চোপর, রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম ও নিয়মিত রেশন সরবরাহ করতে হয়েছে। শিবির পরিচালকও আমরা নিয়োগ করতাম। মহাসচিব হিসেবে আমাকে এই শিবিরগুলিতে অর্থসহ যাবতীয় সরবরাহ প্রথমে সরাসরি এবং জোনাল কাউন্সিলের মাধ্যমে করতে হতো।

এছাড়াও আমাদের দায়িত্ব ছিলো সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু শিবিরগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারত সরকার সহ বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র এবং সাহায্যদাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা। উদ্বাস্তুদের কার্ড ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হতো। মূল কথা, যেহেতু এই সময় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, শিল্পি, সরকারী কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের উদ্বাস্তুদের রিলিফের প্রয়োজন ছিলো সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই অফিসকে সবদিকেই দৃষ্টি রাখতে হতো।  
  
যুব অভ্যর্থনা শিবির ছাড়াও তৎকালীন সশস্র বাহিনী, ইপিআর, আনসার মুজাহিদ যারা প্রথম থেকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিলেন(কারণ তারা ছিলেন শিক্ষাপ্রাপ্ত তাই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো না) তাদের শিবিরগুলির দায়িত্বও আমাদের মন্ত্রীকে নিতে হয়েছে। তাদের কাপর চোপর, খাওয়া দাওয়াসহ যাবতীয় সরবরাহ আমাদেরকেই করতে হয়েছে। এরপর এসেছে যুব শিবির প্রকল্পটির ধারণা। এর মূল উদ্ভাবক ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুনা চরণ সেন। স্থির হলো যুব অভ্যর্থনা শিবির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বাছাই করে এই যুব শিবিরে আনতে হবে। সেখানে উচ্চতর মোটিভেশন সহ মাঝারি ধরনের অস্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেখান থেকে সরাসরি তাদেরকে অস্র দিয়ে গেরিলা হিসেবে দেশের ভিতরে প্রেরণ করা হবে কিংবা কেউ যদি আরো উচ্চতর ভারী অস্রের প্রশিক্ষণ নিতে চায় তাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির নামে আরো কয়েকটি শিবির স্থাপন করা হবে। এসব যুব শিবির সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এগুলোতে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ। এগুলির পরিচালনা ও নিয়োগের জন্য গঠন করা হয় 'Board of control youth camps'। আমাকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সদস্য ছিলেনঃ

(১) ডঃ মফিজ চৌধুরী।  
(২) ক্যাপ্টেন করীম।  
(৩) শ্রী গৌর চন্দ্র বালা।

সচিব ছিলেন তৎকালীন সিএসপি জনাব নুরুল কাদের খান। ডিজি ছিলেন উইং কমান্ডার এসআর মির্জা। ডিরেক্টর ছিলেন আহমেদ রেজা। এর অফিস ছিলো ৮নং থিয়েটার রোড, মুজিবনগর কেন্দ্রীয় অফিস ভবনে।   
  
কামরুজ্জামান সাহেব এবং আমি প্রায়ই এই যুব অভ্যর্থনা শিবির এবং যুব শিবিরগুলি পরিদর্শন করতাম। আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে একটি হেলিকপ্টার নির্দিষ্ট করা ছিলো। চব্বিশ পরগণা জিলার হাসনাবাদ টাকী থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের আগরতলা সাবরুম পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর দীর্ঘ এলাকাব্যাপী এই সমস্ত শিবির স্থাপিত ছিলো। সুতরাং এগুলির পরিদর্শন কাজ খুব সহজসাধ্য ছিলো না। যুব শিবির কিংবা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হতো মুজিবনগর সরকারের বাজেট থেকে। এই হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্টাফ ছিলো, সময় সময় এই হিসাব অডিট করা হতো। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই অডিটের হিসাব বাংলাদেশ সরকারের নিকট দাখিল করা হয় এবং ব্যাংকে রক্ষিত টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রত্যর্পণ করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১স্মৃতিতে বড় উজ্জল হয়ে আছে দিনটি। ৩রা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রিন্সেস স্ট্রীটের অফিসে বসে আছি। হঠাৎ খবর এলো ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চারিদিকেই আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গেলো। অতি আনন্দে সবার চোখই অশ্রুসজল। দীর্ঘ নয় মাসের কত মৃত্যু কত রক্ত কত বেদনা ও অশ্রুঘন কাহিনীর সকরুণ স্মৃতি। এই স্বীকৃতি আমাদের জন্য একটা পরিচয়। জাতি হিসেবে গৌরবময় পরিচয় এনে দিয়েছে। একটা নতুন রাষ্ট্র, একটা নতুন জাতির জন্ম পৃথিবীর বুকে স্বীকৃত হলো।  
  
খুব সম্ভব এদিনেই ফোন পেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের কণ্ঠস্বর। আমার প্রতি নির্দেশ- শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে এক্ষুনি উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে। আমাকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে বালিগঞ্জ বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলাম। আমার গাড়ি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএফ এর এক কর্নেল এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরলে আমি নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্যালুট করলো। আশেপাশে দাড়ানো আরো কয়েকজন অফিসার একইভাবে স্যালুট করলো। সভা ঘরের দরজায় আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা এবং কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এ কে রায়। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, এর আগেও অনেকবার এই অফিসে এসেছি। এদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আগের তুলনায় আজকের ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়ে। এর কারণ, আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে সরকারী এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই অফিসে আমার আগমন। আলোচনার টেবিলে বসলাম। দুপাশের দুই সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ। আমার সামনে বাংলাদেশের পতাকা টেবিলের স্ট্যান্ড দাঁড় করানো। বিপরীতে ভারতের পতাকা। আলোচনার বিষয় ভারতে আগত বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন। প্রথমে আমি ভারত কতৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবং এই সভার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ভারতের পক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রী এ কে রায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শরণার্থী কিভাবে ফিরে যাবে তার একটা ফর্মূলা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। আলোচনা অগ্রসর হবার পূর্বেই আমি বললাম এটা তো সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার। কারণ প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন মর্যাদার সঙ্গেই আমি বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফিরত পাঠাবো। সুতরাং ফর্মূলা উদ্ভাবন করে নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। আমার এই কথায় হঠাৎ ভারত পক্ষ নীরব হয়ে গেলো। প্রধানমন্ত্রী সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে তার নির্দেশ লাভের জন্য শ্রী রায় কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ বন্ধ রাখলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি সভায় এসে বললেন প্রধানমন্ত্রী শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আনুসংগিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। বিভিন্ন স্থান থেকে সুবিধামত শরণার্থীর বাস, ট্রেন এবং অন্যান্য যানবাহনে দেশে ফিরবেন। ফেরার সময় হাঁড়ি পাতিল চাল ইত্যাদি এবং কিছু নগদ টাকা প্রত্যেককে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   
  
এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে সসম্মানে দেশে ফিরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় এবং এত বড় আয়োজনের ব্যবস্থা খুব সহজ কাজ ছিলো না। মিসেস গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেলো। আরেকবার সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অফিসে ফিরে এলাম।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আনন্দ এবং বহু আকাঙ্খিত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটির অভূতপূর্ব অনুভুতি তখনো সদ্য সজীব। এ অবস্থায় একটা প্রলয়ংকারী ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যা দিনাজপুরবাসী কোনদিন বিস্মৃত হবে না। দিনাজপুরের মহারাজাদের তৈরী স্কুল। নাম মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল। বিস্তীর্ণ এলাকা। সামনে বিরাট খেলার মাঠ। বিরাট স্কুল ঘর মজবুত এবং দেখার মতো। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কোলকাতা রিপন কলেজের একটি শাখা দিনাজপুরে খোলা হয় এবং এই মহারাজা স্কুলেই সকালের শিফটে সেই কলেজ চলতো। পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের পর ৭নং সেক্টরের সব মুক্তিযোদ্ধা দিনাজপুর শহরে প্রবেশ করলে তাদের জন্য কয়েকটি শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে দিনাজপুর স্টেডিয়াম ও মহারাজা স্কুল ছিলো বড় শিবির। মহারাজা স্কুলের সামনের মাঠে আন্ডার গ্রাউন্ড ঘর তৈরি করে উদ্ধারকৃত সমস্ত অস্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতিদিন ট্রাকে করে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রকারের অস্র উদ্ধার করে এখানে এনে জমা করা হতো। সেদিন ৬ জানুয়ারী। হিলি সীমান্ত থেকে দুই ট্রাক অস্রশস্র(বিভিন্ন প্রকার তাজা বোমাসহ) নিয়ে এসে সেগুলো ট্রাক থেকে নামিয়ে মাটির নিচের ঘরে রাখার কাজ শুরু হয়। সময় সন্ধা ৬টা ৩০মিনিট। হয়তো অন্যমনস্কতার কারণে তাজা বোমা কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণ এতই প্রচন্ড এবং ভয়াবহ হয় যে সম্পূর্ণ স্কুল ধ্বংস হয়ে যায়। স্কুলের সামনের মাঠটি একটি বিরাট পুকুরে পরিণত হয়। শুধু দিনাজপুর নয়, এই শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে পার্বতীপুর শহরের কিছু বাড়ী ঘরের জানালার কাচও ভেঙ্গে যায়। ৪৫০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা সেখানে থাকতেন। দুর্ঘটনার পর আহতদের আর্তনাদে এক করুণ এবং মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তারদের কাছে পাঠানো ও নিহতদের লাশ উদ্ধার কার্যে শহরের হাজার হাজার মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে পুরো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলা চলে। প্রায় সকলেরই দেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশের অঙ্গ প্রতঙ্গ এক জায়গায় জমা করে মোটামুটি হিসেবে ১৬০ জনের মতো নিহত মুক্তিযোদ্ধার লাশ সংগ্রহ করে শহরের তিন মাইল উত্তরে সুবিখ্যাত চেহেল গাজী মাজারের একপাশে দাফন করা হয়। ঘটনার ৬/৭ মাস পরে ধ্বংসস্তুপ পরিস্কার করার সময় আরো প্রায় ৪০টি মাথার খুলি পাওয়া যায়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে যারা বীরের মতো জয়লাভ করে স্বাধীনতার রক্তসূর্যকে ছিনিয়ে আনলো তাদেরকে সামান্য একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এরূপ মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হলো! বীরদের এই সকরুণ পরিণতি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সকরুণ মর্মন্তুদ অধ্যায় সৃষ্টি করে রাখবে।

-মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

নভেম্বর, ১৯৮৪



[হুসাইন মোহাম্মদ ইশতিয়াক](https://www.facebook.com/hmishtiaq?fref=ts)

<১৫,৩১,২৪৪-৪৬>

*স্বাধীনতার পর প্রথম যেই কাজটা দরকার, তা হলো সংবিধান প্রণয়ন। এর জন্য যেই কমিটি গঠন করা হয়, তাকে গণপরিষদ বলে। আমাদের স্বাধীনতার পর, মাত্র ৮ মাসে যেই চমৎকার সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল, সেই গঠনতন্ত্র কমিটিতে অর্থাৎ গণপরিষদের একজন সদস্য ছিলেন মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ।*

# [মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ]

নওগাঁ ৭ উইং ই,পি,আর হেডকোয়ার্টারে ২৫শে মার্চের পূর্ব হতে ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের পাঞ্জাবী অফিসারবৃন্দের উপস্থিতির কারনে সংগ্রামের শুরুতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মার্চের শেষ ভাগে মেজর নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন বদলী হয়ে নওগাঁ আসেন এবং তাঁরা উভয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তাঁরা প্রথমেই উপরোক্ত পাঞ্জাবী মেজর, ক্যাপ্টেন ও তৎকালীন নওগাঁর পাঞ্জাবী এস,ডি,ও-কে গ্রেফতার করেন। এ সময় আমি নওগাঁ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলাম। আমার সক্রিয় সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যেই নওগাঁর বিভিন্ন ই,পি,আর ক্যাম্পের পাঞ্জাবী ও পাঠান সিপাহীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। এবং এর ফলে সমগ্র নওগাঁ শত্রুমুক্ত হয়।  
  
আমার নেতৃত্বে এবং মেজর নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের পুর্ণ সহযোগিতায় বহুসংখ্যক যুবকদের সামরিক শিক্ষা দানের জন্য নওগাঁ কে,ডি স্কুল ও ডিগ্রি কলেজ প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঐ সময় বগুড়ায় পাক-বাহিনীর গুরুত্বপুর্ণ অর্থসম্ভার (Arms Ammunition dump) ছিল। রংপুর দিনাজপুর থেকে পাক বাহিনী উক্ত অস্ত্রশস্ত্র দখল করার জন্য বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ই,পি,আর ও কিছুসংখ্যক নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে নিয়ে বগুড়ার উত্তর ধারে খান সেনাদের অগ্রগতি রোধ করা হয়। তার কিছুসংখ্যক সৈন্য মারা গেলে তারা পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধে নওগাঁর ১৪ বছর বয়স্ক বাবলু নামক এক তরুন যোদ্ধা প্রথম শহীদ হন। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে ঐ সময় বগুড়া থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব তরুন মুক্তিযোদ্ধা ও ই,পি,আর জোয়ানদের নিয়ে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে পাঞ্জাবীদের তৎকালীন শক্ত কেন্দ্র (Strong hold) রাজশাহী সেক্টর আক্রমন করা হয় এবং বহু পাঞ্জাবী সৈন্য খতম করা হয়। রাজশাহীর যুদ্ধ পরিচালনায় অস্ত্ররসদ সরবরাহ এবং সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনা শহীদ মেজর নাজমুল হক-এর নেতৃত্বে নওগাঁ হতে পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমি সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করি।  
  
এই সময়ে আর্টিলারীর অভাবে সংগ্রাম ব্যাহত হতে থাকলে এবং পাক-বাহিনীর আরিচা-নগরবাড়ী হয়ে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে পারে এই আশংকায় উন্নত ধরনের অস্ত্রপ্রাপ্তির আশায় আমি প্রথমে একাকী মালহদ শহরে ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর জন্য যাই। সেখানে নবাবগঞ্জের এম,সি,এ ডাক্তার মঈনউদ্দিন ওরফে মন্টু ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা হয়। সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনার পর ঠিক হয় যে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অস্ত্র সরবরাহ করতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তৎপুর্বে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের আলোচনা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমি নওগাঁ ফিরি এবং মেজর নাজমুল হককে সাথে নিয়ে পুনরায় মালদহ যাই। এ সময়ে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন গিয়াস রাজশাহী সেনানিবাস দখলের প্রায় কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। অস্ত্র সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস নিয়ে আমি ও নাজমুল হক নওগাঁ ফিরে আসি। কিন্তু ২/১ দিনের মধ্যে পাক সৈন্য ভারী কামান ও অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নগরবাড়ী অতিক্রম করে পাবনা দখল করার পর ট্রেনযোগে নওগাঁ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা আত্মরক্ষার্থে ১৭ই এপ্রিল তারিখে মেজর নাজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে বালুর ঘাট হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করি।  
  
উল্লেখ্য যে, এই এলাকার সমস্ত সংগ্রামের অধিনায়ক মেজর নাজমুল হক শিলিগুরি থেকে তরঙ্গপুর ফেরার পথে আকস্মিকভাবে স্বহস্তচালিত জীপ দুর্ঘটনায় শহীদ হন।  
  
এরপর আমি পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মুক্তিফৌজের সামরিক শিক্ষা শিবিরে, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুরায় শিক্ষানবিশ যুবকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন অবস্থান করি এবং ট্রেনিং ক্যাম্প হতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের মুক্তি সেনাদের নিয়ে ‘শোবরা অপারেশন’ শিবিরে অবস্থান করি। এবং তাদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে সঙ্গে থেকে তাদেরকে সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করতে পারি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকা সেক্টরে বিভক্ত করলে আমি তরঙ্গপুর ‘শোবরা অপারেশন’ ক্যাম্পের জন্য সিভিল লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি।  
  
যে সমস্ত এলাকায় খান সেনাদের গেরিলা যুদ্ধে ঘায়েল করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বান্ধাইখড়া। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে এখানে ৫টি বিরাট নৌকাভর্তি প্রায় ৭০/৮০ জন খান সেনাকে তাদের অফিসারসহ ব্রাশ ফায়ারে খতম করা হয়। সাহাগোলা ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এবং সৈন্য বোঝাই একটি রেলগাড়ি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। এখানে প্রায় শতাধিক খান সেনা নিহত হয়। নগা-মহাদেবপুর হাই রোডের মধ্যে হাপানিয়া গ্রামে মাইন বিস্ফোরণের দ্বারা একটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক বিধ্বস্ত করা হয়। এতে ৮/৯ জন পাক সেনা মারা যায়। হাপানিয়ার দক্ষিনে আরেকটি বিস্ফোরণে দু’জন অফিসারসহ ৫/৬ জন পাক সৈন্য নিহত হয়। 

-মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ   
গণপরিষদ সদস্য (সাবেক এম, এন, এ)   
রাজশাহী ২২ অক্টোবর, ১৯৭২



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

<১৫,৩২,২৪৫-৪৮>

# [মোহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী]

২৩ মার্চ ভুরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ, আনসার মুজাহিদ, সাবেক ইপিআর, আওয়ামী লীগ কর্মী, নেতা এবং সর্বস্তরের জনগণের এক বিরাট সমাবেশে আমি সভাপতিত্ব করি। এই সমাবেশে ইয়াহিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত নস্যাৎ করে সশস্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে মাতৃভুমিকে মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। ঐ সমাবেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভূরুঙ্গামারীর ইতিহাসে এটিই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।  
  
২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু হলে ২৬ মার্চে আমরা জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় নেতাদের নিয়েএক গোপন বৈঠকে থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি এবং সমস্ত ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মোতাবেক সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্যও আমরা কর্মসূচী গ্রহণ করি।  
  
ইতিমধ্যে ভূরুঙ্গামারী থানার সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলোর সাবেক অবাঙালি ইপিআর'রা সাবেক বাঙালি ইপিআর'দের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ইপিআর আনিস মোল্লা এবং রওশন-উল-বারীর নেতৃত্বে ইপিআরের সদস্যবৃন্দ আমাদের সহযোগীতা কামনা করলে স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ আমার ভূরুঙ্গামারীর বাসস্থানে এক জরুরী বৈঠকে অবাঙালি ইপিআরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাঙালি ইপিআরদের সক্রিয় সাহায্যের পরিকল্পনা করা হয়।  
  
২৮ মার্চ অবাঙালি ইপিআরদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরদিন ২৯ মার্চ বাঙালি ইপিআর এবং সম্মিলিত ছাত্র জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জয়মনিরহাট ক্যাম্পের একজন অবাঙালি সুবেদার, একজন ড্রাইভার এবং একজন ওয়্যারলেস অপারেটর নিহত হয়। উক্ত জয়মনিরহাট ক্যাম্পে অবাঙালি ইপিআরদের সঙ্গে সহযোগীতাকারী জয়মনিরহাটের একজন অবাঙালি চক্ষু চিকিৎসক জনগণের হাতে নিহত হয়।

অত্র থানার অন্যান্য সীমান্ত ফাঁড়ি যেমন- কেদার, সোনাহাট, ধলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাঙালি ইপিআরদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন অবাঙালি নিহত হয়। অবাঙালি ইপিআরদের কবল থেকে জয়মনিরহাট ক্যাম্প উদ্ধার করার সঙ্গে সমস্ত অস্রাদি আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী থানার সমস্ত বাঙালি ইপিআরগণকে তাদের অস্ত্রসমেত উক্ত ক্যাম্পে জরুরী ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়।  
  
অতঃপর সাবেক বাঙালি ইপিআরগণের সঙ্গে আনসার, মুজাহিদ এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জয়মনির হাটে যোগ দেয়। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ও এখানে যোগ দেয়। এদের সকলকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়ে আমরা হানাদার বাহিনী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি।  
  
জয়মনিরহাটে সংঘবদ্ধ এই দলকে বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং পুলিশ ফাঁড়ি থেকে প্রাপ্ত সামান্য অস্র দিয়েই রংপুর সামরিক গ্যারিসন থেকে হানাদার বাহিনী যাতে অত্র অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিস্তাপুল প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এই সংঘবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াসহ যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব আমি স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায় পালন করেছি। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় অস্র যোগান দেয়াই ছিলো বড় সমস্যা।   
  
২৯ মার্চ আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জ সীমান্ত ঘাটির সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাদের অনুরোধে উক্ত সেনাধ্যক্ষ প্রাথমিক বেসরকারী সাহায্য হিসেবে ১ এপ্রিল মধ্যরাতে ২টি হালকা মেশিনগান, কিছুসংখ্যক রাইফেল এবং প্রচুর হাতবোমা প্রদান করেন। এসব অস্র তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে সরাসরি পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে আমি সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জের ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠিয়েছি।  
  
৫ ই এপ্রিল ভুরুঙ্গামারী কলেজে আমরা প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলি। যুবক এবং ছাত্ররা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। শীঘ্রই বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র-যুবক এখানে আসতে থাকলে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা হয়। সমগ্র রংপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাঙালি ইপিআরবৃন্দকে আমরা ভূরুঙ্গামারী থানায় সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হই। বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে আগত ইপিআরদের মধ্যে দুই কোম্পানী ইপিআরকে তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেই। এক কোম্পানী ইপিআরকে ভূরুঙ্গামারীতে সংরক্ষিত রাখা হয়।   
  
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ও প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ভূরুঙ্গামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হানাদার কবলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা তৈরি করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়েই গেরিলাদের সরাসরি প্রতিরোধ ঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীকালে এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে অত্র থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এছাড়া ভারতীয় জনগণ ভূরুঙ্গামারী থানার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাল গম আলু কেরোসিন পেট্রোল সিগারেট বিস্কুট ঔষধপত্র প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন।  
  
৮ ই এপ্রিল ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক জরুরী গোপন নির্দেশ পাই। উক্ত নির্দেশে উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দকে অবিলম্বে ভারতের এক অজ্ঞাত স্থানে সম্মিলিত হয়ে স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়।   
  
সে মোতাবেক ৯ এপ্রিল আমি অত্র অঞ্চলের অপরাপর গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে ভারতের আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার সোনাহাট সীমান্ত ঘাঁটিতে উপস্থিত হই। অতঃপর সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আমাদেরকে আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার রূপসা বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। এখানেই আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ বহু নেতার সাথে আমরা প্রথম মিলিত হই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ, কুষ্টিয়ার ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, শেখ ফজলুল হক মনি, ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা, আসাম ৮২তম সীমান্তরক্ষী ব্যাটালিয়নের সেনাধ্যক্ষ, কর্নেল আর দাস রূপসা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন এবং আমাদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে উত্তরাঞ্চলের ভারতীয় সামরিক সাহায্য, মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধান ও তাদের সার্বিক দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়। এই সময় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব মতিউর রহমান সহ সাবেক বাংলাদেশ বাহিনী প্রধান ওসমানী মুক্তাঞ্চল সফর করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এভাবে ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণের সাহায্য সহযোগীতা এবং ভারতীয় জনগণ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে আমরা ২৬ মে পর্যন্ত কুড়িগ্রাম শহরের উত্তরে ধরলা নদীর উত্তর তীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অটল রাখতে সক্ষম হই।   
  
২৬ মে রাতে পাক বাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে আমাদের পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে গেলে আমরা ভারতে আশ্রয় গ্রহন করি।

ভারতে প্রবেশের পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করা হয়। ভারতের পশ্চিম বাংলা সীমান্তের সাহেবগঞ্জ ও আসামের সোনাহাটে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনুমোদনে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা অধিকৃত ভূরুঙ্গামারী এবং নাগেশ্বরী থানার বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের প্রতি আঘাত হানতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করার জন্য পশ্চিম বাংলা সীমান্তে যুব শিবির খোলার খোলার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই যুব শিবিরগুলো স্থানীয় ভারতীয় জনগণের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ছিলো। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার যুব শিবিরগুলোর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহন করে। যুব শিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর তাদের উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে পাঠানো হতো।  
  
দুধকুমার নদীর পূর্ব তীরস্থ নাগেশ্বরী এবং ভূরুঙ্গামারী থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদার কবল মুক্ত ছিলো। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের সাহায্যের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি। মুক্তাঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার জন্য নাগেশ্বরী থানার সুবলপাড় বন্দরে এবং মাদারগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিলো। পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলা শহর উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের Northern zone অফিস হবার পরপরই মুক্তাঞ্চলে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের তীব্র অভাব জরুরী ভিত্তিতে মিটানো হয়। মুক্তাঞ্চলে সোনাহাটে প্রধান মেডিকেল কেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত মেডিকেল কেন্দ্র খোলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের কুচবিহারস্থ Northern zone medical centre থেকে মুক্তাঞ্চলে ঔষধপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আসাম প্রদেশে ৮২তম ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে সেখান থেকে ঔষধপত্র লাভ করেছি এবং উক্ত অঞ্চলের জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। মুক্তাঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিলে আমি তা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে Northern zone-এর সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক গণপরিষদ সদস্য জনাব মতিউর রহমানকে মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করতে আহবান জানাই। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি ৭১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সোনাহাটে এক বিরাট গণসমাবেশে ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় উক্ত টাকা বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ সরকারের Northern zone-এর প্রচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিলো। মুক্তাঞ্চলের জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমরা সাধ্যমতো চালিয়েছিলাম।  
  
বাংলাদেশের সাবেক ইপিআর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নওয়াজেদের অধীনস্থ সাহেবগঞ্জ ঘাঁটির গেরিলা যোদ্ধা এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আসাম সীমান্তের সোনাহাট ঘাঁটির গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সনাবাহিনীর সৈন্যদের এক যৌথ অভিযানের পর ১৭ নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী মুক্ত হয়। এর পরই অত্র থানার আন্ধারীঝাড় বাজার থেকে পাক বাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে পিছু হটে গেলে ভূরুঙ্গামারী থানা শত্রুমুক্ত হয়। এই এলাকা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আশ্রিত জনগণ বিধ্বস্ত ভূরুঙ্গামারীতে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। মাতৃভুমিতে পা দিয়েই জনগণের আনন্দ উল্লাস আমাদেরকে অভিভূত করে। ডিসেম্বরে সারা বাংলাদেশের মুক্তির সাথে সাথে জনগণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে সশস্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে জনগণ বাঙালি জাতির এক ঐতিহাসিক বিজয় বলে মনে করেছে।  
  
- শামসুল হক চৌধুরী

গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম, পি, এ)

রংপুর-১২

১৭ ই মে, ১৯৭৩



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

<১৫,৩২,২৪৮-৫১>

# [অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক]

স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে পাক-সামরিক জান্তার ক্রিয়াকলাপ অনেকের মতো আমার মনেও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ পরিবর্তন করা হয় এবং ঢাকার বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে ভুট্টোর অনীহা প্রকাশের ফলে বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়লে সারা দেশ ক্ষোভে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। এই পটভূমিতে ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-ভুট্টো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা চলে স্বভাবতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তা আমরা অনুসরণ করছিলাম। আমার ধারণা ছিল এই চরম সংকট ও অচলাবস্থা নিরসনে তাঁরা হয়তো একটা সমঝোতায় উপনীত হবেন।

অন্যদিক সারাদেশে প্রতিদিনই ইয়াহিয়ার সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ডাকা হচ্ছিলো। ২৩ মার্চ বিকেলে চট্রগ্রাম শহরে ছাত্র শিক্ষক জনতার একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় ও প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে মিলিত হয়। এই জনসভায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকে গিয়েছিলাম। সভা চলাকালে খবর পেলাম, চট্রগ্রাম বন্দরে বাঙালি শ্রমীকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করায় পাক বাহিনীর জোয়ানরা গোলাবর্ষণ করেছে। এরপর সভা মূলতবী হয়ে যায়। চট্রগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সময় এক অভুতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ করি। তরুণ ও যুবকরা সেচ্ছাসেবকের প্রতীক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। দেখে মনে হলো তারা পাক সামরিক অভিযান বাঁধা দিতে অকুতোভয়। ক্যাম্পাসের দিকে এগুতে পারিনি। গ্রামের ভিতর দিয়ে পায়ে হেটে পথ খুঁজে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে পৌঁছতে অনেক রাত হয়েছিলো।

দেশের এই ক্রান্তিকালে যে কোন মুহূর্তে নতুন কোন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের উন্মোচন হতে পারে এরূপ একটা অবস্থায় গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতিদিন বেতারে খবর শুনতাম। ২৬ মার্চ সকালে রেডিও খুলতেই হঠাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা মনে হলো। ভারী কণ্ঠ যা কোনো বাঙালির মনে হয়নি। ঘোষণা শুনতে পেলাম। ঢকাতে কারফিউ জারি হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। সেই মুহুর্তে ঢাকায় কি ঘটেছে তা জানা যায়নি। তবে সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে তা আঁচ করা যাচ্ছিলো।  
  
দ্বিপ্রহরের পর থেকে আকাশবাণীর খবরে ঢকার কিছু কিছু সংবাদ পেলাম। ইপিআর ও পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করেছে পাক সেনারা, নিরীহ জনসাধারণের উপরও তারা ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনেক পরিচিতজনের নিহত হবার কথাও শুনলাম। ঠিক সেই মুহুর্তে চট্রগ্রামে আমরা কি করবো তা স্থির করতে পারি নি।  
  
২৬ মার্চ রাত বারোটার দিকে উপাচার্য ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন আরো যাকে পান সঙ্গে নিয়ে আসবেন। গিয়ে দেখি অনেক ইপিআর(তদানীন্তন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল)-এর লোকজন রামগড় ও সন্নিহিত সীমান্ত এলাকায় তাদের স্থান ছেড়ে ক্যাম্পাসে এসে জড় হয়েছে। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করাই ছিলো সেই মুহুর্তের সবচেয়ে জরুরী কাজ। আমাকে সেই দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। চাল ডাল তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের খাওয়ার আয়োজন করা হলো। এ অবস্থায় তারা কি করবে এ নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ যায় কিনা এবং কি উপায়ে তা করা যাবে এ ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হলো। উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ছিলো কম।  
  
ডঃ মল্লিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অবস্থা মোকাবেলার জন্য তার গোপন নির্দেশে আমরা মলোটভ ককটেল জাতীয় কিছু বোমা তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য সিএসআইআর-এর ডঃ আবদুর হাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। রসায়ন বিভাগের ডঃ মেসবাহউদ্দিন ও পদার্থ বিঞ্জান বিভাগের এখলাস উদ্দিনের সহায়তায় চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীতে আমরা এ ধরনের কিছু হাতবোমা তাৎক্ষণিকভাবে বানাতে সক্ষম হই এবং সেগুলো পরীক্ষামূলক ব্যবহার করি।  
  
২৭ তারিখ কালুরঘাট স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যায়। ঐ ঘোষণার প্রথমে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তা সংশোধন করে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করেন। তার নেতৃত্বে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা কালুরঘাটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বলেও আমরা খবর পাই। ডঃ মল্লিক কালুরঘাট স্টেশনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।  
  
এই বেতার ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করা আমাদের কারো পক্ষে আর নিরাপদ ছিলো না। মল্লিক সাহেব ক্যাম্পাসে অবস্থানরত মহিলা ও শিশুদের আগে সরাবার ব্যবস্থা করেন। ৩০ মার্চ সকালের দিকে অন্যান্যদের সঙ্গে আমার পরিবার কুন্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় হোস্টেলে আশ্রয় নেয়। অপরাহ্নে আমরাও মিলিত হই তাদের সঙ্গে। নিরাপত্তার আশংকা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলছিলো সর্বত্র। ফজলুল কাদের চৌধুরীর লোকেরা সেখানে আমাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে শুরু করে। আমরা সত্ত্বর সে স্থান ত্যাগ করে নাজিরহাটে চলে যাই। এখানে মল্লিক সাহেব, ডঃ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান এবং আরো অনেক শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। ডঃ মল্লিক চট্রগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান সাহেব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তারা সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ দেন। সকলে চলে যাবার পর আমরা আরো প্রায় এক সপ্তাহ সেখানে কাটাই। এ সময় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে সেতু উড়িয়ে তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটি পরিবার নৌকায় করে রামগড় টি এস্টেটে চলে যাই। সেখানে এক রাত কাটানোর পরই হানাদার বাহিনীর অভিযানের সংবাদ ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। অতি সত্ত্বর আমরা নদী পার হয়ে ভারতের সাবরুমে একটি প্রাইমারী স্কুলে এসে পৌঁছি। এখানে সপ্তাহখানেক অবস্থান করি। স্কুলের একেকটি কামরায় প্রায় ১০টি করে পরিবারকে এই ক'দিন কোনমতে থাকতে হয়েছিলো।   
  
এরপর আগরতলায় এসে ডঃ মল্লিক ও বাংলাদেশ থেকে আগত অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। একটি টেকনিক্যাল স্কুলের পরিত্যক্ত হোস্টেলে সপরিবারে আশ্রিত হই। মে মাসের প্রথম দিকে ডঃ মল্লিক কোলকাতায় যান। সৈয়দ আলী আহসানও তার পরপরই চলে যান।  
  
আগরতলায় শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছিলো। এসব ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে আগত যুবক ও ছেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমি এসব ক্যাম্পে যাতায়াত করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখানে মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, মেজর মীর শওকত আলী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও মাঝে মাঝে আমার দেখা সাক্ষাৎ হতো। মেজর নুরুজ্জামান আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।  
  
ইতিপূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা এবং শরণার্থী শিক্ষকদের নানাভাবে সহায়তা করার উদ্যেশ্য নিয়ে 'কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিলো। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের ঠিকানা ও বিবরণ চেয়ে পাঠানো হয়েছিলো যাতে তারা ভারতে কোথাও কোনোভাবে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে পারেন। তাদের এই আহবান অনুযায়ী আমি আমার বায়োডাটা পাঠিয়েছিলাম। কিছুদিন পর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আগরতলা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ছিলেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে বললেন, “তুমি তো বোঝই আমাদের এখানে চাকরির অনেক অসুবিধা। তবে তোমার জন্য বোধ হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।“ আমি কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলাম এবং সে সময় চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছিলাম। তাই তিনি বোধ হয় আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কোলকাতা যেতে আহবান জানান এবং বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দেন।  
  
কোলকাতা গিয়ে আমি মুজিবনগর সরকারের অফিসে দেখা করি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো। তিনিও আমাকে আশ্বাস দিলেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও শরণার্থী শিক্ষক বুদ্ধিজীবিগণের জন্য বিদেশের একটি সাহায্য সংস্থা হতে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।  
  
‘বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’ আমার বায়োডাটা পাঠিয়েছিলো পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে আমার ঠিকানা ছিলো আগরতলার। জুনের শেষের দিকে আমি কোলকাতায় আগরতলা থেকে পুনঃপ্রেরিত পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চিঠি পাই। বিভাগীয় প্রধান ঐ চিঠিতে আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেবার আহবান জানান। তিনি আরো জানান যে, এজন্য তারা আমাকে এক হাজার রুপী মাসিক বেতন দিতে পারবেন। এই প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করি এবং জুলাই মাসের ১ তারিখে পাতিয়ালা রওয়ানা। এরপর থেকে আমি বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।  
  
পাতিয়ালায় অবস্থানকালে আমি রেডিও মারফত মুক্তিযুদ্ধের খবর ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থেকেছি। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। দেশ স্বাধীন হলে বর্তমান নেতৃত্ব সরকার পরিচালনায় সমর্থ হবেন কিনা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক এরূপ নানা সংশয় বিদ্যমান ছিলো স্থানীয় লোকদের মধ্যে। পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা একটা ব্যাপক প্রোপাগান্ডা হিসেবে অনেকে মনে করতো। শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারণা ছিলো। আমি তাদের যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমি এই ভেবে তাদের ধারণা পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছি যে, আমরা শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো সরাসরি জড়িত ছিলাম না। তবে কেন আমাদেরকে এভাবে খালি হাতে দেশত্যাগ করতে হলো?  
  
পাতিয়ালায় থাকাকালে ভারতের দূরবর্তী এলাকাসমূহে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনের আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করি। যেমন, সিনেমা হলগুলোতে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, শরণার্থীদের অন্তহীন দুর্ভোগ ও দুর্দশা সম্বলিত সংবাদচিত্র প্রদর্শণী, বাংলাদেশ সম্পর্কে নেয়া বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকারের ছবি ও কযাপশন প্রদর্শণী ইত্যাদি। এমনকি ইতিপূর্বে আগরতলা প্রবাসকালে ভারতীয় সংবাদপত্র আমার যেসব বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলো তার কিছু কিছু পাতিয়ালাতেও প্রদর্শিত হয় বলে আমি জানতে পারি।

১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার পর আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি এবং ২৫ ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম এসে পৌছি।–

-মোহাম্মদ শামসুল হক

(উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

জুন, ১৯৮৪



[রাজু আহসান হাবীব](https://www.facebook.com/razu.romeo?fref=ts)

<১৫,৩৪,২৫১-৫২>

# [মোহাম্মদ হুমায়ূন খালিদ]

মেঘালয়ের তুরাতে এফ জে সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারে দীর্ঘ আট মাস মোটিভেশনের দায়িত্বে ছিলাম । এই কয় মাসে প্রায় ১৬ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য আমার হাত দিয়ে শপথ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঢোকে । আমি নিজেও দীর্ঘ ৪ মাস গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করি।  
  
টাঙাইলের গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকির সঙ্গে সর্বপ্রথম আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় । মুক্তি বাহিনীর ছেলেদের ট্রেনিং গ্রহণ করার পর টাঙ্গাইল ময়মনসিংহের ভাল ভাল ছেলেদের সরাসরি কাদের সিদ্দিকির নিকট পাঠিয়ে দিই ।

কাদের সিদ্দিকির জন্য কিছু ( উচ্চ মানের ) অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে আমি ভারতীয় উক্ত সেক্টরের বিগ্রেডিয়ার সাচ্ছু সিংহের সঙ্গে দেনদরবার করি । এই খবর পাক বাহিনী পায় । ফোলে আমার স্ত্রী পুত্র - পরিবারকে বন্দি করে তাদেরকে কঠোর ইন্টারগেশন করে । অবশ্য অন্য কোন অত্যাচার না করে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় । আমি এই খবর ভারতে থেকে পাই । আরও জানতে পারি যে পাক সেনারা আমার পালক পুত্র (কলেজের ছাত্র ) সোহরাব হোসেনকে বন্দি করে টাঙ্গাইল জেলে রেখেছে ।   
  
মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৮ মাসে মাইঙ্কার চর , মহেন্দ্র-গঞ্জ ও ডালুতে ঘুরে ঘুরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট , ইপি আর ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করে উদ্বুদ্ধ করতাম । তারা বজ্রশপথে মাতৃভূমি উদ্ধার কল্পে বাংলাদেশে ঢুকতো । নটিয়াপাড়া , বাঐখোলা, পাটখাগুড়ি , বাসাইল হাতিবান্দা ও মিরিকপুরে ১২ জন নিহত হয় । এদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয় । গণহত্যার স্থান ছিল মিরিকপুর বাসাইল। আমার পালিত পুত্রের বাবা খন্দকার শামসুর রহমানকে শুধু আমারই পালক পুত্রের বাবা হওয়ার অপরাধে ধরে এনে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসের সামনে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয় ।   
  
৩রা এপ্রিল ( যেদিন পাকবাহিনী টাঙাইলে প্রথম ঢুকে ) নাটিয়াপাড়াতে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কাদের সিদ্দিকির নেতৃত্বে তুমুল যুদ্ধ হয় । নটিয়া পাড়া বাজার ও আশেপাশের বাড়িঘর পাক বাহিনী পুড়িয়ে দেয়।   
  
আমার স্ত্রী রিজিয়া খালিদ পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লজ্জায় অপমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন । পরে চিকিৎসার জন্য ছদ্মনামে তিনি ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হন । আমার প্রাক্তন ছাত্র ( ডাঃ আব্দুর রহমান ) উক্ত হাসপাতালের ডাক্তার আমার স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারেন নি । ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল শুক্রবার সকাল ৯টায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন । মারা যাওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশ পেয়ে যায় যে তিনি আমারই স্ত্রী এবং যখন তার লাশ টাঙাইলে নেয়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হয় , পাক বাহিনীর কাছে তা অগ্রাহ্য হয় । ফলে একদিন পর ৪ঠা ডিসেম্বর আজিমপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । সে সময় ঢাকায় ভীষণভাবে বোমাবর্ষিত হচ্ছিল । আমার স্ত্রীর এই অকাল মৃত্যুর খবর আমি ঘাঁটাইলে পাই ১৩ ডিসেম্বর , সর্বপ্রথম আমি যখন ভারত থেকে টাঙাইলের দিকে আসছিলাম।   
  
কাদের সিদ্দিকির উপস্থিতিতে ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে যে জনসভা হয়, সেই সভায় আমি কোরআন তেলাওয়াত করি এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিই । এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম জনসভা । এই সভায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আমি মোনাজাত পরিচালনা করি তাতে সমস্ত জনসভা যেন কান্নার রোলে ফেটে পরে।

-অধ্যক্ষ হূমায়ুন খালিদ

এমসিএ (সাবেক এম এন এ)

টাঙ্গাইল



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

**<১৫,৩৫,২৫২-৬৩>**

# [মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ]

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নওগাঁতেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার পুরোমাত্রায় এসেছিলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখাসমূহ তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সংগ্রাম ছিলো সত্যিকার অর্থেই জনতার সংগ্রাম। অন্যান্য এলাকার মতো নওগাঁবাসীদের অবদানও এতে কোনো অংশে কম ছিলো না। ২৬শে মার্চের আগেই নওগাঁর বুকেও স্বাধীনতার প্রতীক বাংলাদেশের পতাকা নওগাঁবাসীরা উড়িয়েছিলো।  
  
একাত্তরের ২৫শে মার্চের নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ ঘটনাবলীর খবর টুকরো টুকরো খবর দু'একদিনের ভিতর বিভিন্ন সূত্রে নওগাঁতে এসে পৌছেছিল। অনেকের মত আমারও কোনো সন্দেহ ছিলো না যে ঐ ঘটনা আমাদেরকে এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছে।  
  
ঢাকা শত্রু কবলিত হওয়ায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো আর আমাদের ছিলো না। ওগুলো দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছিলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচারণা চালাবার জন্য আমাদেরও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেই বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশেও রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা শহরের হোটেল পট্টির পাশে কাজীপাড়ার ছোট একটি হস্তচালিত প্রেস থেকে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ ক্ষুদ্রাকৃতি এক পাতার দৈনিক "জয় বাংলা" বের করি। বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ধ্বনিত "জয় বাংলা" কথাটি আমাদের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছিলো বলে পত্রিকার নামটিও জয় বাংলা রাখি। মুক্তিযুদ্ধের একটি মুখপত্রের জন্য এর চেয়ে যোগ্য নাম আমার আসেনি।  
  
মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে "জয় বাংলা" লিখা হত। নানা রকম পরিস্থিতিতে জনগণেরকি করণীয় সে সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করা হত। নিজেদের দোষ ত্রুটি এবং সকল প্রকার অনাচারের প্রতিও জোরালোভাবে পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যবলীর রিপোর্ট সংগ্রহ ও প্রকাশের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা আমার একক প্রচেষ্টা ছিলো। লেখা, রিপোর্ট সংগ্রহ, প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের ব্যবস্থাও আমিই করতাম। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও বিভিন্ন রিপোর্ট আমি সাধারণতঃ রাতে এবং খুব ভোরে লিখতাম। তারপর প্রায় সারাদিন ধরে প্রেসে হাত কম্পোজ শেষে প্রুফ দেখে ছাপা হবার পর বিকেলে পত্রিকার বান্ডিল নিয়ে প্রেস থেকে বের হতাম। মুসলিম লীগের সাবেক এমপিএ জনাব কাজী শহ মাহমুদের মালিকানাধীন প্রেসের জন্য যাতে কোন বিপদ না আসে সে কারনে কাজী সাহেবের অনুরোধে পত্রিকায় প্রেসের নাম ছাপা হত না। প্রেসের ম্যানেজার ও কম্পোজিটর যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ করতো।  
  
২৬শে মার্চ থেকেই আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করেছিলাম। তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোনো সরকার গঠিত না হলেও এক গোপন সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে সংগ্রাম পরিষদগুলোকে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি গণ্য করার জন্য "জয় বাংলা" র প্রথম সংখ্যাতেই মত প্রকাশ করা হয়।  
  
যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত অপর কোনো দৈনিক পত্রিকার অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা ছিলো না(পরে প্রমাণিত হয়েছে ঐ সময়ে সত্যি সত্যি আর কোনো দৈনিক পত্রিকা ছিলো না। তাই "জয় বাংলা" পত্রিকাতেই স্বাধীন বাংলাদেশের মুখপত্র হিসেবে হিসেবে কয়টি কথা ছাপা হতো।  
  
"জয় বাংলা" প্রথম থেকেই কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে। কোনো প্রকার স্বার্থান্বেষী মহলের হুমকি এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকিও তোয়াক্কা না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নানা প্রকার গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা এবং সকল প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।  
  
৫ই এপ্রিল রাতে আমি রাইফেল বাহিনীর গোলা বারুদের জীপে চড়ে বগুড়া যাই। বগুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তাঞ্চল সফর শেষে ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় নওগাঁ ফিরে আসি। এ কারণে ৬ ও ৭ই এপ্রিল দুদিন "জয় বাংলা" প্রকাশিত হয়নি। ৮ই এপ্রিল বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এ সফরকালে আমি বগুড়ার তৎকালীন ডিসি এবং এসডিও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বগুড়ায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাই।  
  
এ বিশেষ সংখ্যায় হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বগুড়া শহর রক্ষা এবং মুক্তিবাহিনী কতৃক আড়িয়ার বাজারে অবস্থিত পাক সেনাবাহিনীর গোলা বারুদের ডিপো দখলের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়। এছাড়া মুক্তাঞ্চলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জগলোর কর্মীদের সহায়তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করি এবং বেসামরিক কতৃপক্ষকে শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদানের কথাও লেখা হয়।  
  
"জয় বাংলা" র ১১তম এবং শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১। এ সংখ্যায় যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য 'জবাসস(জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা) গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে যেসব খবর পাচ্ছিলাম সেগুলো সেগুলো একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এটি আমি গ্রহণ করি। আমাদের নিজস্ব কোনো সংবাদ সংস্থা ছিলো না এবং কেউ সে রকম কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় সীমিত সামর্থ নিয়েই 'জবাসস' গঠন করি। মুক্তাঞ্চলের কিছু টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এ কাজে জনাব সেলিম মন্ডল, পাঁচবিবি এক্সচেঞ্জের শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আরও অনেকে বগুড়া সার্কিট হাউজিস্থ মুক্তিযোদ্ধা কন্ট্রো রুমের রিটায়ার্ড সুবেদার দবিরউদ্দিন(ওস্তাদজী) ও হাবিলদার এমদাদুল হক ওরফে তোতাও এ ব্যপারে সহায়তা করেন। এছাড়া রাইফেলস বাহিনীর স্থানীয় কমান্ডার মেজর নাজমুল হকও এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।  
  
দেশের অন্যান্য সীমান্তের মত নওগাঁ সীমান্তও তখন উন্মুক্ত ছিলো। কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকারও দু'এক কপি সীমান্ত পথে আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছিলো। "জয় বাংলা" র ১১তম সংখ্যায় 'জবাসস' সংগৃহিত এবং এসব পত্র পত্রিকা থেকে উদ্বৃত হয়ে কিছু সংবাদ ছাপানো হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার ৯ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে জানতে পারি যে, ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'সংবাদ', ও 'দ্য পিপল' এর কার্যালয়গুলো ধ্বংস করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সাংবাদিক ও কর্মচারীদের হত্যা করা হয়েছে। আরও জানি 'দি পাকিস্তান অবজারভার', 'দি মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক পাকিস্তান', আজাদ' ও 'পূর্বদেশ' পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছাপা হচ্ছে। "জয় বাংলা"য় এ খবর উদ্বৃত করে মন্তব্য করা হয়- "পশ্চিমা বর্বরেরা বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর নাম বা Goodwill ব্যবহার করিতেছে।" এই সংখ্যায় জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর অফিস ধ্বংস ও সাংবাদিক হত্যার নিন্দা করা হয়।  
  
হানাদারদের আক্রমণের ভয়ে নওগাঁ শহর তখন প্রায় ফাঁকা। কাজীপাড়ায় যে প্রেস থেকে 'জয় বাংলা' ছাপা হচ্ছিল তার কর্মচারীদের অনেক বলে-কয়েও নওগাঁ থাকতে রাজী করানো যাচ্ছিলো না। সকলের মনেই ভীতি ছিলো, -এই বুঝি হানাদার এসে পড়লো। অন্যান্য প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে 'জয় বাংলা' আর ছাপানো সম্ভব হয় নি।  
  
১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ভিতরে কিংবা বাইরে থেকে 'স্বাধীন বাংলা'র আর কোনো দৈনিক পত্রিকা ছাপা হয়নি। দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম দিয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একাধিক সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু একটি দৈনিকও বের হয়নি।  
  
নিজস্ব সীমিত পুঁজির উপর নির্ভর 'জয় বাংলা' প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলাম। কারো কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি। প্রেস কতৃপক্ষও কোন লাভ নিতেন না। শুধু কাগজ ও মুদ্রণের খরচ নিতেন। 'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা ধার্য হয়েছিলো। এক ঘন্টায় ২০০ কপি বিক্রিও হয়েছিলো। কিন্তু এ সামান্য দাম আদায়ে ঝামেলার কারণে প্রথম সংখ্যার অবশিষ্ট কপি ও দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যার সকল কপিই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিলো।

'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিলো ১০০০ কপি। পরবর্তী সংখ্যাগুলোর কোনোটা ১৫০০ কোনটা ৩০০০ কপিও ছাপা হয়েছিলো। সর্বমোট কপি সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩০,০০০। খুলনা নিউজপ্রিন্টের হাফ ডিমাই সাইজের কাগজে জয় বাংলা ছাপানো হত। প্রথম কয়েক সংখ্য এক পাতার একপাশে এবং অবশিষ্টগুলো পাতার উভয় পাশে ছাপা হতো। ঐ পরিস্থিতিতে ছোট হাতে চালানো প্রেস থেকে এর চেয়ে বড় আকারে পত্রিকা বের করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলো না।

'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যাটি আমি নিজে আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী জাহিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে নওগাঁ শহরে বিলি করেছিলাম ৩০শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে। এ পত্রিকা প্রকাশকালে নওগাঁর তৎকালীন এমএনএ জনাব বায়তুল্লাহ(পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার), নওগাঁ, রাজশাহী, ও বগুড়া মুক্তাঞ্চলের তৎকালীন কমান্ডার রাইফেল(ইপিআর) বাহিনীর মেজর নাজমুল হক, বিভিন্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আরও অনেকেই উৎসাহ দিয়েছেন এবং সহযোগীতা করেছেন। মেজর হকের অনুমতিক্রমে তার বাহিনীর যানবাহনে নওগাঁর বাইরে 'জয় বাংলা'র বান্ডিল পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তাঞ্চল একে একে আমাদের হাতছাড়া হতে থাকে। পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া ও অন্যান্য শহরগুলোতে হানাদার বাহিনী ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আমাদের অসংগঠিত, বিশৃংখল, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন এবং উপযুক্ত অস্ত্রবিহীন বাহিনী প্রথম পাল্টা আক্রমণেই পশ্চাদপসরণ করতে এবং নিরুপায় হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থার কোনো পরিকল্পনা না থাকায় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। বলা চলে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে হানাদারদের হামলার মুখে সারাদেশ জুড়ে শুরু হয় মাঠ-ঘাট, বন-বাদার, নদী-নালা, টিলা-পাহাড় পেরিয়ে পরিকল্পনাহীনভাবে সকলের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি। সীমান্ত নিকটবর্তী শহর নওগাঁতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নি।

১৪ এপ্রিল সকালে রাইফেল বাহিনীর গোলাবারুদসহ রাজশাহীগামী দুটি জীপের কনভয়ে রাজশাহী যাত্রা করি। অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। দুপুরের আগেই নদীর তীরে কালিকাপুরে পৌঁছি। নদীর ওপারে মান্দা। নৌকায় জীপ পারাপারের ব্যবস্থা ছিলো। সেখানেই রাজশাহী এলাকা থেকে জীপযোগে ফিরে আসা নওগাঁর সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি রাজশাহী শহর হাতছাড়া হবার খবর দেন এবং কনভয়ে কয়েকজন সৈন্যকে একটি জীপ নিয়ে ঐ এলাকায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গিয়াসের সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়ে অপরটিকে তার সঙ্গে নওগাঁ ফিরতে বলেন। রাজশাহী যাওয়া সম্ভব না বলে আমাকেও তার জীপে তুলে নেন। দুপুর ২টার দিকে আমরা নওগাঁর বলিহার হাউজে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসি। জীপে বসে মেজর হককে আমি নওগাঁ ঘাঁটি রক্ষার্থে সম্ভাব্য হামলার রাস্তাসমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার অধীনস্থ সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় প্রতিরক্ষা ব্যূহের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি। তিনি নিরাসক্তভাবে আমার বক্তব্য শোনেন। রাজশাহী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং শিগগিরই নওগাঁ আক্রমণের আশংকা করেছিলেন। হাতিয়ারের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন। যে কয়েকটা মেশিনগান তার বাহিনীর হাতে ছিলো সেগুলোর ফায়ারিং পিনের অভাব দেখা দিয়েছিলো। হানাদারদের ধারণা তার ছিলো কেননা তিনি মূলতঃ আর্টিলারী কোরের সদস্য ছিলেন কিন্তু রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে ডেপুটেশনে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এসব কারণে আমার মতো যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রস্তাবে তার কোনো ভাবান্তর হয়নি। এরপরে সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সকলের মনেই নানারকম আশংকা। প্রায় ফাঁকা নওগাঁ শহরে বিকেলের মধ্যেই আরো ফাঁকা হয়ে যায়।

বিকেলে মেজর হকের সঙ্গে আবার দেখা করি। তাকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে কোনো অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছেন কিনা। এখনো তো তেমন কিছু পাচ্ছি না। আমি তখন তাকে সীমান্তের ওপারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করব কিনা জিজ্ঞাসা করি। তিনি চেষ্টা করে দেখতে বলেন। তার সাথে আলোচনায় এবং হেডকোয়ার্টারের তোড়জোড় দেখে বুঝতে বাকী রইলো না যে কোনো মুহুর্তে তিনি ঘাঁটি ত্যাগ করবেন। সন্ধ্যার পর সংগ্রাম পরিষদের অফিসেও আর কাউকে পাওয়া গেলো না। সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। 'মুক্তি' সিনেমার রাস্তার মাথায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জটিতে তখনো একজন অপারেটর ছিলেন। সেখান থেকে রাতে বলিহার হাউজের রাইফেল বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে ফোন করে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। এ পরিস্থিতিতে আমি অপারেটরের সহায়তায় পাঁচবিবি, আত্রাই, জয়পুরহাট ও পত্নীতলা পিসিও বগুড়া সার্কিট হাউজে অবস্থিত বগুড়া কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং রাজশাহীর সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর দিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেই। নওগাঁর পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেই। পরদিন ১৫ এপ্রিল সকালে হেডকোয়ার্টার শূণ্য থাকার খবর পাওয়া গেলো। আগের রাতেই রাইফেল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শহরও প্রায় শূন্য। প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে আমার শহরে থাকা মানে হানাদারদের হাতে পড়ে খামাখা জান দেয়া বিধায় একটি ব্যাগে কাগজপত্র ও একসেট বাড়তি কাপড় নিয়ে আমার বাসা-কাম-'জয় বাংলা'র দফতরে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। সীমান্ত এলাকায় তখন সুযোগমত লুটপাটের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। দু এক জায়গায় সন্দেহজনক লোকদের তথাকথিত 'চেকপোষ্টে আমার পরিচয় দিয়ে দলসহ ১৫ এপ্রিল রাত প্রায় ১১টার দিকে প্রহরাবিহীন নওগাঁ-পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করি। ভারতে এটাই ছিলো আমার প্রথম প্রবেশ।

ভারতে প্রবেশের কিছুদিন পর কোলকাতা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারীসহ কয়েকজন সদস্য আমাকে কোলকাতা থেকে 'জয় বাংলা' পুনঃপ্রকাশের পরামর্শ দেন। মুক্ত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'জয় বাংলা' সম্ভব হলে পুনরায় মুক্ত বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশিত হবে তাদেরকে আমার এ সিদ্ধান্তের কথা জানাই।

ভারত থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য বাংলাদেশী সাংবাদিকেরা বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্রিকা বের করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১১ই মে ১৯৭১ তারিখে দলীয় মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশস্থলের নাম দেয়া হয় 'মুজিবনগর'। কোলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার ২১/এ বালুহাক্কাক লেনে এ পত্রিকার দফতর ছিলো। কোলকাতাসহ ভারতের পত্রপত্রিকায় 'দৈনিক জয় বাংলা'র ব্যপক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ তাদের পত্রিকার নাম 'জয় বাংলা' রাখেন। এই দলীয় মুখপত্রটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। 'জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা'(জবাসস) নামটি অবশ্য আর কেউ ব্যবহার করে নি।

একাত্তরের ১৫ এপ্রিল মধ্যরাতে আমি ভারতের বালুরঘাট শহরে পৌঁছি। এটা পশ্চিম বাংলা রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সদর। পরদিন ১৬ এপ্রিল নওগাঁয় মেজর হকের সঙ্গে ১৪ এপ্রিলের আলোচনা মোতাবেক স্থানীয় এমএলএ শ্রী বীরেশ্বর রায় এবং পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাই। উভয়েই জানালেন বিষয়টি উচ্চতর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে কোনো সাহায্য দানের ব্যাপারে তারা কিছুই অবগত নন। এরপর ঐ দিনই খবরের কাগজ কিনে বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার' ও ইংরেজী দৈনিক 'অমৃত বাজার' পত্রিকার টেলিগ্রাফ ঠিকানা সংগ্রহ করে বালুরঘাট থেকে 'জবাসস' নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট পাঠাই। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই কোলকাতা পৌঁছে গেছেন এবং পরদিন ভোরে এক্সপ্রেস বাসে বালুরঘাট থেকে কোলকাতা রওয়ানা হই। কোলকাতায় পৌঁছে পত্রপত্রিকায় মুজিবনগর সরকার গঠনের খবর দেখলাম।

কোলকাতা আগে কখনো যাইনি। কাউকে চিনিও না। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে গেলাম। সম্পাদক শহরে ছিলেন না। বার্তা সম্পাদক কবি শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর ঠিকানা নিয়ে তার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে 'জয় বাংলা'র কপিগুলো দেই। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী বসু সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করে সব খবরাখবর নিলেন। তার বাাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ কোলকাতা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী তারাশংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং 'জয় বাংলা'র কপি উপহার দেই। তিনি সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। এরপর চৌরঙ্গীর কিড স্ট্রীটের স্টেট গেস্ট হাউজে যাই এবং ইনচার্জকে অনুরোধ করে রাতের জন্য একটি রুম পাই।

পরদিন ১৯ এপ্রিল সকালেই বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং নওগাঁ এলাকার বিস্তারিত খবর জানাই। তাকে বলি এখনো চেষ্টা করলে নওগাঁ এলাকাটি আমাদের দখলে রাখা সম্ভব। তাকে আরো জানাই সক্রিয় সাহায্য পেলে আমাদের বাহিনী বাংলাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল দখলে রাখতে পারে এবং আমাদের সরকারও দেশের অভ্যন্তরে থেকেই কাজ চালাতে পারে। তিনি আমাকে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য একটি লিখিত রিপোর্ট দিতে বলেন। আমি তখন মিশনের টাইপিষ্ট দিয়ে দেশে থাকাকালীন মুদ্রিত 'জবাসস'-এর প্যাডে একটি রিপোর্ট টাইপ করিয়ে দুই কপি জনাব হোসেন আলীকে দেই। জনাব হোসেন আলী এই রিপোর্টটি আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিবেন বলে জানান। আমার কাছে কোনো বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট নেই বিধায় আমাকে মিশন থেকে আমাকে একটি পরিচয়পত্র দেয়া হয়। একই দিনে মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী জনাব আরআই চৌধুরী,প্রেস এ্যাটাসে জনাব মকসুদ আলীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। এর ৩/৪ দিন পরে পুনরায় জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে মিশনে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জানান ১৯ তারিখের 'জবাসস'র রিপোর্টটি তিনি আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে পৌঁছে দিয়েছেন।

১৮ ও ১৯ তারিখ দুদিন ষ্টেট গেষ্ট হাউজে থাকার পর সেখানে অবস্থানরত গণপরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সুপারিশে আমাকে আরো ৭ দিনের জন্য গেষ্ট হাউজে থাকতে দেয়া হয়।

১৯ এপ্রিল কোলকাতার দৈনিক 'যুগান্তর' 'জবাসস' সম্পর্কিত এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দেশের বাইরে 'জবাসস' প্রচারিত প্রথম সংবাদটি ছাপা হয়। এতে উত্তরাঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং অবিলম্বে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ঐ দিনই ভারতের সর্ববৃহৎ সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করি এবং বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বের লেখক এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত জোরদার করার আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেই। পিটিআই তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে এটি প্রচার করে।

২০ এপ্রিল প্রায় সবগুলো দৈনিকের প্রথম পাতায় এ বিবৃতিটি ছাপা হয়েছে দেখতে পাই। ২১ এপ্রিল পিটিআই-র মাধ্যমে প্রচারিত আরেকটি বিবৃতিতে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্ব বিবেকের প্রতি আহবান জানাই। এতে বাঙালি মুসলমান নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানী বর্বরদের সাহায্য না করার জন্য আরসিডি জোটভুক্ত ইরান ও তুরস্কের মুসলমান ভাইদের প্রতিও আহবান জানাই। এতে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্যও আবেদন জানানো হয়। এটিও ২২ এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। এরপর ভারতের অপর সংবাদ সংস্থা উইএনআই'র কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী ইউআর কালকুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব সম্পর্কিত আমরা 'জয় বাংলা'র বিষেশ সংখ্যার রিপোর্টির উদ্ধৃতি দিয়ে ২৫ এপ্রিল উইএনআই দুটি রিপোর্ট প্রচার করে। ২৬ এপ্রিল এ রিপোর্ট বিভিন্ন দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়।

যুগান্তরের হেডিং ছিলো- ''বীরের এ রক্তস্রোত'।

Statesman-এর "Student Forced Pak Army Column Retreat"।

*-( অনুবাদঃ স্টেটসম্যানের শিরোনামঃ ‘ছাত্ররা পাক আর্মি বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে)*

দিল্লীর Times of India-"Many a Heroic saga from Bangladesh" ইত্যাদি।

*-( অনুবাদঃ দিল্লীর টাইমস অব ইন্ডিয়ার শিরোনামঃ ‘বাংলাদেশের অসংখ্য ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা‘)*

এর আগে ১৯ শে এপ্রিল আকাশবাণী, কোলকাতায় যোগাযোগ করি। ২১ এপ্রিলের সংবাদ পরিক্রমায় 'জয় বাংলা' সম্পর্কে এবং আমার প্রদত্ত বিবৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়।

এ সময়ের মধ্যেই কোলকাতার সব প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা যথা- আনন্দবাজার, *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, যুগান্তর, *অমৃত বাজার পত্রিকা, স্টেটসম্যান*, সাপ্তাহিক দেশ, অমৃত ইত্যাদির সাংবাদিকসহ কোলকাতা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী ও সদস্যদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। এভাবেই ভারতীয় তথা বিশ্ব প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে কোনো প্রকার সরকারী সাহায্য বা আনুকুল্য ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও অরাজনৈতিক প্রচেষ্টায় ভারতে প্রবেশের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হই।

কোলকাতায় অবস্থানকালে সাংবাদিক ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কোলকাতা সফররত সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গেও ২৮ এপ্রিল সাক্ষাৎ করি এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাকে অবহিত করি। শ্রী নারায়ণ তার এই সফরকালে বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রী নারায়ণ এবং তার নেতৃত্বাধীন সর্বোদয় ও গান্ধী আদর্শবাদী আন্দোলনের ভারতব্যাপী শত শত প্রতিষ্ঠানের শাখা উপশাখাগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরগুলোতে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। শ্রী নারায়ণ ভারতে এবং ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং ব্যাপক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় প্রায় প্রতিদিন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। তিনি আমাকে বাংলাদেশের একজন তরুণ সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। একদিন সে তার অফিসের টেবিলের উপর রক্ষিত রাশি রাশি কাগজপত্র দেখিয়ে আমাকে বলল, " দেখো রহমত, এগুলো যুগান্তর এবং অমৃতের পাঠকদের কাছ থেকে পাওয়া তোমাদের বাংলাদেশের এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা, গান ইত্যাদি। এবং প্রতিদিনই আসছে। দুচারটি পড়ে দেখলাম। সবই আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখা। এ কথা সত্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সকল বাংলা ভাষাভাষি বাঙালির মনকেই আবেগ আপ্লুত করেছিলো।

এপ্রিলের শেষে এক সন্ধ্যায় আবার আমাদের মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। তাকে বললাম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে রাজধানী দিল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য অবাঙালি অধ্যূষিত এলাকায় আমাদের নিজস্ব লোকজন নেই বললেই চলে। আর এসব এলাকাতে আমাদের বিপক্ষে পাকিস্তানীদের অপপ্রচার চলছে। আমি দিল্লী থেকে এসব প্রচারণার পাল্টা জবাব এবং সর্বভারত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারীভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে চাই। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন এবং আমাকে কোলকাতা ও দিল্লী মিশনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে বলেন।

দেশ ছাড়ার সময় আমার সঙ্গে যে স্বল্প টাকা ছিলো তা বদলিয়ে ভারতীয় ২৫০ টাকার মতো পেয়েছিলাম। কোলকাতায় ১৯ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ষ্টেট গেষ্ট হাউজে থাকার সুযোগ হয়েছিলো বলে থাকা বাবদ কোনো ব্যয় হয়নি। তবে খাওয়া ও যাতায়াত ব্যয়ে পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। পশ্চিম বাংলার বিধানসভার অধিবেশনের সময় এগিয়ে আসছিলো বলে ষ্টেট গেষ্ট হাউজ খালি করার সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এ ভবনটি এমএলএ হোষ্টেল হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এ পরিস্থিতিতে যুগান্তরের সাংবাদিক শ্রী পরেশ সাহা প্রাক্তন ঢাকা জেলাবাসী পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত শ্রী তরুণ গুহের গোবরা অঞ্চলের বাসায় আমার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। শ্রী গুহ আমার দিল্লী যাবার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং তার মহল্লার তরুণদের সমিতি 'আদর্শসংঘ'র সদস্যরা চাঁদা তুলে আমাকে ১০০ টাকা দেন। সাহিত্যিক শ্রী শংকরের সুপারিশে উল্টোরথে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি লেখা দিয়ে আরো ৫০ টাকা পাই। এভাবেই ৪ঠা মে ট্রেনযোগে দিল্লী রওয়ানা হয়ে পরদিন ৫ মে দুপুরে দিল্লী ষ্টেশন থেকে শ্রী গুহের দেয়া ঠিকানায় তার ভাগ্নের বাসায় যাই। সেখান থেকে যুগান্তরের দিল্লী অফিসে এবং তাদের পরামর্শমত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বাধীন দিল্লীর মহিলাদের 'বাংলাদেশ এ্যাসিসট্যান্স কমিটি'র অফিসে যাই। কমিটির সহায়তায় দিল্লীর জয়সিংহ রোডের ওয়াইএমসিএ ট্যুরিষ্ট হোষ্টেলে এক সপ্তাহের জন্য আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

এখানে প্রথমেই দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক ও শন্যান্য সাময়িকী কিনে প্রচারণার গতি প্রকৃতি আঁচ করে নেই। *আইইএনএস (ইন্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি)* ভবনে অবস্থিত কোলকাতার যুগান্তর ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরোর কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি রাজধানীর পত্র পত্রিকাগুলো আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভুতিশীল তবে প্রভাবশালী হিন্দুস্তান টাইমসের বিশেষ করে *চিঠিপত্র* কলামে বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব বিরোধী বিতর্ক চলছে। কয়েকদিনের পত্রিকা পড়ে আমার সে ধারণাই হয়েছে।

যেমন ৭ তারিখের পত্রিকায় লক্ষ্ণৌ থেকে তিন মুসলমান ভদ্রলোক লিখেনঃ-

"............ the majority of Indian Muslims must not be expected to encourage those who are torch bearers of disruptive tendencies in Pakistan ........”

*-(অনুবাদঃ “...পাকিস্তানে যারা বিধ্বংসী কাজ-কারবার করছে, তাঁদের উৎসাহ দেয়া ভারতীয় মুসলিমদের উচিৎ হবে না...”)*

শেখ মুজিবের কার্যকলাপের নিন্দা করে লেখা হয়- “........the responsibility of the carnage and bloodshed in East Bengal lies entirely on him"

-(অনুবাদঃ “...পূর্ব বাংলায় রক্তপাত এবং গণহত্যার দায়ভার সম্পূর্ন শেখ মুজিবের উপর বর্তায়...”)

এছাড়া আরো অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হয়।

৯ মে'র সংখ্যায় 'Bangladesh and the Indian press' *(বাংলাদেশ এবং ভারতীয় প্রেস)* শিরোনামে প্রকাশিত ৩টি চিঠিতে লেখকেরা ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গণহত্যার খবর ফলাও করে প্রচারের জন্য ভারতীয় পত্রপত্রিকার নিন্দা করেন। তারা এ প্রচারকে অতিরঞ্জিত, নীতি বহির্ভূত বাড়াবাড়ি, পরোক্ষভাবে খোদ ভারতীয় অখন্ডতারও প্রতিকুল বিধায় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী বলে আখ্যয়িত করেন। এসব চিঠিপত্র এ পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থনে লিখা হয়।

এসব বক্তব্যের বিপক্ষে এবং আমাদের স্বপক্ষে কোনো লেখা ছাপা হচ্ছে না দেখে এ প্রচারণার একটি যথাযথ প্রত্যুত্তর দেবার সিদ্ধান্ত নেই এবং 'In defense of Mujib' (শেখ মুজিবের প্রতিরক্ষায়) শীর্ষক একটি দীর্ঘ পত্র লিখে এ পত্রিকার জাদরেল সম্পাদক মিঃ বি জি ভার্গিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। স্বাধীনচেতা এ সাংবাদিক সরকারী মতামতেরও খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। আমি তাকে বলি, 'আপনাদের পত্রিকায় আমাদের বেশ সমালোচনা করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের স্বপক্ষে কিছুই দেখছি না'। এই বলে ব্রীফকেস খুলে আমার টাইপ করা চিঠিটা তার হাতে দেই। তিনি মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়েন। আমি চিঠিটা শেষ করেছিলাম ‘জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা' দিয়ে। তিনি বলেন, 'এ দুটি বাক্য বাদ দিতে হবে, এগুলো শ্লোগান'। আমি বলি প্রথমটি বাদ দিতে পারেন তবে দ্বিতীয়টি রাখতে হবে কারন ‘জয় বাংলা’ আমাদের জাতীয় শ্লোগান। তিনি আমাকে প্রথম শ্লোগানটা বাদে বাকী চিঠিটা হুবহু ছেপে দিবেন বলে জানান।

মিঃ ভার্গিজের কাছে যুক্তি সহকারে আমাদের সংগ্রামের কারণগুলোও ব্যাখ্যা করি। এরপরে তার পত্রিকার কলামে বাংলাদেশবিরোধী বিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। ১০ মে আমার চিঠিটা ছাপা হয়। ১৩ মে আমাদের সমর্থন এবং পাকিস্থানপন্থীদের নিন্দা করে একসাথে ৫ টি চিঠি ছাপা হয় এবং ১৫ মে লক্ষ্ণৌর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হাবিবুল্লাহ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রফেসর কে এ ফারুকীর পাকিস্তানীদের নিন্দা এবং আমাদের আন্দোলন ও নেতাকে সমর্থন করে লিখিত ২টি চিঠি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রভাবশালী হিন্দুস্তান টাইমসের পাতায় পাকিস্থানপন্থীদের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রফেসর ফারুকী পাকিস্তানী বাহিনীকে তৈমুর, চেংগীস ও হালাকু খানের মতো বর্বর বলে আখ্যায়িত করেন।

একই সময়ে দিল্লীর প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। ১০ মে ইউএনআই দিল্লী থেকে আমার রাজধানীতে অবস্থান এবং কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিন প্যারার একটি সংবাদ প্রচার করে। এছাড়া আকাশবাণীর(অল ইন্ডিয়া রেডিও) কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। আকাশবাণীর মহাপরিচালক শ্রী এ কে সেনের পরামর্শ অনুযায়ী আকাশবাণীর বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের, বিশেষ করে উর্দু সার্ভিসের জন্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কতগুলো কথিকা রচনা করি। একটি সিরিজ হিসেবে প্রচারের জন্য তিনভাগে এগুলো লিখি। মূল শিরোনাম ছিলো 'Recent event in Bangladesh' (পাকিস্তানে সাম্প্রতিক ঘটবাবলী)। উপ-শিরোনাম ছিলো 'Historical Background (ঐতিহাসিক পটভূমি)। ১৯৪৭ সালের আযাদী থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঘটনার ভাবাবেগবর্জিত সংক্ষিপ্ত তথ্যমূলক বিশ্লেষণ; Election in Pakistan and Aftermath (নির্বাচনের ফলাফল, অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপট) এবং শেষেরটি Genocide in Bangladesh (২৫ মার্চের পরের গণহত্যার বিবরণ এবং পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারণার জবাব)। ইংরেজীতে লেখা এ কথিকাগুলো উর্দুতে অনুবাদ করে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের বহিবিশ্ব উর্দু সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের ২, ৪ ও ৮ জুন প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। প্রতিটি কথিকার জন্য ১০ মিনিটের বেতার সময় বরাদ্দ ছিলো। এছাড়া আকাশবাণী দিল্লীর 'হামারে মেহমান' অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের উপর আমার একটি ১০ মিনিটের টিভি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় ১৪ মে। এটি উর্দুতে গৃহীত হয় এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে আমার বক্তব্য পেশ করি। একই দিন দিল্লী টেলিভিষন তাদের 'আজকাল' অনুষ্ঠানে আমার একটি ১০ মিনিটের টিভি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। মুক্তিযুদ্ধের উপর এ সাক্ষাৎকারে একই সাথে দিল্লী সফররত আওয়ামী লীগের ধর্মীয় ফ্রন্ট আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি জনাব খায়রুল ইসলাম যশোরীর সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়। শ্রোতাদের সুবিধার্থে এটি হিন্দিতে গৃহীত হয় এবং আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে শ্রোতাদের বোধগম্যভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করি। মাওলানা যশোরী তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ভারতীয় ওলামাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এছাড়া তরুনদের জন্য সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান যুব বাণীতেও আমার আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলো উর্দু অনুবাদ সাংবাদিক জনাব নজমুল হাসান কয়েকটি উর্দু পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মে এবং জুন এই দুই মাসে দিল্লীস্থ প্রচারমাধ্যমগুলোর সহায়তায় ব্যাপক প্রচার চালাই। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলোর মূল ইংরেজীতে স্ক্রীপ্ট সাইক্লোস্টাইল করে 'জবাসস' এর External Bureau (বহিঃদপ্তর) নাম দিয়ে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য এলাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকার ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাই। দিল্লীর অনেক প্রবীণ সাংবাদিক বন্ধু আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করতেন, "রহমত, আপনার 'জবাসস'র External Bureau (বহিঃদপ্তর)-টা কোথায়?" আমিও হেসে জবাব দিতাম, "আমাদের সব কিছুই এখন চলমান, আজ এখানে কাল ওখানে। আমার হাতের ব্রীফকেসটাই আপাততঃ 'জবাসস' এর চলমান ব্যুরো"।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুনদের একটি মুখপত্র AEON (কাল) এর সম্পাদক তাদের বাংলাদেশ সংখ্যার জন্য আমার একটি লেখা নেন। এ সময়েই দিল্লীতে যাত্রাবিরতীকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউজে অবস্থানরত ডঃ এ আর মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

দিল্লী যাবার পূর্বে কোলকাতা থেকে একজন উত্তর কোরীয় সাংবাদিককে সাথে নিয়ে বনগাঁও এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে ক্যাম্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। কয়েকটি ছবিও নিয়েছিলাম। এর উপরে ভিত্তি করে "UN must rush to the rescue of victims" (জাতিসংঘের অতিসত্বর আক্রান্তদের উদ্ধারে এগিয়ে আসা উচিৎ) নামে একটি সচিত্র রিপোর্ট তৈরী করি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজী, উর্দু, হিন্দি, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষায় মুদ্রিত BLITZ (ব্লিটজ)-এর ১৫ মে এটি প্রকাশিত হয়।

“জবাসস এর External bureau' (বহিঃদপ্তর)-এর নামে কিছু বাংলা দেশাত্মবোধক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সাইক্লোস্টাইল করেও প্রচার করা হয়েছিলো। এ সম্পর্কিত কিছু রিপোর্ট কোলকাতার অমৃত ও দেশ পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিলো। দেশ পত্রিকার নিয়মিত ফিচার 'ঘরোয়া'র লেখক 'শ্রীমতি'(শ্রীমতি সুজয়া সেন)-এর সঙ্গেও দিল্লীতে আমার পরিচয় হয়েছিলো। মাতৃসমা এ মহিলার স্নেহ আমার অনেকদিন মনে থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদ ছিলো। জওয়াহরলাল নেহেরু প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পাদকীয় পাতায় 'জবাসস' প্রচারিত "Bengaless are not cowards" (বাঙালিরা কাপুরুষ নয়) নামক একটি কবিতাও ছাপা হয় ১৩ মে।

এছাড়া ব্যাঙ্গালোর ও হুবলী থেকে একযোগে প্রকাশিত ঐ এলাকার কানাডা ভাষার Samyukta karnataka group of papers (সমুক্ত কর্ণাটক গ্রুপ অব পেপারস) মে'র শেষে আমর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। দিল্লীর কয়েকজন মুসলমান সাংবাদিক বন্ধু কিছু উর্দু পত্র-পত্রিকাতেও আমার লেখার অনুবাদ পড়েছেন বলে আমাকে জানান। মোট কথা আমার সীমিত প্রচেষ্টায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই যতটা সম্ভব প্রচারকার্য চালিয়েছিলাম এবং দিল্লীর সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। এ সময়ে শ্রী ফণী মজুমদারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি সংসদীয় দল দিল্লী সফরে আসেন। বেগম নুরজাহান মুর্শেদও এ দলে ছিলেন। দিল্লী প্রেসক্লাব তাদের একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করে। শ্রী মজুমদার ও বেগম মজুমদার এ সভায় বক্তৃতা দেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

জয়সিংহ রোডের ট্যুরিষ্ট হোষ্টেল থেকে সাংবাদিক বন্ধু শ্রী যতীন্দ্র ভাটনগরের বাসায় কিছুদিন থাকি। এরপরে বাকী সময় দিল্লীস্থ শান্তি পরিষদের আন্তর্জাতিক হোষ্টেলে তাদের মেহমান হিসেবে থাকি। কথিকা ও সাক্ষাৎকারের জন্য আকাশবাণী ও টেলিভিশন এবং অন্যান্য পত্রিকা থেকে দু একটি লেখার জন্য প্রাপ্ত সম্মানীর টাকায় আমার খরচ চলে যায়। থাকার জন্য কোনো খরচ হয়নি। খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু খরচ হয়েছে। যাতায়াত, পত্র পত্রিকা কেনা এবং ডাক খরচ সম্মানীর টাকা থেকে চালানো সম্ভব হয়েছিলো।

গান্ধী শান্তি পরিষদের হোষ্টেলে অবস্থানকালে বেনারসের গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব ষ্টাডিজ-এর যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক শ্রী সুগত দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ এ প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক পরিচালক ছিলেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাকে তাদের ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি সময়মত যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দেই। এ হোষ্টেলে অবস্থানকালে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। তাদেরকেও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেই। এছাড়া অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের সেক্রেটারী শ্রী জি এল পুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার পরিষদও আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করেছিল।

দিল্লীতে অবস্থানকালে আমাদের কুটনৈতিক প্রতিনিধি পাকিস্তান হাই কমিশনের দলত্যাগী সাবেক দ্বিতীয় সচিব জনাব কে এম শাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ রক্ষা করেছি। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে খবর প্রচারিত হয়, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নতুন সমরাস্রের চালান পাঠাচ্ছে। বাংাদেশের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থবিরোধী এ আক্রমণের প্রতিবাদ করা হয়। দিল্লীতে ঐ সময়ে মাত্র কয়েকজন খাস বাঙালি ছিলাম। সে কারণে অন্যান্য বাঙালি ও অবাঙালি সমর্থকদের সহায়তায় ২৫ জুন ১৯৭১ সালে মার্কিন দূতাবাসের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। দিল্লীর সাংবাদিক বন্ধুদের সহায়তায় দেশী বিদেশী সংবাদ সংস্থা এবং টেলিভিশন প্রতিনিধিদের দ্বারা এ মিছিলের খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা হয়। দূতাবাসের গেটে রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধির কাছে জনাব শাহাবুদ্দিন প্রতিবাদলিপি অর্পণ করেন। ভারতের সকল প্রধান প্রধান দৈনিকে এ বিক্ষোভের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো।

দিল্লীতে আমার কাজ কর্মের বিস্তারিত রিপোর্ট কোলকাতা মিশনে জনাব হোসেন আলীর কাছে পাঠাতাম। জুনের শেষে দিল্লী থেকে কোলকাতা ফিরে এসে জনাব হোসেন আলী, প্রেস এ্যাটাশে জনাব মকসুদ আলী ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কোলকাতা ফেরার পর আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে ৩রা জুলাই "জানেন ওদের মতলবটা কি" শীর্ষক আমার একটি ১০ মিনিটের কথিকা পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় এবং পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। এতে আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বাঙালিদেরকে জাতিগতভাবে পঙ্গু করার পাকিস্তানী চক্রান্ত সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করে হুশিয়ার থাকবার অনুরোধ জানাই। এর পরে আমি যশোর সীমান্ত এলাকায় যাই এবং নানা প্রকার খবরাখবর সংগ্রহ করি। এছাড়া নওগাঁ এলাকার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বালুরঘাটে যাই। সেখানে নওগাঁর এমএসএ জনাব বায়তুল্লাহ ও অন্যান্যরা ছিলেন। ঐ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের অন্যতম সংগঠক নওগাঁর এমএ জলিলের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে দেখি এবং খবরাখবর সংগ্রহ করি।

কোলকাতায় অবস্থানকালে আমি গান্ধী শান্তি পরিষদের কোলকাতা কেন্দ্রের আতিথ্য লাভ করি। এ প্রতিষ্ঠানও সীমান্ত এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলোতে 'অক্সফাম'-এর সহযোগীতায় নানা রকম ত্রাণ তৎপরতার ব্যাপকতা সম্পর্কে তার কাছেই একটি ভাল ধারণা পাই।

জুলাইয়ের শেষে উত্তর ভারতের বেনারস শহরে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন গান্ধীবাদী শিক্ষা ইন্সটিটিউট-এর বাংলাদেশ বিষয়ক কাজকর্মে যোগ দেবার জন্য দিল্লীতে থাকাকালীন যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক দাশগুপ্তের আমন্ত্রণ অনুযায়ী বেনারস যাই। কনসালট্যান্ট অন বাংলাদেশ এ্যাফেয়ার্স হিসেবে প্রাথমিকভাবে তিন মাসের জন্য ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুগক্ত থাকি। আমাকে ৫০০ টাকা সম্মানী দেয়া হয়। এ ফেলোশীপটি তিন মাস পর আবার এক বৎসরের জন্য বাড়ানো হয়েছিলো তবে এর দুমাস পর দেশে ফিরে আসি। ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক ও সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী দিল্লীতে ‘বাংলাদেশ নিয়ে বৈশ্বিক সম্মেলন’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ সমর্থক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এ কনফারেন্স ব্যবহারের জন্য নানা রকম ওয়ার্কিং পেপার ইনস্টিটিউট থেকে তৈরী করা হয়। আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব পত্র পত্রিকার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ‘Genocide in Bangladesh', 'Bangladesh in world press' (বাংলাদেশে গণহত্যা এবং বিশ্ব পত্রিকায় বাংলাদেশ) শিরোনামে দু’টি পুস্তিকা প্রস্তুত করি এবং অন্যান্য ওয়ার্কিং পেপার তৈরীতেও অন্যদের সাহায্য করি। এ পুস্তিকা দুটি এবং ওয়ার্কিং পেপারগুলো ঐ কনফারেন্সে বিতরণ করা হয়।

আগষ্ট মাসে খবর বের হয় যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিচার করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকবান ব্যক্তিরা এর প্রতিবাদ করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। উত্তর ভারতের বেনারসেওইনস্টিটিউটের যুগ্ম পরিচালক শ্রী সুগত দাশ গুপ্তের নেতৃত্তে বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আমিও এতে যোগ দেই। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রও এতে অংশ নেন।

সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে বেনারসে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকালে শ্রী নারায়ণ আমাকে বলেল, ভারতের অবাঙালি অধ্যুষিত অনেক এলাকাতেই পাকিস্তানপন্থীরা আপনাদের বিরুদ্ধে ২৫ মার্চের আগেই বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বিহারী নিধনের অভিযোগ করে প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে আপনাদের পক্ষে বক্তব্য রাখার সময় আমাকেও মাঝে মাঝে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, এ অভিযোগ কতটা সত্যি? আমি তাকে জানাই ২৫ মার্চের আগে বাঙালিরা এ ধরনের কাজ ব্যাপক হারে করেছে এ অভিযোগ সত্যি নয়। দু এক জায়গায় এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা অবশ্য ঘটেছে তাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এটাকে ব্যাপক বিহারী হত্যা কোনো মতেই বলা চলে না। কোনো কোনো এলাকায় বাঙালিরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ২৫ মার্চে পাকিস্তানী গণহত্যা শুরুর পরে আমাদের দখলাধীন কিছু কিছু জায়গায় কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে সেটা সত্য। আর তার জন্য দায়ী হানাদারেরা এবং তাদের সহযোগী বিহারীরা। এর উত্তরে তিনি বলেন ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে আমি আমি আপনার কাছ থেকে নিশ্চিত হলাম। ২৫ মার্চের ঘটনার পরের দায়-দায়িত্ব তো পাকিস্তানীদের। যদিও পাকিস্তান সরকার তাদের শ্বেতপত্রে আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছে। এরপরে তিনি আমাদের ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢকা, পশ্চিম পাকিস্তান এবং কিছু নামকরা বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে এ অভিযোগ খন্ডন করে ব্যাপক প্রচারের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরী করার চেষ্টা করতে বললেন। তিনি বলেন, এ রিপোর্ট ভাবাবেগবর্জিত এবং নিরপেক্ষ হতে হবে। এ আলোচনার পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর বিদেশী পত্রিকার ঐ সময়ের কপি খোজার জন্য দ্বিতীয়বার দিল্লী যাই। আমার রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য আমি দিল্লীর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ লাইব্রেরী, বৃটিশ হাই কমিশন লাইব্রেরী এবং ইউএস আইএস লাইব্রেরীতে ঢাকা, পিন্ডি, প্যারিস, লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের প্রধান প্রধান পত্রিকাসমূহ অনুসন্ধান করি।

এসব পত্রিকার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 'Pakistan propaganda-is based on facts?' (পাকিস্তানি প্রচার-আসলেই কি সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রচারিত?) নামে একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা রচনা করি। এতে পাকিস্তান সরকারের 'শ্বেতপত্রে' বিহারী নিধনেত অভিযোগও খন্ডন করা হয়। আমাদের কোলকাতা মিশনও আমার এ কাজে আগ্রহ দেখান এবং এ রিপোর্টের কপি পাঠানোর অনুরোধ করেন। আমি যথাসময়ে তা পাঠাই। ইনস্টিটিউট থেকে মুদ্রন করে এ রিপোর্টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আমিও ডাকযোগে বিভিন্ন সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে এটি পাঠাই।

নভেম্বর মাসে পুনরায় কোলকাতা আসি। এ সময়ে জানতে পারি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী কোলকাতায় অবস্থান করছেন। আমি মিশন থেকে ঠিকানা নিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্ট্রীটের হোটেল পূর্বরাগে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অনেক আলোচনা হয়। তিনি তখন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগীতায় মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এবারে কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে মেঘালয় সীমান্ত পথে দেশেত অভ্যন্তরে ঢোকার প্রস্তুতি নিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাই। ততদিনে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে শিলিগুড়ি থেকে ফের কোলকাতা ফিরে আসি। সীমান্তে জোরেশোরে লড়াই চলছে শুনে নভেম্বরের শেষে কোলকাতা ছেড়ে নওগাঁ সীমান্ত নিকটবর্তী ভারতীয় শহর বালুরঘাট রওয়ানা হই। কিন্তু বালুরঘাটে তখন পাকিস্তানী শেলিং-এর কারনে শহর প্রায় ফাকা হয়ে গিয়েছিলো বলে মালদা থেকে পুনরায় কোলকাতা ফিরে আসি। খবর পাই ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একযোগে লড়াই চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর পরে ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজের সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেনারসে যাই। সেখান থেকে শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য পাটনা যাই ১১ ডিসেম্বর। শ্রী নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ১৩ ডিসেম্বর কোলকাতা পৌঁছি। শত্রুমুক্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছিলো। কোলকাতায় সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় এক্সপ্রেস বাসযোগে নওগাঁ সীমান্তের নিকটবর্তী বালুরঘাট রওয়ানা হই। বিকেলে বাসে বসেই রেডিওতে ঢাকায় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শুনি। ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বালুরঘাট শহরে থাকি। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার রাস্তাঘাটে পাকিস্তানী মাইন পোঁতা ছিলো এবং ভারতীয় বাহিনী মাইন অপসারনের কাজ চালাচ্ছিলো। ২২ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর জীপে বালুরঘাট ছেড়ে নওগাঁ ফিরে আসি।

-মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ

সম্পাদক, দৈনিক জয়বাংলা, নওগাঁ

জুন, ১৯৮৪



[লিও](https://www.facebook.com/leo.amarblog) এবং [অমিতাভ বড়ুয়া](https://www.facebook.com/amitav.barua.12?fref=ts)

<১৫,৩৬,২৬৩-৯৩>

# [অধ্যাপক রেহমান সোবহান]

সত্তরের ডিসেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধে আমার সংশ্লিষ্টতা শুরু হয়। যদিও দেশের অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মতো আমিও এক দশক পূর্বে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা বরাবরই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। সত্তরের দশকে বিভিন্ন উন্মুক্ত ফোরাম এবং প্রফেশনাল ও জনপ্রিয় প্রকাশনায় আমি আমার দৃষ্টিতে আঞ্চলিক বৈষম্য এবং পাকিস্তানকে দু’টি ভিন্ন অর্থনীতির আলোকে দেখার কথা লিখতে থাকি। এই দর্শনগুলো জনগণের মাঝে প্রবলভাবে আলোচিত হয় এবং এভাবেই আমরা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর চোখে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠি।

বাঙালি অর্থনীতিবিদদের এইসব আলোচনা পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকদের কাছে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে খুব দ্রুত পৌঁছে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে প্রফেসর নুরুল ইসলামের সাথে আমি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে উপস্থিত ছিলাম। সে বছরেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে সভায় অধ্যাপক আখলাকুর রহমান, মোশারফ হোসেন এবং আমি সংযুক্ত ছিলাম।

১৯৬১ সালের প্রথম অর্থ সম্মেলন (যেখানে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম একজন সদস্য ছিলেন এবং আমি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের উপদেষ্টা ছিলাম), ১৯৬৫ সালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (যেখানে মোশারফ হোসেন এবং আমি উভয়েই সদস্য ছিলাম), ১৯৭০ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (যেখানে অধ্যাপক মাজহারুল হক, নুরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান এবং আমি সহ সকলেই সদস্য ছিলাম) প্রভৃতি সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের সাথে পাকিস্তানের পরিকল্পনাবিদ ও নীতি নির্ধারকদের দর্শনে প্রবল পার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা যায়।

১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত আমি সাপ্তাহিক ফোরামের নির্বাহী সম্পাদক ছিলাম। সেখানে আমি জনতার দরবারে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে প্রধান সামরিক আইন উপদেষ্টা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম, এম আহমেদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি।

সেই সব গবেষণা এবং বাংলাদেশের অধিকার নিয়ে জনতার কাতারে বাঙালি অর্থনিতিবিদদের প্রত্যক্ষ অবস্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের পালে প্রবল হাওয়া লাগায়। আমাদের অনেকে তখন প্রায়শঃই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় বসতেন।

আওয়ামি লীগের ৬ দফা আন্দোলন আমাদের লেখালেখি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। যদিও আমার জানা মতে কোন অর্থনীতিবিদ সেই দফাগুলো লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন না।

১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকলিপি প্রস্তুতে পরামর্শ দেবার জন্য অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে ডেকেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরিতেও সেই বছরের গ্রীষ্মে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ডঃ এ, আর খান, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ হাসান ইমাম এবং আমি ডঃ কামাল হোসেনের সাথে করাচিতে দেখা করেছিলাম।

অবশ্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের আমাদের অবদান অনিয়মিত ছিল। যাই হোক, সত্তরের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের সেই ব্যাপক নির্বাচনী বিজয়ের পর নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান তৈরি করার উদ্যোগ নিলেন। উল্লেখ্য, এই ৬ দফার ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিল। উনি এরকম একটি সংবিধানকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য আলোচনায় বসতে চাইলেন যেন ৬ দফা কেবল নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং এটি যেন জাতীয় পরিষদের সমঝোতার টেবিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে আসে এবং দেশের জন্য একটি কর্মময় সংবিধান সৃষ্টির পথে অবদান রাখে।

নির্বাচনের পরের মাস থেকে সংবিধান নিয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে একের পর এক মিটিং বসতে লাগলো। সেখানে আওয়ামী লীগের হাই কম্যান্ড তাজউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খোন্দকার মোশতাকসহ ডঃ কামাল হোসেন, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং আমি উপস্থিত থাকতাম। বুড়িগঙ্গার পাড়ে একটি বাড়িতে সারা দিনব্যাপী আলোচনা চলতো। একাডেমিশিয়ানদের পাশাপাশি ডঃ কামাল হোসেন সবচেয়ে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতেন। তাজউদ্দিন আহমেদের গভীর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি খুব সহজেই কঠিন কঠিন টেকনিকাল ইস্যুগুলোকে মৌলিক বিষয়াদিতে ভেঙে ফেলতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সহজাত ধারালো চিন্তাধারার মাধ্যমে সেখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। সেই গ্রুপের কাজ শেষ হবার পর আওয়ামীর হাতে একখানা নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত ছিল এবং সমঝোতার টেবিলে যে কোন ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংলাপের জন্য তখন আওয়ামী লীগ পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো কি সংবিধান সংশোধন বা ৬ দফা নিয়ে কিছু ভাবছিলেন? তা জানার জন্য বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন আহমেদের অনুরোধে আমি একাত্তরের জানুয়ারিতে ইনফর্মালভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে গেলাম।

লাহোরে আমি পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত মুবাশ্বের হাসান ও মিয়া মাহমুদ আলি কাসুরি সাথে দেখা করলাম। শুনলাম, উনারা কেউই সংবিধান সংশোধন নিয়ে তেমন কিছু ভাবেন নাই! তাঁরা ৬ দফাকে শুধু নির্বাচনে জয়লাভের ফাঁকা বুলি ভাবছিলেন! স্বাধীনতার পর জেনেছিলাম যে আমাদের সেই আলোচনার মাঝের কিছু তথ্য কাসুরি সাহেব পাকিস্তানের মিলিটারি গোয়েন্দাদের জানিয়েছিলেন এবং সেই মোতাবেক যুদ্ধকালীন গ্রেপ্তারকৃত ডঃ কামাল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

তারপর আমি লাহোর থেকে করাচি গেলাম। দেখা করলাম ব্যারিস্টার রাফি রেজার সাথে। উনি ভুট্টোর সংবিধান সংক্রান্ত উপদেষ্টা ছিলেন। জানতে পারলাম যে সামনের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান সংক্রান্ত পাকিস্তান পিপলস পার্টির অবস্থান নিয়ে কর্মপরিকল্পনা করতে তিনি ভুট্টো কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছেন। বাস্তবে উনি খুব কম কাজই করেছিলেন কারণ ভুট্টো নিজেই সংবিধান সংশোধন নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না। ভুট্টর আরেকজন মুখ্য লেফটেন্যান্ট আবদুল হাফিজ পীরজাদা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ঢাকায় ফিরে আমি বঙ্গবন্ধুকে রিপোর্ট করলাম যে পিপিপি সংবিধান সংশোধন নিয়ে তেমন সিরিয়াস নয়।

এই বিষয়টা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল একাত্তরের জানুয়ারির শেষে, যখন পিপিপি-র লোকজনসহ ভুট্টো ঢাকায় আসলেন। তাজউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে উনারা ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের চেয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয়ে আলোচনা করতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। সেই সফর চলাকালীন আমি রাফি রাজা, মুবাশ্বের হাসান এবং পিপিপি-র শক্তিশালী নেতা মেহরাজ মোহাম্মদ খানের সাথে কিছু আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু সেই আলোচনাগুলো সুনির্দিষ্ট ছিল না, বরং ছিল আধা-দার্শনিক গোছের। অন্যরা পিপিপি-আওয়ামীর এই সংলাপ সম্পর্কে আমার চেয়ে আরো ভালো বর্ণনা দিতে পারবেন। যদিও উনাদের অনেকেই আজ সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। যতদূর বুঝলাম, ১ লা মার্চের আগ পর্যন্ত ইয়াহিয়া কিংবা পিপিপি ৬ দফা নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার কথা ভাবেন নাই। যতদূর জানি, আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মাঝে কখনোই ৬ দফা বাস্তবায়নের আসল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয় নাই। যখন বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়েছিল, তখন একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের ৫ মিনিট আগে সাংবিধানিক ইস্যুগুলো ৬ দফা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল এবং জেনারেলরা আগেই রক্তপাত ও অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন।

মার্চের ১ তারিখের আগ পর্যন্ত শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতিতে আমার লেখালেখির মাধ্যমে আমি উপরের বিষয়গুলো সম্পর্কে ফোরামে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। পাকিস্তান সমস্যার সর্বশেষ সমাধান যে ৬ দফাকে রাজনৈতিকভাবে অনুধাবন করা, সেটাই আমার লেখার মূল বক্তব্য ছিল। এটা ছাড়া একটা পথ অবশিষ্ট আছে। তা হলো গণসংগ্রাম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অল্প কিছু বাঙালি শুধু সে সময় পাকিস্তান সৃষ্টির দর্শনের সাথে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তবে প্রশ্ন ছিল একটাঃ আলাদা হয়ে যাওয়া কি সাংবিধানিকভাবে হবে? নাকি যুদ্ধের মাধ্যমে?

১ লা মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাংবিধানিক সভা স্থগিত করার ঘোষণা আমার মাথায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তার জন্ম দেয়। ঐ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে ডাকা অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের সীমানায় পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। সেই রাজনৈতিক কর্তৃক আর কোন দিন ফিরে আসে নি। ২৬ শে মার্চ, ১৯৭১-এর পর পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার সকল চেষ্টাকে বাংলাদেশের লোকজন বিদেশী সশস্ত্র বাহিনীর দখলদারিত্ব হিসেবে দেখেছে।

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক অভূতপূর্ব সফলতার পাশাপাশি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন প্রয়োজনীয় নাগরিক এবং অর্থনৈতিক সেবা প্রদানে সংকট সৃষ্টি করেছিল। যখন প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের আহবানে সাড়া দিয়েছিল, তখন আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট ব্যতিত পাকিস্তান সরকারের সকল নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। দেশের সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়া রোধে এই শূন্যতা কাটিয়ে ওঠা অপরিহার্য ছিল। ফলে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে সেনাবাহিনীকে ক্যান্টনমেন্টে ফেরত যাবার আদেশ দিলে বঙ্গবন্ধু দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর এই দিন থেকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জন করে।

অদ্ভুতভাবে লক্ষণীয় যে, এই সময়ে বাংলাদেশের কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ অবিভক্ত পাকিস্তানের অর্থনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে সমস্যাসমুহের দিকে মনোনিবেশ করছিলেন। যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থপ্রেরণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, পাকিস্তানের টাকশাল হতে ছাপানো মুদ্রার সরবরাহের সীমা নির্ধারণ, রপ্তানী নীতিমালা এবং রপ্তানীমূল্য পরিশোধের উপায়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং কাঁচামাল আমদানী ইত্যাকার সমস্যাগুলোই তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল।

৩২ নম্বর ধানমন্ডিস্থ প্রফেসর নুরুল ইসলামের বাসাটি শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের একরকম অর্থনীতি বিষয়ক সচিবালয় হয়ে উঠেছিল। সার্কিট হাউস সারিতে ডাঃ কামাল হোসেনের বাসভবন ছিল তৃতীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র। আমাদের কেউ কেউ প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য প্রফেসর ইসলামের বাসায় মিলিত হতাম। সেখানে বাঙালি বেসামরিক এবং ব্যাংক কর্মকর্তারাও অংশ নিতেন। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন আহমেদ কিংবা কামাল হোসেন কর্তৃক ৩২ নম্বর হতে বা কামাল হোসেনের বাসা হতেই আদেশ বা নির্দেশনা আকারে ব্যাংক, সরকারি কর্মকর্তা এবং পত্রিকায় প্রচারনার জন্য পাঠানো হতো।

স্থানীয় অর্থনীতি পর্যালোচনা ছাড়াও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিদের নিকট সারসংক্ষেপ তুলে ধরা ছিল আমাদের অন্যতম কাজ। প্রতিদিনই বড় বড় আন্তর্জাতিক পত্রিকার প্রতিনিধি আমাদের আলোচনার সময়ে আসতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস এর টিলম্যান এবং পেগি ডারবিন, সিডনি শনবার্গ -যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্প্রচার করতে গিয়ে পাকিস্তানী আর্মি কতৃক ঢাকা হতে বহিষ্কৃত হন, যা তাঁকে পুলিৎজার পুরষ্কার প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, দ্য গারডিয়ান এর পিটার প্রেস্টন (বর্তমান সম্পাদক) এবং গার্ডিয়ান পত্রিকার মারটিন এডেনি, টাইমস এর পিটার হাজেলহার্স্ট, ওয়াশিংটন পোস্ট এর স্যালিং হারিসন, ওয়াশিংটন স্টার-এর হেনরি ব্র্যাডশার প্রমুখ। অভিজ্ঞ এসব সাংবাদিকদের সকলেই তাদের পত্রিকার পাঠকদের ঢাকার নাটকীয়তার আদ্যোপান্ত জানানোর জন্য নিয়মিত রিপোর্ট করছিলেন।

পিটার হাজেলহার্স্টই আমাকে জানান যে, তিনি সম্প্রতি লারকানায় ভুট্টোর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে চলমান উত্তেজনা কিছু শহুরে রাজনীতিবিদদের চায়ের আসরে ঝড় ব্যতিত আর কিছু নয়। বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালালে এই উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হবে এবং আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এই সামরিক অভিযান আন্দোলনকারীদের ওপর হত্যা-সন্ত্রাস চালিয়েছিল এবং বহু নেতাদের জেলে পুড়েছিল। এই গোপনীয় তথ্যটি আমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ছিল যা আমরা পরবর্তীতে ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ সামরিক অপারেশন দেখতে পাই। ভুট্টো নিশ্চয়ই তার ভ্রান্ত ধারণা ইয়াহিয়া খান কে-ও জানিয়েছিলেন।

এ সময় প্রফেসর নুরুল ইসলামের দুজন ভগ্নিপতি, পাকিস্তান আর্মির কর্নেল ইয়াসিন এবং টি এন্ড টি তে কর্মরত জনাব এস হুদা নিয়মিত তার বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। কর্নেল ইয়াসিন ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। ফলে তার কাছে ঢাকায় পাকিস্তান আর্মিকে খাদ্য সরবরাহকারীদের তালিকা ছিল। পার্টির স্বেচ্ছাসেবকেরা এই তালিকা মোতাবেক সকল সরবরাহকারীদের সাথে দেখা করেন এবং বেশ কয়েকজনকে ক্যান্টনমেন্টে সরবরাহ বন্ধ করাতে সক্ষম হন। এ কাজের ফলাফলও ভয়াবহ হয়েছিল। ২৫ শে মার্চের ঘটনার পর, কর্নেল ইয়াসিন এবং জনাব হুদা দু’জনকেই আর্মিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। হুদাকে তাঁরা ঢাকা হাজতে অত্যাচার চালিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেয়েছিল যে, তিনি আমার এবং প্রফেসর ইসলামের সাথে মিলিত হয়ে আওয়ামীলীগ এর পক্ষ থেকে ভারতের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের ষড়যন্ত্র করছিলেন। এই বানোয়াট অভিযোগ পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে ‘৭১ এর সময়টাতে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

কর্নেল ইয়াসিনকে আরও করুণ পরিনতি ভোগ করতে হয়েছিল। তাকেও হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাকে লাহোরে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তাকে অত্যাচার করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করার চেষ্টা চালানো হয়। এঁদের দু’জনেরই এই পরিণতি ভোগের মূল কারণ ছিল মার্চের সেই দিনগুলোতে অধ্যাপক ইসলাম এবং আমার সাথে মাত্র কয়েকবার দেখা হওয়া।

ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল, আওয়ামীলীগ টিমের ব্যাক-আপ দেয়ার জন্য নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং কামাল হোসেনের পাশাপাশি আমাদের কয়েকজনকেও থাকতে হয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের টিমে ছিলেন মেজর জেনারেল পীরজাদা, বিচারপতি কর্নেলিয়াস এবং এম এম আহমেদ। আলোচনার লক্ষ্য ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের রূপরেখা নির্ধারণ করা। আমরা প্রতি সেশন শেষে ইয়াহিয়া খানের টিম প্রদত্ত প্রস্তাবনা গুলো নিয়ে বসতাম এবং আমাদের প্রত্যুত্তর বা বিকল্প প্রস্তাব ঠিক করতাম। সেশনগুলো অনেক দীর্ঘ হতো। কিছু সেশনে বঙ্গবন্ধু নিজেই থাকতেন। ডঃ কামাল হোসেনের মতিঝিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত সেশনটি ছিল চরম পরিণতিমূলক, যেটাতে সারারাত ধরে আওয়ামীলীগের হাই কমান্ড এবং উপদেষ্টামন্ডলী পরের দিন আলোচনায় চূড়ান্ত অবস্থান ঠিক করতে কাজ করেছিলেন। আমাদের প্রস্তাবনার ওপর এম এম আহমেদের হাতে লিখিত সংশোধনী নিয়ে আমরা বসেছিলাম, সেটাই ছিল শেষ। ইয়াহিয়া খানের টিম সর্বশেষ যে অবস্থান নিয়েছিলেন তাতে মনে হয়েছে অন্তত অর্থনৈতিক বিষয়াদিসমূহে একরকম ঐক্যমত্যে পৌঁছানো সম্ভব। আমাদের প্রত্যাশা ছিল জেনারেল পীরজাদা ২৪ শে মার্চ আলোচনার সর্বশেষ সেশন আহ্বান করবেন এবং সেখান থেকে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রেসে আসবে। এই আহবানটির জন্য আমরা ২ দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। ২৫ তারিখে আমরা জানতে পারলাম যে এম এম আহমেদ গতরাতে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন। মনে হচ্ছিলো যে তিনিও মিটিঙের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু পীরজাদা অকস্মাৎ তাঁকে এবং বিচারপতি কর্নেলিয়াসকে এই বলে ঢাকা ছাড়তে বলেন যে তাদের কাজ শেষ। সমঝোতার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করছি না। আগ্রহী পাঠকেরা ‘বাংলাদেশের জন্য সমঝোতা’ শীর্ষক আমার আর্টিকেলে আমার দৃষ্টিতে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। এটা আমি স্মৃতি সজীব থাকতেই বছরের শেষের দিকে রেকর্ডস্বরূপ সাউথ এশিয়ান রিভিউতে লিখেছিলাম। ডঃ কামাল হোসেনও পৃথকভাবে এই বাদানুবাদ নিয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন।

বাদানুবাদের সময়টাতে ক্রমাগত উত্তেজনা তুঙ্গে উঠছিলো। কারণ প্রতিদিন বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের দখলদারিত্ব বাড়ছিলো। বাংলার আমজনতা রাজনীতি সচেতন ও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে আমাদের এক বন্ধু মঈদুল হাসান আমাকে জানান যে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে পাওয়া একটি জরুরী খবর তিনি বঙ্গবন্ধুর নিকট পৌঁছে দিতে চান। খবরটি কে পাঠিয়েছে, সে তা সেই সময়ে না বললেও পরে আমাকে জানায় যে যে, খবরটির সোর্স ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকার, যিনি তখন পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমি মঈদকে এক রাতে ১০ টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানালেন যে পাকিস্তানী সেনারা সমর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু খবরটি টুকে নিলেন যদিও তিনি এই প্রস্তুতি সম্পর্কে আগেই অবগত আছেন বলে জানালেন।

বাদানুবাদ চলাকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতার সাক্ষাৎ লাভ করার সুযোগ হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, দৈনিক সংবাদ এর প্রোপ্রাইটর আহমেদুল কবির এর সাথে এনডব্লিউএফপি-এর আব্দুল ওয়ালী খান এবং বেলুচিস্তানের ঘাউস বাক্স বাইজেনজো অবস্থান করছিলেন। ওয়ালী খান এবং বাইজেনজো দুজনেই তাদের উপলব্ধির কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে আলোচনা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে। এই পাঠান এবং বেলুচদের উপলব্ধির কারন এই যে, ভুট্টো আলোচনায় তার নিজের নির্বাচনী এলাকা পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অধিকতর ক্ষমতায়ন দাবী করছিলেন। মুজিবের পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীর বিপরীতে ভুট্টো শুধু পাঞ্জাব আর সিন্ধু নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের পুরোটা নিজের করায়ত্ত্ব করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পিপলস পার্টি এনডব্লিউএফপি এবং বেলুচিস্তানের দু’টো নির্বাচনেই হেরেছিল, সেহেতু ভুট্টো আশংকা করেছিলেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামীলীগ পাঠান আর বেলুচদের সাথে নিয়ে পিপলস পার্টিকে কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে একেবারেই ছুঁড়ে ফেলে দিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে পাঞ্জাবের একক ক্ষমতা খর্ব করবে। ন্যাপ নেতারা এই ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে পূর্বের স্বায়ত্ত্বশাসনের বিনিময়ে হয়তো মুজিব পশ্চিমের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো ভুট্টোর হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের চলমান স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলন চাপা দিবেন। পরবর্তীতে দেখা গেল যে মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের ধারনা ছিল একেবারেই পুঁথিগত। যদিও ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে যে তাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার ঠিকই পাঞ্জাব আধিপত্যে হারিয়ে গেল, প্রথমে ভূট্টো এবং বর্তমানে সামরিক জান্তার হাতে।

পাকিস্তানী জেনারেলদের আলোচনায় গড়িমসি দেখে আমার ধারনা হচ্ছিলো যে ওরা বাংলাদেশে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সময়ক্ষেপণ করছিল। ২৪শে মার্চ ন্যাপ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ক্ষুদ্র অঞ্চলভিত্তিক দলের নেতারা ঢাকা ছাড়েন। এ থেকে বুঝা গিয়েছিল যে তাদেরকে ইয়াহিয়া খানই এ নির্দেশ দিয়েছিলেন আর সেনারা শীঘ্রই মাঠে নামছে।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়, আনুমানিক ৫/৬টার দিকে তারিক আলীর পিতা স্বনামধন্য সাংবাদিক মাজহার আলী খানকে নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে ধানমন্ডি ৩২ এর বাসায় যাই। মাজহার সাহেব ফোরামে একটি কলাম লিখতেন। ঐ সময় বাড়িটি সাংবাদিকে জনাকীর্ণ ছিল। উনারা উপলব্ধি করেছিলেন যে হয়তো পাক সেনাদের সাথে ঘটনাবলী পরিশিষ্ট হয়ে গেছে।

মাজহার আলী খান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সেখানে সর্বদাই ভিড় থাকতো বলে এ ব্যাপারে তাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। বঙ্গবন্ধু মাজহারকে আগে থেকেই চিনতেন যখন তিনি মিয়া ইফতিখার উদ্দিনের মালিকানাধীন পাকিস্তান টাইমস এর সম্পাদনা করতেন। তিনি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং রুমে শুধু আমাদের দুজনকে রেখে বাকিদের যেতে বললেন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন যে আর্মি সেনা অভিযানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মনে আছে তিনি বলেছিলেন, “ ইয়াহিয়া মনে করে যে আমাকে মেরে সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারবে। কিন্তু তার ধারনা ভুল। আমার কবরের ওপরেই স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মিত হবে।” তার মৃত্যু অবধারিত এবং সেটি তিনি মেনে নিয়ে বাকিটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই মিটিং এর পর মাজহার আলী আসন্ন রক্তবন্যা সম্পর্কে কয়েকজন পিপিপি নেতার মনোভাব জানতে চেয়েছিলেন। ৩২ নম্বর থেকে আমরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এ যাই। সেখানে মাহমুদ আলী কাসুরীর সাথে দেখা হয়। তার স্বভাবজাত দাম্ভিক স্বরে কাসুরী আমাকে এই বলে অভিবাদন জানালেন যে, “ মনে হচ্ছে আওয়ামীলীগ নিষ্পত্তি চাইছে না”। যেহেতু আমার জানামতে প্রেসে পাঠানোর জন্য একটি চুক্তির খসড়া ইতোমধ্যেই তৈরি ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই খবর তিনি কোথায় পেলেন। উত্তরে তিনি জানালেন যে জেনারেল পীরজাদা তাকে এমনটিই বলেছেন। যেহেতু পীরজাদা আলোচনার টেবিলে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, সেহেতু তারা নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের একটি ভিন্ন গল্প শোনাচ্ছিলেন আর সেনা অভিযানের ভিত্তি তৈরি করছিলেন। কাসুরী বলে চললেন, লিংকন যেভাবে আমেরিকার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য রক্তপাতের মাধ্যমে সিভিল ওয়ার লড়েছিলেন এখানেও দরকার হলে তা করা হবে। ভিয়েতনামে আমেরিকার চালানো গণহত্যা বিষয়ক বারট্রান্ড রাসেল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনালের একজন সুপরিচিত জুরিস্ট ছিলেন কাসুরি। আশা ছিল বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানী আর্মিদের আসন্ন গণহত্যার বিষয়েও তিনি সোচ্চার থাকবেন যেমনটি তিনি ভিয়েতনামিদের প্রতি দেখিয়েছেন।

পাকিস্তানী জেনারেলদের এই শঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে আমি সার্কিট হাউস সারিতে কামাল হোসেনের বাসায় গেলাম এবং জানালাম যে পীরজাদা পিপিপির সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে বানোয়াট গল্প প্রচার করছেন এবং হামলা চালানোর প্রেক্ষাপট মোটামুটি তৈরি। সেখান থেকে আমি গুলশানের বাড়িতে ফিরে এলাম। খবর আসছিল যে আর্মিরা আওয়ামীলীগ কর্মীদের রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে বাধ্য করছিল। আনুমানিক রাত ৯/১০টার দিকে আমরা প্রথম গোলাবারুদের শব্দ শুনতে পাই যাতে বুঝতে পারছিলাম যে ইপিআর এবং পুলিশ ব্যারাকে পাকিস্তানী আর্মিদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আমি বঙ্গবন্ধুর অবস্থা জানার জন্য ৩২ নম্বরের সরাসরি ফোন নাম্বারে ফোন করলাম। জানি না কে ধরেছিল তবে ফোনের সেই স্বরটি নির্দেশ করেছিল যে বঙ্গবন্ধু সেখানেই আছেন। পরের কলগুলোর জবাব কেউ দিলোনা। কিছুক্ষণ পরে সকল টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পরের ৩৬ ঘন্টা আমরা ভারী আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি শুনলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম দূরের আকাশে আর্মিদের গোলাগুলির আলোকচ্ছটা। ২৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষণা কানে এল। আমাদের সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তবে কখন শেষ হবে সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টায়, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় আর গুলশানের বাড়িটিতে অবরুদ্ধ থেকে আমরা শুধু গণহত্যার আর্তনাদই শুনেছি। ২৭ শে মার্চের সকালে কারফিউ তুলে দেওয়া হল। আমি প্রথমেই কিছু কারণবশতঃ হেঁটে গুলশানের ফোর্ড ফাউন্ডেশন গেস্ট হাউসে গেলাম যেখানে সরবন হতে আগত পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের ভিজিটিং স্কলার ড্যানিয়েল থরনার অবস্থান করছিলেন। ধানমন্ডিতে প্রফেসর নুরুল ইসলাম ঠিক আছেন কিনা, তা অনতিবলম্বে গাড়ি চালিয়ে দেখে আসার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম আমার বন্ধু মঈদুল হাসান এবং পাকিস্তান টোব্যাকোর জনাব এ আলম আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মঈদ আমাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছেড়ে যেতে বললেন। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, সশস্ত্র বাহিনী পাইকারি মাত্রায় গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে। কামাল হোসেন এর বাসায় তিনি খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন যে আর্মি তাকে তুলে নেবার জন্য সেখানে গিয়েছিল। তবে সেখানে তাকে পাওয়া যায় নি।

আমার ধারনা ছিল না যে আমিও আর্মির টার্গেট হতে পারি, কারন কেউ একজন বলেছিল যে আর্মি শুধু রাজনৈতিক কর্মীদেরকেই ধরবে। তারপরও মঈদ আমাকে বিপদের সম্ভাবনা এড়াতে বাসা থেকে চলে যেতে বললো।

আমার পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি যেতে চাছিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী বললেন যে আমার উপস্থিতি তাদেরকেও বিপদে ফেলতে পারে। এছাড়া আমি বাড়িতে না থাকলেই সে নির্ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঢাকার বাইরে চলে যেতে পারবে এবং আমিও নির্বিঘ্নে স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ করতে পারবো।

প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আমার পরিবারকে ছেড়ে ঐদিন সকালে গুলশানের আরেকটি বাড়ীতে উঠলাম। মঈদ বিকেলে আমাকে জানালো যে, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে গণহত্যার চিহ্ন দেখেছেন। জগন্নাথ হলের বিপরীতে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, প্রফেসর আনিসুর রহমানেরা যে ব্লকে থাকতেন, সেই ব্লকের মেঝে এবং সিঁড়িতে প্রচুর রক্ত দেখেছেন। সব কিছু তছনছ করা হয়েছে। প্রফেসর রাজ্জাককে আর্মিরা হত্যা করেছে বলে শুনলাম। তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন বলে শুধু নয়, পাকিস্তানী আর্মিরা যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে জড়িত ছিলেন না এমন ব্যক্তিদেরকেও হত্যা করছে, সেটা জেনে আরও বেশী মর্মাহত হলাম।

২৭ তারিখের রাতটা আমি আমার নতুন আশ্রয়ে কাটালাম। পরদিন সকালে মঈদ এসে জানালেন যে গত সন্ধ্যায় কারফিউর পরপরই, আর্মি আমাকে তুলে নেবার জন্য আমার বাড়ীতে গিয়েছিল। পরে আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছিলাম যে কর্নেল সাঈয়েদউদ্দীন এর নেতৃত্বে দুই ট্রাকভর্তি পাক আর্মি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। এই কর্নেলই ২৫শে মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল বলে জানা যায়।

পাকিস্তানী আর্মিরা যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন ৮ বছর বয়সী আমার বড় ছেলে তৈমুর বাড়িতেই ছিল। তাকে কর্নেল সাঈয়েদউদ্দীন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে অস্ত্রধারী এত এত সেনার মাঝেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল। আমার স্ত্রী সালমা সৈন্যদের আসতে দেখে এবং তৈমুরের জন্য ভয় পেয়ে বাড়ীতে লুকোতে চেয়েছিলেন কিন্তু অস্ত্রের মুখে সৈন্যরা তাকে আটকে ফেলে। কর্নেল সাঈয়েদউদ্দীন আমার প্রতিবেশীদেরকেও আমার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যখন জানতে পারল যে আমি ঐদিন সকালেই বাড়ী ছেড়েছি, তখন সে আমার স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যাতে “আমি বের হয়ে আসি”। যাই হোক, আমার প্রতিবেশীরা তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

পাকিস্তানী আর্মিরা যেহেতু তাদের অপারেশনের প্রথম ৪৮ ঘন্টাতেই আমার খোঁজে গিয়েছিল, সেহেতু আমি বুঝতে পারলাম যে আমি তখন তাদের একজন তালিকাভুক্ত লক্ষ্যতে পরিণত হয়েছিলাম। মঈদ আমাকে উপদেশ দিল যে আমার ঢাকার বাইরে যাওয়া উচিত। কারন এখানে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু হতে পারে এবং আমাকে পাওয়া গেলে আশ্রয়দাতার কপালেও দুর্ভোগ নেমে আসবে। সময়টা এমন ছিল যে আমরা জানতাম না যুদ্ধটা কোনদিকে গড়াবে আর তাতে আমাদেরই বা কি করার থাকবে। আমি আমার স্ত্রী কে একটি চিরকুট পাঠালাম যেন সে ঢাকা ছেড়ে যায় আর যদি সম্ভব হয় তাহলে দেশের বাইরে চলে যেতে যাতে আমি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় থাকতে পারি।

ঢাকা ছাড়ার প্রস্তুতির জন্য প্রথমে মঈদ আমাকে গুলশানে মোকলেসুর রহমান (সিদু মিয়াঁ)-র বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে নদী পাড় হয়ে বারাইদ নামক একটি গ্রামে সিদু মিয়াঁর শ্বশুর জনাব মতিন এর বাড়িতে উঠলাম। গুলশান থেকে বারাইদ আসার পথে দীর্ঘ প্রান্তরে আমি পলায়নরত গণমিছিলে মিশে গিয়েছিলাম। এরা সকলেই ঢাকা থেকে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। এই গণমিছিলে আমি আনিসুর রহমানের দেখা পেলাম যিনি আমাকে জানালেন গত ২৫-২৬ তারিখ তারা কী বিভীষিকাময় সময় পার করেছেন। তিনি জানালেন যে কিভাবে আর্মিরা তাদের ব্লকের নিচতলার বাসিন্দা অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলি করে মেরেছে। মেরেছে উপর তলায় বসবাসরত পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে। শুধু ভাগ্যের জোরে প্রফেসর রাজ্জাক বেঁচে গিয়েছিলেন। কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য তার দ্বিতীয় তলার বাসার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেছিল। তিনি দরজা খুলতে কিছু সময় নিয়েছিলেন আর তাতে পাকিস্তানীরা ভেবেছিলো যে বাসা খালি। ফলে দরজা খোলার আগেই পাকিস্তানীরা চলে গেল। প্রফেসর রাজ্জাকের সামনের বাসাতে থাকা আনিস বেঁচে গিয়েছিলেন এই কারনে যে তার বাসার দরজাগুলোর একটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ফলে এক্ষেত্রেও বাইরে থেকে মনে হয়েছিল যে বাসায় কেউ নেই। দু’ রাত এক দিন যাবত সেনারা যখন সিঁড়ি থেকে লাশগুলো সরাচ্ছিলো, তখন আনিস স্ত্রী এবং দুই কন্যা কে নিয়ে পুরোটা সময় তার বাসার মেঝেতে কাটিয়েছেন।

জনাব মতিন এর বারাইদ গ্রামে আমাদের অনেক বন্ধুর সাথে দেখা হল। সেখানে পেলাম জামিল চৌধুরী ও তার পরিবারকে, মোকাম্মেল হক ও তার পরিবার (যিনি জনাব মতিন এর জামাতা), ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে যেহেতু আমি আর্মিদের সরাসরি টার্গেট এবং হয়তো আনিসও, সেহেতু আমরা বর্ডার পেরিয়ে ভারতে যাব এবং বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য প্রচারণা শুরু করব।

২৯শে মার্চ এর ভোরে গাইড হিসেবে মতিন সাহেবের একজন আত্মীয় জনাব রহমতউল্লাহর সাথে আনিসুর রহমান, মোস্তফা মনোয়ার, একজন স্থানীয় স্কুলশিক্ষক জনাব রশীদ এবং আমি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সিদু মিয়া আর মঈদ আমাদের নদীর পাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল।

এখান থেকে আমরা নৌকায় শীতলক্ষ্যা ধরে নরসিংদীর দিকে আসছিলাম। সারাটা পথ জুড়ে দেখেছি মানুষ ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল। নরসিংদীতে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার জন্য আমরা লঞ্চ খুঁজছিলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছি শুধু উদ্ভ্রান্ত জনতা আর্মির ভয়ে ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল। গুঞ্জন শুনছিলাম যে চট্টগ্রামে কিছু প্রতিরোধ হয়েছে তবে সেটা কোনমতেই পুরোদমে প্রতিরোধ যুদ্ধ বলা যায় না। প্রথম আমরা যুদ্ধের চিহ্ন দেখলাম একটা লঞ্চে। সেটা মেঘনা পাড়ি দিয়ে যাত্রী নিতে নরসিংদী আসছিলো। সেখানে বাংলাদেশের একটা পতাকা করে উড়ছিল।

কিছুটা চলার পর লঞ্চটি তীরে ভীড়ানো হচ্ছিলো, যদিও ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখনো অনেক দূর। সেখানে কিছু ছাত্র আমাদেরকে লঞ্চ থেকে নেমে তাদের সাথে যেতে বলল। এতদূর এসে আনিস এবং আমার কারোই পরিচয় প্রকাশে ভয় ছিল না, যদিও ভিড়ের মাঝে পাকিস্তানী গোয়েন্দা চর থাকতে পারতো। তবুও আমরা ইতস্তত করতে করতে তীরে নেমে পড়লাম। এখানকার যে পরিস্থিতি তৈরি হলো, তার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ কয়েকজন আমাদের পরিচয় নিয়ে সন্দিহান ছিল। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে বুঝতে পেরে মোস্তফা মনোয়ার উপস্থিত বুদ্ধিতে বললেন যে আশপাশের এলাকার মধ্যে কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছে কিনা এবং যদি থাকে তাকে ডেকে পাঠানো হোক, তাহলে সে তার শিক্ষকদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারবে।

আনিস এবং আমি বললাম যে আমাদের সংগ্রাম পরিষদের নেতার কাছে নিয়ে যাওয়া হোক যাতে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারি, এই উত্তেজিত জনতার ভিড়ে আমরা পরিচয় দিতে চাই না। এমন সময় ঢাকার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (যেখানে আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম) সেখানকার একজন পিয়ন আমাকে চিনতে পারলেন এবং সবাইকে আমাদের কথা শোনার জন্য আশ্বস্ত করলেন। এরপর সংগ্রাম পরিষদের প্রধান যিনি আওয়ামীলীগেরও একজন নেতা ছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন মিলে আমাদেরকে স্থানীয় একটি স্কুলে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা আমাদের পরিচয় বললাম কিন্তু আমাদের পরিচয় নিশ্চিত করানোর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেউ কেউ আমার নাম শুনেছে কিন্তু আমরাই যে তারা সেটা বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে আপাতত আমরা বাইরে অপেক্ষমান জনতাকে বলব যে আমাদের পরিচয় সম্পর্কে দেওয়া তথ্য গ্রহনযোগ্য হয়েছে। আমরা বাইরে আসামাত্র মুকতাদা নামের একজনকে দেখা গেল। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে আমার এবং আনিসের সরাসরি ছাত্র ছিল। সাথে ছিল তার চাচাত ভাই মোফাকখের, ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। তারা পাশের গ্রামে থাকতো। মোস্তফা মনোয়ারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুঁজে আনার আবেদন পেয়ে আমাদেরকে চিনিয়ে দেবার জন্য তারা কয়েক মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে।

আমাদের পেশা, পরিচয় ইত্যাদি নিশ্চিত হওয়া মাত্র আমরা এলাকাটিতে আমরা তারকাখ্যাতি পেয়ে গেলাম। আমাদেরকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। এক পর্যায়ে গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আমাদের দেখতে আসছে। যা হোক, গুজব আস্তে আস্তে কেটে গেল কিন্তু আমাদের পরিচয় গোপন রাখা গেল না এবং আমরা বুঝলাম যে আমাদের যাওয়া উচিত।

আমাদেরকে স্থানীয় নেতারা জানালেন যে গ্রামের সাধারন মানুষ পাকিস্তানী চর আর ছত্রীসেনা সম্পর্কে সজাগ আছে। স্থানীয় জনগন হাতের কাছে যেই অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে, তা যোগাড় করে রেখেছে এবং তীক্ষ্ণভাবে সতর্ক আছে। এতে আবারো নিজের চোখে দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, বিগত চার সপ্তাহে গ্রামের সাধারন মানুষ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাকিস্তানী আর্মিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছে। স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে তাঁরা সারা দেশেই নিজেদের সংগঠিত করেছে।

এই এলাকা থেকে মুকতাদা আর মোফাকখের আমাদেরকে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। বর্তমান ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ, মোফাকখের এর ভাই প্রফেসর নোমান এর বাসায় গেলাম। সেখানে ঠিক হলো যে, আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব তবে রাতেই ভ্রমন করবো। কারন আঁচ করা যাচ্ছিলো যে হয়তো পাকিস্তানী আর্মিরা নদীতে টহল দিচ্ছিলো। ৩০শে মার্চের প্রথম প্রহরে আমরা নৌকায় চড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সাথে ছিল মুকতাদা, মোফাকখের এবং তার তার বড় ভাই মোহাদ্দেস। সে রেডিও পাকিস্তানে কাজ করত। আমরা সেখানে রশিদ আর রহমত উল্লাহকে বিদায় জানালাম। বললাম যে, যদি সম্ভব হয় তবে আমাদের পরিবারের কাছে আমাদের খবর পৌঁছে দিতে।

৩০শে মার্চের ভোরে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামলাম। শহরের রাস্তা ঘুরে প্রথমেই লক্ষ্য করলাম যে বাংলাদেশের পতাকাওয়ালা একটি আর্মি জীপ টহল দিচ্ছে। ঐ সময়েই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল এক টুকরো স্বাধীন বাংলাদেশ। বুঝাই যাচ্ছিল শহর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রনে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা করার সুযোগও হয়েছিল। সেই বিকেলে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস কোম্পানির রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশারফের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের জানালেন যে কিভাবে তিনি তার ইউনিট নিয়ে পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে মুক্ত করেছেন। এখন তারা পাকিস্তানী আর্মির আক্রমন প্রতিহত করার পরিকল্পনা করছেন।

মেজর মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিরক্ষা তদারকি করার সময় আমাদেরকে সাথে নিয়ে গেলেন। যখন রাত নামল, তখন তিনি আমাদের তিনজনকে নিয়ে তিনি তেলিপাড়া চা বাগানের কাছের কমান্ড পোস্টটিতে নিয়ে গেলেন। এটিও পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানী বিমান হামলার ভয়ে সাবধানতাস্বরূপ পুরো এলাকা অন্ধকার করে রাখা হয়েছিল। বাগানের ম্যানেজারদের বাংলোর সব আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে মেজর মোশাররফ আমাদেরকে তার ব্যাটেলিয়নের এতদূর আসাবার গল্প শোনালেন আর কুমিল্লায় তার বেস ক্যাম্পে বাঙালি সহকর্মীদের ওপর কিভাবে গনহত্যা চালানো হয়েছে, তার বর্ণনা দিলেন। সমস্যা হল, অন্যান্য প্রতিরোধ গড়ে ওঠা এলাকার সাথে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না এবং চট্টগ্রামের যুদ্ধের খবর তিনি রেডিওতেই পাচ্ছিলেন।

ঐ রাতে আমরা রেডিওতে শুনলাম যে প্রবাসী বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অস্ত্র কিনতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। মোশাররফ আমাদের অনুরোধ করলেন যেন আমরা সীমানা পাড়ি দিয়ে ভারতীয় কতৃপক্ষের কাছে আরও গোলাবারুদ সরবরাহের অনুরোধ জানাই এবং প্রবাসী বাঙালিদের সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বিদেশ হতে অস্ত্র কিনতে সাহায্য করি। মোশাররফ আশংকা করছিলেন যে তাদের প্রতিরক্ষা শক্ত হলেও শীঘ্রই যদি তারা যদি আরো অস্ত্র নতুন সরবরাহ না পায় তাহলে পাকবাহিনীর সামনে তাঁরা টিকতে পারবে না। তিনি আমাদেরকে আরও জানালেন যে তিনি এবং তার অন্যান্য অফিসাররা বিদ্রোহীদের অবস্থানে আছেন। তারা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনা চান। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল অফিসার এবং অন্যান্যদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গঠন করা যেতে পারে। এমন একটি কতৃপক্ষ গঠন করার মত ক্ষমতা যে আমার ছিল না, খালেদ সেটা জানতো না। তবে আমাকে জোর করল যেন নির্বাচিত কোন রাজনৈতিক নেতার দেখা পেলে অন্তত তাকে যেন আমি এই সংবাদটি পৌঁছে দিই। ঐ সময়েই, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে, ক্যান্টনমেন্ট এ ফেলে আসা পরিবারের নিরাপত্তা ভুলে এগিয়ে আসা এই নিষ্ঠাবান সৈনিকদের দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

পরের দিন অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ ভোরবেলা, মেজর মোশাররফ একটি জিপে করে আমাদের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় পাঠিয়ে দিলেন। মনে হলো, ততদিনে সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষ নির্বিঘ্নে পারাপার করছিল।

আগরতলায় আমরা জানতে পারলাম যে, বাংলাদেশীদের এক বিরাট বহর স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অবস্থান করছেন। সেখানে আমরা এম আর সিদ্দিকি, তাহের উদ্দিন ঠাকুরসহ অনেক আওয়ামীলীগ সংসদ সদস্য এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে আসা অনেক ছাত্র-শ্রমিকের দেখা পেলাম।

জানতে পারলাম যে এম আর সিদ্দিকী এবং ঠাকুর ঐদিন সন্ধ্যায় ভারত সরকারের কাছে গণহত্যার বিষয়াদি তুলে ধরার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্লেনে চেপে দিল্লী যাচ্ছেন। তারা ভারত সরকারের কাছে বাঙালিদের প্রতিরোধ ধরে রাখার জন্য সহায়তা চাইবেন। সিদ্দিকীর কাছে শুনলাম অন্যান্য আওয়ামীলীগ নেতারা বেঁচে আছেন কিংবা থাকলে কে কোথায় আছেন, সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি নিজে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শুধু সেই প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্যে সামরিক সহায়তা চাইতে ত্রিপুরায় এসেছেন ।

সিদ্দিকী এবং ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, তাদের নিজেদের তেমন দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ে জানাশোনা নাই। তারা অনুধাবন করল আনিস এবং আমার ভারতীয় কয়েকজন বড় বড় অর্থনীতিবিদদের সাথে পরিচয় নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সমস্যা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে সহায়তা করবে। সুতরাং সন্ধ্যায় এম আর সিদ্দিকীদের সাথে আমাদেরও যেতে রাজী করানো হলো। সেখানে যেতে আগরতলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিমান ভ্রমনে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল ধার করা পাজামা পাঞ্জাবি।

৩১শে মার্চ, ১৯৭১-এ দিল্লীতে নেমে আনিস এবং আমি অমর্ত্য সেনকে ফোন করলাম। তিনি তখন দিল্লীর অর্থনীতি বিষয়ক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এবং তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আমাদেরকে তাদের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে প্রফেসর সেন আমাদেরকে তৎকালীন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সিপিএম সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ডঃ মিত্র তৎক্ষণাৎ আরেকজন সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর পি এন ধর কে ডেকে পাঠালেন। প্রফেসর ধর তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একজন সচিব ছিলেন। প্রফেসর ধরকে আমি এবং আনিস যতটুকু জানতাম গণহত্যার পটভূমি, ঢাকায় গণহত্যার ব্যাপকতা এবং বাংলাদেশীদের প্রতিরোধের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বললাম। প্রফেসর ধর আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পি এন হাকসারের নিকট নিয়ে গেলেন, যার কাছে আমরা আমাদের কথাগুলো পুনরায় বললাম।

আমরা জানি না যযে এটাই স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারত সরকারের উচ্চপর্যায়ে প্রথম যোগাযোগ কিনা। তবে যে সময়ে আমরা দিল্লী গিয়েছিলাম, সে সময়ে তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল হকও দিল্লীতে গিয়ে আরও নানান দিক তুলে ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ মজবুত করেছিলেন। পৌঁছানোর পরপরই আমাকে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি নিজেই জানেন না যে তার কোন কোন সহকর্মী বেঁচে আছেন। তিনি বললেন যে আর্মি অভিযানের আগাম খবর পেয়ে কিভাবে আমিরুল ইসলাম, ডঃ কামাল হোসেন আর তিনি ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তারা চেষ্টা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাদেরকে আত্মগোপন করতে বলেছিলেন। তাজউদ্দীন এবং ইসলাম তখন কামাল হোসেনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ধানমন্ডিতে লুকিয়ে ছিলেন। এরপর তাদের সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাজউদ্দীন এবং ইসলাম কুষ্টিয়া হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

দিল্লীতে থাকাকালীন রেডিওতে ডঃ কামাল হোসেনকে পাকিস্তানী আর্মিদের বন্দী করার খবর শুনে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি। যাহোক, ততদিনে আমরা জানতে পারলাম যে একের পর এক আওয়ামীলীগ এর একজন বড় নেতারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে পড়ছেন। তাজউদ্দীন আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার জন্য দ্রুত তাদের সাথে দেখা করতে বিমানে চড়ে সীমান্তে চলে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

এমন একটি সরকারকে কার্যকরী ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিখিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা যা প্রথমে আওয়ামীলীগের আব্দুল হান্নান এবং পরে মেজর জিয়াউর রহমান রেডিওতে সম্প্রচার করেছিলেন, সেটা এখন আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে।

তাজউদ্দীন আহমেদ আমাকে নির্ভরতার সাথে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং এর প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশীদের ওপর পাকিস্তানী আর্মির গণহত্যা সংক্রান্ত আরেকটি বিবৃতি রচনার দায়িত্ব দিলেন। এগুলো ঐতিহাসিক দলিল হতে যাচ্ছে ভেবে আমি বেশ উত্তেজনার সাথে দায়িত্বটি নিলাম। মূল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু এবং খালেদ মোশাররফ এর সেই অনুরোধ এর ওপর ভিত্তি করে আমার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচিত হল। (খালেদ মোশাররফের অনুরোধটি ছিল, যেসব বাঙালিরা এতদিন পাকিস্তানী আর্মিতে কর্মরত থাকার পরে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর পর বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করছে তাদেরকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্মিতে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত)।

পরবর্তীতে জানলাম যে আমার রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি এ ধরনের দলিলের আইনগত ঘাটতি পূরণের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু আমার দেয়া কয়েকটা উপাদান দিয়েই ঘোষণাপত্রের মূল অংশটি রচিত হয়েছে। যাই হোক, পটভুমির সম্পর্কিত আমার রচিত বিবৃতিটি অবিকৃত রইল এবং কুষ্টিয়ার সেই বাগান, যা আজ মুজিবনগর বলে পরিচিত, সেখানে ১৪ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমেদ বিশ্ববাসীর কাছে এটিই তুলে ধরেছিল। সেখান থেকে যে বাক্যটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে তা হল, “পাকিস্তান মরে গেছে আর পর্বতসমান লাশের নিচে চাপা পড়েছে” যেটি ছিল সে সময়ে আমার সত্যিকারের অনুভূতি। এটি ছিল আমার পরবর্তী সকল কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

তাজউদ্দীন এবং ইসলাম এর সাথে অবস্থানকালে বিবিসিতে শুনলাম যে পাকিস্তানে দাতাগোষ্ঠীর কাছে নবায়নকৃত সহায়তা প্রার্থনার জন্য এক জরুরী মিশনে এম এম আহমেদ ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। তাজউদ্দীন আহমেদ বুঝলেন যে আমাদের রাজনৈতিক সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে বৈদেশিক সহায়তার নামে এই যুদ্ধে অর্থায়ন প্রতিহত করতে হবে। তাজউদ্দীন আমাকে দায়িত্ব দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব লন্ডন এবং ওয়াশিংটন গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রধান প্রধান দাতাদেরকে পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান বন্ধের আহবান জানাতে। আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত সকল বাঙালি কর্মকর্তাদের ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাতে। আমেরিকার মিশন আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কারন দক্ষ বাঙালি অফিসারদের অনেকেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাদের নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়া বিরাট গুরুত্ববহ একটি প্রচারণা হবে এবং বাংলাদেশের জন্যেও সহায়ক হবে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি আমি লন্ডন পৌছাতে পারলাম। সেখানে গিয়ে আমি জানতে পারলাম যে আমার স্ত্রী তিন সন্তানকে নিয়ে পাকিস্তান থেকে বের হতে পেরেছে এবং তারা এখন জর্ডানে তার বোনের কাছে আছে। খবরটা শুনে আমি পুরোপুরি নির্ভার বোধ করলাম। এখন আমি প্রকাশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে পারব। লন্ডনে আমি তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলাম। লন্ডনে যারা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং গনহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মাঝে অন্যতম ছিলেন।

লন্ডনের এক সাংবাদিক ব্রায়ান লেপিং এর সাহায্যে আমি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাথে যোগাযোগ করে হাউস অফ কমন্সে একদল লেবার পার্টির এমপির সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে পাকিস্তান সরকারকে সহায়তা বন্ধের জন্য ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টিকে চাপ দেবার ওপর আমি জোর দিয়েছিলাম। তারা খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব দেখালো। পরে আমি হাউস অফ কমন্সে লেবার পার্টির তৎকালীন ছায়া মুখপাত্র ডেনিস হিলে-র সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম।

আমার স্ত্রীর পরিবারের সাথে পরিচিত স্যার ডগলাস ডডস পার্কারের মাধ্যমে আমি টরি সরকারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তৎকালীন টরি সরকারের পররাষ্ট্র সচিব স্যার আলেক ডগলাস হোম এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে পারতেন। উনিও আমার স্ত্রীর পরিবারের পরিচিত ছিলেন। ডড্‌স পার্কার বললেন যে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর খবর তিনি পররাষ্ট্র সচিবকে পৌঁছে দিবেন এবং তিনি তা করেছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র সচিবের কাছ থেকে আমি কখনোই সরাসরি সাড়া পাইনি। তিনি বাংলাদেশের “বিদ্রোহী” সরকারের একজন মুখপাত্রের সাথে আলোচনার রাজনৈতিক ঝুকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পরবর্তীতে আমি তার ব্যক্তিগত সচিব নিকোলাস বেরিংটনের মাধ্যমে আবার চেষ্টা চালিয়েছিলাম। উনি আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে সব তথ্য পররাষ্ট্র সচিবের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে বেরিংটন আমাকে বেশ সাহায্য করেছিলেন।

ওদিকে, এম এম আহমেদ আসার পরে ওয়াশিংটনেই ঘটছিল আসল ঘটনা। আমরা জানতে পারলাম যে পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্য শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং জরুরী ভিত্তিতে বিদেশী সাহায্যের দরকার ছিল। বাংলাদেশের পাট রপ্তানী আর রাজস্ব বাধাগ্রস্থ হওয়াতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নতুন সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

এপ্রিলের শেষে আমি আমেরিকায় পৌঁছালাম। সেখানে দৈবক্রমে আমার সাথে প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং প্রফেসর আনিসুর রহমানের সাথে দেখা হয়ে গেল। তারা নিজেদের মত করেই সেখানে গিয়েছিলেন। প্রফেসর ইসলামের ঢাকা ছেড়ে আসাটা রীতিমত নাটকীয় ছিল। তিনি অবশ্য রওয়ানা হবার আগে দিল্লীতে আমার সাথে একবার দেখা করেছিলেন।

আমি বিশ্ব ব্যাংকে কর্মরত একজন সিএসপি অফিসার হারুন উর রশীদকে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন গেলাম। বিমানবন্দরে পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসের অর্থনীতি বিষয়ক মিনিস্টার এ এম এ মুহিত আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেদিন সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন দূতাবাসের সমস্ত বাঙালির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সেই সম্মানিত গ্রুপের প্রধানদের মধ্যে ছিলেন মরহুম এনায়েত করিম, শামসুল কিবরিয়া যিনি পরে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন, প্রফেসর আবু রুশ্‌দ মতিনুদ্দিন যিনি সেখানকার শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা ছিলেন, মোয়াজ্জেম আলী যিনি সম্ভবত তৃতীয় সচিব ছিলেন, বেশ কয়েকজন নন-পিএফএস অফিসার যেমন রুস্তম আলী, রাজ্জাক খান এবং শরিফুল আলম। ঐ সময় এদের কেউই ইস্তফা দেননি। তারা সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে ইউএস কংগ্রেস সদস্য, এমনকি স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছিলেন। আমি তাদের কাছে তাজউদ্দীন আহমেদের ইস্তফা দেবার আহবান পৌঁছে দিলাম। তারা সকলেই এতে রাজী ছিলেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশী জনতার নিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত হবার পাশাপাশি তাদের ইস্তফার ফলে যে বাস্তবধর্মী সমস্যার সৃষ্টি হবে, সে সংক্রান্ত ব্যাপারেও আশ্বস্ত হবার নিশ্চয়তা চাইছিলেন। এর আগ পর্যন্ত তাঁরা বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে রাজি হলেন, তবে তা জনসম্মুখে নয়।

এ সময় রাজ্জাক খান, শরিফুল আলম এবং একজন বাংলাদেশী ছাত্র মহসিন সিদ্দিকী পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করে দেবার জন্য আমার আহবান প্রচারে প্রেস, টিভি এবং কংগ্রেস এর সাথে যোগাযোগের কাজে প্রকাশ্যে নেমে পড়লেন। আমাকে মোক্ষম সময়ে বেশ কয়েকবার টিভি তে উপস্থিতির সুযোগ দেওয়া হল যা বাংলাদেশের জন্য প্রচারণায় বেশ মুল্যবান ছিল। বিশেষ করে ওয়ারেন উনা নামের একজন জনপ্রিয় সাংবাদিক এবং টিভি ভাষ্যকার এ কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও রাজ্জাক এবং আলম আমার জন্য এক ধরণের সচিবালয়ের মতোই কাজ করেছিলেন।

প্রেসে আমি কথা বলেছিলাম ওয়াশিংটন স্টারের হেনরি ব্রেডশার, ওয়াশিংটন পোস্ট এর লুইস সিমন, বাল্টিমোর পোস্ট এর এডাম ক্লাইমার, নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেন ওয়েলস এবং একটি বড় সাপ্তাহিক, নিউ রিপাবলিকের গিলবার্ট হ্যারিসনের সাথে। এগুলো ওয়াশিংটনের প্রধান প্রধান পত্রিকা ছিল এবং এ পত্রিকাগুলোর কলাম লেখকেরা কংগ্রেস এর মতামতে অনেক প্রভাব রাখতেন। এম এম আহমেদের ওয়াশিংটনে অবস্থানকালীন সময়ে পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধ না করা পর্যন্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করে প্রায় একই সময়ে চারটি প্রধান পত্রিকায় সম্পাদকীয় ছাপানোর ঘটনা ছিল বাংলাদেশের জন্য এক বড় ধরনের অভ্যুত্থান।

আমি কংগ্রেসেও সক্রিয় ছিলাম। এখানে আমি ঐ সময়ে বাংলাদেশের জন্য দুজন সক্রিয় সমর্থক সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং সিনেটর ফ্রাংক চার্চ এর সংস্পর্শে ছিলাম। উনারা সিনেট বৈদেশিক সম্পর্কে কমিটির পদধারী সদস্য ছিলেন। সিনেটর চার্চ এর সহকারী টম ডেইন, সাথে সিনেটর কেনেডির সহকারী গেরি টিঙ্কার এবং ডেইল ডেইহেন বাংলাদেশের জন্য সক্রিয় মুখপাত্রের ভুমিকা পালন করার ফলে এদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। তাদের মাধ্যমে আমি বেশ কয়েকজন সিনেটরের সাথে সাক্ষাৎ করি। সে সময় কেনেডি, চার্চ এবং গেলাঘেরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি পরিষদে কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটররা পাকিস্তানে গণহত্যার নিন্দা জানানো এবং পাকিস্তানে সাহায্য স্থগিতের জন্য জোর দাবী জানান। তথ্য ও উপাত্তসহ এইসব বিবৃতির অনেকগুলো এবং ২৬ শে মার্চ এর পর বাংলাদেশ হতে প্রেরিত চিঠিগুলো কংগ্রেশনাল রেকর্ডে স্থান পায়।

এ পর্যায়ে আমি জানতে পারলাম যে সিনেটর সিমিংটনের নেতৃত্বে আমার পুরনো পাকিস্তানী বন্ধুরা একটি চা চক্রের আয়োজন করছেন যেখানে এম এম আহমেদ সিনেটরদের নিকট পাকিস্তানের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন। সেখানে গুটিকয়েক লোকজন এসেছিলেনও বটে কিন্তু হিলে আমার বন্ধুরা বললো যে আমাদেরও এরকম কিছু একটা করা উচিত। চার্চ এবং কেনেডি যেহেতু ডেমোক্রেটিক পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় তাই সিনেটের প্রায় মধ্যপন্থী একজনকে দিয়ে আমার সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনের চিন্তা করা হল, যাতে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক দু’দলের লোকদেরই টানা যায়। ওহাইয়োর সিনেটর স্যাক্সবি এটি আয়োজনে রাজী হলেন। এতে এম এম আহমদের পার্টির চাইতে সংখ্যায় বেশী এবং অনেক গুরুত্বপূর্ন সিনেটরদের সমাগম শুরু হলো। এর ফলে অন্যান্য অনেকের মাঝে সিনেটর চার্চ, ফুলব্রাইট, সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সভাপতি, সিনেটের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল রিপাবলিকান পার্টির নেতা সিনেটর স্কটের সামনে আমার কথা বলতে পেরেছিলাম। পাকিস্তানী গণহত্যার বাস্তব প্রেক্ষাপট এবং পাকিস্তানের প্রধান দাতা হিসেবে এতে আমেরিকার দায় সংক্রান্ত আমার বক্তব্য আমেরিকান রাজনীতির এইসব গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিরা ধৈর্য সহকারে শুনেছিলেন। সিনেটে আমাদের এইসব প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলাফল হিসেবে মার্কিন বৈদেশিক সহায়তা বিলে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী আনা হয়। বাংলাদেশে গণহত্যা চলাকালীন পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য বন্ধ রাখাই এর উদ্দেশ্য ছিল। তবে এটাও অনেক পরের ঘটনা, আমাদেরকে এর জন্য আরও যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

সিনেটে আমাদের সাফল্য দেখে এম এম আহমেদ ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছেন বলে শুনলাম। এতেও তাকে হারাবো বলে আমরা ঠিক করলাম। রাজ্জাক খান এবং তার সহযোগীদের সহায়তায় আমাদের নিজস্ব সম্মেলন আয়োজন করে তা পেরেওছিলাম। এতে প্রেস, রেডিও এবং টিভি প্রতিনিধির ভালোই উপস্থিতি ছিল। ভয়েস অফ আমেরিকা আমার উদ্ধৃতি নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে প্রচার করেছিল। ডন পত্রিকার প্রতিনিধি নাসিম আহমেদ (যিনি পরে ভুট্টোর অধীনে তথ্য সচিব হয়েছিলেন) এবং সাথে আরেকজন সাংবাদিক কুতুবউদ্দিন আজিজ আমার প্রচারণা ভণ্ডুল করার জন্য গিয়েছিলেন। নাসিম আহমেদ আমার প্রেস কনফারেন্সে ছিলেন। কিন্তু আমাকে কোন সিরিয়াস প্রশ্ন করার চেয়ে উনি বরং কে কে সেখানে উপস্থিত আছেন, তা দেখতেই বেশী মনযোগী ছিলেন। আমাদের প্রেস কনফারেন্সের সার্থকতা এবং বাংলাদেশকে যেভাবে তুলে ধরা হচ্ছিল তা দেখে এম এম আহমেদ আশাহত হয়ে গেলেন আর পরবর্তীতে নিজের কনফারেন্স বাতিল করলেন।

মার্কিন কংগ্রেস এবং মিডিয়া আমাদের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুনলেও নিক্সন প্রশাসনের উপরের স্তরে যাওয়াটা অনেক বেশী কঠিন ছিল। আমরা হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের দিকে নজর দিলাম। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সেমিনারগুলোতে অনেক বাঙালিদের পড়িয়েছেন। তাই ভাবলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তার ভাল ধারণা থাকবে। শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম যে বাংলাদেশের জন্য আমেরিকার প্রশাসনের দরজা বন্ধ। পরামর্শ পেলাম যে ক্যামব্রিজে গিয়ে কিসিঞ্জারের সাবেক সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যদি তাঁদের সহায়তায় কিসিঞ্জারের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। তারা স্বনামধন্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ছাড়াও কিসিঞ্জারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে বিবেচিত, যেমন অধ্যাপক ডর্ফম্যান। সরকারি অধিদপ্তরের অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটনের সাথেও আমি দেখা করেছিলাম। তিনি কিসিঞ্জারের সহকর্মী ছিলেন। এছাড়া হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর লজ এর সাথেও আমি দেখা করেছিলাম। উনি কিসিঞ্জারের আরেকজন নিকট বন্ধু ছিলেন। এসব যোগাযোগের কোনটিই তেমন কাজে লাগেনি।

ওয়াশিংটনে কর্মকর্তা পর্যায়ে আমি এনায়েত করিমের বাসায় সর্বোচ্চ দেখা করতে পেরেছিলাম ক্রেইগ বেক্সটারের সাথে। উনি ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ ডেস্কের কর্মকর্তা ছিলেন। আমি তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক টম হেক্সনারের সহায়তায় ইউএস এইড এর ডেপুটি ডিরেক্টর মরিস উইলিয়ামসের সাথেও দেখা করেছিলাম। উইলিয়ামসের মাধ্যমে পাওয়া মেসেজটির জন্য এই সাক্ষাৎকারটি আমার বিশেষভাবে স্মরণে আছে। সেটি ছিল এই যে, বাংলাদেশ যদি চায় যে তার ব্যাপার ওয়াশিংটন আরও গুরুত্ব দিবে। তবে তাকে সামরিক সক্ষমতা প্রমান করতে হবে।

ওয়াশিংটনে আমার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাংক। এটি ছিল পাকিস্তানে দাতাগোষ্ঠীসমূহের প্রধান এবং প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রধান মুখপাত্র।

বিশ্বব্যাংকে আমার প্রথম যোগাযোগ মাধ্যম ছিল তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইংরেজ আই পি কারগিল যিনি পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের সভাপতি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি আই সি এস এর সময় থেকে এম এম আহমেদ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত কনসোর্টিয়ামের সাম্প্রতিক সম্মেলনে কারগিল এর উপদেশে সদস্যরা একমত হন যে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত মিশনের রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধ রাখা হবে। কারগিল আমার কথা দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছিলেন এবং তার প্রত্যুত্তর দেখে আমি বুঝেছিলাম যে, বাংলাদেশে মিলিটারি কার্যক্রম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতির দেয়ার সম্ভাবনা নেই।

কারগিল এর পরে আর থাকে শুধু বিশ্ব ব্যাংকের স্বর্গীয় প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা। বিশ্বব্যাংকের বন্ধুদের অনেক প্রচেষ্টার পর ম্যাকনামারা আমার সাথে সাক্ষাতে রাজী হয়েছেন বলে আমাকে জানানো হল। আমাকে বলা হল যে তার কম্পিউটারের মতো প্রখর মস্তিষ্ক শুধু প্রামাণ্য তথ্যগুলোই গ্রহণ করে এবং সেগুলো আমাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে। এর প্রস্তুতি হিসেবে ওয়াশিংটনে অন্যান্য বাংলাদেশীদের সহায়তায় আমি পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধের জন্য একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করলাম। পেপারটি পরে মুদ্রন করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আমার যতদূর মনে আছে পেপারটির শিরোনাম ছিল “ পাকিস্তানে সহায়তাঃ পেছনের কথা এবং ভবিষ্যতের বিকল্প”। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যখন এটি তুলে ধরা হলো, তখন মনে হলো ম্যাকনামারার মানবিক দিকটি হয়তো নাড়া দিয়েছিল। অন্তত উনি আমাকে সংকটের তীব্রতায় সত্যিকার উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ম্যাকনামারার ভূমিকা আলাদা করে দেখার অবকাশ ছিল না। যা দেখা গিয়েছিল তা হলো, বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানে একটি মিশন পাঠিয়েছিল এবং মিশনটি তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে পাকিস্তান আর্মির ভয়াবহ নৃশংসতার বিবরণ ছিল। সাথে ছিল সেখানে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভেঙ্গে পড়ার চিত্র। হারুন উর রশীদ এর ফাঁসকৃত সেই রিপোর্টটি নিউইয়র্ক টাইমস এ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি আমেরিকার অভ্যন্তরে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর পক্ষে লবিস্টদের অনেক সাহায্য করেছিল এবং ১৯৭১-এর জুনে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের সদস্যদের নতুন সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে প্রভাবিত করেছিল।

কংগ্রেস, বিশ্বব্যাংক এবং মিডিয়ার বাইরে আমি আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির গড়ে ওঠা কিছু দলের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তাদের মধ্যে প্রধান একটি গ্রুপ, যার সভাপতি ছিলেন প্রয়াত এফ আর খান, বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকায় জনমত গঠন আর স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহে কাজ করছিলেন।

আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এসব গ্রুপের সংগৃহীত তহবিল হতে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান মিশনে এবং নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত বাঙালিদের ইস্তফা দানের পর সহায়তা প্রদানের জন্য তাদের আশ্বস্ত করা। বাঙালি কমিউনিটি এবং মিশনে কর্মরত বাঙালিদের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবোঝি ছিল যা আমি দূর করার চেষ্টা করেছিলাম। ওয়াশিংটনে আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল মিশনের সকল সদস্যকে একত্র করা, তাদের চলার জন্য আর্থিক প্রয়োজনের প্রাক্কলন করা এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যাতে তারা কাজ পারে, সেরকম একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো। একটা তারিখও ঠিক হয়েছিলো, সম্ভবত ১লা জুলাই, যেদিন তারা একত্রে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করবেন এবং বাংলাদেশের জন্য দায়বদ্ধতা প্রকাশ্যে ঘোষনা করবেন। ওয়াশিংটন থেকে আমি নিউইয়র্কে গেলাম। সেখানে বাঙালি কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বললাম। এছাড়া শিকাগোতে এফ আর খানের সাথে কথা বলে আমেরিকায় বাংলাদেশ মিশনের জন্য তাদের সংগৃহীত তহবিলের একটা অংশ বরাদ্দ দিতে অনুরোধ করলাম।

এসব বড় বড় কাজের পাশাপাশি যেটুকু সময় আমার অবশিষ্ট থাকতো, তাতে আমি বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা গ্রুপের সাথে মিটিং করতাম যাদেরকে কোন না কোনভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজে লাগানো যেত। নিউইয়র্কে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম নিউইয়র্ক টাইমসের জিম ব্রাউনের সাথে যিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামুলক নিবন্ধ লিখেছিলেন।

আমি পরে আরও কয়েকবার টিভিতে গিয়েছিলাম। সুলতানা আলমের আমন্ত্রনে আমি ফিলাডেলফিয়ায় একটি অত্যন্ত মূল্যবান সফরে গিয়েছিলাম। ক্রিপেনডর্ফে তার তৈরি করা বাংলাদেশের সমর্থনে গঠিত একটি গ্রুপের সামনে ভাষণ দিয়েছিলাম। অন্যান্য বাঙালিদের দ্বারা আয়োয়িত বাঙালিদের কিংবা আমেরিকানদের অনেক গোষ্ঠীও শ্রোতা হিসেবে প্রস্তত থাকতো।

আমেরিকায় আমার অবস্থানের শেষের দিকে একটি বাঙালি কর্মী গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে একদিনের জন্য অটোয়াতেও গিয়েছিলাম। তারা মনে করেছিল যে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র হিসেবে সেখানে আমার উপস্থিতি তাদের কাজে লাগবে। অটোয়াতে পৌঁছেই আমি একটি জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন করলাম। এরপর অটোয়ার কয়েকজন সংসদ সদস্যর সাথে দুপুরের খাবারে অংশগ্রহণ করলাম যেখানে সংসদের বিরোধী দলীয় ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেছিলেন। বিকেলে একটি ব্যক্তিগত ক্লাবে মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের সাথে গোপন বৈঠকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। মন্ত্রী হিসেবে তিনি আমার সাথে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার কথা সহমর্মিতার সাথে শুনেছিলেন। সন্ধ্যায় আমি অটোয়াতে একটা বাঙালি গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করলাম। আমার একদিনের অটোয়া সফর পুরো ক্যাম্পেইনে অন্যতম ফলপ্রসূ দিন ছিল।

মে মাসের শেষের দিকে আমি লন্ডন ফিরে এলাম। লন্ডনে আমার স্বল্প সময় অবস্থানকালে দেখলাম যে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত প্রবলতর হচ্ছে। কিউ গার্ডেনসে আমি জুডিথ হার্টের নিজের বাড়িতে দেখা করলাম। তিনি বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক লেবার পার্টির সামনের সারির মুখপাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি লেবার পার্টির সরকারের সময়ে বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হন। আমার সাথে আলোচনার পর লেবার পার্টির বিরোধীদলের পক্ষ থেকে তিনি হাউস অফ কমন্সে একটি শক্তিশালী বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি দাবী করেন যে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত নেতাদের সাথে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য হতে পাকিস্তানে যেন আর কোন সাহায্য পাঠানো না হয়।

টরি এবং লেবার উভয় দলেরই বেশ কয়েকজন এমপির সাথে আমার ভাব বিনিময় করার সুযোগ হয়েছিল। এছাড়া আবারো স্বল্প পরিচিত নিকোলাস বেরিংটনকে ব্যবহার করে স্যার এলেক ডগলাস হোমের কাছে আমাদের চিন্তাভাবনা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। এছাড়া প্যারিসে অনুষ্ঠিত কনসোর্টিয়ামে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আমি কথা বলি এবং তাদের স্মারকলিপি পৌঁছে দিই।

ওয়াশিংটনে ম্যাকনামারা এবং মার্কিন কংগ্রেস এর কাছে পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধ করার জন্য যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল, সেগুলোই যুক্তরাজ্যে বাঙালি কমিউনিটির প্রচারনায় মূল প্রচারণা প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ালো। যুক্তরাজ্যে প্রচুর প্রবাসী বাঙালি অবস্থান করছিলেন। তারা তহবিল সংগ্রহে আর পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধের জন্য জনমত গঠনে বেশ সক্রিয় ছিলেন। এজন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রধান মুখপাত্রের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং পূর্ব লন্ডনের লিভারপুল স্ট্রিট ষ্টেশনের কাছে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য একটি অফিস খুলেছিলেন।

সেবার এবং পরবর্তীতে লন্ডন সফরগুলোতে গঙ্গা রেস্টুরেন্ট-এর মালিক তাসাদ্দুক আহমেদ এবং তার স্ত্রী রোজমেরি আমার জন্য মিটিঙের আয়োজনে অনেক সাহায্য করেছেন এবং গেরাদ স্ট্রিটে রেস্টুরেন্ট এর উপরে তাদের গুদামঘরটি একরকম আমাদের লন্ডন অফিসের মতোই ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নির্বাসিত নেতা ফিযো এর সাথে একটি আলোচনার আয়োজন করা হল এই ভেবে যে, তার সাথে বেইজিংয়ে চীন প্রশাসনের একটি সংযোগসূত্র ছিল। তাই বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে তার মাধ্যমে চিনকে অন্যান্যবারের চেয়ে আরো পরিষ্কারভাবে জানানো যাবে। ফিযো আলোচনার সময় গঙ্গা রেস্টুরেন্টে তার মেয়েকে নিয়ে এলেন। আলোচনায় মনে হচ্ছিলো যে তিনি চাইনিজদের সাথে আমাদের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার চাইতে নাগাদের পক্ষে আমাকে টানতেই বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। আলোচনাটি তাই মজার কিন্তু নিষ্ফল ছিল।

যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে আমি বাংলাদেশ বিষয়ে কিছু লেখালেখির সুযোগ পেয়েছিলাম। দ্য নিউ স্টেটসম্যান নামের বামঘেঁষা সাপ্তাহিকীটির সাথে আমি আমার পুরণো যোগাযোগ নবায়ন করলাম আর সেখানে বাংলাদেশে গণহত্যা এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর ইয়াহিয়া সরকারের টিকে থাকার বিষয়ক একটা লেখা পাঠালাম। নিউ স্টেটসম্যানের সম্পাদক পরবর্তীতে আমার লেখার ওপর ভিত্তি করে প্রথম পেজে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সেখানে তিনি পাকিস্তানে যুক্তরাজ্যের সব ধরনের সাহায্য বাতিলের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাউথ এশিয়ান রিভিউয়ের সম্পাদক জন হোয়াইট এর অনুরোধে সেখানে একটি লেখা দিয়েছিলাম যাতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানী আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়া পর্যন্ত আলাপ আলোচনার বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছিলাম। আমি গার্ডিয়ানেও একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম।

আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে আকবর নরমান এবং তারিক আব্দুল্লাহ নামক দু’জন সহানুভূতিশীল পাকিস্তানীর আয়োজিত একটি বড় বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে বহু লোক সমাগম ছিল এবং সেখানে প্রফেসর ড্যানিয়েল থরনিয়ার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যিনি পিআইডিই (পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডিবেলাপমেন্ট ইকনমিক্স)-এর সাথে কাজ করাকালীন ঢাকা অবস্থানসূত্রে পাক আর্মির গণহত্যার একজন সাক্ষী ছিলেন। তিনি পারিসের সরবনে ফিরে এসে বাংলাদেশের জন্য নেতৃস্থানীয় সোচ্চারকন্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ড্যানিয়েল ছাড়াও অন্য এক পাকিস্তানী তারিক আলী পাকিস্তানী আর্মি কর্মকাণ্ডের জন্য কড়া সমালোচনা করেছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছিলেন। তিনি অবশ্য এই বিপ্লবী উত্থানের মধ্য দিয়ে দুই বাংলা এক হওয়ার সম্ভবনা দেখেছিলেন। পাকিস্তানী আর্মির কড়া সমালোচনা দেখে তাকে গ্যালারীর পেছনদিকের একজন পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স অফিসার প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিলেন। এই আলোচনায় ভুট্টোর পিপলস পার্টির একজন প্রতিনিধিও বক্তৃতা রেখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানী যুক্তি তেমন একটা ধোপে টিকে নি। আমি ছিলাম সর্বশেষ বক্তা। শ্রোতাদের কাছ থেকে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম। সবখানেই এ ধরণের জনসভায় এরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল।

লন্ডন থেকে আমি প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের সেই চরম গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে গেলাম। সেটি ছিল খুব সম্ভবত জুনের ৭ তারিখে। বড় চালানের নতুন পণ্য সহায়তা পাবার আশায় পাকিস্তানীরা এই মিটিংটির ওপর নির্ভর করেছিল। যুদ্ধের কারণে তাদের আমদানী সক্ষমতা কমে গিয়েছিল।

প্যারিসে আমি ড্যানিয়েল এবং এলিস থরনারের বাসায় ছিলাম। এই থরনার দম্পতির আশ্রয়ে আরও ছিলেন ডঃ হাসান ইমাম, যিনি পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডিবেলাপমেন্ট ইকনমিক্স-এ ছিলেন এবং সম্প্রতি ভারত হয়ে প্যারিসে এসেছেন। ম্যাকনামারার নিকট উপস্থাপিত স্মারকলিপির ওপর ভিত্তি করে ড্যানিয়েল, হাসান ইমাম এবং আমি মিলে কনসোর্টিয়ামের জন্য একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করলাম। তারপরে এটি মিটিংয়ের আগের রাতে প্রত্যেক প্রতিনিধি নেতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। কেউ কেউ আমাদের কথা শুনেছিল। বাকিদের কাছে যাওয়া যায় নি। মিটিংয়ের আগের রাতে আমি ভোটাও নামের আমেরিকান বংশোদ্ভূত বিশ্বব্যাংকের সহকারী প্রধানের সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে কনসোর্টিয়াম নতুন সহায়তা দেবে এমন সম্ভাবনা কম। বিশ্বব্যাংকের সহ-সভাপতি পিটার কারগিলের সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছিল। তিনি সদ্য পাকিস্তান থেকে ফিরেছিলেন। তিনি তার সহকারীর দেয়া মতামতের নিশ্চয়তা প্রদান করলেন কিন্তু আমাকে বললেন মিটিং শেষে দেখা করতে।

কনসোর্টিয়ামে আমাদের তিনজনের তদবিরকারী দল ছাড়াও একদল বাঙালি প্যারিসে মিটিং অনুষ্ঠিত হবার সময় ভবনের সামনে প্রতিবাদ করতে এসেছিলেন। পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধের দাবিতে তাদের হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডও উপস্থিত ছিল।

কনসোর্টিয়াম শেষ হবার পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের সময় আমি পিটার কারগিলের সাথে পাঁচ তারকা হোটেল রয়েল মন্স্যুতে দেখা করলাম। তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে বাংলাদেশে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে কোনো নতুন সহায়তা না দেওয়ার ব্যাপারে কনসোর্টিয়ামে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে ঢাকা এবং ইসলামাবাদ ঘুরে কারগিলের দেওয়া রিপোর্টের প্রভাব ছিল। মিটিংয়ে তিনি পাকিস্তানের অত্যন্ত অস্থিতিশীল অবস্থার কথা নিশ্চিত করেছেন। কোনো কোনো সদস্য আরও কড়া কড়া কথা বলেছেন। তবে বেশিরভাগই পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে নিজ দেশে জনগনের চাপের মুখে খুশি মনে নতুন সহায়তা প্রদানের জন্য পাকিস্তনের উন্নয়ন পরিস্থিতি নেই মর্মে অজুহাত দেখিয়েছিলেন। মার্কিন প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে সাহায্যের দোহাই দেবার চেষ্টা করলেও শক্ত ভাবে বিতর্কে না জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করেছিল।

পাকিস্তানের জন্য কনসোর্টিয়ামের মিটিংটি ছিল একটি বড় ধরনের ধাক্কা আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজুড়ে চলা সংগ্রামের জন্য ছিল একটি বিরাট জয়।

কনসোর্টিয়ামে কাজ করা ছাড়াও আমার উপস্থিতিকে ড্যানিয়েল প্রভাবশালী ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের নিকট বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফরাসী সাংবাদিকসহ আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার জরুরী কয়েকটি মিটিং ছিল। যেমন রেয়মন্ড এরম, লুইস ডুমন্ট দ্য সোশাল এন্থ্রোপোলজিস্ট এন্ড দ্য এরাবিস্ট, ম্যাক্সিম রবিনসন। আমি সরবনেও কয়েকটি সেমিনার করেছিলাম। আমরা জানতে পারলাম যে ফ্রান্স পাকিস্তানে অস্ত্রের অন্যতম বড় যোগানদাতা। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রভাবশালীদের মতামত জোগাড় করে এসব বিক্রয় বাতিল করা। পরে দেখা গেল পাকিস্তান অস্ত্র সংক্রান্ত তাদের পুরণো দেনা পরিশোধের জন্য যে সময় কাঠামোর পুনর্বিন্যাস চাইছিল, ফরাসী সরকার তাতেই বেশী মনযোগী ছিল। আর্থিক কারনে ক্রমান্বয়ে ফরাসী অস্ত্রের চালান বন্ধ হয়ে গেল।

প্যারিস থেকে আমি রোমে গেলাম। সেখানে স্বল্প সময়ের অবস্থানে আমি বিশ্ব খাদ্য সংস্থা-কে এই বলে স্মারকলিপি দিলাম যে, পাকিস্তানে খাদ্য সাহায্যের যে অংশ বাংলাদেশ অংশের জন্য দেখানো হয়, তা বাংলাদেশ সরকারের নিকট পাঠানো হোক। এরা সীমান্ত পাড়ি দেয়া মানুষগুলোর মাঝে তা বিতরণ করবে। এই উদ্দেশ্যের বাইরে পাকিস্তানে ইতালি সহায়তা বন্ধের জন্য আমি ইতালির তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটস, কম্যুনিস্ট আর সোশালিস্ট কর্তাব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছিলাম। ইটালি কিন্তু পাকিস্তান কিংবা অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য তেমন বড় দাতা কখনোই ছিল না। এটা শুধু তাদের প্রতি একটি ইশারা ছিল মাত্র।

রোম থেকে আমি কেন্দ্র অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের কাছে আমার প্রচারণার প্রতিবেদন জমা দিতে গেলাম। ১৯৭১ এর জুলাই মাসে সেখানে থাকাকালীন আমি আমার অনেক বন্ধু এবং একাডেমিক সহকর্মীকে দেখতে পেলাম। আমরা ভাবলাম যে, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেবার জন্য কিছু করা উচিৎ। এই চিন্তা হতে আমি বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদের কাছে প্রস্তাব করলাম যে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করা হোক। সদস্য হিসেবে প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ স্বদেশ বসু এবং আমি থাকব বলে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম। ধারণাটা একসময় গৃহীত হয়েছিল কিন্তু বাস্তবায়িত হতে কিছু সময় নিয়েছিল। একমাস কেন্দ্রে থাকার পর আমি যখন ইউরোপ হতে ফিরে আসি, তখন সমস্ত ধকল গেল প্রফেসর হোসেনের ওপরে। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী শেষ পর্যন্ত এলেন। তাকে বোর্ড এর সভাপতি করা হল। বোর্ডটি একটি অফিসের জন্য জায়গা আর গবেষণার জন্য অল্প বরাদ্দ খুঁজে পেল এবং যুদ্ধ শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে মন্ত্রীপরিষদের জন্য কয়েকটি পলিসি পেপার তৈরির কাজ শুরু করে দিল।

কেন্দ্রে থাকাকালীন আমার সাথে মেজর খালেদ মোশাররফের আবার দেখা হয়েছিল। তিনি ততদিনে বাংলাদেশ আর্মির সদস্য হয়ে গেছেন এবং একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তিনি আমাকে বেলোনিয়ার যুদ্ধের বর্ণনা দিলেন। বললেন যে ব্রিটিশ টিভি সাংবাদিক ভানিয়া কিউলি তাদের সাথেই ছিলেন। এই সাংবাদিককে আমি আগেই লন্ডনে বলেছিলাম যুদ্ধ দেখতে চাইলে খালেদের সাথে দেখা করার জন্য। এরপর আমি মেজর জিয়াউর রহমানকে প্রথম বারের দেখলাম যিনি ছিলেন আরেকজন সেক্টর কমান্ডার। জিয়া তখন ব্যক্তিত্বের দিক থেকে খালেদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন। জিয়ার কাছ থেকে আমি তার চট্টগ্রামে যুদ্ধের বর্ণনা এবং বর্তমানে যুদ্ধের বিশ্লেষণ শুনলাম। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর এবং ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারের সাথেও আমার দেখা হল।

মুক্তিবাহিনীর যার সাথেই আমার কথা হচ্ছিলো, সবাই তরুণদের মুগ্ধকর গল্প শোনাছিলেন যারা জোয়ারের মতো প্রতিরোধ গড়তে ছুটে এসেছিল। গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে, তা আমি মেজরদের কাছ থেকে জেনেছিলাম। তাদের সকলেরই একই অভিযোগ ছিল যে, অপ্রতুল আর সেকেলে অস্ত্রগুলোই প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের প্রধান বাঁধা। পরে আমি জানতে পারলাম, সবে আগস্ট মাস থেকে মুক্তি বাহিনীকে অস্ত্র সরবারহের ব্যাপারে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদের কাছে আমার প্রতিবেদন জমা দেওয়া আর পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেবার পর আমি পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধের জন্য ইউরোপ আমেরিকায় জনমত গঠনের কাজে ফিরে গেলাম। এবার আমার কাছে মন্ত্রীপরিষদের দেয়া অফিসিয়াল কাগজ ছিল যাতে আমাকে ‘অর্থনৈতিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিশেষ দূত’ হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল।

আগস্ট মাসে আমি লন্ডনে ফিরে এসে দেখলাম যে, স্থানীয় বাঙালিদের প্রচারনা তুঙ্গে উঠেছে। ট্রাফলগার স্কয়ারে একটি বিশাল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রেসের সমর্থন শক্ত ছিল, সংসদে সকল দলের মুখপাত্রগন পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন এবং টরি সরকার পাকিস্তানে নতুন সহায়তা প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হল।

লন্ডনে চাথম হাউসে রয়েল ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের আহবানে আয়োজিত একটি সভায় আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখানে আমন্ত্রিত সকলেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার স্ত্রী পুত্র ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন। আমি সময়মতো লন্ডন ফিরতে না পারায় আমার পরিবর্তে আমার স্ত্রী সালমা বক্তৃতা করেন। আরও বক্তব্য দেন পাকিস্তান হতে সদ্য ফেরত লেবার পার্টির এমপি আর্থার বটমলি। উনি ছিলেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যাওয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের প্রধান। বটমলেয়ের চাক্ষুষ রিপোর্টের পাশাপাশি পরিস্থিতি সম্পর্কে সালমার হৃদয় নাড়া দেয়া বর্ণনার মাধ্যমে এটি বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ফোরামে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে অক্টোবর মাসে চাথম হাউসে আমাকে আবার বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল।

যুক্তরাজ্য থেকে আমি ওয়াশিংটনে ফিরে গেলাম। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে ওয়াশিন্টন দূতাবাস এবং জাতিসংঘের সমস্ত বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। এটি ছিল এক বিরাট কূটনৈতিক অভ্যুত্থান। তারা ছিল সংখ্যায় অনেক ভারী এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক দক্ষ কর্মকর্তারা সেখানে ছিলেন। এস এ করিম ছিলেন জাতিসংঘের পাকিস্তান মিশনে স্থায়ী সহকারী প্রতিনিধি এবং সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি নিউইয়র্ক থেকে চলে এলেন এবং একটি জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তাদের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হল। এনায়েত করিমের অনুপস্থিতি সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু জানা গেল তিনি কয়েকদিন আগে মারাত্মকভাবে হৃদক্রিয়া আটকে হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং সেখান থেকেই তিনি বাঙালিদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

জুনের শুরুর দিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম যে, পাকিস্তানে পাঠানো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-আইএমএফ এর ফ্যাক্ট মিশনের রিপোর্টটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কেউ একজন নিউ ইয়র্ক টাইমস এর কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন। শুধু কনসোর্টিয়ামের ওপর নয় বরং আমেরিকার সাধারন জনগন, কংগ্রেস এমনকি আমেরিকা বাদে অন্য দাতাদের ওপরও এই রিপোর্টটির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ছিল।

এতদিনে আমেরিকাতে বাংলাদেশ আন্দোলন তদবিরের দিক থেকে সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। প্রতিশ্রুতিশীল এবং আদর্শবান আমেরিকানদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশের জন্য তাদের সময় এবং শ্রম দিচ্ছিল, যা দেখে আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর গ্রুপটি ছিল ওয়াশিংটন ভিত্তিক ‘বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র’। এরা স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর জন্য তদবিরের সমন্বয় করছিল।

বাঙালি কূটনৈতিকদের সংখ্যা আর জনগণের মধ্যে আমেরিকান কংগ্রেসে বাংলাদেশে বিপুল জনসমর্থন দেখে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশে স্থায়ী মিশন স্থাপনের জন্য মনস্থির করা হল। এটি ওয়াশিংটনের কানেক্টিকাট এভিনিউতে উপশহরে অবস্থিত ছিল। এম আর সিদ্দিকীকে মিশনের প্রধান করা হল এবং ইস্তফা দানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এতে নিয়োগ করা হল। এস এ করিমকে জাতিসংঘ এবং নিউইয়র্ক অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

ওয়াশিংটনে নবগঠিত মিশন এবং বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র সেখানে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী প্রণয়নে লবিঙের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। এই সংশোধনীতে দাবী করা হয়েছিল যে, মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য আইনে একটি অংশ যোগ করা হোক। তা অনুযায়ী গণহত্যা বন্ধ না করা এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ শুরু করার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে মার্কিন সহায়তা বন্ধ থাকবে। একজন পদধারী রিপাবলিকান আর একজন ডেমোক্রেটের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সিনেটের এই দ্বি-দলীয় গ্রুপ ইতোমধ্যে সিনেটে প্রচুর সমর্থক যোগাড় করে ফেলেছিল।

ঐ মুহূর্তের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল সিনেটে সংশোধনীটির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করা। এই সংশোধনীটির প্রতি জোরালো সমর্থন থাকলেও এর সমর্থকদের আমেরিকা প্রশাসন থেকে আসা বিপরীত জোরালো চাপও সহ্য করতে হয়েছিল। প্রশাসন এই অজুহাতে ইয়াহিয়া প্রশাসনকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো যে ইয়াহিয়া প্রশাসন তাদের অনুগত এবং সহায়তা কমিয়ে দেয়া হলে পাকিস্তানীদের ওপর তাদের প্রভাব খর্ব হবে। এই অজুহাতে পাকিস্তানে তাদের অস্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশের চালান অব্যাহত ছিল যা সিনেটে বক্তৃতাকালে সিনেটর কেনেডির প্রকাশ করে দেন। ইস্ট কোস্টে বন্দরে একটি নোঙ্গর করা জাহাজে করে পাকিস্তানে অস্ত্র যাচ্ছে ভেবে একদল আমেরিকান সমর্থক তা নৌকায় করে ঘেরাও করেছিল, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ওয়াশিংটনে ফিরে আমার কাজ তাই হয়ে পড়ে হিলে স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী বিলের পক্ষে সমর্থন জোরালো করা। এ কাজে আমি বাংলাদেশ মিশন এবং বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্রের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছিলাম। তথ্য কেন্দ্র লবিং করার জন্য স্টাফ বিষয়ক কাজটা নিয়েছিল। এতে তারা পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রত্যেক কংগ্রেসম্যানের নথি তৈরি করেছিল, যাতে সকলের রাজনৈতিক অবস্থান এবং ভীতি বর্ণিত ছিল। তদবিরের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছিল। বাঙালি এবং ওয়াশিংটন ও সারা দেশের অন্যান্য সহানুভূতিশীল আমেরিকানদের লবিং কার্যক্রম চালানোর জন্য ওয়াশিংটনে এসে কিছু সময় দেবার জন্য রাজী করানো গিয়েছিল। এই একত্রিত হওয়াতে আরও বেশী সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। মানুষ কাজ থেকে ছুটি নিয়েও কিছু সময় ওয়াশিংটনে এসে লবিঙে সমর্থন জানাতো। আমেরিকানদের পাঠানো হত তাদের নিজ নিজ স্টেটের সিনেটরদের কাছে। আর বাঙালিদের লক্ষ্যকৃত সিনেটর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।

এই লবিং কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে আমেরিকার রাজনীতির জটিলতা এবং রাজনৈতিক মতামত গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা হয়েছিল। কিছু আমেরিকান গ্রুপের সদস্য এবং হিল এ কর্মরত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের জন্য যেরকম নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তা ভোলার নয়। আমার বিশেষ করে মনে পড়ে বাংলাদেশ গ্রুপের টম ডাইনের স্ত্রী জোয়ান ডাইনের কথা। তিনি হিলে আমাদের সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠাবান ছিলেন। মনে পরে ডেইভ ওয়েইসবার্গ নামক একজন তরুণ স্নাতকের কথা, যিনি বিআইসি’র পূর্ণকালীন সচিব হয়েছিলেন। তাদের সহায়তা করেছিলেন কায়সার হক নামের একজন তরুণ বাঙালি, যিনি নিজেও যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। হিলে কর্মরত টম ডাইন, গেরি টিংকর এবং ডেইল ডাইহান প্রথম থেকেই বন্ধু ছিলেন। পরে সেখানে সিনেটর স্যাক্সবির সহকারী মাইক গার্টনার এলেন। সিনেটর স্যাক্সবি তো মে মাসের শুরু থেকেই বাংলাদেশের জন্য একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজ প্রশাসনের বিল সংশোধনের সহ-পৃষ্ঠপোষকই হয়ে গেলেন। এজন্য তাকে হোয়াইট হাউসের অনেক চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। এ সময়ে মাইক গেস্টনার ছিলেন তার অক্লান্ত পরামর্শ আর সমর্থনদাতা।

স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী সিনেটে বাতিল হবার উপক্রম হয়েছিল। এখানে একটা অদ্ভুত জোট গড়ে ওঠে। ফ্রাংক চার্চ এর মত উদারপন্থি সিনেটরের সাথে দক্ষিণাঞ্চলীয় রক্ষণশীলরা এক হয়ে উঠল। উদারপন্থিগণ বলছিলেন যে পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য ইয়াহিয়ার বর্বরোচিত গণহত্যায় অপব্যবহৃত হচ্ছে। সকল উদারপন্থি সমর্থকগণ একই সুরে বলছিলেন। এবারে তাদের সাথে যুক্ত হল রক্ষণশীলের দল। এরা জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভূক্তিতে সাধারন পরিষদে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশের উল্লাস দেখে এমনিতেই রাগে ফুঁসছিলেন। ১৯৭১ সালে আসলেই কমিউনিস্ট চীন বিপ্লবের সফলতার পর দীর্ঘ ২২ বছর পরে জাতিসংঘ থেকে তাইওয়ানকে সরিয়ে দেয়। জাতিসংঘের এ সমস্ত ঘটনা রক্ষণশীল কংগ্রেসম্যানদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। এরা একে মার্কিন সহায়তার উপর নির্ভরশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অকৃতজ্ঞতা হিসেবে দেখেছিল। সাহায্য বন্ধ করে তারা এদেরকে একটা শাস্তি দিতে চেয়েছিল।

এসব জানাজানি হয়ে গেলে, সিনেটে পুরো সহায়তা বিলটাই হেরে গেল। স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর প্রয়োজন হলো না। পুরো জিনিসটাই বাকি বিশ্বের জন্য অবশ্যই অনেক বড় ঘটনা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের লবিং প্রচেষ্টার জন্য এটা একটা বিজয় বলেই গণ্য হলো। কারণ এটি সকল সাহায্য গ্রহীতাদের মধ্যে পাকিস্তানে নতুন সাহায্যের চালান বন্ধ করে দিলো।

যাই হোক, এই বিজয় কিন্তু আমেরিকা প্রশাসনকে অন্যান্য ছিদ্রপথে পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান থেকে বাঁধা দিতে যথেষ্ট ছিল না। ততদিনে ন্যাটো জোটের মধ্যে আমেরিকা একাই ইয়াহিয়া প্রশাসনের সমর্থনে রক্ষাকবচ হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্তত পাক জান্তার সাথে চুক্তি বহির্ভূত সহায়তা বন্ধে কংগ্রেস এবং আমেরিকান জনগনের মধ্যে লবিং চালিয়ে যাওয়াটা আবশ্যক ছিল।

ওয়াশিংটনে যখন লবিং চলছিল, পাকিস্তানের দাতা কনসোর্টিয়াম তখনো একটি প্রভাব বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। অক্টোবর, ১৯৭১-এ ওয়াশিংটনের শেরাটন হোটেলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর বার্ষিক সভা ছিল আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। যদিও মিটিংটির আলোচ্যসূচিতে পাকিস্তানের প্রতি সহায়তার বিষয়টি ছিল না, তথাপি আমাদের বন্ধুরা বললো যে পাকিস্তানীরা তাদের দায় পরিশোধের জন্য কনসোর্টিয়ামের কাছে সময় পুনর্বিন্যাসের আবেদন করার পাশাপাশি আবার নতুন সহায়তা প্রার্থনার জন্য এই মিটিংটিকে কাজে লাগাতে পারে। এ এম এ মুহিত এবং আমি মিলে পাকিস্তানের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই চরম মুহূর্তে পাকিস্তানে আর সাহায্য প্রদানে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে একটি নতুন একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করলাম।

সভায় অংশগ্রহনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কনসোর্টিয়ামে আসা প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের কাগজপত্র পৌঁছে দেয়া, তাদের সাথে কথা বলা সহ যাবতীয় দায়িত্ব মুহিত এবং আমি নিজেই নিলাম। একদিনের জন্য প্রফেসর নুরুল ইসলাম তার কাজের মূল জায়গা ইয়েল থেকে বিমানে করে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। হোটেল এর বাইরে বিআইসি গ্রুপ ছোট করে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল। অন্যদের মাঝে জোয়ান ডাইন তার শিশুসন্তান এমিকে হাতগাড়িতে চড়িয়েই নিয়ে এসেছিল। একসময় মুহিত বাইরে প্রতিবাদকারীদের সাথে ছিলেন আর নিরাপত্তা রক্ষীরা তখন শেরাটন চত্বর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি প্রতিবাদকারীদের কাছ থেকে দূরে ছিলাম এবং মুহিতের কাছ থেকে আমাদের কাগজপত্র নিয়ে হোটেলের অভ্যন্তরে কাজ চালাতে পেরেছিলাম।

এটা ছিল আমাদের জন্য আরেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কক্ষে, বারান্দায় যেখানে যাকে পাই ধরে ধরে আমাদের কথাগুলো বোঝানো। কেউ কেউ শুনেছিল, কেউ কেউ এড়িয়ে গেল। কয়েজনের সাথে দেখা হয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এরকম একজন ছিল আমার ১৮ বছরের পুরনো ক্যামব্রিজের সহপাঠী শাহ পুর সিরাজী। তিনি তখন ইরানের ব্যাংক মারকাযির গভর্নর ছিলেন। সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান মিলিটারীকে ইরানের শাহ-এর সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। শাহপুর দাবী করলেন যে ইরানের শাহ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করার জন্য ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন। কথাটা যাচাই করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

আরেক পর্যায়ে ক্যামব্রিজের আরেক বন্ধু তৎকালীন শ্রীলংকা সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক সচিব লাল জয়াবর্ধনের সাথে দেখা হল। লাল তারপর প্রফেসর ইসলাম এবং আমার সাথে শ্রীলংকার অর্থমন্ত্রী ট্রটস্কাইতি এন, এম পিরার সাথে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করে দেন। আমরা তাকে অস্ত্র এবং সৈন্য পরিবহনে সুবিধার্থে শ্রীলংকায় পিআইএ এবং পাকিস্তান এয়ার ফোর্স এর অবতরণের জন্য অনুমতি প্রদান বিষয়ে ধরেছিলাম। তিনি তখন তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন যে প্রদত্ত অবতরণ সুবিধার এমন অপব্যবহার যাতে না হয়, তিনি তা খেয়াল রাখবেন। এক্ষেত্রেও তিনি তার কথা রাখতে পেরেছিলেন কিনা, তা আমার জানা সম্ভব হয় নি।

ঐ সময় আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত ছিলাম। তা হলো জাতিসংঘে প্রচারণা। ১৯৭১-এর অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বাংলাদেশ একটি দলকে মনোনিত করেছিল। সেই দলটির প্রধান ছিল বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। সদস্যদের মধ্যে আমি ছাড়াও ম্যানিলা থেকে ইস্তফা দানকারী রাষ্ট্রদূত কে কে পন্নী, ইরাক থেকে ইস্তফা দানকারী রাষ্ট্রদূত এ ফতেহসহ ডঃ এ আর মল্লিকের মতো আরো অনেকেই ছুটে এসেছিলেন সেই প্রতিনিধি দলে যোগদান করার জন্য। জাতিসংঘে আমাদের প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল সাধারন পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে যেন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এখানে আমাদের কার্যক্রম ছিল আরও হতাশাজনক। অধিবেশনে কয়েকজনের এবং কয়েকটি কমিটির বক্তব্যে আমাদের পক্ষে কিছু কথা উঠে আসলেও, তা থেকে কিছুই হলো না। কারণ জাতিসঙ্ঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ হবে বলে বেশীরভাগ দেশই এ ব্যাপারে আওয়াজ তুলতে অনিচ্ছুক ছিল। যেহেতু ভেটো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো দেশই ঐ পর্যায়ে জনসমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে নি, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের প্রচেষ্টার কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফলও ছিল না।

এই সময় আমি বাংলাদেশের পক্ষে বেশ কয়েকটি বক্তব্য দিয়েছিলাম। এগুলোর মধ্যে ছিল ফিলাডেলফিয়া ও সাইরাকুস বিশ্ববিদ্যালয় দু’টিতে জনবহুল সভা। এছাড়া এমআইটিতে-ও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে আমার সাথে ছিলেন বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী এবং ডঃ মহিউদ্দীন আলমগীর। প্রফেসর আনিসুর রহমান আমার জন্য সেখানকার উইলিয়ামস কলেজে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। এছাড়া প্রফেসর নুরুল ইসলামের ইয়েল কলেজেও একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। বেশীরভাগ অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করার জন্য পাকিস্তানীরা দলে দলে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগের চাইতে দুঃখই পেত বেশী আর সাধারণ কয়েকটি প্রশ্নই শুধু করত।

আমি মাঝে মাঝে টিভিতে যাওয়া এবং সাময়িকীর জন্য লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে থাকাকালে একেবারে শেষের দিকে টিভিতে গিয়ে দু’বার খুব মজার ঘটনা ঘটল। প্রথমটি বোস্টনের সরকারী টেলিভিশনে। অনুষ্ঠানটি খুব জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে হতো। সেটি একটি আদালতে মামলা ভিত্তিক আয়োজিত হতো যেখানে দু’জন আইনজীবী পক্ষে এবং বিপক্ষে কথা বলতেন। প্রত্যেকে তিনজন করে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারতেন। যতদূর মনে পরে, সেদিনের বিষয় ছিল বাংলাদেশের জন্য আমেরিকা সরকারের সমর্থন প্রদানের ওপর আলোচনা। আমাদের পক্ষের উকিল কে ছিলেন, তা আমি মনে করতে পারছি না। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রধান ছিলেন আমেরিকার অন্যতম প্রধান রক্ষণশীল সাপ্তাহিকী ন্যাশনাল রিভিউ-এর স্বত্ত্বাধিকারী উইলিয়াম রাশার। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন সুপরিচিত ডানপন্থী ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম এফ বাকলে জুনিয়ার। রুশার ছিলেন বাকলের চাইতে, এমনকি গেঙ্গিস খানের চাইতেও রক্ষণশীল। উপমহাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল জন ফস্টার ডালেসের সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তিনি ইন্ধিরা গান্ধির ভারত এবং ১৯৫০ সাল সময়কার ইন্দিরার পিতার ভারত সম্পর্কে পার্থক্য করতে পারছিলেন না আর কৃষ্ণ মেননকেই তখনো ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে ধরে নিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানটির দর্শক খুব বেশী ছিল না। কিন্তু এটি মজার ছিল কারণ তা বাংলাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি বের করে এনেছিল। রাশার অনুষ্ঠানটির জন্য টিভির একজন কর্মীকে পাকিস্তানে পাঠালেন ভুট্টোর সাক্ষাতকার নেবার জন্য। এরকম একটি পক্ষপাতমূলক ভিডিও প্রযোজনা করে আমাদেরকে স্টুডিওতে দেখানো হয়েছিল। রাশার নিউ জার্সির কংগ্রেসম্যান ফ্রেলিংঘুসেন এবং পাকিস্তানে আমেরিকার একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত, পেপসি কোলার ধনকুবের ব্যবসায়ীকেও জড়ো করেছিলেন। যাকে নিক্সনের নির্বাচনী প্রচারণার খরচ যুগিয়েছিল বলে পুরষ্কার স্বরূপ সেখানে পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষে আমাদের উকিল নিয়ে এসেছিলেন লেবার পার্টির এমপি জন স্টোনহাউসকে, যিনি ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে অন্যতম বাকপটু প্রচারক ছিলেন। উনি বিশেষ করে সেই অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেবার জন্য লন্ডন থেকে উড়ে এসেছিলেন। আর ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম কে রাগোস্ত্রা। তিনি ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে এল কে ঝা এর ডানহাত ছিলেন এবং বর্তমানে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব। সবশেষে অনুষ্ঠানে একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে ছিলাম আমি। স্টুডিও দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি নাকি টিভি দর্শকদের জন্য একটি প্রাণবন্ত উপস্থাপনা করেছিলাম।

টিভিতে আমার দ্বিতীয় উপস্থিতি ছিল আরও ঐতিহাসিক। এর আগে জাতিসঙ্ঘে প্রতিনিধিত্বকালে আমরা অনেক বেশী সক্রিয় হলাম যখন ভারত-পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব প্রকাশ্যে আসার পরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারন পরিষদে বাংলাদেশ ইস্যু শেষ পর্যন্ত উঠে এলো। উত্তর ভারতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর হামলার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সীমান্তে উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌছালো। যে পাকিস্তান এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ইস্যু জাতিসংঘের আলোচ্যসূচিতে আনতে চায় নি, তারাই এখন এটাকে ইন্দো-পাকিস্তান শান্তির হুমকি হিসেবে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে তৎপর হয়ে উঠল। বাংলাদেশে ভারত সেনাবাহিনীর সফল অগ্রগামিতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলো। ফলে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ভারত সেনাবাহিনীকে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক সহায়তা চাইতে বাধ্য হলো। এ ব্যাপারে তারা আমেরিকা এবং চীনের শক্ত সমর্থন পেয়েছিল। পাকিস্তানের জন্য এই তদবির ছিল জাতিসংঘে চিনের প্রথম প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড। যুদ্ধবিরতি এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারন পরিষদে অপ্রতিরোধ্য সমর্থন পাচ্ছিলো। স্পষ্টতই বেশীরভাগ সদস্য এই ইস্যুতে একমত হয়েছিল কারণ তারা ভাবছিল যে এতে একটি যুদ্ধের অবসায়ন হতে যাচ্ছে। ফলে আমেরিকা এবং চীনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছিলো। শুধু ভেটো দিয়ে বাঁধ সাধলো সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এই ভেটোকে পাশ কাটানোর জন্য সাধারণ পরিষদে একই ধরনের একটি সিদ্ধান্তপত্র আনা হল যেখানে একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সদস্যদের সমর্থন ছিল আরো বেশী। ফলে জানা ছিল যে এখানে এই রেজ্যুলেশন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। আমি পরবর্তীতে এই বিতর্কে সকলের বক্তৃতা পর্যালোচনা করে দেখলাম, খুব অল্প দেশই পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন থেকে এটি করেছিল। বেশীরভাগ দেশ যুদ্ধবিরতি সায় দিয়েছিল কারণ এটাকে আন্তর্জাতিক রীতিতে ‘শান্তিনীতি’ বলেই ধরে নেয়া হয়।

আমরা বাংলাদেশীরা ছিলাম জাতিসংঘে এই নাটক দেখা গ্যালারীর দর্শক। আমাদের প্রচেষ্টা অনেকের ব্যক্তিগত সহানুভূতি আদায় করতে পেরেছিল। কিন্তু সাধারণ পরিষদে আমাদের পক্ষে বলার মত তেমন কাউকে পাচ্ছিলাম না। বক্তারা সকলেই ৯ মাসের আগ্রাসন আর পাকিস্তানী আর্মির গণহত্যা বেমালুম ভুলে সদ্য উদ্ভুত ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল।

নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিধিদের কাছে লবিঙে অংশ নেয়ার ছাড়াও আমি নিউ ইয়র্কের একটি পাব্লিক টেলিভিশনে আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই চ্যানেলটি অন্যদের তুলনায় আলাদা ছিল এই কারনে যে, জাতিসংঘের সাধারন ও নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম শুধু এই চ্যানেলটিতেই দেখানো হত। আমাদের অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আদলেই সাজানো হয়েছিল। দুটি প্যানেলের একটি সেট সাজানো হয়েছিল। একটি আমেরিকানদের নিয়ে। যতটুকু মনে পরে, এখানে ছিলেন টম ডাইন, নিউজউইক ম্যাগাজিন-এর আর্নল্ড ডি বর্সগ্রেইভ এবং অন্য আরেকজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তাদের তিনটি পক্ষের সাথে আলোচনা করতে হয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন নিউইয়র্কে পাকিস্তানের কনসাল-জেনারেল নাজমুস সাকিব খান, ভারতের পক্ষে ভারতীয় কনসাল-জেনারেল এবং বাংলাদেশের পক্ষে আমি। পাকিস্তানের কনসাল-জেনারেলকে আমার সাথে একই প্লাটফরমে বসতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই ভারতীয় কনসাল-জেনারেল এবং তিনি পর্দায় এক সাথে এলেন আর আমি এলাম পরে। তাই আমার বেলায় মনে হচ্ছিলো যেন আমি একক ভাবে ছিলাম। কাকতালীয়ভাবে আমি যখন এলাম, তখন সাধারন পরিষদে ভোট গণনার ফল প্রকাশ হচ্ছিলো। আমার বিবৃতি শুরু হওয়া মাত্র ক্যামেরা জাতিসংঘের অধিবেশনের দিকে ফিরে গেল। রিপোর্টে দেখা গেল তাৎক্ষনিক যুদ্ধবিরতি এবং সীমানা অতিক্রমকারী সৈন্যদের ফেরত পাঠানোর প্রস্তাবে বিপুল ভোট পড়েছে। ক্যামেরা আবার আমার কাছে ফেরত এল এবং সাক্ষাতকার গ্রহণকারী স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রতিকূল এই ঘটনা সম্পর্কে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। যতটুকু মনে পড়ে, নিজেকে দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে আমি বলেছিলাম, “পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ হতে উদ্ভুত এই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশকে এই সাধারন অধিবেশনের আলোচনায় ডাকা হয় নি। বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণ তাই জাতিসংঘের এই গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন অংশ নয় এবং বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানের আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলবে।” বাংলাদেশে অবস্থা নিয়ে আমার বিবৃতি এবং জাতিসংঘে বিতর্কের পরে উদ্ভূত পরিস্থিতি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কিছু দিন পর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় আমার কথাগুলো শুনে থাকা এক আগন্তুক আমাকে থামিয়ে আমার বিবৃতির জন্য বাহবা জানিয়েছিলেন।

যা হোক, টিভি তারকার ভূমিকা ছিল ক্ষণস্থায়ী। আসল নাটক চলছিল বাংলাদেশে এবং জাতিসংঘের আনাচে কানাচে। আমরা জানতে পারলাম যে, শেষ মুহুর্তে সরকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিউইয়র্ক আসছেন। যদিও ভূট্টোর আসার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের মাটিতে ঘটছিল। ভারতীয় এবং বাংলাদেশী বাহিনীর দর্শনীয় অগ্রগামিতা আর পাকিস্তানী ব্যুহের একেবারেই ভেঙ্গে পড়া জাতিসংঘের বিতর্কে তাদের অবস্থান খারাপ করে দিয়েছিল। একজন সাংকেতিক বার্তা নিয়ে কর্মরত কেরানীকে বলা হয়েছিল জাতিসংঘের পাকিস্তানী দূতাবাসে থেকে যেতে। তিনি জানালেন যে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুমতি চেয়ে জেনারেল নিয়াজির পাঠানো সাংকেতিক বার্তা এসে পৌঁছেছে। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরাপদে আত্মসমর্পণের নিশ্চয়তা চেয়ে পাঠানো রাও ফরমান আলীর একটি বার্তা ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মারে হেনরি জাতিসংঘের মহাসচিবের কার্যালয়ে পাঠিয়েছেন।

ভুট্টো বিমানবন্দরে নেমেই তার জন্য ভয়াবহ এই সংবাদগুলো পেলেন। নিরাপত্তা পরিষদে তার চক্রান্তের পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। এত কিছুর জন্য একেবারেই অপ্রস্তুত ভুট্টো নিভৃতে চলে গেলেন এবং পরের কয়েকদিন জাতিসংঘে আমেরিকা এবং চীনের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যথাক্রমে জর্জ বুশ এবং হুয়ান হুয়াং এর সাথে একান্তে আলাপচারিতায় কাটালেন। তারা গোপনে কি আলাপ করেছিলেন জানিনা তবে কয়েকদিন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কিছু শোনা গেল না। বুশ বর্তমানে রিগ্যান প্রশাসনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। মনে হলো, ইসলামাবাদ থেকে নিয়াজি এবং ফরমান আলীর আর্জি এই বলে খারিজ করা হল যে নতুন সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। তার মানে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোকে উত্তর থেকে চীন এবং সমুদ্র থেকে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হঠাৎ আমরা দেখলাম যে নিরাপত্তা পরিষদে আরেকটি অধিবেশন ডাকা হলো যেখানে ভুট্টো ভাষণ দিবেন।

আবারো জাতিসংঘে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলকে নিরাপত্তা পরিষদের গ্যালারিতেই বসে ভুট্টোর ভাঁড়ামি দেখতে হলো। আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে যুদ্ধবিরতি চেয়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করাতে চেষ্টা করছিলাম। এর পিছে আমরা সময় দিচ্ছিলাম আর এটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশের জন্ম অনিবার্য। বেশীরভাগ মুখপাত্র একমত ছিলেন যে, ‘বাংলাদেশ’ একটি বাস্তব সত্ত্বা এবং সর্বোত্তম সমাধান হলো পাকিস্তান আর্মিকে দ্রুত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার মাধ্যমে যৌথ বাহিনীর অনতিবিলম্বে জয় লাভ করা। তারা বললেন, নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকান আর চিনারা যারা দেখাতে চাইছে যে ইয়াহিয়া খানের জন্য তারা তাদের সামর্থ্যের সবই করেছেন। এটা একটা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মিটিংগুলোতে জাপানের প্রতিনিধিদের মাঝে আমার আরেকজন অক্সফোর্ড সহপাঠি আমার সাথে নিয়মিত দেখা করতো এবং নিরাপত্তা পরিষদের মনোভাব আর অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর দিত।

পাক আর্মির আত্মসমর্পণ আগমুহূর্তে আমি নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্ক দেখেছিলাম। ভুট্টো যখন নিরাপত্তা পরিষদে তার কাজ করছিলেন, তখন খবর এলো যে নিক্সন আমেরিকার সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে যেতে বলেছেন। এর কোনো উদ্দেশ্য এখন পর্যন্ত বলা হয় নি। আমেরিকা প্রশাসন একগুয়েভাবে ভারতকে শাসিয়ে যাচ্ছিল এবং বাংলাদেশে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়া পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য কিছু একটা বুদ্ধি যে বের করবে তা অনুমান করা কঠিন ছিল না। ধারনা ছিল যে, এমন একটি হস্তক্ষেপ যা নিয়াজি সুদীর্ঘকাল ধরে চাইছিলেন, সেটার হয়তো ছক আঁকা হয়ে গেছে। এ হতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ভিত্তি মজবুত করা যাবে এবং এমন একটি মীমাংসা হবে যা থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা অটুট থাকবে। তাই বাংলাদেশকে ঘিরে যে বড় নাটক চলছিল, সেটি ঢেকে রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নাটকটা ছিল একটি উছিলা মাত্র।

উত্তর পূর্ব থেকে ভারতে চীনের সম্ভাব্য আক্রমন কিংবা মনোযোগ সরানোর চেষ্টা পাকিস্তানের জন্য ছিল অন্যতম আশা। আমাদের কানে এসেছিল যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আর্মি জেনারেলকে ভুট্টো পিকিং পাঠিয়েছেন। আমি নিজেও আগে এমন একটি সম্ভাবনার বিষয়ে ভেবেছিলাম। অক্টোবরের শেষ দিকে আমি প্যারিসে বেইজিংয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কে এম কাইসার এর সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছিলাম। পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহূত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে যোগ দিতে কে এম কাইসার জেনেভায় এসেছিলেন। সেখান থেকে আমার সাথে দেখা করার জন্য তিনি গোপনে প্যারিস আসেন এবং আমাকে এই গুপ্ত তথ্যটি দেন যে চিন পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না। তারা পাকিস্তানকে অস্ত্র এবং কূটনৈতিক সহায়তা দেবে কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে যতই প্রকাশ্যে তর্জন-গর্জন করুক না কেন, চিনের সাথে আওয়ামীলীগের গোপনে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যেন এসব তথ্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠাই। আমি সে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। পরে জানলাম যে আমি ছাড়াও বেইজিংয়ে পাকিস্তান অ্যাম্বাসীতে কর্মরত বাঙালিদেরকেও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে এ ধরনের তথ্য পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই তথ্যের পিছে এই অঞ্চলে মিলিটারি কৌশলে আর কী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, তা আমি বলতে পারি না।

নিরাপত্তা পরিষদের ভেতরে এবং বাইরে আমেরিকা, চিন আর পাকিস্তানের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া যৌথ বাহিনী কত দ্রুত পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করাতে পারে, তার সামর্থ্যের ওপর উত্তেজনা নির্ভর করছিল। ডিসেম্বরের ১০ তারিখের দিকে আত্মসমর্পণ নিশ্চিত মনে হচ্ছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মোড় ঘুরে গেল ইসলামাবাদের নির্দেশে। ইসলামাবাদ চেয়েছিল বাইরের খেলোয়াড়দের খেলার জন্য কিছুটা সময় দিতে। আমি যখন নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনের বাসায় ফিরে যাচ্ছিলাম, বাতাসে তখন তীব্র উত্তেজনা। সপ্তম নৌবহরের মাধ্যমে আমেরিকা এই যুদ্ধকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উন্মোচিত করেছে। এটি এখন আর কেবল কল্পনার মাঝে সীমাবদ্ধ নেই।

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন আমি পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণের উল্লাসজনক সংবাদটি শুনলাম। আমি ঢাকার রেসকোর্সে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা সিং এর কাছে জেনারেল নিয়াজির হাত নিচু করার দর্শনীয় ঘটনাটি টিভিতে দেখলাম। আজ পর্যন্ত এটি উদঘাতিত করা যায় নি যে, জেনারেল নিয়াজির বাহিনী আর একটু সময়ক্ষেপণ করতে পারলে কি আসলেই আমেরিকার সপ্তম নৌবহর হস্তক্ষেপ করতো? নাকি পাকিস্তানের সত্যিকারের মিত্র হিসেবে নিজেকে দেখানোর জন্য নিক্সনের এটা একটি গণসংযোগ প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। এ ধরনের হস্তক্ষেপে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যে সমর্থন ছিল না, তা নিশ্চিত। এই ইস্যুতে মিডিয়া অত্যন্ত সোচ্চার ছিল। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কিসিঞ্জারের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে নিক্সন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ভারতের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি আগেই জ্যাক এন্ডারসন ফাঁস করে দিয়েছিলেন, যা বহু জায়গায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। চার্চ, কেনেডি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সদস্যরা আমেরিকার এ ধরণের নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছিলেন। তাই ধারনা করা যায় যে, আমেরিকার জনগন, মিডিয়া এবং কংগ্রেস যদি বাংলাদেশের প্রতি এরকম সহানুভূতিশীল না হতো কিংবা উদাসীন হতো, তবে নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন আরও অনেক দূর নিয়ে যেতেন। এ থেকে বলা যায় যে, নিষ্ঠুর নিক্সন প্রশাসনের মাথার ওপর এমন তীব্র প্রচারণা বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যহীন ছিল না।

পাকিস্তানে নতুন সহায়তা প্রদানের প্রশ্ন যেন পুনরায় ফিরে না আসে, সেজন্য দাতাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত চলমান ছিল। অর্থাৎ নভেম্বর এর শুরুর দিকে পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের জন্য আরেকটা মিটিঙে শেষ বারের মতো আমাকে আরেকবার প্যারিস যেতে হয়েছিল। কারগিল এর সাথে এই আরেকটা প্রাতরাশের মিটিংয়ে আমাকে নিশ্চিত করা হল যে, আমেরিকার যথেষ্ট চাপ সত্ত্বেও কনসোর্টিয়ামের সদস্য দেশগুলো পাকিস্তানে নতুন সাহায্য কিংবা পুরনো দায় পরিশোধের বিষয়ে সময় পুনর্বিন্যাসের সহায়তা করার কোনোটাতেই রাজী ছিল না। তাদের এই অবস্থানের কারণে পাকিস্তান হুমকি দিয়েছিল তারা তাদের দায় পরিশোধ নিয়ে একমুখী খেলাপিকরণের ঘোষণা দিবে। তবে তারা এমন একটি নীতিগত পরিবর্তনের ফলে সহায়তার সারিতে থাকা জাপানের মতো দেশগুলোর কাছ থেকে সাথে সাথে সাহায্য হারাবে। কারণ জাপানের মতো দেশগুলো এ ধরণের খেলাপিকরণের হুমকির ব্যাপারে আইনগতভাবে শক্ত। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক ভাবলো সকলেই বাড়াবাড়ি করছে। তাই এটি পাকিস্তান এবং কনসোর্টিয়ামের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগলো। যার ফলে পাকিস্তান হয়তো খেলাপি অবস্থানে যায় নি।

এখানে আবারো পাকিস্তানে নতুন সাহায্য না দেওয়ার জন্য দাতাদের আশ্বস্ত করতে পারাটা আমাদের প্রচারণার মাঝারি ধরণের সফলতা হিসেবেই ধর্তব্য। সেই মে মাসে আমার প্রচারণার শুরু থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ হওয়া পর্যন্ত কনসোর্টিয়ামের একটা দেশও আসলে পাকিস্তানকে নতুন কোন সহায়তা দেয় নি। তবে দাতা দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সাহায্য হিসেবে খাদ্য এবং যাতায়াতের জন্য যন্ত্রপাতি আকারে ত্রাণ এসেছে। এটি তাদের মানবিক আচরনের বহিঃপ্রকাশ ছিল। বাস্তবে পাকিস্তানের জন্য প্রচুর সহায়তা সারিবদ্ধভাবে ছিল। কারণ বাংলাদেশ অঞ্চলে তার চলমান আমদানী মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল। তাই এটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে চলছিল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দায় পরিশোধের চাপে পাকিস্তান আগেও একবার খেলাপিকরণের হুমকি দিয়েছিল। এই অনৈতিক পথের মাধ্যমে সুবিধা নেবার জন্য পরিষ্কারভাবেই পাকিস্তানের আরও কিছুদূর আসার দরকার ছিল। যেন ন্যূনতম পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমান আমদানী এবং ভোগ তাদের সামর্থ্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্য স্তরে টেকসই অবস্থানে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান নিজেও চেয়েছিল সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ এবং নতুন সাহায্য যেন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুত সহায়তা বাতিল করার জন্য দাতাদের বুঝানো, যা কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আইনি জটিলতার কারণে তেমন সফল হয় নি।

এভাবে আমাদের প্রচারণা যতটা না তাদের দৃশ্যমান কাজকর্ম কমিয়ে আনার ব্যাপারে প্রভাব ফেলেছিল, তার চাইতে বেশী প্রভাব ফেলেছিল ছিল রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে। কিন্তু তারা পুরো সময় জুড়েই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল এবং নতুন সহায়তা ছাড়া তাদের নাভিশ্বাস উঠছিল। সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি আর কিছু দিন প্রলম্বিত হতো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং জনগণ তীব্র সংকটে পড়তো কিনা।

প্যারিসে ‘পুরাতন’ পাকিস্তানের জন্য কনসোর্টিয়ামের সর্বশেষ মিটিংয়ে নভেম্বরে আন্দ্রে মার্লো নামক বিদগ্ধ ফরাসী নোবেলজয়ীর সাথে দেখা করার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল। আমরা আগেই পত্রিকা মারফত জেনেছিলাম যে, মার্লো প্রকাশ্যে বাংলাদেশের জন্য তার সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে তিনি মুক্তিবাহিনীর সাহায্যার্থে ফরাসী যুদ্ধের সময়কার জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী সহযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করবেন। মার্লো নিজে ছিলেন সত্তরোর্ধ্ব এবং অসুস্থ। তাই তার প্রস্তাব কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, তা পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু ড্যানিয়েল থর্নার চেয়েছিলেন, বাংলাদেশে সরকারের একজন দাপ্তরিক প্রতিনিধি যেন তার সাথে অন্তত দেখা করে এই পদক্ষেপের জন্য অভিবাদন জানাক।

ড্যানিয়েল আমাকে প্যারিসের শহরতলীতে মার্লোর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি প্রথমবারের মতো এই মানুষটির দেখা পেলাম। ম্যালরক্স প্রবল উৎসাহের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন যে, স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে তিনি প্রজাতন্ত্রের হয়ে পাইলটের কাজ করেছিলেন। তারপর থেকে নিজের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশের কোন ঘটনায় তিনি এভাবে আন্দোলিত হন নি। বাংলাদেশের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার্থে তিনি এতই দায়বদ্ধতা বোধ করছিলেন যে, তার বৃদ্ধ বয়স এবং অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও তিনি তার পুরনো সহযোদ্ধাদেরকে বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তারা তার ডাকে সাড়াও দিয়েছিল। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তারা বিস্ফোরক এবং যোগাযোগের জন্য মূল্যবান দক্ষ বিষয়াদি শিখিয়ে দিতে পারবেন, যা গেরিলা যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বিস্ফোরক এবং যোগাযোগের নানান যন্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুরো একটি দল নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এরপর তিনি এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এবং যুদ্ধে জড়ানোর বাস্তব সমস্যা বিষয়ক বিশদ এক কারিগরী আলোচনায় আমাকে নিয়ে গেলেন। দুঃখজনকভাবে এখানে আমি তাকে পরামর্শ দেওয়ার মত যথেষ্ট যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু আমি তাকে তার উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং তার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেব বলে কথা দিলাম। সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি আমাকে কথা দিলেন যে তিনি গ্যালিস্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ফ্রান্স সরকার যাতে পাকিস্তানে কোন অস্ত্র না পাঠায়, সেজন্য তার প্রভাব ব্যবহার করবেন। অবশ্য পাকিস্তানের দায় পরিশোধের ব্যর্থতার কারনে এটি এমনিতেই বাতিল হয়েছিল। মনে হয়েছিল, অস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফরাসীরা রাজনৈতিক চাপের চেয়ে হিসাব বইয়ের দ্বারাই বেশী তাড়িত হয়েছিল।

আগেই বলেছিলাম, ১৬ই ডিসেম্বর যখন পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের খবর এলো, আমি তখন অক্সফোর্ডে ছিলাম। বছরের শুরুর দিকে আমি অক্সফোর্ডের ‘রানী এলিজাবেথ হাউজ’-এর পক্ষ থেকে একটা ফেলোশিপ পেয়েছিলাম। যা থেকে অক্সফোর্ডে আমার পরিবারকে মোটামুটি চালানো যেত। সেই ফেলোশিপের একাডেমিক কাজে আমি খুব কম সময়ই দিতে পেরেছিলাম। কারণ আমার পুরোটা সময় আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম। তাই আমি পরিবারের সাথে থেকে অক্সফোর্ডের ফেলোশিপ ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি এবং উত্তোরণের উপর একটা বই লিখব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন প্রভাতের অনুভূতি থেকে আর ওখানে রয়ে যেতে পারলাম না। অতএব কলকাতা হয়ে বাংলাদেশে ফেরার জন্য রওনা দিলাম। কারণ ঢাকায় সরাসরি কোন বিমান যাচ্ছিলো না।

কলকাতায় আমার সাথে অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বসু আর ডঃ আনিসুজ্জামানের দেখা হল। তারা শেষের মাসগুলোতে শরণার্থী পুনর্বাসন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের নীতিমালা তৈরিতে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

মোশাররফ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার সাথে ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। পরে আবার এসেছেন তার পরিবারকে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে। ৩১শে ডিসেম্বর আমি আর মোশাররফ, সাথে কামরুজ্জামান ও তাঁর পরিবার এবং জোহরা তাজউদ্দীন আর উনার পরিবার ভারতীয় এয়ারফোর্সের পুরাতন ডিসি-৩ বিমানে করে ঢাকায় এলাম। বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে দেখা হলো। তাকে আমি এর আগে এপ্রিলের সেই সংকটময় দিনে সর্বশেষ দেখেছিলাম, যখন বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তার সেই ঐতিহাসিক বিবৃতিটির খসড়া তৈরি করেছিলাম। শীতের একটি সকাল ছিল সেদিন, কিন্তু সূর্য কিরণ দিচ্ছিলো। আমাদের মনে হচ্ছিলো যেন নতুন বছরটি বাংলাদেশের সুদীর্ঘ বঞ্চনা আর যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের জন্য বয়ে আনবে আশা আর সম্ভাবনার এক নতুন পৃথিবী।

-রেহমান সোবহান

ডিসেম্বর, ৮৩



[**আলামিন সরকার**](https://www.facebook.com/alamin.sorkar.7161)

<১৫,৩৭,২৯৩-৯৪>

# [শাহ জাহাঙ্গীর কবীর]

আমার নির্বাচনী এলাকা ছিলো রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানা। আমি ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছি। এরপর পলাতক রংপুর ও বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ভারতে যাইনি।  
  
আমার এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর মাঝে সাইপাল, সাঁতারপাড়া, কাঁটাখালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহিমাগঞ্জ নামক বিখ্যাত বন্দর এলাকাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। এখানকার বিভিন্ন পাটের গুদাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো।  
  
কাঁটাখালী ব্রীজের কাছে ছিলো পাক বাহিনীর ক্যাম্প। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লোকজন ধরে এনে হত্যা করতো। আমার এলাকায় প্রায় এক থেকে দেড় হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিলো। ছাত্রনেতা লতিফ, আমজাদ নামক জনৈক ব্যক্তি, মাসুম চৌধুরী, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, বাতাসু, এমাদাদুদ্দিন, কাদের সরকার প্রমুখ অনেক লোকই পাক বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়েছেন।  
  
২৮ শে মার্চ পাক বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে কাঁটাখালী ব্রীজের আশেপাশের এলাকা। গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার লোক ব্রীজটিকে অকেজো করে দেবার জন্য আসলে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক বাহিনী খবর পেয়ে এগিয়ে আসে। স্বয়ংক্রিয় অস্র দিয়ে তারা ব্যাপক গুলি চালায়। এতে অকুলস্থলেই প্রায় ৬ জন শহীদ হয়। এই শহীদদের মাঝে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মান্নানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাক বাহিনী চলে গেলে এ এলাকা আবার মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। এরপর ১৭ই এপ্রিল রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল পাক সৈন্য ট্যাংক ও মর্টার নিয়ে এই এলাকা দখল করার জন্য এগিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী ও ইপিআর বাহিনীর প্রবল মর্টার আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে।  
  
এরপর থেকেই মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন অথচ সুপরিকল্পিতভাবে পাক বাহিনীকে আক্রমণ করেছে। মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য ছিলো রেলপথ, সড়ক সেতু অকেজো করে দেওয়া। এই তৎপরতায় মুক্তিবাহিনী ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ডিসেম্বরের প্রথমেই আমার এলাকা মুক্ত হয়। হিলি পুনর্দখল করে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী এগোতে থাকলে পাক বাহিনী ফাঁসিতোলা নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে। সেখানে তুমুল ট্যাংক যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী বগুড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার ফলে সম্পূর্ণ এলাকাটি মুক্ত হয়।  
  
উল্লেখিত কাঁটাখালী ব্রীজের কাছে পাকবাহিনীর যে ঘাটি ছিলো সেখানে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে এনে মেয়েদের উপরে পাশবিক অত্যাচার করতো। এই এলাকায় প্রায় শ'খানেক মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে বলে জানা গেছে।  
  
মাসুম চৌধুরীকে হত্যার ঘটনাটিই আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের এলাকায় সবচেয়ে সজ্জন ব্যাক্তি ছিলেন। কামাদিয়া হাট থেকে পাক বাহিনী তাকে ধরে। হাটের লোকদের জড়ো করে পাক বাহিনী মাসুম চৌধুরীকে নির্দেশ দেয় এদের মাঝ থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের খুজে বের করে দিতে। বহু লোককে চেনা স্বত্বেও এই জনদরদি ব্যাক্তি কাউকেই আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। এরপর পাকবাহিনী তাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়। স্বাধীনতার পর ক্যান্টনমেন্টের মাটি খুঁড়ে তার লাশ আবিস্কার করা হয়। এবং আশ্চর্য হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, দীর্ঘ সময়েও তার লাশে কোনো রূপ পচন ধরেনি। সম্পূর্ণ অবিকৃত লাশটিকে তুলে এনে আমরা তার পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করি।  
  
-শাহ জাহাঙ্গীর কবির

(সাবেক গণপরিষদ সদস্য, রংপুর)   
৭ জুন, ১৯৭৩



[জহির রায়হান](https://www.facebook.com/zohir.rayhan.12)

<১৫,৩৮,২৯৪-৯৮>

# [সাঈদ-উর-রহমান]

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার শেষ দিন। ঐ দিন এম, এ শেষ পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষার উত্তর দিতে দিতে বার বার শুনছিলাম করিডোর ও রাস্তায় ছাত্রদের মিছিলের শ্লোগান। পরীক্ষা শেষে হল ছেড়ে দেয়ার কথা ছিল। ভাবলাম আরো সপ্তাহখানেক থেকে পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরব। সাত তারিখে শেখ মুজিবের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও নয় তারিখে মওলানা ভাসানীর পল্টন ময়দানের সভায় অংশ নিয়ে দশ তারিখে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলাম। পুনরায় পঁচিশ তারিখে ঢাকায় আসবো ও একেবারে হল ছেড়ে দেব; সে ধরনের চিন্তা মাথায় ছিল।   
  
ছাব্বিশ তারিখের সকালে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা বিমূঢ় করে দিল; সাহস ফিরে পেলাম পরদিন মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে। পরবর্তী এক মাস বাড়িতে কাটালাম। আমার বাড়ি কুমিল্লা শহর থেকে দুই মাইল উত্তরে; ভারত-সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং রেল লাইনের একেবারে লাগোয়া। সুতরাং পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া প্রতিদিন দেখলাম।  
  
মে মাসের প্রথম দিকে বুঝলাম; আমাদেরও বাড়ি ছাড়তে হবে। আমাদের বাড়ির মাইলখানেক উত্তরে ফকিরহাট রেল স্টেশন। ওখানে ঘাঁটি পেতেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তারা কুমিল্লা শহরে আসা-যাওয়া করে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। দেশে থাকা আর নিরাপদ মনে হল না। মে মাসের শেষ দিকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতেই চলে যাই।  
  
দেশত্যাগ করে প্রথমে উঠলাম আত্মীয়ের বাড়িতে। ওখানে ছিলাম সপ্তাহখানেক। নিকটস্থ বক্সনগর যুবশিবির প্রতিদিন যেতাম ও দেখতাম মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক কসরৎ। ক্যাম্পের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় হল। শিবির প্রধান অধ্যাপক আবুর রউফ আমার পুরনো পরিচিত। আমি চিন্তা করলাম আগরতলা যাবার। একদিন যুবশিবির থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে ভোরবেলা রওয়ানা হলাম আগরতলার উদ্দেশ্যে। পার্বত্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের অধ্যুষিত এলাকার ভেতর দিয়ে প্রায় পনের মাইল হেঁটে দুপুরের দিকে শহরে উপনীত হলাম। আগেই জেনেছিলাম যে কলেজের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধক্ষেত্রের সমন্বয়কারীদের কয়েকজনের অফিস আছে- তাদের একজন ছিলেন আবদুল মান্নান চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আমার পুরনো বন্ধু। বিকালের দিকে মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং তিনি আমাকে পাঠালেন সোনামুড়ায়; রাজনৈতিক যুবকর্মীদের কেন্দ্রস্থল। সেখানকার প্রধান ছিলেন সৈয়দ রেজাউর রহমান- তিনিও ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত। তিনি এবারে আমাকে পাঠালেন হাতিমারা যুবশিবির; শিবির প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে। সোনামুড়ায় একরাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরবেলা আমি হাজির হলাম শিবিরে। যথারীতি অন্তর্ভুক্ত হলাম শিবির সদস্যরুপে। শুরু হল নতুন জীবন।  
  
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাজনীতির প্রত্যক্ষ কার্যকলাপে আমার কোন যোগ ছিল না; তবে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলাম মিছিলে; মিটিংয়ে। বিভিন্ন সংগঠনের মতপার্থক্য সম্বন্ধে জানলেও টার তীব্রতা আগে বুঝি নি।  
  
হাতিমারা পার্বত্য ত্রিপুরার একটি পরিচিত অঞ্চল। জঙ্গল বেশ ঘন গভীর। উঁচু নিচু টিলা মধ্যে প্রবাহিত ছোট নালা; মাঝে মাঝে টিলায় পার্বত্য উপজাতি টিপরাদের বসতি। নিকটেই একটি বাজার ও প্রাইমারী বিদ্যালয়।   
  
রাস্তার সামান্য দূরে শিবির। প্রথম শিবিরের প্রধান ফটক। ভেতরে সারি সারি ব্যারাকসমূহ। শাল গাছের খুঁটি, বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনি দিয়ে দীর্ঘ ব্যারাকসমূহ তৈরি। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। কোনটি শিবির প্রধানের; কোনটি গুদাম। এসবে থাকেন বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দ।   
  
সুপারভাইজার এম, এ হান্নান সাহেব গোড়া থেকে সংশ্লিষ্ট। তিনি প্রথম শিবিরটি চালু করেন। শিবির প্রধান আফজাল খান আসেন আগস্টের মাঝামাঝি। তিনি কুমিল্লার সুপরিচিত ছাত্রনেতা। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ইমাম আবু জাহিদ সেলিম। আমি এসে পেলাম আমার এক পুরনো সহপাঠীকে- খায়রুল আলম বাদল। সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন হাবিলদার মেজর আইউব।   
  
শিবিরের প্রধান আকর্ষণ তরুন মুক্তিফৌজেরা। প্রতিদিন এরা আসছে। আর নাম লিখাচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে। কেউ আসে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে কেউ আসে ঢাকা-ফরিদপুরের মতো দূরের এলাকা থেকে। এদের মধ্যে পনের বছরের কিশোর আছে। আবার পঁয়ত্রিশের যুবকও নজরে পড়ে।  
  
হাতিমারা একটি যুবশিবির। দেশত্যাগী তরুণরা প্রথমত এসবে আশ্রয় নেয় ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করে। রাইফেল, স্টেনগান ও গ্রেনেড ছোড়া সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করে সামরিক শিক্ষার জন্য উপযোগী করে তোলাই এসবের লক্ষ্য। ছেলেরা সর্ববিধ কাজ নিজেরা করে। পানি আনা, রান্না করা, জ্বালানী সংগ্রহ, শিবির প্রহরা সবই নিজেদের করতে হয়।   
  
কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতা পালন করা হয়। সকাল বেলায় নাশতা একটা আটার রুটি; সাথে কোনদিন সবুজ চা, বা অল্প ভাজি। দুপুরে বা সন্ধ্যায় এক বাসন ভাত, সাথে সামান্য ডাল বা তরকারি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মাসান্তে অর্ধেক ডিম বা দু’এক টুকরা মাংস বা মাছ পাওয়া যায়।  
  
ছেলেরা থাকে বাঁশের মাচায়। কেউ এর উপর সতরঞ্চি বা চাদর বিছায়। বালিশ অনেকের নেই। বালিশের অভাবে কেউ কেউ মাথার নীচে কাপড়ের পুটুলি রাখে বা খাওয়ার প্লেটটি উপুড় করে দেয়। মশারি অধিকাংশের নেই। পানি খাওয়ার জন্য তারা ব্যাবহার করে মগ, কেটলি বাঁশের চোঙ্গা বা মর্টারের খোল। টিলার নিচে একটি টিউবওয়েল আছে। স্নান করে নালাতে। এতে পানি থাকে কখনো এক বিঘত, কখনো এক হাঁটু। বৃষ্টির দিনে নালার জল কর্দমাক্ত, অন্য সময় নির্মল।   
  
সকাল সাতটায় শিবিরের কাজ শুরু। পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের পর ব্যায়াম শিক্ষক ক্লাশ নেন। পুরো এক ঘণ্টা চলে প্যারেড ও দৈহিক অনুশীলন। তারপর সামান্য বিরতি ও নাশতা। নাশতার পর আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষাদানের ক্লাশ। বেলা দশটায় রাজনীতির ক্লাশ, এগারোটার দিকে পূর্ণ বিরতি।  
  
বিকালের দিকে শিবির পুনরায় জেগে ওঠে। বেলা চারটে হতে প্যারেড ও দৈহিক ব্যায়াম করে খেলাধুলা শুরু হয়। শিবিরে আছে দুটো ভলিবল। সন্ধ্যার দিকে ছেলেরা আসর জমায় অফিসের সামনে খোলা যায়গায়। দুটো জারুল গাছকে ঘিরে বাঁশের মাচা তৈরি হয়েছে। তার ওপরে তারা বসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটা থেকে। অনেকেই অপেক্ষা করে চরমপত্রের জন্য। এরপর ক্যাম্প নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।   
  
শিবিরের কাজকর্মে চাঞ্চল্য আসে যেদিন কোন বিখ্যাত অতিথি আসেন বা রিক্রুটের জন্যে সামরিক কর্তার আগমন ঘটে। এমপি বা এমএনএ-রা আসেন, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেন, আশ্বাসের কথা শোনান। রিক্রুটিং অফিসার আসেন, ট্রেনিং-এর জন্য ছেলে নির্বাচন করেন। দল বেঁধে ওরা চলে যায় আসামে বা দিল্লিতে। বাকি ছেলেরা অশ্রুসজল চোখে তাদের বিদায় জানায় আর ভাবে কবে নিজেদের সুযোগ আসবে।   
  
ক’দিন পরে আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে বললাম আমার প্রশিক্ষনের কথা। এমনিতেই কর্মহীন জীবনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তিনি আমাকে একটি বড় আশা দিলেন। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে আরো বড় একটি প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা আছে বিশেষ কারো ক্ষেত্রে। দেরাদুনে জেনারেল ওভানের নেতৃত্বে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এদের নাম বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি। যুদ্ধান্তে এদের মধ্য থেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হবে। তিনি ভরসা দিলেন যে আমাকে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তিনি এনে দিবেন। আমি আশায় আশায় থাকি।  
  
হাতিমারা এলাকায় যুদ্ধের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। প্রায়ই তিনি বাদল ও আমাকে ডেকে পাঠাতেন তাঁর তাবুতে। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভক্ত ও মাওলানা ভাসানীর অনুসারী। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ফিরতাম পরদিন।  
  
কিছুদিন পরে ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আমার জ্ঞাতি ভাই ফিরে এল দেরাদুন ট্রেনিং নিয়ে। আমাদের ক্যাম্পেই উঠল। সে জানতে চাইল বাড়ির খবরাখবর; আমি জানতে চাইলাম ট্রেনিং এর খবর। আমি ঐ ট্রেনিং-এ যেতে চাই শুনে সে আতংকিত হল। বলল এই ট্রেনিং শুধুমাত্র বিশ্বস্ত বাছাই করা মুজিবভক্তদের জন্য। স্বাধীনতার পর মুজিব-রাজত্ব নিরঙ্কুশ করার কাজে এদের ব্যবহার করা হবে। আপনি যেহেতু ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী সেজন্য আপনার যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। দেরাদুন যেতে পারলেও; কোনভাবে আপনার মতিগতি জানতে পারলে পরিণতি বিপদজনক হবে। সুতরাং এখানে আছেন ভাল। চুপচাপ থাকেন ও সময় কাটান।  
  
কিন্তু সময় আর কাটেনা। ঠিক করলাম একবার বাড়িতে যাব। ক’দিন ধরে শুনছিলাম; এই শিবির পার্বত্য ত্রিপুরার আরো ভেতরে সরিয়ে নেয়া হবে। তাহলে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্য একদিন সকালবেলা রওয়ানা হলাম দেশের দিকে।   
  
বারটার দিকে বাংলাদেশের ভেতর ঢুকলাম। গ্রামের পর গ্রাম নির্জন; পরিত্যাক্ত। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে। বাইরের উনুনগুলো ভেঙে পড়েছে। কলাগাছে পাকা কলা, খাবার লোক নেই। একটি বাড়িতে ডাব গাছ দেখে প্রবল তৃষ্ণা পেল। আমার সঙ্গী ছিল আমাদের পাশের বাড়ির রহিম। সে গাছে উঠার উপক্রম করতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন শীর্ণকায় বৃদ্ধ। তিনি ঘর থেকে ডাব ও বঁটি এনে দিলেন। পরিতৃপ্তি সহকারে তৃষ্ণা নিবারণ করে আমরা যাত্রা করলাম। আছরের নামাজের সময় বাড়িতে পৌঁছলাম। মা তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলেন, আমি গেলাম পুকুরঘাটে গোসল করতে।   
  
হঠাৎ চিৎকার উঠল মিলিটারী আসছে। ফকিরহাট ঘাঁটি থেকে রওনা দিয়ে তারা আমাদের গ্রামে এসে গেছে। দিলাম দৌড় পশ্চিম দিকে-মাঠ পেরিয়ে রেল লাইন অতিক্রম করে যেতে পারলে জানে বাঁচা যাবে। মাঠে পৌঁছে দেখলাম মাঠ ভর্তি লোক। সবাই দিগ্বিদিক ছুটছে। বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী পুরুষ সবাই ছুটছে। আমার সাত বছরের ছোট বোন নুরুন্নাহারও কাপড়ের একটি পুটুলি নিয়ে মা ও চাচীদের পেছনে দৌড়ুচ্ছে।  
  
মাইল দুয়েক দৌড়ুনোর পর আপাতত নিরাপদ স্থানে পৌছা গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে এত অবসন্ন ছিলাম যে ধান ক্ষেতের আলের উপর শুয়ে পড়লাম। অনেক পরে, রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে ফিরলাম বাড়িতে। তার দুদিন পর আবার হাতিমারা।  
  
সম্ভবত আগস্ট মাসের শেষাশেষি শিবির সরিয়ে নেয়া হয় পদ্মানগরে- আরো পনের বিশ মাইল অভ্যন্তরে। পূর্বোল্লিখিত বক্রনগর ক্যাম্পও একই জায়গায় নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে আমি ট্রেনিং এর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম; সুতরাং কর্তৃপক্ষ আমাকে Political Motivator হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেন। প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে বক্তৃতা দেয়ার কথা বলা হল- উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে দীক্ষিত করা। এ কাজ করার জন্য আমি ছোট একটি গ্রন্থাগার তৈরি করলাম এবং নিজেও পড়াশোনায় মন দিলাম। শিবিরের বাইরে একটি স্থান নির্বাচন করে নিলাম- প্রায় দুপুর কাটতো সেখানে। বক্তৃতায় আমি বললাম মুক্তির কথা – ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’- ঐ কথার উল্লেখ করে। ছেলেরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনত। কোনদিন হয়তো বলতাম সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের কথা- চারু মজুমদার ও চে গুয়েভারার রণকৌশলও আলোচনায় আসত। সমাজতন্ত্র মানে, ইতিহাসের বিকাশ, শোষণ-মুক্ত প্রভৃতি সরল ভাষায় বলার চেষ্টা করতাম।  
  
সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ির দুটো দুঃসংবাদ পাই। আমাদের গ্রামের বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছে মিলিটারিরা, বিশেষ করে পুড়িয়েছে চাচার বছরখানেক আগে নির্মিত সুদৃশ্য বাড়িটি। আমাদের ঘরগুলো অধিকাংশ পুড়ে গেছে- একটি ঘর শুধু রক্ষা পেয়েছে। জ্ঞাতি ভাই ফজলু ও নুরুদের সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে (এরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল)। দ্বিতীয়টি হল যে আব্বাকে, চাচাকে ও চাচাতো ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর নির্যাতন করেছে; তবে কেন জানি প্রাণে মারেনি। আমাদের বাড়ির লোকেরা অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

অক্টোবর মাস থেকে ভাল খবর পেতে লাগলাম। বাড়ি থেকেও সুসংবাদ পেলাম। ফকিরহাটের ঘাঁটি ছেড়ে পাকিস্তানী বাহিনী চলে গেছে। গাঁয়ের সবাই বাড়িতে ফিরেছে। যুদ্ধেরও নাটকীয় মোড় ফেরা লক্ষণীয় হয়ে উঠল। রাজনৈতিক নেতাদের আলাপে সালাপে মনে হল শুভ দিন সন্নিকটে। চট করে মনে পড়ল ক্যাপ্টেন দিদারুল আলমের তাঁবুতে এক ভারতীয় মেজরের কথা। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরতে পারবো বলে তিনি আশা করেন।   
  
তারপরে শুরু হল চূড়ান্ত যুদ্ধ। ডিসেম্বরের সাত তারিখে আমাদের শিবির বন্ধ বলে ঘোষিত হল। ছেলেরা রওয়ানা হল যার যার দেশে। আমি যাত্রা করলাম নয় তারিখে। সোনামুড়ার চৌকি দিয়ে কুমিল্লা প্রবেশ করলাম। সন্ধ্যায় হাজির হলাম নিজ বাড়িতে। পৌষের প্রসন্ন ভোরবেলায় আবার জমজমাট হয়ে উঠল অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ভিটে।  
  
-সাঈদ-উর রহমান  
(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)  
জানুয়ারি; ১৯৮৪



[গুরু গোলাপ](https://www.facebook.com/hemlok1?fref=ts)

<১৫,৩৯,২৯৮-৩০২>

# [অধ্যাপক সারওয়ার মুর্শেদ]

প্রথমে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পর্যবেক্ষক এবং পরে এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে, সেই সংগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা ভিত্তিক খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ণকারি গ্রুপের সদস্য হিসেবে ২৫শে মার্চের বেশ আগেই উপলব্ধি করেছিলাম রক্তপাত হবেই, পাকিস্তানের কাঠামোতে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হলেও তা কাগজে নক্সা হয়েই থাকবে।এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুর "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষিত হল,তখন পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে গণহত্যার পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছিল। জাহাজ বোঝাই সমরসম্ভার এবং সাদা পোষাকে বিমানযোগে পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানি,ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমুহে মেশিনগান এবং কামানের নগ্ন উপস্থিতি। মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনা সম্পর্কে সন্দেহ বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান আসন্ন;এ ধারণাকে আমার মনে দৃঢ়মূল করেছিল।  
  
এসময়ে আমার মনকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাসস্কুল করেছিল:বাঙালি জাতি উদ্বেলিত প্রত্যয় এবং প্রচন্ড আবেগে ঐক্যবদ্ধ এবং অগ্নিগর্ভ, একটি সশস্ত্র সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের জন্য,সংগঠন এবং আয়োজনের দিক থেকে তৈরি কি? মার্চের মাঝামাঝি সময়ে এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয়া সহজ ছিল না। চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য তথা কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে ছ'দফার দাবীকে কিছু নমনীয় করা যুক্তিযুক্ত নয়? কিন্তু একই সংগে এও বুঝেছিলাম যে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার কঠিন ঝুঁকি নেয়া হলেও সেই মুহূর্তে ইতিহাস তার গতি মন্থর করবে। স্বাধীন বাঙালি সত্তার শত্রুরা বাঙালিদের সময় দেবে, এমন চিন্তার কোন নিশ্চিত ভিত্তিও নেই।  
  
সুতরাং গঠনতান্ত্রিক আলাপ আলোচনার আড়ালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে যে একটি মৃত্যুযজ্ঞের আয়োজন করেছিলো,এ বিষয়ে বিশ্বজনমতকে অবহিত করার প্রচেষ্টা আমার কাছে প্রাধান্য পেল। ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ জন কেথে গলব্রেথ,সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং টাইমস ও নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকসহ আরো অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি তারবার্তা পাঠাই। এবিষয়ে আরো উল্লেখ্য যে কিসিঞ্জার-নিক্সনের পাকিস্তান সমর্থনের নীতি এবং বাংলার মাটিতে পরাশক্তি সমূহের অস্ত্রের উপস্থিতি এবং পাকিস্তানি শাসকদের বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে তা' ব্যবহারের ক্রুর সম্ভাবনা কিভাবে বাংলার মানুষকে বিপন্ন জনগণের বিরুদ্ধে তা' জানাবার জন্য পূর্বপরিচয়ের সুত্র ধরে প্রফেসর হেনরী কিসিঞ্জারকে আমি ১৬ মার্চ একখানা চিঠি লিখি। চিঠির অনুলিপি নিচে সন্নিবেশিত হলোঃ

“I am writing to you at a moment of grave peril to my people. Yahya has moved in guns and tanks apparently to reinforce his and mr. Bhutto's constitutional arguments. There has already been a good deal of wanton killing and move is promised by the situation.The holocaust that seems all but inevitable will destroy many bengali lives and much else. it is clear to us that this country can not survive the application of force and that the resulting chaos and instability in wide area was in the subcontinent will benefit neither our friends nor our enemies.  
  
We want the world to know that a military solution to our constitutional problem is not only liable to be barren and disastrous; but it is unnecessary. A political settlement is possible; provided the bengali demand for changing the colonial pattern of the relationship between the two wing was accepted by writing a constitution for the country, which would give them complete control over their economic resources. But of course; Mr. Bhutto; backed by army and the economic interests responsible for the deprivation of the bengalis for the post twenty three years; continued to oppose this.  
  
The situation therefore has the element of a sophoclean tragedy; with this difference that its denouement would affect the fate of real human beings who number seventy five millions. What looms large in one's mind at the moment of the bristling array of weapons to be seen in Bangladesh today and what they augur. These weapon ; American; Russian and Chinese in origin are to be used against an unarmed people. Bengalis are united as never before their history in their resolve to replace the old system of relationship in the country. Paradoxically, this make the threat of massive use of force by Islamabad more real; for it has no other way to imposing its will on the Bengalis ; although every dictate of sanity is against it.  
  
I should like to appeal all men of goodwill; and you are a man of goodwill in high office in America; to do all they can to help avert this cruel possibility involving fellow human beings.   
  
I am writing this letter to you as a teacher and as one who had the great good fortune and honour of knowing you and feel sure that you could sympathies human aspect of our crisis. You would earn our eternal gratitude if you would exert your influence and help prevent the threatened mass slaughter of men, women and children in East Pakistan. “  
  
-(The weekly Web; 25 March 1973)

(অনুবাদ)

আমার আমার লোকেদের ভীষণ বিপদের সময় তোমাকে লিখতে বসেছি। ইয়াহিয়া স্পষ্টতই তার এবং ভুট্টোর সাংবিধানিক মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য অস্ত্র এবং ট্যাংকের আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নির্বিচার হত্যা শুরু হয়ে গেছে এবং অবস্থাদৃশ্যে তা চলমান থাকবে। ভয়াবহ গণহত্যা দেখে মনে হচ্ছে এতে অনিবার্যভাবে আরো অনেক কিছুর ধ্বংসের সাথে প্রচুর বাঙালি মারা পড়বে। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে এই দেশ জবরদস্তী সহ্য করতে পারবে না এবং এই জবরদস্তীর পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এই উপমহাদেশ যে বিশৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে তা আমাদের বন্ধু বা শত্রু কারো জন্য লাভজনক হবে না।

আমরা বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই যে আমাদের সাংবিধানিক সমস্যার মিলিটারি সমাধান শুধু নিষ্ফল এবং সর্বনাশা নয় বরং এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। একটা রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব হতো, যদি বাঙালিদের দাবী মেনে নিয়ে বর্তমানে চলমান ঔপেনিবেশিক কাঠামো পরিবর্তন করে দেশের দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের রীতি সাংবিধানিকভাবে বদলে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো। কিন্তু বিগত ২৩ বছর যাবৎ বাঙালিদের বঞ্চনার জন্য দায়ী অর্থনৈতিক বিষয়াদি। আর্মি সমর্থনপুষ্ট জনাব ভুট্টো তাই ক্রমাগত এর বিরোধিতা করে যাচ্ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে যে কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটার সমূহ উপাদান রয়েছে। এরকম চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ভাগ্য এতে আক্রান্ত হবে যাদের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ। এমন যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখে মাথায় একটা ব্যাপারই গুটি পাকাতে থাকে যে এগুলো কিসের ভবিষ্যৎ বাণী করছে? অ্যামেরিকা, রাশিয়া এবং চায়নাতে তৈরি এই সব অস্ত্রসমুহ নিরস্ত্র মানুষের উপর ব্যবহার হবে। ইতিহাসের আগের যে কোন সময়ের থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ এবং দুই দেশের মধ্যকার সনাতন কাঠামো পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর। অপরপক্ষে এটা ইসলামাবাদ কর্তৃক ব্যাপক বল প্রয়োগের সম্ভাবনাকে আরো বাস্তবসম্মত করে তুলছে, বাঙালীদের উপর তাদের নেতৃত্ব খাটানোর এছাড়া আর কোনই পথ নেই; যদিও সকল সদবিবেচনা এর বিপক্ষে যাবে।

আমি সকল সহৃদয় মানুষের কাছে আপিল করব এবং আপনি আমেরিকার উচ্চ পদস্থ একজন সহৃদয় মানুষ; মানুষের উপর এই নিষ্ঠুর সম্ভাবনা প্রতিহতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা করবেন।

আমি এই চিঠিটা আপনাকে একজন শিক্ষক হিসেবে লিখছি যে কিনা আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সৌভাগ্য এবং সম্মানের অধিকারী হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে আমাদের বিপদের মানবিক দিকটি আপনি সহানুভূতির সাথে দেখবেন। যদি আপনি আপনার প্রভাব বিস্তার করে পূর্ব পাকিস্তানের নারী পুরুষ এবং শিশুদের নির্বিচার গণহত্যা প্রতিহত করতে পারেন, তবে এর মধ্যদিয়ে আপনি অর্জন করবেন আমাদের শ্বাশত কৃতজ্ঞতা।

দা উইকলি ওয়েভ

২৫ মার্চ, ১৯৭৩

চীন-আমেরিকা সম্পর্ক পুনঃনির্মাণের সেতু হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহারের নীতির অন্যতম স্থপতি হেনরী কিসিঞ্জার যে বাংলাদেশের ঘটনাক্রমের উপর কোন শুভ প্রভাব বিস্তার করেননি তা' আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমার এই চিঠির একটি sequel (অনুবাদঃ পরবর্তী পর্ব) আছে যার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। এ চিঠির কয়েক মাস পর কিসিঞ্জার নয়া দিল্লিতে এলে আমি তাকে পশ্চিম বাংলায় আমাদের শরণার্থী শিবির গুলোতে এসে আমারিকার পাকিস্তান নীতির ফলাফলের একটি দিক স্বচক্ষে দেখে যেতে আমন্ত্রণ জানাই। মানবিক বা নৈতিক প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন এই ধুরন্ধর কূটনৈতিক এবার আমার চিঠির জবাব দিলেন এবং সবিনয়ে সময়াভাবহেতু আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।  
  
২৫শে মার্চের কালো রাত্রের পর যখন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য নিজের শক্তি অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিবো।  
  
বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা ছেড়ে কিছুদিন আত্নগোপন করে থাকার পর যখন দেখলাম আশ্রয়দানকারীর সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে তখন একদিন নরসিংদীর পথে ভারত সীমান্তের দিকে রওয়ানা হই। ৪ঠা এপ্রিল কি ছিল সেই দিনটি? তিতাসের ওপারে এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে যখন আমি পরিবারসহ সিংগারবিল যাওয়ার পথ খুঁজছি দ্বৈবক্রমে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র আমাকে দুর থেকে দেখতে পেয়ে কবি সানাউল হকের বাংলোয় নিয়ে আশ্রয় দেয়।এবং নদীর ওপারে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার উপর পাকিস্তানি প্লেন থেকে কয়েক দফা গুলি বর্ষিত হয় সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী এবং চার পুত্র কন্যা সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলার দিকে রওনা হই। সম্ভবতঃ সেই দিনটি ছিল ১৪ এপ্রিল।  
  
ভারতে অবস্থানকালে আমার তৎপরতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ 

(১) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন।  
(২) অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের অভ্যন্তরে নানা সমাবেশ এবং সেমিনারে বাংলাদেশ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা;   
(৩) বাংলাদেশ শিক্ষা সমিতির প্রথমে আহবায়ক; পরে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে প্রয়োজনমত মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে সমিতির স্বতন্ত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। 

এছাড়াও ঐ সময়ে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদের কোন কোন বক্তৃতা ও নীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের খসড়া ইংরেজিতে তৈরি করে দিয়েছি বা প্রয়োজনমত বাংলায় করতেন ডক্টর আনিসুজ্জামান।  
  
বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার কয়েকটি জায়গায় স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে তা উল্লেখ করবো। আসামের বুদ্ধিজীবীরা "স্বাধীন বাংলাদেশের তাৎপর্য" বিষয়ে শিলং সরকারি কলেজের মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আসাম সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রী ত্রিপাঠী।   
  
আমি সে উপলক্ষে যা বলেছিলাম তা' সংক্ষেপে এইঃউপমহাদেশে দুটি দেশ; ভারত এবং বাংলাদেশ; খুব স্বাভাবিক কারনে পরস্পরের বন্ধু হবে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভূগোলের দিক দিয়ে যথেষ্ট নৈকট্য থাকা সত্বেও ভারত এবং পাকিস্তান স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে নি।পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরবাদীর ভারত বিদ্ধেষকে তাদের স্বৈরশাসন এবং অর্থনৈতিক শোষনের স্বার্থে জিইয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার পর নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরিণত কান্ডজ্ঞান প্রবুদ্ধ স্বার্থচেতনা এবং পারস্পারিক সম্ভ্রন্ত এবং এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের একটি বড় রকমের বিকৃতি দুর হবে। দু দেশের যৌথ নদনদী। সহজ যাতায়াতের প্রয়োজন অর্থনৈতিক আদানপ্রদান ও সহযোগীতার প্রশ্নাতীত যৌক্তিকতারও তা'ই দাবী করে। বাংলার স্বশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের সহায়তা আমাদের বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় দান; একটি বড় গণতান্ত্রিক দেশের অন্য একটি গণতন্ত্রকামী মানবগোষ্ঠীর প্রতি এ মহানুভব সমর্থন। এই নতুন সম্পর্কের শুভসূচনা। শুধু একটি কথা; ভারত আয়তনে,সম্পদে,শক্তিতে একটি বড় দেশ আর বাংলাদেশ সেসব দিক থেকে ক্ষুদ্র। এ অসমতা যেন দু'দেশের স্বাভাবিক বন্ধুতার পথে কোনদিনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে দু'দেশকে সজাগ থাকতে হবে।“  
  
বক্তৃতা শেষ হলে মন্ত্রী মহোদয় আসন ছেড়ে এসে আমায় অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করেন এবং শ্রোতা বৃন্দও আমার বক্তব্য ও তার আন্তরিকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।   
  
কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এক আজব কান্ড করে বসে। তারা তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো রিপোর্টে দাবী করে যে বাংলাদেশ থেকে আগত এক নরাধম অধ্যাপক ভারতকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে হাঙ্গেরী রুপে কল্পনা করে ভারতকে প্রতিবেশী দমনেচ্ছু আগ্রহী শক্তিরুপে চিত্রিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন প্রভাবশালী যারা আমাকে জানতেন; আশ্রয়দানকারী সরকারের বিরাগ থেকে সে যাত্রা আমায় রক্ষা করেন।  
  
আরেকটি অন্য ধরনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের এক দরিদ্র মুসলিম পল্লীতে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে। এই স্বল্পশিক্ষিত গরীব মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান ছিল একটা বিশ্বাস এবং কল্পনার স্বর্গ; তারা সেখানে কোনদিন যেতে পারবেনা; তবুও যে স্থানটি তাদের মনের মধ্যে লুকোনো আশ্বাস এবং নিরাপত্তা। অনেক্ষন বক্তৃতার পরও দেখলকম মানুষ গুলো পাহাড়ের মত নিরব নিরুত্তাপ, তাদের চোখে শীতল ক্রোধের কাঠিন্য। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল যখন আমি তাদের দিকে সঙ্গীনের মত কয়েকটি প্রশ্ন উদ্যত করলাম এবং জানতে চাইলাম ইসলামে কোন নির্দেশ আছে ধর্মের নামে কোন মুসলমান সৈনিক পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করতে পারে, লুন্ঠন, অগ্নীসংযোগ, নারী এবং শিশু হত্যা করতে পারে? প্রশ্নের পর পাকিস্তানি বর্বরতার কিছু বর্ণনা, তারপর আবার প্রশ্ন করলাম, এরই নাম কি ইসলাম?  
এই পাকিস্তানই কি আপনার প্রিয় পাকিস্তান? 'না' ভঙ্গীতে অনেকগুলা হাত একসঙ্গে উঠে গেল। আমার সে সন্ধ্যার বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই পাথর গলেছিল; সেই সরল বিশ্বাসী মুসলমানরা বুঝেছিল; কেন বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল।  
  
স্বাধীনতাযুদ্ধের স্বপক্ষে কার্যক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সরকার সংশ্লিষ্ট তৎপরতার বাইরেও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কাজের সংগে যুক্ত ছিলাম, এই কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করেছি - সেটা হল সংবাদ মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সংগে সহযোগিতা।  
  
বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদেরকে বুদ্ধিজীবি বলেও আখ্যায়িত করা হয়, ভারতে অবস্থানকালে বাংলাদেশ আন্দোলন ভিত্তিক তাদের একটা আলাদা অস্তিত্ব বা তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র রকম সংহতি ছিল বৈকি বাংলাদেশ শিক্ষক সমতি স্বতন্ত্র সংহতির একটা দৃষ্টান্ত।  
  
দিল্লি আন্তর্জাতিক সেমিনারে পাঠ করার জন্য "The nature of Bengali Nationalism" (অনুবাদঃ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি) শিরোনামে আমাকে একটি Paper (অনুবাদঃ প্রবন্ধ) তৈরি করার অনুরোধ জানানো হয়েছিলো, তবে সেই সেমিনারে যোগ দিতে আমি অসমর্থ হই। কিন্তু প্রবন্ধটির জন্য যে কাজ শুরু করেছিলাম তা' বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের রুপ নেয়। perspectives of Bengal (অনুবাদঃ বাংলার প্রেক্ষাপট) শিরোনামে রচিত এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিয়তাবাদের প্রকৃতি ও উৎস নিরূপণ করা।  
  
মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। একটি Long term (দীর্ঘ মেয়াদী) একটি Mid term (মধ্য মেয়াদী) এবং একটি Short term (স্বল্প মেয়াদী) প্ল্যান তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই কমিশনকে। আমি এই কমিশনের একজন সদস্য ছিলাম। কোন দীর্ঘ মেয়াদী বা মধ্য মেয়াদী প্ল্যান নিয়ে কমিশন সদস্যদের মধ্যে কোনও গভীর বা ধারাবাহিক আলোচনা বা বিতর্ক হয় নি। তবে কিছু স্বল্প মেয়াদী প্ল্যান নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে- যেমন যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত শিক্ষা ব্যাবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন বিষয়টি বং এর কোন কোনটি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল। (মনে পড়ে তরুন মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সমস্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমীক্ষা আমার তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল)। অস্থায়ী সরকার আওয়ামীলিগের পুরো আদর্শগত বর্ণালী ধারক হিসেবে স্বাভাবিকভাবেঈ যুদ্ধ জয়ের শেষে এক কোটি শরণার্থীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যকেই প্রাধন্য দিয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন দীর্ঘমেয়াদী এমনকি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরির ভিত্তিগত দিকনির্দেশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। কার্যতঃ তা পাওয়াও যায় নি। মৌলিক বিষয়ে, আমার বিশ্বাস কমিশনের সদস্যরাও একমত পোষণ করতেন না। স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক হবে এমন একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সে সমাজতন্ত্র আবদ্ধ থাকবে, না ভূমির ব্যাক্তি মালিকানা বাতিল বা পুনর্বন্টনের পথে আরো সুদূরগামী হবে, এ জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা যুদ্ধরত অস্থায়ী সরকার দেন নি। সুতরাং কতগুলো অবিতর্কমূলক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাতে কমিশন নিজের কাজকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তার অর্থ এই নয় যে আলাদাভাবে কমিশনের সদস্যরা কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার রুপরেখা বিবেচনা করেন নি-কিন্তু তা সহজবোধ্য কারনেই সরকারের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে নি।  
  
বিজয়ের পর কবে কিভাবে দেশে ফিরে আসি আমি তার সঠিক তারিখ কিছুতেই মনে করতে পারছিনা - একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে জেনারেল অরোরার সৌজন্যে তাঁর বিমানে করে দেশে ফিরি। প্রায় দু'দিন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেও ঢাকাগামী কোনোও বিমানে জায়গা পেলাম না জানতে পারলাম জেনারেল অরোরা ঢাকায় যাচ্ছেন, তাঁকে অনুরোধ জানান মাত্র তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হন। ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনীর অধিনায়কদের সংগে কয়েক ঘন্টা কাটাবার এবং কথা বলার একটি অমূল্য সুযোগ আমার এভাবে দৈবাৎ মিলে গিয়েছিল। মনে পড়ে সিলেটের ভারতীয় ছাউনীতে অফিসারদের সঙ্গে জেনারেল অরোরা তাদের মেসে এক মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন। তাঁর মেহমান হিসেবে আমিও এই ভোজে শরিক হই। এই উপলক্ষে আমার কয়েকজন জেনারেল এবং অন্ততঃ এবং একজন এডমিরালের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁদের কিছু কথা এবং ইঙ্গিত আমাকে বিস্মৃত করেছিল। স্মরণযোগ্য যে স্বাধীনতা লাভের আগের মুহূর্তে 'আল বদর' পৈশাচিক নিপুনতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক ক'জন বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করেছিল। জাতির হৃদয়ে অনেক শোকের মধ্যে এই শোকটি বড় বেশি রকম আঘাত হেনেছিল।   
  
ভারতীয় অফিসারদের কথাবার্তা আমার মনে হয়েছিল - তাদের ধারণা আগেই এই ব্যাপারটি ঘটেনি এবং এ বাঙালিদের গুজব সৃজন কুশলতার আরেকটি প্রমাণ। আমি মরিয়া হয়ে অফিসারবৃন্দকে বলেছিলাম যে দীর্ঘ নিহতের তালিকায় আমার অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় অন্ততঃ চার জন অধ্যাপক ছিলেন এবং আমি নিশ্চিত করে জানি তারা পাকিস্তান পরিচালিত আল বদরের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ হারিয়েছিল।  
  
বিমান ভ্রমণের সময় জেনারেল অরোরার সাথে আমার নানা বিষয়ে আলাপ হয়। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম; মিত্র বাহিনীর সাথে পাকিস্তানের এত দ্রুত পরাজয়ের কারণ কি? জবাবে তিনি তিনটি প্রধান কারনের উল্লেখ করেছিলেনঃ

1. The command structure of the Pakistanis had collapsed.
2. The Mukti Bahini had worked havoc on their communication lines and sapped their morale in a war of attrtition.
3. The Pakistanis were surrounded by a sea of hostility while the allied forces had the spontaneous support of the people of Bangladesh.

*(অনুবাদ)*  
১। পাকিস্তানের কম্যান্ড কাঠামো ভেঙে পড়েছিল।   
২। মুক্তিবাহিনী তাঁদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এলোমেলো করে দিয়েছিল এবং এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁদের মানসিক অবস্থা দুর্বল করে দিয়েছিল।   
৩। পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের জনগণের নিকট হতে ক্রমাগত অসহযোগিতা পেয়ে আসলেও মিত্রবাহিনী জনতার কাছ থেকে ক্রমাগত সহায়তা পেয়ে আসছিল।

-খান সারওয়ার মুর্শেদ

৯ নভেম্বর, ১৯৮৪



[মেহজাবীন মোস্তফা](https://www.facebook.com/mehjabeen.mostafa?fref=ts)

<**১৫,৪০,৩০২-০৫**>

# [সিরাজুর রহমান]

১৯৭১ সালে বিবিসিতে কতকগুলি সমস্যা ছিল। আমাদের শ্রোতাদের সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে, সর্বশেষ এবং সঠিক খবর তাদের জানাতে হবে কিন্তু সেই খবরগুলো আমরা পাই কোথায়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকার ফলে সংবাদ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এই অসুবিধার ভেতর দিয়ে যথাসাধ্য আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এরূপক্ষেত্রে যা হয়, যেখানে সত্যিকারের সংবাদ পাওয়া কঠিন হয়ে যায় সেখানে মিথ্যা সংবাদ অজস্র আসতে থাকে, গুজবগুলো সংবাদের আকার নেয়। আমাদের পক্ষে আরো বড় সমস্যা ছিল যে, বাংলাদেশ-ভারতের বাংলাভাষী শ্রোতারা, যাদের নিয়ে আমাদের কাজ কারবার, বরাবরই তাদের জন্য আমাদের সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু যদি কখনো অজান্তে গুজবের বেসাতি করে আমরা এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করে ফেলি যে আমরা দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে কখনো শ্রোতারা আমাদের বিশ্বাস করবেন না। এক দিকে যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমরা খবর অন্যান্যদের পরে দিচ্ছি, দ্বিতীয়ত আবার কেউ যাতে অভিযোগ করতে না পারে আমরা মিথ্যা খবর দিচ্ছি। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়েছে দু'কূল বজায় রেখেই সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে। এই ছিল আমাদের মূল সমস্যা। এছাড়া আমাদের অনুষ্ঠানের সময় ছিল খুব কম, বেশি খবর দেয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় বাড়ানো হয়েছিলো।

আমরা বাংলা বিভাগে যারা ছিলাম সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলাম। আমাদের পক্ষে সবকিছু সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিলো। সৌভাগ্যবশত তখন আশেপাশে কিছু ছাত্র ছিলেন তাঁরা এদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আমার মনে আছে আমার সহকর্মী শ্যামল লোধ, কমল বোসসহ কোনো কোনো সময়ে দিনের পর দিন আমরা সকাল ৯টার সময় এসেছি আবার রাত ২/৩টার সময় ট্রান্সমিশানগুলোর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছি।

এর মধ্যে আবেগেরও বহু ব্যাপার ছিল। দেশ থেকে অবিরাম খবর আসছে। দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃহত্তর ভোগান্তি ইত্যাদি নানা কাহিনী শুনে আমাদের মন আবেগে আপ্লুত হয়ে যেত। সে দিকটি তো ছিলই। তার ওপর আর একটা বড় সমস্যা ছিল - আমাদের হাজার হাজার বাঙালি যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলো। দেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না তাদের। দুই তরফ থেকে তারা আমাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তখনই আমরা বুঝতে পারলাম বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রতি তাদের ভালোবাসা কতোটুকু। কারণ বেপরোয়া হয়ে তারা আমাদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। প্রথমত আমরা বাংলাদেশ থেকে পাওয়া কিছু চিঠি পাকিস্তানের আত্মীয়স্বজনের অথবা পাকিস্তানে আটকে পড়াদের চিঠি বাংলাদেশে তাদের আত্মীয়স্বজনদের পাঠানোর চেষ্টা করেছি। বেশ কয়েক হাজার চিঠিপত্র এভাবে এদিক-ওদিক গিয়েছিলো। আমাদের পর্যাপ্ত জনবল ছিল না এগুলো দেখাশোনা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমরা 'সেতুবন্ধন, সাগর পাড়ের বাণী' অনুষ্ঠানে তাদের খবরাখবর বিনিময় শুরু করলাম। অজস্র চিঠি আমরা সে সময় পেয়েছি। এর ভেতর দিয়ে আমাদের শ্রোতারা কতো একাত্মবোধ করেছেন সেই প্রমাণ আমরা সেই সময়ে পেয়েছি।

আরো মনে পড়ে, যখন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা টের পেয়ে গেলাম যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করবে তখন আমরা নতুন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার মনে আছে যখন আমরা সেই অনুষ্ঠানটি প্রচার করি ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি কানে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনছিলাম এবং মুখে আমাদের শ্রোতাদের খবর দিয়ে যাচ্ছিলাম যে ইয়াহিয়া খান তখন কি করছেন - একই টেইপে। অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান যে মুহূর্তে বেতার ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজিতে সেই মুহূর্তে ভারত-বাংলাদেশে আমাদের বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এই বিষয়ে অনুষ্ঠানটি মারফতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটা শুনতে পেরেছিলেন। আবেগে মনটা এ রকম হয়ে পড়েছিলো যে কান্না চাপাটাই খুব অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিলো। অথচ আমি জানি বেতার সাংবাদিকদের পক্ষে আবেগ-অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেওয়া অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয়। কিন্তু তবুও সেদিন কান্না চেপে রাখা কষ্টকর ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দেশের প্রবাসী বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এটা বলতে হবে। এখানে আমার কিছু বাঙালি বন্ধু ছিলেন, তারা একটা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুললেন এবং আমার সাহায্য চাইলেন। সাব্যস্ত হলো আমি তাদের সাহায্য করবো জনসংযোগ ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে ছিলেন ওয়ালী আশরাফ, মাহমুদ হোসেন মঞ্জুর, মোশারফ হোসেন, বুলবুল মাহমুদ, মানিক চৌধুরী, শামসুদ্দীন প্রমুখ। সুরাইয়া খানমও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশ্বের জনসাধারণকে তাঁরা অবহিত করবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো সাংবাদিক, বেতার-সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী এবং বিশেষ করে দেশের বাইরে যারা আছেন তাঁরা বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্য ও অন্যান্যদের বুঝাবেন। একটা উপায় স্থির করা হলো যে, তথ্য বুলেটিন বের করা হবে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের সে ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমরা নিজেরা প্রচুর তথ্য বুলেটিন লিখেছি। আমার পুরো মনে নেই মনে হয় হাজার পাঁচেক প্রতিনিধির বাড়িতে, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, সংবাদপত্র সম্পাদক, বেতার-টেলিভিশন, বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান - এঁদের কাছে এবং লন্ডনে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হতো। আমরা নিজেরা যা লিখতাম তা তো বটেই অন্যান্যরা বাংলাদেশের সপক্ষে লিখতেন সেগুলোও আমরা তাঁদের কাছে তুলে ধরতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, একদিন এক বন্ধু আমাকে আমেরিকা থেকে টেলিফোন করে জানালেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বাংলাদেশের দাবীকে সমর্থন করে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তথ্য দলিল বের করেছেন। আমি বললাম সেটিই চাই। ডাঃ শামসুল হক স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন সেই দলিলটি। আমার মনে আছে সে দিনের মধ্যেই ৩২ পৃষ্ঠার দলিল আমরা ৫ হাজার কপি বিতরণ করেছি। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যে তথ্য পুস্তকটি বের করেছিলেন তাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এভাবে এই অবস্থা হয়েছিলো যে, পত্রপত্রিকাগুলো প্রায়ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে তার বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কাছে ফোন করতেন রাতে-বিরাতে। বহুবার তাঁরা ফোন করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক কিছু করা হয়েছিলো।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে একটা বিশেষ সন্তুষ্টি ব্যাপার ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন বাংলাদেশ আন্দোলন পক্ষে এখানে কাজ করছিলেন। তবে তাঁর কাজের ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। কারণ, তিনি বিচারপতি ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। টেলিফোনে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা হলো। আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে তাঁর প্রকাশ্যে কাজ করা উচিত। তিনি তখন ভাবছিলেন, তাঁর আত্মপরিচয় না দিয়ে যদি তিনি শিক্ষাব্রতী এবং বিচারকমণ্ডলীদের মধ্যে কাজ করেন ভালো কাজ হবে। এ সময়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর সদস্যদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন তুলে ধরেন।

ইতিমধ্যে দেখা গেল যে, ব্রিটেনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করার জন্য, বিশেষ করে ২৫শে মার্চ তারিখের পর থেকে আমাদের কর্মীর অভাব নেই, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেয়ার লোকের অভাব আছে। যা হোক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে আমি এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। বোধ হয় এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে আমার সবচাইতে আত্মতুষ্টির কারণ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমার যুক্তির সাথে একমত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে, তারপরে তিনি আত্মপ্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আমার সাংবাদিক বন্ধু পিটার গিল (পরবর্তীকালে যিনি উপমহাদেশের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা হয়েছিলেন), আমার এখানে বসে বিচারপতি চৌধুরীর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং তাঁর একটি আধ ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম আমি।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে আর একটা সন্তুষ্টির কারণ এই যে; টেলিফোনে তৎকালীন পাকিস্তানের বাংলাদেশী কূটনীতিকরা, যাঁরা বিভিন্ন দূতাবাসে ছিলেন, আমি তাঁদের নাম বলতে চাই না। তাঁদের অনেকের সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিলো। আমার মনে হয় তাঁরা সেই সময় বাংলাদেশের পক্ষে চাকরি ছাড়তে রাজি ছিলেন এবং পরে ছেড়েছিলেন।

আমার মনে আছে, বিভিন্ন সময়ে লন্ডনে যখন র‍্যালি করা হতো, পার্লামেন্ট লবী করা হতো, টেলিফোন করলে আমাদের বাংলাদেশীরা জিজ্ঞেস করতেন কতো লোক দরকার। কখনো কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও তিন হাজার - আগে থেকেই আমরা ঠিক করে নিতাম কোথায় কতো লোক পাঠানো হবে এবং সেই পরিমাণ লোক তাঁরা সংগ্রহ করে পাঠাতেন দু'একদিনের নোটিশে। সেই সময় বাংলাদেশের মহিলা সমিতি এখানে খুব কাজ করছিলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মহিলা সমিতির সদস্যরা পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় নিয়মিত গিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে বসে থাকতেন। সদস্যদের কাছ থেকে অবশেষে তারা শতাধিক পার্লামেন্ট সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন বাংলাদেশের দাবি সমর্থন করে পার্লামেন্টে একটা প্রস্তাব আনার ব্যাপারে। সেখানে আবার আর একটা সংশ্লেষ আছে, তখন মহিলা সমিতির সাধারণ ছিলেন আমার স্ত্রী সুফিয়া রহমান।

-সিরাজুর রহমান

বিবিসি, বাংলা বিভাগ

১৯৮০



[দীপায়ন অর্নব](https://www.facebook.com/idi0tic?fref=ts)

<১৫,৪১,৩০৫-১৩>

# [সৈয়দ আলী আহসান]

একাত্তরের মার্চ মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন তুমুলভাবে চলেছে এবং ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনার প্রহসনলীলা তুংগে উঠছে সে সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিস্ক্রীয় ছিলাম না। আমি অনুভব করেছিলাম যে একটি দুর্যোগ আসছে। সুতরাং আমরা ছেলেমেয়েদের সকলকে আমি সন্নিকটে আনতে চেয়েছিলাম। ঢাকায় আমার বড় মেয়ে মোহাম্মদপুরে তার নিজের বাড়িতে থাকত। এলাকাটি অবাঙালিদের। তাদের বাড়িতে ঢিল পড়ত রাত্রে। কখনো কখনো সরাসরি হুমকীও তাদের দেয়া হয়েছে। এ খবর পেয়ে আমি ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আমার গাড়ী নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তবে বিকেলের দিকে মোহাম্মদপুর এলাকায় আমার মেয়ের বাড়ির কাছে মোড় ঘুরতে গিয়ে একটি অদ্ভুদ দৃশ্য চোখে পড়ল। একটি কাক তড়িতাহত হয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছে। আর এক তলা বাড়ির কার্নিশে এক সারি কাক বসে আছে। একটি কাক কা কা করে মৃত কাকটির শরীর প্রায় ছুঁয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে সব কটি কাক একটি অর্ধবৃত্তের মতো আবর্ত রচনা করে একে একে উড়ে চলে গেল। কাকগুলো তাদের মৃতের প্রতি শেষ বেদনা নিবেদন করলো। দৃশ্যটি দেখেই আমার ছেলেকে গাড়ি থামাতে বলেছিলাম। আমি গাড়িতে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখলাম। সে দৃশ্যের কুশীলবরা হচ্ছে কাক এবং রংগমঞ্চ হচ্ছে বাড়ির কার্নিশ এবং গাড়ি চলাচলের রাস্তা। আমি হঠাৎ কেন যেন শংকিত হলাম। শুনেছি ইতর প্রাণীরা পূর্বাহ্নেই অনুভব করে যে সংকট আসছে। আমার তখন মনে হল যে হয়তবা বিপদ শিগগিরই আসবে। সেদিন ছিল ২২শে মার্চ। আমি চট্টগ্রাম থেকে গাড়ি করে ঢাকায় এসেছিলাম। আমার বড় মেয়ে, জামাই এবং তাদের দু’টি সন্তানকে নিয়ে যেতে।

মোহাম্মদপুরে মেয়ের বাসায় পৌঁছে মুনীর চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম মনে আছে। মুনীর চৌধুরী রাত্রে দেখা করতে এসেছিলেন। পরদিন সকালে সবাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের পথে যাত্রা করলাম। এবারেও কোন বিঘ্ন ঘটেনি। শুধুমাত্র ব্রীজে ডাইভারশনের কাছে এসে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাদের গাড়ি ডাইভারশনের পথে নেমে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসেছে তখন উল্টোদিকে থেকে আমাদের মুখোমুখি হর্ন বাজিয়ে একটি আর্মি জীপ উপস্থিত হল। আমরা সঙ্গেই সঙ্গেই পিছিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু জীপটি না এগিয়ে সেও পিছিয়ে গেল এবং আমাদের এগুতে বলল। আমরা যেই একটু এগিয়েছি তখন আবার নেমে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমরা তখন পেছনে চালিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় উঠে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জীপটিও পেছনে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের এগিয়ে আসতে বললো কিন্তু আমরা ভয়ে এগুলাম না। তখন জীপটি এল, বড় রাস্তায় পড়ল এবং আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে চললো। আমাদের গাড়ী পেরুবার সময় জীপের মধ্যে কয়েকজনের অট্টহাসি শুনলাম এবং একটি শুন্য মদের বোতল রাস্তায় এসে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ীতে কোন আঘাত লাগেনি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে দেখলাম, সারাদেশে একটা কিছু যেন ঘটবে সকলেই তার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বিভিন্ন লোক, শিক্ষক এবং ছাত্র যূথবদ্ধ হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কথাবার্তা চলছে। আশা এবং আশঙ্কা এ দুইয়ের মিলন ঘটলে যে এক রহস্যময়তার সৃষ্টি হয় তখনকার সময়ে সেই রহস্যময়তা ছড়িয়ে ছিল। শুনলাম পরের দিন ২৪ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক সম্মিলিতভাবে একটি সভা আহবান করেছে যে সভায় ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করবে।

পরের দিন বিকেলে শহরে মিটিং ছিল আমরা সবাই সেখানে গেলাম। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হল। বক্তৃতা করলেন অনেকে। সভা চলাকালে হঠাৎ খবর এলো সমুদ্র বন্দরে পাকিস্তান থেকে আগত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামানো হচ্ছে এবং বাঙালি শ্রমিকদের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাদের সংঘর্ষ বেধেছে। আমরা খবর পেলাম যে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাতে আপত্তি করায় বাঙালি শ্রমিকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে এবং অনেক নিরীহ লোক নিহত হয়েছে। মাঝপথে আমাদের সভা ভেঙ্গে গেল। আমার ছোট মেয়ে এবং জামাতা দেব পাহাড়ে থাকত। আমি গাড়ী নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তাদেরকে আমার সঙ্গে ক্যাম্পাসে নিয়ে এলাম। দুর্ঘটনা একটা ঘটবে সেটা আমরা সকলে অনুমান করেছিলাম। এই দুর্ঘটনার মুহূর্তে আমি আমার ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইনি। সবাইকে তাই একত্রিত করেছিলাম। বড় মেয়েকে তো আগের দিনই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। পরের দিন ছোট মেয়েকে। যাহোক সেদিন শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ফেরা খুব সহজ হয়নি। আমাদের যাবার পথে ক্যান্টনমেন্ট পড়ে। সেসব রাস্তায় চলাচল বন্ধ ছিল। বড় বড় গাছ কেটে এবং আড়াআড়িভাবে কিছু ট্রাক সাজিয়ে রাস্তার চলাচলকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে গ্রামের কাঁচা মাটি এবং খোয়া ফেলানো পথ দিয়ে অনেক সময় নিয়ে রাত প্রায় ১২টার দিকে ক্যাম্পাসে ফিরলাম। রাত্রিবেলা গ্রামের পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। সুতরাং আশেপাশের জঙ্গল এবং বন্যফুলের সমারোহ চোখে পড়েনি কিন্তু তাদের গন্ধ পেয়েছিলাম। একজন ইংরেজ কবি এরকম বর্ণনা করেছেন এভাবে, শংকিত পথে অন্ধকারে ফুলগুলো কোন আশ্বাস আনে না। তাদের সুগন্ধ ক্রমশঃ হারিয়ে যায় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

পঁচিশ তারিখ সারাদিন মানুষের আনাগোনা চলছিল বিভিন্ন এলাকায়। শহর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের কেউ কেউ এসেছিলেন, সন্ধ্যার দিকে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস-এর একটি প্লাটুন বর্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিল। গ্রামের লোকেরা এদের জন্য প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করল। তখন আমাদের সকলের মধ্যে একটি মাত্র বিশ্বাস সমুচ্চারিত যে আমরা বাংলা ভাষাভাষি এক ও অভিন্ন। যারা বাংলায় কথা বলে তাদের সকলকেই এখন একত্রিত হতে হবে একটি বিশ্বাসের সচলতায় যে এদেশ আমার। আমার মনে হয় তখন এই বিশ্বাসটি নির্মাণ করতে হয় নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবেগের অন্তঃসার হিসেবে উৎসারিত হয়েছে। আমরা তখন চিন্তা করছিলাম না ভবিষ্যৎ আমাদের কি হবে। আমরা একটি প্রবল আন্তরিক ভাবাবেগের প্রবাহকে আশ্রয় করেছিলাম। সারাদিন বিভিন্ন সময় আমরা ঢাকার সঙ্গে করছি। যোগাযোগের স্থান ছিল দুটো- ইত্তেফাক অফিস ও বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই ভয় হয়। কিছু একটা ভয়ানক ঘটতে যাচ্ছে এটা অনুভব করছিলাম কিন্তু তা যে কত ভয়াবহ এবং প্রচণ্ড হতে পারে তা আমাদের অনুমান করার সাধ্য ছিল না। বিপদের সম্ভাবনা আমরা ব্যাখ্যা করি ঝড় আসবে বলে। এদেশে আমরা প্রকৃতির তাণ্ডবকে তাই প্রকৃতির উপমা আনি। আমরা বলি ঝড় আসবে, প্রচন্ড ঝড়, প্রকান্ড সব বৃক্ষ উৎপাটিত হবে, লোকেরা ধুলায় আচ্ছাদিত হবে, বন্যায় গৃহাঞ্চল প্লাবিত হবে। আমরা প্রকৃতির উপমা একারণেই দেই যে প্রকৃতির তাণ্ডবের মুখে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। সে বিপদ কেউ রোধ করতে পারে না। সে ভেসে যায় এবং ধ্বংসের লীলা নৈপুণ্যে সে নিশ্চিহ্ন হয়। আমার এক বিদেশী বন্ধু সবসময় বিপর্যয়ের সঙ্গে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার উপমা দিতেন। তিনি ছিলেন জার্মান, হাইডেলবার্গের লোক, চতুর্দিকে সবসময় পাহাড় দেখতেন তাই পাহাড়ের কথাটি তার অনিবার্যভাবে মনে পড়ত। তিনি বলতেন, পাহাড় যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন প্রস্তর খণ্ডগুলো প্রচন্ড বেগে নিম্নাভিমুখে ছুটতে থাকে। তার গতিরোধ করার সাধ্য কারো থাকে না। পাথরগুলো প্রচণ্ড গতিতে সম্মুখের সমস্ত কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে ছুটে চলে, ধ্বংসের অনিবার্যতা তো একেই বলে।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা প্রায় সারারাত জেগেই কাটিয়েছিলাম। রাত ১টা পর্যন্ত আমরা বিভিন্নজনের বাড়ীতে বসে আলাপ-আলোচনা করেছি কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কিছুই নির্ধারণ করতে পারি নি। একটি প্রধান চিন্তা ছিল ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বিভিন্ন পরিবারকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। এখানে তো সম্ভাব্য ভয়াবহতার চিত্র উদঘাটিত হয়নি। তাই আমরা দ্রুত রাত্রির অবসান চাচ্ছিলাম এবং দিনের আলোয় কর্তব্যের কথা চিন্তা করব ভেবেছিলাম। সেসময়, রূপক করে বলা যায়, আমাদের দক্ষিণ দিকে নিস্তব্ধতা, বাম দিকে নিস্তব্ধতা, আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে নিস্তব্ধতা। শুধু আমাদের মাথার উপরে আকাশে বাংলা বর্ণমালারা সবকটি অক্ষর ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই বেদনা এবং প্রতিবাদের শব্দগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

রাত্রি কাটলো সুগভীর নিদ্রায় নয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। প্রায়ই জেগে উঠেছি আশংকায় এবং বিমূঢ়তায়। সকালে শয্যা ছেড়ে মাঠে কবুতরের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। এটা আমার রোজকার অভ্যাস। খাঁচার দরজা খুলে গম অথবা ধান মাঠে ছিটিয়ে দেই। কবুতর গুলো প্রচুর পবিত্র শুভ্রতায় শেফালী ফুলের মতো খাদ্যকণার উপর ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। কবুতরের ঘরের দরোজা খুলে দিয়ে মাঠের মধ্যে ধান ছড়িয়ে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু কবুতরগুলো খাবারের দিকে এগিয়ে এল না। ওরা খাঁচার সামনে একটু ঘুরে ওদের ঘরের ছাদের ওপর বসলো। ১২ টির মত কবুতর ছিল, সবকটি প্রায় সাদা, একটি দুটি খয়েরি রঙের। হঠাৎ কবুতর কটি একসঙ্গে উড়তে লাগলো। পাখা ঝাপটিয়ে প্রথমে একটি উড়লো, পরে দোতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত উড়লো। পরে সব কটি পাহাড়ের মধ্যে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। আমি আমার জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখিনি। সে মুহুর্তে আমি জানলাম যে, ঢাকায় ভয়ানক কিছু ঘটেছে এবং আমাদের জীবনেও আমরা একটি সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে প্রায় লাগোয়া ছিল ক্যান্টনমেন্ট। আমরা রোজই দেখতাম যে হেলিকপ্টার উড়ে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছে। এবং যাবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বার কয়েক ঘুরে যাচ্ছে। তাছাড়া কুমিরার দিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচলের সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল। যদিও প্রথমে কয়েকদিন চট্টগ্রাম শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনী কবলিত হয়নি এবং মেজর জিয়া নামক একজন সৈনিকের নাম তখন আমরা শুনেছিলাম যিনি কালুরঘাটে ঘাঁটি স্থাপন করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করছিলেন। কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণাবাণী শুনতে পেয়েছিলাম। সেই মুহুর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহুর্ত ছিল। যখন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের অভাব ঠিক সেই মুহুর্তে জিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার দাবি একটি বিষ্ময়কর মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। আমরা তখনই ভাবতে পেরেছিলাম যে, কোন কিছুই হারিয়ে যায় নি, আবার সবকিছু ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনবরত মানুষের আনাগোনা হচ্ছিল। উপাচার্য ডঃ মল্লিককে কেন্দ্র করে একটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বাসগৃহগুলোকে অরক্ষিত রেখেই ৩০শে মার্চ সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম কুন্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে। কুন্ডেশ্বরী রাউজান থানার অন্তর্গত। কুন্ডেশ্বরীর মালিক বাবু নতুন চন্দ্র সিংহ আমাদের সবার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আনন্দিত হয়েছিলেন। কুন্ডেশ্বরী বিদ্যালয়টি একেবারেই বড় সড়কের পাশে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। রাত্রি বেলা প্রায়ই নানাবিধ শঙ্কায় আমাদের জেগে উঠতে হতো। এদিকে ওদিকে সৈন্য চলাচলের সংবাদ শুনতাম। কখনো বিদ্যালয় গৃহটি আক্রান্ত হবে এমন খবরও আসতো। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে আমরা কুণ্ডেশ্বরী পরিত্যাগ করে প্রথমে নাজিরহাট এবং পরে কাটাখালি হয়ে রামগড়ে উপস্থিত হলাম। আমরা কুণ্ডেশ্বরী ছাড়লাম ৭ই এপ্রিল তারিখে। সে সময় একটি সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম কোন গ্রামে আত্মগোপন করে থাকব কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় যে সীমান্ত এলাকায় যাওয়াই ভাল। কেননা সেনাবাহিনী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়েও আমরা রক্ষা পাব না। কিন্তু সীমান্তে যদি যাই তবে প্রয়োজনবোধে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে যাওয়া সম্ভবপর। রামগড় তখন মেজর জিয়ার প্রতিরোধ কেন্দ্র ছিল। তিনি কালুরঘাট থেকে সরে এসে রামগড়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। রামগড়ে পৌঁছে জিয়াকে প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। তার চোখে কালো চশমা ছিল এবং মুখ ছিল শ্মশ্রূমন্ডিত। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং কখনো কখনো কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমাদের কারো সঙ্গেই তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নি।

পহেলা বৈশাখ তারিখে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ পেলাম। জিয়াউর রহমান আমাদের জানালেন যে, কোন সিভিলিয়ানের তখন আর রামগড় থাকা নিরাপদ নয়। কেননা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী সেখানে এসে পড়বে। আমাদের পরিবার পরিজনদের বাসের ব্যবস্থা করে আমি, ডঃ মল্লিক, তৌফিক ইমাম এবং আরো কয়েকজন রামগড়ের সীমানা পেরিয়ে আমরা আগরতলার দিকে রওনা হলাম। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সাবরুমের রাস্তায় একদল ভারতীয় স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছাত্ররা আমাদের জীপ থামিয়ে জীপের চারদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল “আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে”। সিকান্দার আবু জাফর এই গানটি লিখেছিলেন কিছুদিন আগে, তখন এই গানটির তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু অপরিচিত পরিমন্ডলে শঙ্কিত সময়ের পদক্ষেপে গানটির বাণী আমার কাছে অসাধারণ তাৎপর্যবহ মনে হলো। আমার মনে হলো ঠিক এমন করে হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়ে কেউ হয়তো তার জাতির বেদনাকে রুপ দিতে পারেননি। সে মুহুর্তে ইমোশন প্রবল ছিল। তাই হয়তো গানটিকে অসাধারণ মনে হয়েছিল। তবে অসাধারণ তো বটেই তার কারণ, আমাদের সংকটের মুহুর্তে এ গানটি আমাদের জন্য সমর্থন ও সহায়তা এনেছিল। আগরতলায় আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে। তিনি এবং মাহবুব আলম চাষী আগরতলায় একটি বাংলাদেশ মিশন খুলেছিলেন। আমাদের পরিজনবর্গ আগরতলায় এসে পৌঁছোয় বিকেলবেলা। প্রথম রাতের জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম গ্রান্ড হোটেলে। নামটি গ্রান্ড কিন্তু কর্মব্যবস্থা অত্যন্ত সাধারণ এবং মলিন। হোটেলটি ছিল আগরতলায় রাজপরিবারের। সে রাতেই আমাদের সংগে দেখা মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। একটু বেশি রাতে এম আর সিদ্দিকী সাহেবও হোটেলে এলেন এবং পরের দিন তিনি কলকাতায় যাবেন বললেন। আমাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন। আমরা এক রাতই গ্রান্ড হোটেলে ছিলাম। পরের দিন আগরতলায় সরকার নরসিংগড়ে একটি পলিটেকনিক স্কুলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আগরতলায় আমরা অবর্ণনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছে বিশেষ টাকা পয়সা ছিল না। পাকিস্তানী মুদ্রার বিনিময় হার দিয়েছিল ১০০ টাকার স্থলে ভারতীয় ৪০ টাকা। অন্ততপক্ষে পোদ্দারদের কাছ থেকে আমরা এ হারই পাচ্ছিলাম। সে সময় আমার চিন্তা হল কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, যারা দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, তাঁদের জন্য অর্থনৈতিক সঙ্গতির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। প্যারিসে আমার কিছু পরিচয়ের সূত্র ছিল। একাডেমী ফ্রান্স-এর সদস্য এবং বিখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী এবং কবি পীয়ের ইমানুয়েলকে আমি চিনতাম। তাঁর কাছে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। আমার চিঠি পীয়ের ইমানুয়েল পান ১৭ই মে তারিখ। ১৯শে মে ইমানুয়েলের পক্ষ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পাই। টেলিগ্রামের ভাষা ছিল নিম্নরুপঃ

“পীয়ের ইমানুয়েল

আপনার চিঠি পেয়েছে। চিঠির অংশবিশেষ প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশের অনুমতি চাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি ঘটবে।”

পরবর্তী চিঠিতে প্যারিস থেকে স্টিফেন স্পেনডারের ঠিকানা আমার কাছে পাঠানো হয়। তখন তিনি কানেকটিকাটে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করছিলেন। বিখ্যাত স্পেনীয় দার্শনিক সালভাদর মাদারিয়গার ঠিকানাও আমি এভাবে পাই। এদের দুজনের কাছেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি চিঠি লিখি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সহানুভূতি কামনা করি। পীয়ের ইমানুয়েল বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য আবেদন জানান। অবশেষে ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডমের সভাপতি মিং শেফার্ড স্টোন আমাকে জানান যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাদের সাহায্যের জন্য পঁচিশ হাজার ডলার অনুমোদন করেছে। এ টাকা (অনুবাদ) “সে সকল লেখক, স্কলার এবং বুদ্ধিজীবীদের জন্য ব্যয় করতে হবে, যারা জবরদস্তমূলক আচরণের কারণে নিজ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন” তাঁদের জন্য ব্যয় করতে হবে।

মে মাসের শেষে আমি কোলকাতায় যাই এবং পাম এভিনিউতে ব্যারিস্টার এ সালামের বাড়িতে অবস্থান করতে থাকি। সালাম সাহেবের ওখানে বাংলাদেশের তিনজন ছিলাম- আমি, মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন আমার পুরনো বন্ধু বোম্বের এ বি শাহ। এ বি শাহ সেকুলারিস্ট পত্রিকার সম্পাদক এবং কোয়েস্ট পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। এ বি শাহ কলকাতায় আসেন ৮ই জুন। সে তারিখে রাত্রে গ্রান্ড হোটেলে তাঁর সংগে আমার যোগাযোগ হয়। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত টাকা যথাযথভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করি। কমিটির সভাপতি হন জাস্টিস এস এম মাসুদ এবং সদস্য থাকেন অন্নদাশঙ্কর রায়, আমি, ডাঃ মল্লিক, সুশীল ভদ্র এবং সুশীল মুখার্জী। জাস্টিস মাসুদ কর্তৃক অনুমোদিত ২১শে জুন তারিখের বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা আমার কাছে আছে তার মধ্যে জুন মাস থেকে দেশ স্বাধীন হবার সময় পর্যন্ত প্রতিমাসে যারা নিয়মিতভাবে সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের নাম আছে। এ নামগুলো হচ্ছে- ডঃ এ আর মল্লিক, প্রফের সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ সরওয়ার মুর্শেদ, ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরায়শী, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান, মিঃ ওসমান জামাল, মিঃ আলী আশরাফ মাসুদ, মিঃ আবু জাফর, অনুপম সেন, ডঃ মোতিলাল রায়, ডঃ বেলায়েত হোসেন, শওকত ওসমান, বুলবুল ওসমান, গোলাম মোর্শেদ, আবদুল হাফিজ, ডঃ ফারুক আজিজ খান, ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, বদরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মাহবুব তালুকদার, সাদেক খান, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ মযহারুল ইসলাম, মোস্তফা মনোয়ার। এই তালিকায় পরে আরো অনেক নাম যুক্ত হয়েছিল যারা জুন মাসের পর কোলকাতায় এসেছিলেন। সে নামগুলো আমার কাছে নেই। এদের মধ্যে ডঃ মুসলিম হুদার নাম মনে পড়ছে। আরো ক’জনের নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে একজন ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদ, আরেকজন ডঃ সফর আলী আকন্দ এবং ডঃ সালেহ আহমদ।

২৫শে জুন এ সাহায্য সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডমের ভারতীয় শাখার প্রোগ্রাম পরিচালক এ, বি শাহ কর্তৃক পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল তার হুবহু প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

INTERNATIONAL ASSOCIATION CULTRAL FREEDOM

June 25, 1971

For the favor of publication

The International Association for Cultural Freedom has made a special grant of $25,000 to provide assistance to emigrant schools, intellectuals and writers from Bangladesh. The grant has been made from the fund for Intellectuals that the Association created in 1968 in the wake of soviet occupation of Czechoslovakia.

The grant will be operated by a Committee for Assistance to Bangladesh Intellectuals formed for the purpose by the IACF office in India. The Committee consists of Mr. Justice S.A. Masud of Calcutta High Court, Mr. Annada Sanker Ray, the eminent writer, Dr. A, R Mullick, Vice Chancellor of Chittagong University, Professor Syed Ali Ahsan, Head of the Department of Bengali in Chittagong University and former Director of the Bengali Academy in Dacca, professor A.B. Shah, Director of Programmes of the IACF in India, Mr. Sushil Bhadra, Mr Sushil Mukherjea, social workers from Calcutta.

The Committee has already provided adhoc financial assistance to 25 scholars from Bangladesh and is preparing a comprehensive list of others who have emigrated to India. The Committee is also trying to persuade some of the Indian Universities to offer temporary assignments to Bangladesh scholars and secure the cooperation of Indina publishers to facilitate the publication of their manuscripts.

The Committee is also sponsoring a special issue of Quest, the well know intellectual and cultural journal, to be edited by Dr. A R Mullick and Professor Syed Ali Ahsan.

Scholars, Writers and intellectuals from Bangladesh are requested to contact Mr. Sushil Mukherjea at the Committee’s office at P 542 Raja Basanta Roy Road, Calcutta 29.

sd / - A. B. Shah

Director of Progammes, India.

(অনুবাদ)

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডম

জুন ২৫, ১৯৭১

প্রকাশনার জন্য

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডম বাংলাদেশ থেকে আগত স্কলার, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের সহায়তার জন্য ২৫,০০০ ডলারের একটি বিশেষ অনুদান অনুমোদন করেছে। অনুদানটি প্রদান করা হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের জন্য তৈরি করা তহবিল থেকে। এটি ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত দখলদারিত্বের প্রাক্কালে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

অনুদানটি একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে যেটি আইএসিএফ ইন্ডিয়া শাখার প্রস্তাবনায় বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের সহায়তার জন্য গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন-

জনাব জাস্টিস এস এ মাসুদ (কোলকাতা হাইকোর্ট)

জনাব অন্নদাশংকর রায় (প্রখ্যাত লেখক)

ডঃ এ আর মল্লিক (ভিসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান (বাংলা বিভাগের হেড, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক)

প্রফেসর এ, বি শাহ (পরিচালক, প্রোগ্রামস, আইএসিএফ, ইন্ডিয়া) এবং

জনাব সুশীল ভদ্র

জনাব সুশীল মুখারজি (সমাজকর্মী, কোলকাতা)

এই কমিটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ২৫ জন স্কলারকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন এবং অন্য যারা ইন্ডিয়াতে ইমিগ্রেন্ট হয়েছেন, তাঁদের একটি লিস্ট তৈরি করেছে। এই কমিটি ইন্ডিয়ার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশী স্কলারদের সাময়িক কাজের ব্যবস্থা করছে এবং ইন্ডিয়ান প্রকাশকদের সহযোগিতায় তাদের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করছে।

এই কমিটি আরেকটি বিশেষ বিষয়ে প্রণোদনা দিচ্ছে। একটি স্বনামধন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জার্নাল তৈরির কাজে, যেটি ডঃ এ, আর মল্লিক এবং প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে।

বাংলাদেশ থেকে আগত স্কলার, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ করা হচ্ছে জনাব সুশীল মুখার্জির সাথে কমিটি অফিসে যোগাযোগ করার জন্য। যোগাযোগের ঠিকানাঃ পি-৫৪২ , রাজা বসন্ত রায় রোড, কোলকাতা-২৯।

স্বাক্ষর/-

এ. বি. শাহ্‌

ডিরেক্টর অফ প্রোগ্রামস, ইন্ডিয়া

এ সময় মিসেস লী থ (Lee Thaw) নামক এক ভদ্রমহিলা কোলকাতায় আসেন এবং ওবেরয় গ্রান্ড হোটেল অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমিতির (International Refugee Organization) প্রতিনিধি। তিনি লোকদের জন্য কিছু সাহায্য এনেছিলেন। তার অর্থদানের পাত্র ছিল সৃষ্টিধর্মী লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক। ৫-৭-৭১ তারিখে আমি মিসেস থ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক এবং সাংবাদিকদের একটি তালিকা তাকে প্রদান করি। সে তালিকা অনুসারে যারা পূর্বের সাহায্য সংস্থা থেকে কিছু পান নি এবং সৃষ্টিশীল লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক, তাদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ১১জন লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিককে ৫ হাজার ৮ শত টাকা দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২২ হাজার ৫ শত টাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। যারা সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী কামরুল হাসান, জহির রায়হান, অভিনেত্রী সুমিতা এবং আরো অনেকে ছিলেন। তবে একটি কথা এখানে না বললে অন্যায় হবে, তা হচ্ছে লেখক ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ প্রথমে সাহায্য নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তার চেয়েও দুঃস্থ কোন লেখক এবং সাংবাদিকের আনুকূল্যে অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এ সময় আরেকটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা কোলকাতায় উপস্থিত হয়। উক্ত সংস্থা বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর সংগে যোগাযোগ করেন। এই সংস্থার নাম International Rescue Committee, সংক্ষেপে I.R.C। উক্ত প্রতিষ্ঠান মূলত ইহুদীদের প্রতিষ্ঠান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ থেকে যে সমস্ত ইহুদী পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, মূলত তাঁদের সাহায্যের জন্য এ সংস্থাটি গড়ে ওঠে। আমাদের দুর্দশার সময় সংস্থাটি যখন কোলকাতায় আসে তখন এদের পশ্চাদভূমি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। যাই হোক, জনাব হোসেন আলী এ সংস্থার সংগে ডঃ মল্লিকের যোগসূত্র ঘটিয়ে দেন এবং তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সকলের সংগে পরামর্শ করে এই অর্থ বরাদ্দ করবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ সাহায্য পাবার ফলে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আর্কাইভস-এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন ডঃ মল্লিক এবং আমি সভাপতি হয়েছিলাম। মোট ১৬ জন ব্যক্তি আর্কাইভস-এর কর্মপরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র এবং আমার সহকারী হিসাবে আর্কাইভস-এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আবু জাফর (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। আর্কাইভস ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সংক্রান্ত যে সমস্থ খবর প্রকাশিত হতো তা সংগ্রহ করতো। এই সংগৃহীত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করে একটি হওয়ার পর আমি বাংলাদেশ আর্কাইভস-এ দিয়ে দিয়েছি। আর্কাইভস এর পক্ষ থেকে একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী সার্ভিস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়নি। ডঃ মযহারুল ইসলাম আই আর সি-র কাছ থেকে একটি অনুদান নিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত বিবিধ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে “লোকলোর” সংগ্রহের জন্য। এই লোকলোর সংগ্রহের কাজে মযহারুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

এ সময় কোলকাতায় বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ‘বাংলাদেশ তথ্যানুসন্ধান কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্রী শৈবালকুমার গুপ্ত। মূলত এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান যে নির্যাতন করছে, তা ছিল সাম্প্রদায়িক। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে উক্ত দেশকে পুরোপুরি ইসলামী দেশ বানানো। তাঁর মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর একটি প্রশ্ন ছিল, “বাছিয়া হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা, গৃহদাহ ও লুন্ঠনের পরিকল্পনা ছিল এমন অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে কি?” হিন্দু সম্পত্তি লুঠ হইয়া থাকিলে কাহারা করিয়াছে”? আমার সংগে সে সময় ডঃ রমেশ মজুমদারের যোগাযোগ হয় এবং আমি তাঁর এই তথ্যানুসন্ধান ব্যাপারে দুঃখপ্রকাশ করি। সৌভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিলেন এমন সব হিন্দুরা ডঃ মজুমদারের সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধানের প্রতিবাদ করেছিলেন। তারা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তারা বাংলাদেশী এবং সকল বাংলাদেশী সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত। শেষ পর্যন্ত ডঃ রমেশ মজুমদার তাঁর সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধান তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, ডঃ মজুমদারের লোকেরা ক্যাম্পে অবস্থানরত সাধারণ হিন্দুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তারা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আসেন নি এবং সাধারণ হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য রেখেছিলেন।

২৩শে জুলাই আমি বাঙালোর শহরের গান্ধী স্মারক নিধির আমন্ত্রণক্রমে বাঙালোর যাই এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করি। বাঙালোর এবং মহীশুরে আমি বাংলাদেশের সংকৃতি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর মোট দশটি বক্তৃতা করি। বাঙালোরে গান্ধী স্মারক নিধির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

১ লা আগস্ট তারিখে ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি বাংলাদেশের ওপর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম এবং ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি ছিলেন।

১৪ থেকে ১৬ই আগস্ট দিল্লীতে জয় প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার আহবান করেন। উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যথার্থ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত করা। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ মল্লিকের নেতৃত্বে দশজন সদস্য দিল্লীতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে আমি ছিলাম, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ ছিলেন, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ মোতিলাল রায়, মিঃ ওসমান জামাল, মিঃ সাদেক খান, মিঃ মওদুদ আহমদ, মিঃ আলমগীর কবির ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ বিখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত প্রফেসর গলব্রেইথ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। সার্কাস এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশনে সাক্ষাৎকারটি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃ মল্লিক, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃ আনিসুজ্জামান এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্ভবত আরো কয়েকজন ছিলেন, আমার এখন তাদের নাম স্মরণে নেই। গলব্রেইথ সাহেব বাংলাদেশ থেকে আগত বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। আমরা বিনয়ের সংগে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করি। আমরা তাকে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তাঁর সংগে জানাই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করা, আমাদের উদ্দেশ্য স্থায়ীভাবে বিদেশে পুনর্বাসন নয়। যখন গলব্রেইথ সাহেব আমাদের সামনে এ প্রস্তাব উপস্থিত করছিলেন সে সময় আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির নাম ছিল’ হারভার্ড সামার স্কুল কমিটি ফর ইস্ট-পাকিস্তান রিফিউজিস’। এ খবরটি প্রকাশিত হয় দা ‘হারভার্ড ক্রিমসন’ নামক পত্রিকার ৩০শে জুলাই সংখ্যায়।

২৯ শে আগস্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোলকাতায় মহাজাতি সদন ভবনে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ-এর লোকগাথা অবলম্বনে কবি চন্দ্রবতী নামক একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এ অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্র জন্মবার্ষিকীও অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯ শে আগস্ট বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উদ্বোধন করি। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য ডঃ অম্লান দত্ত।

এ সময় হার্ভার্ড গ্রুপের পক্ষ থেকে অর্থনীতিবিদ গুস্তাভ পাপানেক কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন এবং কয়েকদিন বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্রস্তাব ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাছে পেশ করেন। প্রস্তাবটি মেমোরেন্ডাম আকারে ছিল এবং নাম ছিল ‘The longer term problem of Bengali refugee intellectuals’ (অনুবাদঃ বাঙালি শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা)। মেমোরেন্ডামে পাপানেকের স্বাক্ষরের তারিখ হচ্ছে ১লা জুলাই ১৯৭১। পাপানেকের এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। শুধু উচ্চতর গবেষণার জন্য বাংলাদেশের দু’জন শিক্ষককে তিনি বৃত্তি দিতে সক্ষম হন। পাপানেক তাঁর মেমোরেন্ডাম ফোর্ড ফাউন্ডেশনের জর্জ জাইগেনস্টাইন-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোলকাতায় ওরিয়েন্টস লংগম্যানস এ সময় ‘বাংলাদেশ স্টোরি’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং আমি তাদের সংগে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হই কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা গ্রন্থ প্রকাশে ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। আমার সাথে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন টি মেলবুনি আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সংগে আমার আলোচনা হয়। ১১ নভেম্বরে আমি অস্ট্রেলিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু অবশেষে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় যাত্রা স্থগিত রাখি। শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রফেসর মেলবুনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ‘বাংলাদেশ স্টাডিজ’ বলে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ইনস্টিটিউট শেষ পর্যন্ত হয়নি।

বিখ্যাত ফরাসী সংবাদপত্র La Monde (লা মঁদ) এ সময় আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং জানায় যে তারা বাংলাদেশের কবিতার ওপর একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সংখ্যায় লা মঁদ বাংলাদেশের কিছু কবিতার অনুবাদ এবং আলোচনা পত্রস্থ করেন। সেখানে আমার ‘প্রতিদিনের শব্দ’ কবিতার ফরাসী অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। বোম্বাই এর কোয়েস্ট পত্রিকা বাংলাদেশ সংখ্যা প্রকাশ করে। উক্ত সংখ্যায় আমার একটি আলোচনা ছিল এবং একটি কবিতা ছিল। আমার প্রবন্ধটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ওপর এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার আগ্রহ এবং তাৎপর্যের ওপর।

সবশেষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে ‘ইসলামের দৃষ্টিতে’ এই নামে কতকগুলি কথিকা প্রচার করি। উক্ত কথিকাগুলোর মধ্যে আমি কোরআন শরীফ এবং হাদীস থেকে উদাহরণ উপস্থিত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তানীদের আচরণ সর্বতোভাবে ইসলামবিরোধী। আমার আলোচনাগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল বলে শুনেছি এবং বাংলাদেশের মানুষ সেগুলো শুনেছে এবং উৎসাহিত বোধ করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি কবিতাও পাঠ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বেতার কেন্দ্রের দান যথেষ্ট। শুধুমাত্র উচ্চারিত বাণীর সাহায্যে মানুষের চৈতন্যকে যে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দিয়েছিল।

আমি স্বাধীনতার সংগে সংগে দেশে ফিরতে পারিনি। তখন সকলেই দ্রুতগতিতে দেশমুখী হচ্ছিলেন তাই ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে পর্যায়ক্রমে সকলের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে দেশে ফিরেছি। দেশে ফিরে মনে হয়েছিল একটি নতুন প্রত্যুষে আমি যেন নতুন সূর্যোদয় দেখছি। ঠিক সেই মুহুর্তের মানসিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। একটি নতুন চৈতন্যের প্রান্তরে আমি নিজেকে উপস্থিত দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

-সৈয়দ আলী আহসান

১৯ এপ্রিল, ১৯৮৪



[ইব্রাহিম রাজু](https://www.facebook.com/ibrahim.razu)

<১৫,৩৭,৩১৩-৩৫>

# [অজয় রায়]

২৫ শে মার্চ কাল রাত্রিতে ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের চাতুরিতে ঢাকায় শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়ার জানোয়ার মুখ উন্মোচিত হল। শুরু হল অপারেশন সার্চলাইট, হল নয় মাসব্যাপী গণহত্যাযজ্ঞের উদ্ধোধন- বাংলার রক্তে, বাঙালীর রক্তে।  
  
কামান, মার্টার আর মেশিনগানের বিকট কানফাটা গর্জনে সে রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রচন্ড শব্দে ভেঙ্গে গিয়েছিল জানালার কাঁচ। আর্ত মানুষের অসহায় চিৎকারকে ছাপিয়ে সারারাত ধরে শুনছিলাম অগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ, ট্রাক ও ট্যাঙ্কের পদচারণ ধ্বনি। শঙ্কিত চিত্তে আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে পৈশাচিক বাহিনীর উপস্থিতি। বুঝতে কষ্ট হয় নি সারারাত ধরে কিসের হোলি উৎসব - কাদের রক্তে ঢাকার রাজপথ পরিণত হচ্ছে রক্ত নদীতে।

যা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটল। সারাদেশের সাথে আমরা ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও অপেক্ষা করছিলাম উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে ইয়াহিয়া মুজিবের আলোচনার ফলাফল। অসহায়ভাবে লক্ষ্য করছিলাম ইয়াহিয়া সরকারের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি আমরা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে এ ধরনের এক ভয়ংকর পরিস্থিতির, অনুমান করছিলাম আসন্ন গণহত্যার পূর্বাভাস। তাই মার্চের ২২/২৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে গণহত্যার পূর্বাভাষ জানিয়ে আমরা প্রেরণ করেছিলাম ইউ, এন ও-র সেক্রেটারি জেনারেল ও বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে। আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।  
  
সে রাত্রে পাকিস্তানের বীর জোয়ানেরা কত বাংগালীকে হত্যা করেছিল তার সংখ্যা হত্যাকারীরাও বলতে পারবে না। শুধু এতটুকু জানি রাজারবাগে শত শত পুলিশ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে নীলক্ষেত কমলাপুর এলাকার শত শত বস্তিবাসী, আত্মাহুতি দিয়েছে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের অসহায় ছাত্ররা, রাস্তার অসহায় নিরস্ত্র মানুষ আর রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড তৈরীরত শত শত সাধারন মানুষ ও অকুতোভয় শ্রমিকেরা।  
  
সব রাতের শেষ আছে। ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রিও এক সময় পোহাল। দূরাগত ঐ আজানের ধ্বনি ভেসে আসল। না-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে সেদিন আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয় নি -সাহস পাননি নামাজের আহ্বান জানাতে ধর্মপ্রাণ মুয়াজ্জিন। যেন মনে হল দূরাগত ঐ আজানের ধ্বনি মধ্যে সারা বাংলাদেশের কান্না ঝরে পড়েছে। এমন বিষদ আর ক্রন্দনময় আজান ধ্বনি জীবনে শুনি নি।   
  
রাত পোহাল, সকাল হলো, ২৬ শে মার্চের সকাল। সূর্যদেব কি সেদিন আমাদের সাথেও কেঁদেছিল, না রোষে গর্জন করে ছড়িয়েছিল দাবাগ্নি ! পর্দা সরিয়ে দেখলাম আমাদের এলাকায় বেশ কিছু সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উপস্থিতি। দেখলাম মাঠের বাইরে এককোণে জড় করা কয়েকটি মৃতদেহ, চোখের সামনে টেনে নিতে দেখলাম পাশের ভবনে একতলার অধিবাসী মুকতাদিরের মৃতদেহ। কর্কশ কন্ঠে নির্দেশ এল এলাকাবাসীদের প্রতি- অবিলম্বে কালো পতাকা আর বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলার। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম জনৈক সৈনিক আমাদের ভবন শীর্ষ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। ভবনটি কেঁপে উঠল। মনে পড়ল আমাদের ভবন শীর্ষে ও বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, ছেলেরা ২৩ শে মার্চ তারিখে উত্তোলন করেছিল আর নামায় নি। অতি সন্তপর্ণে মিলিটারীর চক্ষু এড়িয়ে ছাদে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে পতাকাকে ধীরে নামিয়ে আনলাম। মুহূর্তে চিত্ত বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছিল। ভেবেছিলাম এই পতাকা কি আর কোনদিন তুলতে পারব।

দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডঃ মুর্তজাকে দিয়ে ও আরও কয়েকজনকে দিয়ে আমাদের ভবনের দিকে এল। আতঙ্কে অপেক্ষা করছিলাম যে কোন সময় মৃত্যুদূতের আগমন। নীচের তলায় লোকজন ছিল না কিছুক্ষন দরজায় লাত্থি মারল, সৌভাগ্য ওরা চারতলা পর্যন্ত উঠে এল না। একটু পরে লাশগুলি নিয়ে আমাদের উদ্দেশে পুনর্বার সাবধানবাণী উচ্চারন করে ওরা স্থান ত্যাগ করল। আমরা বাঁচলাম।   
  
রেডিওতে ঘোষিত হল, অবাঙালী কন্ঠে, কর্কশ আর ভাংগা বাংলায়, সারাদেশে কঠোরভাবে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে, রাস্তায় বা ঘরের বাইরে দেখামাত্র গুলি করা হবে। পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেংগে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ম্লান মুখে সহধর্মিণী পাশে এসে দাঁড়াল। উদ্বেগ ব্যকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করল ' বঙ্গবন্ধুর ' খবর কি ? কি জবাব দেব ! আমিও ভাঁবছিলাম তার কথা। পেরেছেন কি নিজেকে বাঁচাতে ? নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছেন কি! ভাবছিলাম অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা, ছাত্র নেতাদের কথা। পরে সন্ধ্যায় শুনলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রেডিও ভাষণ- সমগ্র পরিস্থিতির জন্য বাংগালী, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে কুৎসিৎ ও অশালীন ভাষায় আক্রমন করল। সেদিন বঙ্গবন্ধু কে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট কর্কশ কন্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন " The man and his party are enemies of Pakistan...He had attacked the solidarity and integrity of Pakistan this crime will not go unpunished. " *(অনুবাদঃ এই লোকটি এবং তাঁর দলটি পাকিস্তানের শত্রু… সে পাকিস্তানের একাত্মতা ও অখণ্ডতার উপর আঘাত হেনেছে। এই অপরাধকে ক্ষমা করা হবে না)* সেই কণ্ঠ এতদিন পরে আজ ও আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।  
  
এত নিরাশার মধ্যেও আশার আলোর ঝলকানি বয়ে আনল ' আকাশবাণী ' - ভেসে এল রেডিও তরংগে মধুর আশ্বাসবাণী "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"।

আকাশবাণী জানাল পূর্বপাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার আশেপাশে, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তিফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা ও শোনাল একই বার্তা। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও আশ্বস্ত হলাম, না, বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।  
  
পরদিন ২৭ শে মার্চ। কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে ছুটে গেলাম জগন্নাথ হলে ছোট ভাই বাবুর খোঁজে। বাবু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-লীগের একজন সক্রিয় কর্মী। সারা হল এলাকা জনশূন্য -হল ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধযজ্ঞের সাক্ষ্য হিসাবে তখন ও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়োনেটবিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ,আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সামনে মাঠে সদ্যখোদিত গণকবর - অনেকেরই হাত পা বেরিয়ে রয়েছে। তখনকার মনোভাব আজ আর বোঝাতে পারব না। কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বাবুর দোতলার ঘর পর্যন্ত। সারা ঘর বিপর্যস্ত রক্তাক্ত। পেলাম না মৃতদেহ সন্ধান। বুঝলাম বাবু আরো অনেকের সাথে গণকবরের অভ্যন্তরে শায়িত।   
  
দেখা করলাম তখনও জীবিত গৃ্হশিক্ষকদের সাথে- রসায়ন অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ নাথ, জগন্নাথ হলের নরমেধযজ্ঞের একজন নীরব সাক্ষী, দেখা হল সংস্কৃতির অধ্যাপক রবীন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের সাথে। মুখে কারো কথা নেই, এরা সবাই দিশেহারা, স্তব্ধ, জীবন্মৃত। দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলে পথে নেমে পড়লাম। ঐ ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা- জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার এলাকা, ইকবাল হল, নীলক্ষেত এলাকা ঘুরে দেখলাম। খবর সংগ্রহ করলাম যথাসাধ্য। সব এলাকা অত্যাচারক্লিষ্ট। রমনা কালীবাড়ী, আনন্দময়ী আশ্রয়, শিববাড়ী কোন এলাকাই রেহায় পায়নি। রেহায় পায় নি রোকেয়া হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেনীর আবাস এলাকাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ভবন ও শক্তির দাপটের সাক্ষ্য বহন করেছে।

পথে পথে মিলিটারী- চোখ তাদের দানবীয় দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়েছে ঘৃণা। তার মধ্য দিয়ে ক্লান্ত-ম্লান বিষন্ন মুখে ফিরে এলাম বাসায়। এলাকা প্রায় জনশূন্য। সহকর্মীরা চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। উদ্বিগ্ন মাতা, উৎকন্ঠিতা স্ত্রী জানতে চাইলেন আমরা কোথায় যাব? বুঝতে পারছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় যাব? ঢাকার, বাংলাদেশের কোন স্থান আজ নিরাপদ? একবার ভাবলাম নদীর ওপার জিঞ্জিরার দিকে যাওয়ার, যেদিকে সবাই যাচ্ছে। কিন্তু মিলিটারী চক্রবূহ ভেদ করে হাঁটাপথে সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি অনেক, আর সে দিকের ও যেকি অবস্থা কে জানে। পরে শুনেছিলাম পলায়নপর নিরস্ত্র জনতার ওপর সদরঘাট এলাকায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে অসংখ্য নর নারী - এই পিশাচ বাহিনী।   
  
বেলা বারোটার দিকে এলেন সহকর্মী অধ্যাপক রফিকুল্লাহ আমাদের খোঁজে। জানালেন ওরা আশ্রয় নিয়েছে ওর বড় ভাই ওখানে- আমাদেরকেও সেখানে নিয়ে যেতে এসেছেন। আর আধ ঘন্টার মধ্যেই পুনরায় কারফিউ জারী হবে, অতএব আর দ্বিধা না করে এরকম এক বস্ত্রেই গৃহ ত্যাগ করলাম।  
  
সেই কাল রাত্রিতে ও পরদিন জগন্নাথ হল ও তার আশেপাশের এলাকায় যে নির্মম হত্যাকান্ড ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী জগন্নাথ হলের তৎকালীন ছাত্র কালীরঞ্জন শীল হলে থেকেও সেদিন অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।  
  
শ্রী শীল সেই রাত্রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও পরদিন সকালে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে ও অন্যান্য অনেককে দিয়ে জগন্নাথ হল ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে লাশ বহন করানো হয়েছিল। মিলিটারীর আনাগোনা কমলে তিনি সুইপারদের বস্তিতে একটি বাথরুমে লুকিয়েছিলেন। পরে জনৈক ব্যক্তি সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বুড়িগংগার তীরে পৌঁছে দেয়। জগন্নাথ হলে আক্রমনের আর একজন সাক্ষী ঐ হলের গৃ্হশিক্ষক শ্রী গোপাল কৃষ্ণনাথ।  
  
সেদিন পঁচিশে মার্চের রাত্রিতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের' মেঠোকর্মিরা ও অধিনায়কগণ অপারেশন সম্পর্কে অয়ারলেসের মাধ্যমে কথোপকথন করেছিলেন তা জনাব জামিল চৌধুরী (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীর পরিচালক) ও আর ও কয়েকজন রেকর্ড করেন।  
  
২৭ শে মার্চ থেকে শুরু হল আমার পলাতক জীবন, আত্নগোপনের পালা। ঢাকার নানা স্থানে কখনও সপরিবারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছি। পরে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে একাধিকবার মিলিটারী আমার সন্ধানে গিয়েছিল। বহুবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। তবু সাহস করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি সে সময়, দেখেছি ওদের অত্যাচারের নানা রূপ অসহায়ভাবে। ওদের নারকীয় কাণ্ডকারখানা আর অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেই দুঃসময়ে ঢাকার আত্নগোপনে যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আমাকে এবং আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, নানাভাবে সাহায্য করেছিল তাদের কথা কোনদিন ভুলব না। ভুলব না ডঃ আজাদের কথা, ডঃ ওবাইদুল হকের কথা, ডঃ মুর্তজার কথা, অধ্যাপক এ, বি এম হাবিবুল্লাহর কথা।  
  
অনেকবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। একদিনের কথা বলি- দিনটি ছিল ১১ ই এপ্রিল। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় এক পরিচিত বন্ধু পাট ব্যবসায়ীর ওখানে সপরিবার আশ্রয় নিয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। বিকাল সাড়ে তিন বা চারটার দিকে একটি মিলিটারী জীপ কয়েকজন সেপাই ও অফিসারসহ বাসায় এল। আমরা উৎকন্ঠিত ও শঙ্কাকুল চিত্তে অন্দরমহলে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে পরে ওরা চলে গেল। গৃহকর্তা জানালেন ওরা জানতে চাইল এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক আশ্রয় নিয়েছে কিনা।

গৃহকর্তা অনেক কষ্টে তাদের বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন অন্ততঃ সাময়িকভাবে। তিনি আরো জানালেন আমাদের সেখানে থাকাটা আর নিরাপদ নয়। ভাবলাম আবার যদি তারা ফিরে আসে তাহলে সবাই বিপদে পড়ব। এদিকে বিকাল ৫ টায় আবার কারফিউ বলবৎ হবে, নতুন আশ্রয়স্থল খোজার সময় নেই। বন্ধুকে জানালাম যে আজ রাতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসই হবে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, কেননা যদি ওরা আমার সন্ধানে এসেই থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা ওখান থেকে খোঁজ নিয়ে এসেছে। ৫টার একটু আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তখন শ্মশানের নিরবতা, জন প্রানী ও নেই, দু'একটা কুকুর কেবল ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন বাতি না জ্বালিয়ে সেই রাত আমরা কাটালাম ভয়ে ভয়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কোন বিপদ ঘটেনি। পরদিন আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

আর একদিনের কথা-আজিমপুর এলাকায়। একটা গলির ভেতর একটি মেসে আশ্রয় নিয়েছি একা। রাত এগারটার দিকে বেশ হৈ চৈ -চারিদিকে ছুটাছুটি, বন্দুকের গুলি। কিছুক্ষন পরে বোঝা গেল সমস্ত এলাকা মিলিটারী কর্ডন করেছে। ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে। মেসের অধিবাসী আমরা কজন আতংকিত হয়ে অপেক্ষা করছি। কখন দুশমনের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আমাদের মেসে ওদের পদার্পণ ঘটেনি। পরদিন সকালে জানা গেল আশেপাশের এলাকা থেকে কয়েকজন যুবক ও ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম এদের মধ্যে ক'জন জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে !   
  
২৭ শে মার্চ সন্ধায় বিবিসি রেডিও অস্ট্রেলিয়ার বরাত দিয়ে জানাল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তিনি চট্টগ্রাম রয়েছেন। অপরদিকে রেডিও পাকিস্তান ক'দিন ধরেই বলে চলেছে শেখ সাহেবকে ২৬শে মার্চ তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৮শে মার্চ বিকেল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা (শেখ সাহেবের পক্ষে) আমরা শুনলাম। এই দু'টি ঘোষণাই আমাদের বন্দী অসহায় জীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল বলাই বাহুল্য।  
  
প্রায় প্রতিদিন কোন কোন এলাকায় নরহত্যা সংঘটনের খবর পেতে থাকলাম। শুনলাম ২৯ শে মার্চ রাত্রে শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজার এলাকায় হিন্দু নরনারীদের শেয়াল কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিন সাহস করে একা একা তাঁতী বাজার এলাকায় হিন্দু নরনারীদের শেয়াল কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিন সাহস করে একা একা তাঁতী বাজার গেলাম। সেখানে আমার পূর্বপরিচিত জগন্নাথ কলেজের প্রধান ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণ সাহা থাকেন তাঁর সন্ধানে। দেখলাম সারা এলাকা নিস্তব্ধ ওর বাড়ী ফাঁকা। গলির মোড়ে এক পান বিড়ির দোকানে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওদের কথা। জানাল ওরা জিঞ্জিরায় চলে গেছে। নদীর ওপারে। সে আরো জানাল যে, তাঁতী বাজার আর শাঁখারী বাজার এলাকা এখন অবাঙালীদের দখলে, অধিকাংশ হিন্দু বাড়ী ওদের দখলে। আমাকে ওদিকে যেতে নিষেধ করল। শাঁখারী বাজার এখন ’টিক্কা খান রোড'।

২৮ শে মার্চ রাত্রে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে তোপ দেগে গুঁড়িয়ে দেয়া হল। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক আমাদের সংগ্রামের প্রতীক এখন মসজিদে রূপান্তরিত। রিক্সা করে একদিন ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখলাম কারা যেন সবুজ রঙে বাংলা ও উর্দু বড় বড় হরফে লিখে রেখেছে " মসজিদ-মসজিদ"। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক রাত্রে ডিনামাইট দিয়ে ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির উড়িয়ে দেয়া হল ধূলিস্যাৎ করা হল আনন্দময়ী আশ্রম। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম মোহাম্মদপুর এলাকার অনেক বাঙালী হত্যা করা হয়েছে। শোনা যেতে লাগল প্রতি রাতেই কোন না কোন অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে - এর সাথে চলছে লুটপাট, আর নারী নির্যাতন। শিশুরাও বাদ পড়ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের ছাত্রীরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সারা ঢাকা শহর ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে একটি বন্দিশালায়।

এর মধ্যে আর একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। অবাঙালীদের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিদিনই মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করতে শুরু করেছে পাক বাহিনী ও সরকারের সমর্থনে। এদের অনেকেই চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে নৃসংশভাবে তথাকথিত অবাঙালি হত্যাকান্ড সম্পর্কে অতিরঞ্জিত খবর পরিবেশন ও বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে শুরু করল। এর প্রতিক্রিয়া ঢাকাতে অনুসৃত হল আরও বাঙালী নিপীড়ন, হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। শোনা যাচ্ছিল নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী নদীতে, ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রতিদিনই অসংখ্য লাশ একত্রে বাঁধা অবস্থায় ভেসে যায়। ঢাকা অবরুদ্ধ বাংলাদেশ বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। স্থির করলাম বাংলাদেশের প্রকৃত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সম্পর্কে, গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে যে করেই হোক জানাতে হবে। নরহত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের একটি প্রতিবেদন তৈরী করলাম উপরোক্ত মেসের একজন রুমমেট কে দিয়ে। তার অফিস থেকে গোপনে কয়েক কপি টাইপ করলাম। যে করেই হোক প্রতিবেদন বাইরে পাঠাতে হবে। ডঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ করলাম তাঁর প্রতিষ্ঠানে তখনও ২/১ জন বিদেশী রয়েছে যারা ঢাকা ত্যাগ করেন নি, তবে শীঘ্রই করবেন। একদিন বিকেলে ওদের একজনের সাথে ডঃ আজাদসহ দেখা করলাম। সবকিছু জানালাম এবং এ ব্যাপারে তার সহয়তা কামনা করলাম। তিনি সানন্দে রাজী হলেন এবং আমার প্রতিবেদনের এক কপি রাখলেন। জানালেন তিনি নিজেও একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এবং কিছু ছবি তুলেছেন। এ সব ই তিনি আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন এবং যাওয়ার সময় আরো তথ্য প্রদান করলে নিয়ে যাবেন সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির সহায়তায়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের প্রথম কাজ শুরু হল। তিনি জানালেন যে তিনি চলে গেলেও একজনকে বলে যাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।  
  
এদিকে ২৬ শে মার্চ থেকে নরহত্যার পাশাপাশি বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র পাক বাহিনী বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ইপিআর, পুলিশ, ইবিআর, প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্র, জনতার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয়ভাবে মুক্তিফৌজ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার মারফত স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে, কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর সীমান্তে মেজর ওসমানের নেতৃত্বে; ময়মনসিংহে মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে; ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া, আখাউড়া এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে ; সিলেট অঞ্চলে মেজর দত্তের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এই নামগুলি সেদিন অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর প্রেরণার উৎস। তখনই স্থির করেছিলাম পাকিস্তানী অধিকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চাকুরী নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে কোন কাজ করাই হবে পবিত্রতম কর্তব্য। প্রথম দিকে স্থির করেছিলাম ঢাকাতেই আত্মগোপন করে অবস্থান করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করব সীমিত সাধ্য নিয়ে। কেননা এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ টিকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। গেরিলা যুদ্ধই হবে আমাদের ভরসা, আর এজন্য প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও থেকে যাওয়া। তবে সেই দুর্যোগকালেও কয়েকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম ঢাকায় থেকে প্রতিরোধের পক্ষে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। কারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঢাকায় অবস্থান করাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রতিরাতেই ঢাকার কোন কোন এলাকা পাকিস্তানী হামলার শিকার হচ্ছিল।  
  
বুঝতে পারলাম সপরিবারে ঢাকায় থাকা আর নিরাপদ নয়। শুভান্যধায়ীরা বিশেষ করে ডঃ আজাদ পরামর্শ দিলেন ঢাকা ছেড়ে মুক্তাঞ্চলে চলে যাওয়ার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অসুস্থ স্ত্রী আর বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে। ১১ই এপ্রিল আকাশবাণীর মারফৎ জানলাম মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছে -যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পরে আগরতলায় আমার এক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা সঞ্জয়ের সাথে দেখা হওয়ায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা নোয়াখালী শহরে কিভাবে স্বাধীনতার কথা জানতে পারে। সে আমায় জানিয়েছিল যে, ২৭ শে মার্চ সকাল থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন এ সম্পর্কে মাইক যোগে প্রচার করতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত একটি হ্যান্ডবিল জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তার মতে বঙ্গবন্ধুর এই বাণীটি টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারীরা পান এবং তারা নেতৃবৃন্দকে জানান। এ ঘটনা থেকে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর বাণীটি চট্টগ্রামে ধৃত হওয়ার পর টেলিগ্রাফ ও অয়ারলেসের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তারা আবার অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই বাণী এভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হয়। আরো অনেকের কাছেই এ ধরনের কথা শুনতে পাই।

২২ শে এপ্রিল। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ যোগাযোগ করলেন একটি দুঃস্থ অসহায় হিন্দু পরিবারের জন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে। ভদ্রলোক একজন সরকারী চাকুরে। তাঁকে কয়েকদিন হল মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেননি। সকন্যা মহিলা বিপদে পড়েছেন। কন্যাটির প্রতি মিলিটারীর নজর পড়ছে। মিলিটারীর লোকজন প্রতিদিন আনাগোনা করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। টাকা দাবি করছে বাবাকে ছেড়ে দিবে এই বাবদে। মিসেস আব্বাসের সাথে যোগাযোগ করে ওদের একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। আজিমপুরায় আমার এক পরিচিত হিন্দু সরকারি কর্মচারী পালাতে পারেননি, সরকারী নির্দেশে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন অবাঙালি তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তাঁরও কলেজে পড়ুয়া কন্যা রয়েছে। সেই সূত্রে কয়েকজন মিলিটারি অফিসার তাঁর বাসায় যাতায়াত করে বৈকালিক চা পানের উদ্দেশ্যে।খবর পাঠিয়েছেন মেয়েটির জন্য কিছুদিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের। সুলতানের সাথে যোগাযোগ করলাম। ও রাজী হল মেয়েটির একটি সুব্যবস্থা করার। আজিমপুরায় যে মেসে থাকতাম সেখানকার একজন একদিন সন্ধ্যায় জানালেন - তাকে তার অফিসে জনৈক অবাঙালি কর্মচারী ভয় দেখাচ্ছে যে তিনি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছেন -টাকা চাইছে। স্থির করেছেন মুক্তাঞ্চলে চলে যাবেন, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। পরদিন সকালেই চলে যাবেন। সকালে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।  
  
স্থির হয়েছিল এপ্রিলের শেষে ঢাকা ত্যাগ করব। পুরানো এক রাজনৈতিক কর্মীবন্ধু মেসেজ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে মুক্তাঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য। আমার জন্য ঢাকায় থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। বার্তাবাহক সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উদ্যোগ ব্যর্থ হল। মিলিটারী বূহ্য ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। অর্ধপথ থেকে ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। এবার অন্য সূত্র ধরলাম। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ভিতরে এক গ্রামে আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক মামা থাকেন। সেখানে যাওয়া স্থির করলাম। ডঃ ওবাদুল হকের অফিসে ঐ অঞ্চলের কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সে খবর নিয়ে জানাল আমাদের আত্নীয়রা গ্রামে আছেন ওদিকে মিলিটারীর দৌরাত্ম নেই। মুক্তাঞ্চল বলা চলে। সে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে রাজী হল। ওর নাম হল নুরুল ইসলাম। স্থির হল নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ বা নৌকায় আমরা ঐ গ্রামের দিকে যাব। ডঃ আজাদ পরামর্শ দিলেন হিন্দু পরিচয়ে কিছুতেই যাবেনা। যেতে হল মুসলমান পরিচয়ে। কিন্তু বিপত্তি হল মাকে নিয়ে। মা কিছুতেই প্রথম জিজ্ঞাসাতে মুসলমান নাম বলতে পারেন না , মুখ দিয়ে আসল নাম বেরিয়ে আসে। অতএব স্থির হল আমরা রাস্তায় জিজ্ঞাসাবাদের পাল্লায় পড়লে নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান পরিচয় দেব। নাম স্থির করার প্রয়োজন নেই। ক্রিশ্চিয়ানরা বাংলা নামেই পরিচয় দেয়। হলিক্রস কলেজের পরিচিত এক সিষ্টারের কাছ থেকে 'ক্রশ', কিছু বাংলা ও ইংরেজী বাইবেল ও অন্য পুস্তক যোগাড় হল। মা ও স্ত্রী 'ক্রশ' ঝুলালেন গলায়। স্থির হল যে ১৫ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করব। ডঃ আজাদ ওর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে পরিচয় পত্র যোগাড় করে দিলেন।   
  
ঢাকা ত্যাগের কয়েকদিন আগে চক্ষু চিকিৎসক ডঃ আলিম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি পূর্ব পরিচিত অসহায় আন্দোলনের সময়েই তার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁকে সব জানালাম। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে তাঁর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই উপরন্তু তিনি চিকিৎসক কাজেই ঢাকায় থাকাটা তাঁর জন্য অতটা বিপদজনক নয়। স্থির হল যে তিনি ঢাকায় আগত গেরিলাদের যোগাযোগকারী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করবেন। তাদের আশ্রয়, প্রয়োজনে চিকিৎসা ঔষধ পত্রাদি যোগানোর ব্যাপারে অন্যান্যদের সহায়তা করবেন। ডঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ রাখার কথাও তাঁকে বললাম। আর ও কয়েকজন এর সাথে এ ব্যাপারে দেখা করলাম। সরকার ঘোষনা করেছে ১ লা জুলাইর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য। যাওয়ার কয়েকদিন আগে বিভাগীয় প্রধান ইন্নাস আলীর সাথে দেখা করলাম তাঁর আজিমপুরস্থ অস্থায়ী বাসভবনে। তিনি পাকিস্তানের গুলিতে আহত হয়েছিলেন, তখন নিরাময়ের পথে। সাশ্রুনেত্রে বিদায় জানালেন, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

বিদায়ের মূহুর্ত এগিয়ে এল। ডঃ আজাদ ও ডঃ হক নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় জানাল - আশার বাণী উচ্চারণ করল আবার দেখা হবে - হয়তো মুক্তদেশে। ডঃ আজাদকে আর একটি প্রতিবেদন হস্তান্তরিত করলাম বাইরে পাঠাবার জন্য। দেশ মুক্ত হবার পর অনেকের সাথে দেখা হয়েছিল কিন্তু এই নীরব দেশকর্মীর সাথে আর দেখা হল না। চিরতরে হারিয়ে গেলেন। পথে কোন বিপদ হয়নি। কেবল পাগলার ওখানে আমাদের গাড়ী আটকিয়ে জনৈক মিলিটারী অফিসার আমার পরিচয় ও কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করেছিল। মাকে দেখিয়ে বলেছিলাম ওঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনিয়েছিলাম -গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা মুক্তি পেলাম। নদীর ধারে গেলাম অসংখ্য লাশ পড়ে রয়েছে। চারদিকে শকুনের উল্লাস। অনেকগুলি নারায়ণগঞ্জ অভিমুখী বাস আটকানো - যাত্রীদের পথের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। শেষ পর্যন্ত ওদের কি হয়েছিল জানি না।   
  
অবশেষে নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ ও নৌকাযোগে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছালাম নূরুল ইসলামের সহয়তায়। আসবার সময় শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরীতে ভেসে যেত দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ। নূরুল ইসলাম জানাল দিন কয়েক আগে নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকায় মিলিটারী অপারেশন হয়েছে - এ তারই ফলশ্রুতি।  
  
আমাদের আত্নীয়রা আমাদের গ্রহণ করল সাদরে। অনেকদিন পর মার মুখে দেখলাম আশ্বস্তির ঝিলিক। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল গভীরে গ্রামটি। যাতায়াতের সুবিধা নেই তাই আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের একটি ভাল আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। গ্রামবাসীদের অনেকে এবং আশেপাশের গ্রামসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে পলাতক এবং স্থানীয় ছাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করল- ঢাকার অবস্থা জানতে চাইল। ওরা জানাল যে আশেপাশের গ্রাম মিলে ওরা একটি ছোটখাটো মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রশিক্ষন ও অস্ত্রের বড্ড অভাব। পরামর্শক্রমে ঠিক হল আপাততঃ সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এখন কেবল সংগঠন গড়ে তোলা আর চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ করে দাউদকান্দিতে ঘাঁটি স্থাপন করা পাক বাহিনীর গতিবিধির ওপর। স্থির হল ১০/১২ জনের একটি দল ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষন ও অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। ওরা ফিরে এলে আর একটি দল যাবে এবং ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া চলবে যতদিন না স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।  
  
কয়েকদিন গ্রামে কাটালাম। একদিন রাতে দাউদকান্দি কুমিল্লা মহাসড়কের দুপাশে কয়েকটি গ্রামে মিলিটারী অপারেশন চালাল। এর ঢেউ আমাদের গ্রামেও এসে লাগল। গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ। আমার আত্নীয়রা ও স্থির করল ওরা ও ভারতে চলে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। তাই স্থির করলাম ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার। স্থির হল যে ২২ শে মে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর একটা ছোট দল আমাদের সাথে যাবে তবে ওরা যাবে ভিন্ন পথে, আমরা মিলিত হব সি এন্ড বি রোড পার হয়ে গোমতীর ওপাড়ে। গভীর রাতে একজন পথ প্রদর্শক সাথে নিয়ে আমরা আবার পথে নামলাম। দীর্ঘপথ কখনো হেঁটে, কখনো নৌকা যোগে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম চান্দিনার কাছে এক গরীব নাপিতের বাসায়। পরদিন রাত্রে আমরা অতিক্রম করলাম সবচেয়ে বিপজ্জনক পথ চান্দিনা-কুমিল্লা রোড এবং পরে সি এন্ড বি রোড। অতিক্রম করলাম গোমতী নদী, ওপারে মুক্তিবাহিনীর দলটির সাথে দেখা হল। আমরা সেখান থেকে বুড়িচং হয়ে নয়নপুরের কাছ দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করলাম। প্রণাম জানালাম দেশের মাটিকে। চোখে জল এল। ভাবছিলাম আবার কি ফিরে যেতে পারব জন্মভূমির কোলে। দুপুরে আমরা পৌঁছালাম সীমান্ত শহর সোনামুড়ায় ২৪ শে মে। ছোট শহরে ভরে গেছে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীতে। আপাততঃ আশ্রয় পেলাম স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোনের বাসায়। দেখা হল আওয়ামিলীগ এর প্রাদেশিক সংসদ সদস্য অধ্যাপক খুরশীদ আলমের সাথে। তিনি পূর্বপরিচিত। মুক্তিবাহিনীর ছোট দলটির আগমনের উদ্দেশ্য ওকে জানালাম,ওরা আশ্রয় পেল যুবশিবিরে।

কয়েকদিন অধ্যাপক আলমের সাথে কাজ করলাম রিক্রুটিং সেন্টারে। দলে দলে যুবকরা আসছে সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন এর জন্য। এদের রাজনৈতিক মতবাদ ভিন্ন, কিন্তু মাতৃভূমি উদ্ধারে দৃপ্ত শপথে সকলেই বলীয়ান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সদা সতর্ক যেন উদ্বাস্তদের সাথে পাকিস্তান চর বা গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ করতে না পারে। একদিনের ঘটনা - বিকেলে থানা থেকে জনৈক পুলিশ এসে আমাকে জরুরী প্রয়োজনে থানায় নিয়ে এল থানা অফিসার জানালেন যে তারা গোয়েন্দা সন্দেহে কয়েকজন কে আজ আটক করেছে- সবাই পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে। আমি সনাক্ত করতে পারি কি না। সন্দেহের কারন ওদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রাস্তা ঘাট ও নদীপথের মানচিত্র। আমার সাথে ও ধরনের কিছু ম্যাপ ও কাগজপত্র ছিল। ডঃ আজাদ অন্যান্যদের সহযোগীতায় জোগাড় করে ঢাকা ত্যাগের সময় আমাকে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর লোকজনদের কাজে লাগাতে পারে এই ভরসায়। ছাত্রদের সাথে থানা হাজতে কথা বলে সন্দেহমুক্ত হলাম, ওরা প্রকৃত ছাত্র। কয়েকজন আমাকে চিনতেও পারল। ওরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে। অফিসারকে বলায় ওরা মুক্তি পেল কিছুক্ষণ পরে।   
  
মুক্তিযুদ্ধে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চাই। তাই পরদিন আমরা এলাম আগরতলায়। সপরিবারে আশ্রয় নিলাম আগরতলায় কলেজের উদ্বাস্ত শিবিরে। কলেজের হোস্টেলের একটি কামরায় আমাদের স্থান করে দিলেন সুপার শ্রী ভট্টাচর্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানা ভাবে এবং উদ্বাস্তদের দেখাশুনার ব্যাপারে শ্রী-ভট্টাচার্য যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তা আমি আজ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। হাজার হাজার শরণার্থী - সাধারন মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক। দেখা হল ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন সহ বেশ ক'জন ছাত্রনেতাদের সাথে, দেখা হল জনাব জিল্লুর রহমান ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে। নেতাদের জানালাম আমি ভারতে এসেছি উদ্বাস্ত হিসাবে থাকার জন্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে।   
  
সেদিন বিকেলে ভারতীয় চলচ্চিত্র, ডকুমেনটেশন বিভাগ আমার একটি সাক্ষাৎকার চিত্রায়িত করল। ঢাকা ও বাংলাদেশের যে গণহত্যা চলেছে তার একটি বিশদ বিবরণ দিলাম। এই চিত্রায়ন পরে ভারতের নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরদিন ছিল নজরুল জয়ন্তী, সত্য বাবুর উদ্যোগে উদ্বাস্তু ও যুবশিবিরে ছাত্ররা অনুষ্ঠান করল। আমরা অনেকেই বক্তৃতা করলাম। দেখা হল চট্টগ্রাম এর বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর সাথে। তাঁকে সব জানালাম। তিনি পরামর্শ দিলেন কলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য। সেখানে মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ডঃ এ আর মল্লিকের সাথে দেখা করার জন্য। সেখানে আমাদের মত লোকের নাকি বিশেষ প্রয়োজন।   
  
স্থির করলাম কলকাতা চলে যাওয়ার। কয়েকদিন শরণার্থী শিবির ও যুবশিবির ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনদের কাছ থেকে বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। দেখা হয়েছিল দেবদাস চক্রবর্তী ও ডঃ এস আর বোসের সাথে। সমস্যা দেখা দিল অসুস্থ স্ত্রী আর মাকে নিয়ে। ওঁদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। স্থির হল আসামে শিবসাগরে কর্মরত বড় ভাইয়ের কাছে মা ও স্ত্রীকে রেখে আমি কলকাতায় যাব। চিঠি লিখলাম কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে ডঃ এ আর মল্লিকের কাছে আমার আসামের ঠিকানা জানিয়ে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আসামে পৌঁছলাম কয়েকদিন পরে। কিন্তু আসামে এসে বিপদে পড়লাম আসাম কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করেছেন উদ্বাস্তদের সব রকম চলাচল নিষিদ্ধ করে। বড় ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন আমার কলকাতা যাওয়ার অনুমোদন লাভের। দেরী হচ্ছিল। এরই মধ্যে ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ডঃ মল্লিকের পক্ষ থেকে তার কন্যা আমার ছাত্রী সেলিনার চিঠি পেলাম। ত্বরিত কলকাতা যাওয়ার কথা দু'জনেই লিখেছেন। অনেক নাকি কাজ। আসাম সরকারেরও অনুমতি পাওয়া গেল।   
  
কলকাতার পথে গৌহাটিতে একদিন অবস্থান করলাম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী শিক্ষকদের সাথে দেখা করলাম। ওদের আসামে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস কাজ করার আবেদন জানালেন। তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একটি সভারও আয়োজন করল- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম, আসামবাসীদের সহযোগীতা কামনা করলাম। আসাম থেকে এলাম উত্তরবংগে। শিলিগুড়ি, রামগঞ্জ প্রভৃতি সীমান্তে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ইত্যাদি ঘুরে দেখলাম যতদুর পারি বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ঘুরে খেলাম আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদিবের সন্ধান। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২৫ শে মার্চে তিনি ছিলেন দিনাজপুর আর আমরা ঢাকায়। কোথাও তার সন্ধান মিলল না। অবশেষে দিনাজপুর সীমান্তের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধাদের এক শিবিরে তার সন্ধান পেলাম। দিনাজপুর শহরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানাল যে বাবা গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা আরো জানাল যে সেই গ্রামটি বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ভাল আশ্রয়স্থল- বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দান ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

অবশেষে কলকাতা পৌঁছালাম জুন মাসের মাঝামাঝিতে। আশ্রয় পেলাম মাসীমার ভবানীরপুরস্থ বাসায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের সাথে দেখা করলাম তিনি আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। যোগাযোগ হলো ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ খান সারওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক আলী আহসান ও অন্যান্য অনেকের সাথে। মুক্তিযুদ্ধের কাজে সর্বাত্নকভাবে নেমে পড়লাম। ডঃ আনিসুজ্জামান সরকারের বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ায় মে মাসে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর বর্তালো।  
  
অবরুদ্ধ ঢাকায় অবস্থানকালে ও বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নারকীয় হত্যার আরেকটি প্রতিবেদন আমরা তৈরী করেছিলাম। তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখিত হল। এই প্রতিবেদনে আমরা পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে বহু ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকারের কাছে প্রেরণ করি।  
  
ঢাকার ঘটনাঃ

২৫শে মার্চ জগন্নাথ হল ও তৎপপার্শ্ববর্তী এলাকায় সংগঠিত হয় সবচাইতে বড় নরহত্যা। জগন্নাথ হলের যে সব নিহত ছাত্র ও কর্মচারীর নাম সংগ্রহ করা হয়েছিল-

সর্বশ্রী স্বপন চৌধুরী (ছাত্রনেতা),

গণপতি হালদার,

সুশীল দাশ (সহ-সাধারন সম্পাদক),

রমণীমোহন ভট্টাচার্য,

রণদা রায়,

সুভাষ চক্রবর্তী,

প্রবীর পাল,

কিশোর মোহন সরকার,

ভবতোষ ভৌমিক,

বরদা কান্ত তরফদার,

সত্যদাস,

কার্তিক শীল,

পল্টনদাস,

কেশব চন্দ্র হালদার,

নির্মল কুমার রায়,

সুজিত দত্ত,

রবীন্দ্র রায়,

বিধান ঘোষ,

মৃনাল বোস (ছাত্রনেতা),

শিব কুমার দাস,

শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী,

উপেন রায়,

সন্তোষ রায়,

জীবন সরকার,

নিরঞ্জন সাহা,

মনোরঞ্জন বিশ্বাস,

অজিত রায় চৌধুরী,

সত্যনাগ,

রুপেন্দ্র সেন,

মুরারী বিশ্বাস,

বিমল রায়,

প্রদীপ নারায়ণ রায় চৌধুরী,

নিরঞ্জন চন্দ্র,

সুব্রত সাহা,

প্রিয়নাথ ( ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

দুখী রাম (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

সুনিল দাস ( ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ),

শংকর মোদক ( ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ),

শিবু মোদক (৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী),

সুশীল চন্দ্র দাস (৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী),

খগেন্দ্র চন্দ্র দে (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

মতিলাল দে (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ),

বোধিরাম ((৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

দাওরাম (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

ভীরুরাম (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

মনভরণ রাম (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

জহরলাল (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

মণিলাল (৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী),

রাজভর(৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ),

লতিফুর রহমান (অতিথি ছাত্র),

বদরুদোজ্জা (অতিথি ছাত্র),

মহতাব উদ্দিন (অতিথি ছাত্র)

এবং আরও বহু ছাত্র যাদের নাম সংগ্রহ করা আর কোনদিনই হয়ত সম্ভব হবে না।  
  
এছাড়া ইকবাল হলেও বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং আশ্রয়প্রার্থী বস্তি এলাকার অসংখ্য নরনারী।  
  
এই গনহত্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও। যে সব কর্মচারী নিহত হন তারা হলেন :

মধুদে - সকলের মধু দা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের মালিক ও তার স্ত্রী, বড় ছেলে এবং পুত্রবধু,

ননী রাজভর, রোকেয়া হলের দারোয়ান ও স্ত্রী ও সকল সন্তানসন্ততি,

খগেন দে, দর্শন বিভাগের ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী,

শামসুল মোল্লা, ইকবাল হলের দারোয়ান,

রোকেয়া হলের দারোয়ান মইনুদ্দিনের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধু,

চুন্নু মিয়া, রোকেয়া হলের মালী,

আব্দুল খালেক, রোকেয়া হলের মালী ,

পিয়ার মোহাম্মদ, রেজিস্ট্রার অফিসের পিয়ন- ২৭ শে মার্চ ঢাকা থেকে পালাতে গিয়ে রাস্তায় নিহত হয়।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ভবনে পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদের ৪ জন হল ক্লাবের বেয়ারার, অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায় নি - সম্ভবত ওদের কারো অতিথিঃ

আব্দুল মজিদ,

সিরাজুল হক,

সোহরাব হোসেন,

আলী হোসেন।  
  
২৫ শে মার্চ থেকে ২৯ শে মার্চের মধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যা বা আহত করা হয়েছিলঃ  
  
প্রফেসর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, উপমহাদেশের দার্শনিক ও দর্শন বিভাগের প্রধান। ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রাতঃকালে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রথমে বন্দুকের গুলিতে পরে সঙ্গিনের খোঁচায় হত্যা করা হয়। তার মুসলিম পালক পুত্রকে ও হত্যা করা হয় একই সাথে।

মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান, তাকে তাঁর ভাই, এক ছেলে ও ভাইপোসহ ২৬ শে মার্চের সকালে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদ মুকতাদির, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোড আবাসিক এলাকায় তার বাসভবনে ২৬ শে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়।

শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের গৃ্হশিক্ষক জগন্নাথ হল। হলের মধ্যে তার বাস ভবনের বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন ২৫ শে মার্চ রাতে সেনাবাহিনীর লোকজন ওখানে তাঁকে হত্যা করে।

ডক্টর জোতির্ময় গুহঠাকুরতা, রীডার ইংরেজী বিভাগ, প্রোভস্ট জগন্নাথ হল; ২৬ শে মার্চ সকালে তাকে হত্যা করা হয়। পরে অধ্যাপক রাজ্জাক ও মিসেস গুহঠাকুরতা তাকে বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি জীবিত ছিলেন- ২৭ শে মার্চ সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ২৯ শে মার্চ হাসপাতালে মারা যান।

মুহাম্মদ সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক, ফুলার রোড এলাকায় তাঁর বাসভবনে তাকে হত্যা করা হয়। ২৭ শে মার্চ সকালে তাকে বাসভবনের পিছনের মাঠে কবরস্থ করা হয়।

ড. ফজলুর রহমান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, তাকে এবং তার ভাইপোকে নীলক্ষেত এলাকায় তার বাসভবনে হত্যা করা হয়।

একইভাবে এ ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়া অসংখ্য বস্তিবাসীকে ও হত্যা করা হয়।ঐ সব লাশ দীর্ঘদিন ধরে ছাদে পড়ে ছিল।

জনাব এ আর খান খাদিম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার, ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) সংলগ্ন কর্মচারীদের আবাসস্থলে তাকে ২৬ শে মার্চ হত্যা করা হয়।

জনাব শরাফত আলী, লেকচারার গনিত বিভাগ, একই স্থানে একই সময়ে তাকে ও হত্যা করা হয়।

এছাড়া একই স্থানে আরো তিনজনকে হত্যা করা হয় যাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

ড.মুহাম্মদ শহাদত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট সিনিয়র লেকচারার, ২৬ শে এপ্রিল ঢাকা থেকে তার বাড়ি নরসিংদী যাওয়ার পথে বর্বর পাক ফৌজের হাতে নিহত হন।  
  
ঐ কাল রাত্রিতে এবং তৎপরবর্তী নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেনঃ  
   
প্রফেসর এম ইন্নাস আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। অধ্যাপক ও তদীয় পুত্র ফিরোজ আলীকে পাক বাহিনীর একটি দল ২৫শে মার্চ রাত্রে নীলক্ষেতস্থ বাসভবনে প্রবেশ করে তাদের প্রতি লক্ষ করে গুলি করে। এর ফলে তারা উভয়েই আহত হন। পরে তাদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে আরোগ্য লাভ করেন।

অধ্যাপক এ কে রফিকুল্লাহ রীডার পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ৩১ শে মার্চ জিঞ্জিরা থেকে সপরিবারে নৌকাযোগে পলায়ন কালে পাক বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া অধ্যাপকের ভ্রাতা জনাব এন হামিদুল্লাহর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফেসর এম এন হুদা অর্থনীতির অধ্যাপক, ২৫ শে মার্চ রাতে জগন্নাথ হলের নিকট তার বাসভবনে ঢুকে তার প্রতি গুলি ছোড়া হয়- সৌভাগ্যবশত তিনি রক্ষা পান।

প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, ইতিহাসের অধ্যাপক ও সলিমুল্লাহ হলের প্রোভষ্ট, শহীদ মিনারের নিকট তার বাসভবনে ২৫ শে মার্চ গভীর রাতে আত্মগোপন করে রক্ষা পাননি।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, ২৫ শে মার্চ রাত্রে শহীদুজ্জামানের নিকটস্থ তার বাসভবনের একটি কক্ষে আত্নগোপন করে অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।

সে সময় ঢাকায় ঢাকায় আর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেনঃ

কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলা ২নং আসামী। ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে তাকে তার বাসবভন থেকে টেনে বের করে এনে উন্মুক্ত রাজপথে গুলি করে মারা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা উদ্দীপনায় কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের অবদান অমূল্য।

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ; ৩১ শে মার্চ গেন্ডারিয়ায় তার বাসভবনে এই অশীতিপর বৃদ্ধকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়।

ড. এস দে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ; এপ্রিল মাসের গেন্ডারিয়ার বাসভবনের কাছে তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ লোহার পুলের কাছে ফেলে রাখা হয়।

ড. শৈলেন ভদ্র, শল্যচিকিৎসক, শাখাঁরী বাজারের নিকটে তার বাসভবনে ৩১ শে মার্চ পাক বাহিনী তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, মির্জাপুর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে গভর্ণর ভবনে ডেকে আনা হয় সেখান থেকে বের হবার পর সেনাবাহিনীর লোকজন ওদের ধরে নিয়ে যায় - সম্ভবত ক্যান্টনমেনটে পিতা পুত্র উভয়কে হত্যা করে।

শহীদ সাবের, সাংবাদিক ও সাহিত্যক কিছুদিন যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলেন। ৩১ শে মার্চ সকালে সংবাদ অফিস ভবনে অগ্নিসংযোগ করে পাক বাহিনীর সদস্যরা তাকে পুড়িয়ে মারে।

জহিরুল আসলাম, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিক, সংগঠক, জিঞ্জিরায় ২রা এপ্রিল তারিখে পাক বাহিনী যে বর্বর নরহত্যাকান্ড চালায় তাতে তিনি অন্য অনেকের সাথে নিহত হন।

মেহেরুন্নেছা, কবি ও রেডিও মেকানিক, ২ মে মার্চ তাকে বর্বর পাক বাহিনীর সদস্যরা মা ও ছোট ভাই সহ নির্মম অত্যাচারের পরে হত্যা করে। আবু তালিব দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক, ২৯ শে মার্চ মিরপুর এলাকায় পাক বাহিনীর কতিপয় অবাঙালি অনুচরদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. আজহার আলী, রেডিওলজিস্ট, নভেম্বরের মাঝামাঝি খুব সম্ভব ১৬ই নভেম্বর তাকে পাক বাহিনীর অনুচরেরা বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। তার মৃতদেহ ফকিরাপুল এর কাছে পাওয়া যায়।

ডা. হুমায়ুন কবির, সদ্য পাশ করা ডাক্তার, ড.আজহার আলীর সাথে একই সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ দুটি খবর আমরা কলকাতায় পাই -ঢাকায় যোগাযোগ রক্ষাকারী গেরিলা ইউনিটের কাছ থেকে নভেম্বরের শেষে।

২৮ শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে ইত্তেফাক,পিপলস ও সংবাদ অফিস ভবন পাক বাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়। বেশ ক'জন লোক এই অফিসে নিহত হয়।

ঢাকা থেকে আগত লোক মারফত খবর পাওয়া গেল নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের বেশ ক'জন বাঙালী কর্মচারীকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে।   
  
অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গণহত্যার স্বাক্ষর  
  
নানা সূত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ সংগ্রহ করিঃ  
  
**চট্টগ্রাম ও আশেপাশের অঞ্চলঃ**

শ্রী পিসি বর্মন, লোকহিতৈষী চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসী, চট্টগ্রামে মার্চের শেষের দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তার বাসভবনে পাক বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর পুত্র ও সম্ভবত নিহত হন।

জনাব আলী ইমাম, চট্টগ্রাম স্টেট ব্যাংক শাখার কর্মচারী ; মার্চ- এপ্রিলে পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন।

কাজী হাসান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র ; প্রতিরোধ যুদ্ধকালে লালখাঁ বাজারে স্বীয় বাসভবনে পাক হানাদারদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রী নতুন চন্দ্র সিংহ, কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, একই সময়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানে এই সত্তুর বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়।

কাওসার আহমেদ, চট্টগ্রাম পিআইএ অফিসের তরুণ কর্মচারী। বর্বর পাক বাহিনীর সদস্যরা বিমানবন্দর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সঠিক সময় জানা যায়নি।

শ্রী বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, প্রবর্তক সংঘের নিবেদিত প্রাণ বৃদ্ধ পুরুষ ; এপ্রিল -মে মাসে এই সংসারত্যাগী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

শ্রী শান্তিময় খাস্তগীর, কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ; কলেজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় পাক বাহিনীর নির্মম জল্লাদের গুলিতে শহীদ হন। ঘটনাটি ঘটে ৩১ শে জুলাই শ্রী অবণীমোহন দত্ত, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। অবরুদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। পালান নি বা পালিয়ে যেতে পারেন নি। বাসা থেকে তাকে ও তার ভাইপোকে জল্লাদেরা ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরতে পারেননি। চিরতরের জন্য হারিয়ে গেছেন।

শামসুদ্দিন আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা, সম্ভবত জুলাই আগস্ট মাসে বর্বর পাক সৈন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব শামসুল হক, চট্টগ্রামের এসপিপি; স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে চট্টগ্রামে তাকে পাক সৈন্যরা হত্যা করে।

শ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ চট্টগ্রাম সিগনেট লাইব্রেরীর মালিক। এপ্রিল-মে মাসের দিকে তিনি পাক বাহিনীর ঘাতকদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব আব্দুল খালেক, চট্টগ্রাম কোতোয়ালীর তরুণ ওসি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ইপিআর বাহিনী পশ্চাদপদসারণ করলে তিনি চাচার বাসায় আশ্রয় নেন গ্রামে। সেখান থেকে ১৬ই এপ্রিল ধরে নিয়ে এসে অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে ২২শে এপ্রিল হত্যা করা হয়।

শ্রী সুধাংশু ভট্টাচার্য; তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী, এপ্রিলের দিকে তাকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়, আর কোন দিন ফিরে আসেন নি।

শামসুল আবেদীন, চট্টগ্রাম হাবিব ব্যাংক শাখার একজন অফিসার ; তাঁকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাক বাহিনীর সৈন্যরা এপ্রিল-মে মাসের দিকে। ফিরতে পারেন নি।

ডা. শফি, দন্তচিকিৎসক, মার্চ-এপ্রিলে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা তার জীবন নির্বাপিত করে দেয় বন্দুকের গুলিতে।   
  
অবরুদ্ধকালে কুমিল্লা শহরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন তাদের মধ্যে সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তারা হলেনঃ  
  
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ; মার্চ মাসে তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

শ্রী অতীন্দ্র ভদ্র, শহরের বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী ; একই সময়ে তাকেও ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করা হয়।

শ্রী অসীম রায়' কুমিল্লা ভিক্টরীয়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ল্যাব শিক্ষক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ অতীন রায়ের পুত্র, একই সময়ে পাক বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শোনা গিয়েছে কুমিল্লার তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডিসি নিহত হন সে সময়ে।   
  
অন্যান্য অঞ্চলে নিহত বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গঃ

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিত বিভাগের প্রধান, ১৬ই এপ্রিল তাঁকে সেনাবাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেন নি।

শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসভবন থেকে তাঁকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

জনাব মামুন, ডিআইজি, রাজশাহী, ২৬ শে মার্চ তাঁকে থরে নিয়ে যাওয়া হয় পরে পাক জল্লাদ বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জনাব নজমুল হক সরকার, রাজশাহী বারের এডভোকেট, জেলা আওয়ামি লীগ এর সভাপতি, ২৫শে মার্চের পরে কোন এক সময় পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিহত হন।

লেঃকঃ মঞ্জুরুর রহমান, অধ্যক্ষ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ১৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁর কলেজের বাংলোর মাঠের সামনে তাকে বর্বর পাক বাহিনী হত্যা করে।

জনাব হালিম খান, অধ্যাপক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ; একই তারিখে একই স্থানে এই অধ্যাপককেও হত্যা করা হয়। একই সাথে কলেজের কয়েকজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে হত্যা করা হয়।

জনাব মাশুকুর রহমান, গনিতজ্ঞ, চট্টগ্রামে একটি বীমা কোম্পানির পদস্থ অফিসার ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে যশোরের বাড়িতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে শহীদ হন।

জনাব আব্দুল জব্বার, বগুড়া শহরের এডভোকেট; ১৭ই মে তাঁকে পাক হানাদার বাহিনী তাঁর গ্রামের বাড়িতে হত্যা করে।

ডা. জিকরুল হক, সৈয়দপুর শহরবাসী, সংস্কৃতিবান, আওয়ামী লীগ সদস্য, এপ্রিল মাসে তাঁকে আরো কয়েকজন সহকর্মীর সাথে পাকহানাদার বাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসে বন্দী করে রাখে, ১২ ই এপ্রিল এদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

লেঃ মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজীম, উত্তরবঙ্গস্থ গোলাপুর সুগার মিলের প্রশাসক, ৫ ই মে ঐ মিলে দ্বিশতাধিক শ্রমিক ও কয়েকজন অফিসারসহ তাকেও পাক বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করে।

ডা. শামসুদ্দিন, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষঃ ৯ই এপ্রিল আরও কয়েকজন হাসপাতাল কর্মীর সাথে তাঁকে পাক-বাহিনীর ঘাতকেরা হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শ্যামলকান্তি লালা।

ডাঃ ‘লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, জুলাই মাসের শেষের দিকে পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে তাঁর বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেন নি।

ডাঃ লেঃ কঃ নুরুল আবসার মোঃ জাহাঙ্গীর; ৩০ শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পাক সৈন্যরা, আর দিরে আসেন নি। খুব সম্ভব তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, রংপুর শহরবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য, ৩০শে মে আরও কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনি পাক বাহিনীর হাতে নৃসংশভাবে নিহত হন। এছাড়া এপ্রিল মাসে শহরের ১১জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্রে বেধে হত্যা করে নরপিশাচেরা।

জনাব মশিউর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট আওয়ামিলীগ নেতা; ৪ঠা এপ্রিল তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। বেশ কিছুদিন তাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে অমানুষিক অত্যাচারের পর সম্ভবত ২৮/২৯ এপ্রিল নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

যশোর শহরের পলিটেকনিক স্কুলের প্রিন্সিপালকে ৬/৭ ই এপ্রিল হত্যা করে। একই সাথে তাঁর বন্ধু ডঃ ওবায়দুল হককেও গুলি করে মারে পাক জল্লাদরা ।

জেলা জজ সাহেবের নাজির ; তাঁকে একই সময়ে পথিমধ্যে পাক বাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করে।

জনাব আহসানুল্লাহ, খেজুরা গ্রাম, সম্ভ্রান্ত কৃষক, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঐ গ্রামে প্রবেশ করে পাক সৈন্যরা সস্ত্রীক আহসানুল্লাহকে হত্যা করে এবং তাঁর বাড়ী লুট করে।

যশোরের কসবা এলাকায় পোষ্টাল সুপারিনটেন্ডন্টের পুত্রসহ সাতজনকে একই সাথে গুলি করে মারে পাক সৈন্যরা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে।

জনাব এ করিম, সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, যশোর ; এপ্রিল মাসে তাঁকে কোর্টের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই সময়ে জনৈক বৃদ্ধ উকিলকেও নিহত করে পাক সেনারা।

বসন্ত কুমার দাস, সাবজজ, যশোর; ১ লা মে তারিখে আরও ১১ জন ব্যাক্তির সাথে পাক বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

এছাড়া যশোর শহরের আরও ১৭ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করে এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে।

জনাব আহসান আলী, জামালপুরবাসী, ন্যাপ নেতা ও সাংবাদিক, ২৮ শে জুলাই মাসে পাক বাহিনীর কুখ্যাত অনুচর আলবদরের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, বাগেরহাট পিসি কলেজের অর্থনীতি অধ্যাপক, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৮ শে অক্টোবর নিহত হন পাক বাহিনীর অনুচরদের গুলিতে।

অধ্যাপক ফজলুল হক, গণিতের অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২৫শে এপ্রিল তাঁর নওগাঁর বাসভবনে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জল্লাদেরা একই সাথে তাঁর মা, বোন ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জনাব আব্দুল কাইয়ুম মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ; নভেম্বর মাসে তাঁকে পাক হানাদার বাহিনীর নরপশুরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, দর্শনের অধ্যাপক, কুষ্টিয়া কলেজ ; ২৮শে জুন তারিখে তাঁকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আর কোনদিন ফিরে আসেন নি।

জনাব মহসীন আলী দেওয়ান, বগুড়া-শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ৩রা জুন বগুরার বাসভবন থেকে বর্বর পাক সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর ফেরেননি।

শ্রী সুমঙ্গল কুন্ডু, দিনাজপুর বারের এডভোকেট, ৯/১০ ই এপ্রিল দিনাজপুর শহরে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে তাঁকে পাকবাহিনীর অনুচরেরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

এছাড়া দিনাজপুর শহরের আশেপাশে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং অসংখ্য নারীপুরুষকে মেশিনগানের গুলিতে সারিবদ্ধভাবে হত্যা করা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ঐ সময় পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর গুলির শিকার হয়েছেন, বহু নারী নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন। এই সব হিসাব হয়ত আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।  
  
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কর্ম তৎপরতাঃ

"বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি" একাত্তরের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং- এ সর্বস্তরের দেশত্যাগী শিক্ষকদের সমাবেশ গঠিত হয়। সে সভায় একটি কার্যকরী সংসদ ও নির্বাচিত হয়।

সভাপতিঃ ডঃ এ আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কার্যকরী সভাপতিঃ জনাব কামারুজ্জামান, ঢাকা জুবিলি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংসদ সদস্য।

সহ- সভাপতিঃ ড. ফারুক খলিল, অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমেদ।

সম্পাদকঃ ড. আনিসুজ্জামান, রীডার বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পরে জুলাই মাস থেকে ড. অজয় রায়, রীডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

সহসম্পাদকঃ জনাব গোলাম মুর্শিদ, শ্রী রাম বিহারী ঘোষ ও জনাব এস এম আনোয়ারুজ্জামান।

কোষাধ্যক্ষঃ ড. খান সারওয়ার মোর্শেদ, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য ১২ জন।   
  
এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিলঃ

(১) মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হিসেবে সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা।  
(২) ভারতবর্ষ সহ দেশ -বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।  
(৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যমুলক রচনা, পুস্তকাদি প্রকাশ করা ও অন্য সংগঠনকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।  
(৪) শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা ও সম্ভাব্য আর্থিক অনুদান।  
(৫) প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা দান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরন করা।  
(৬) প্রচারনা ও মনস্তাত্বিক যুদ্ধে সহায়তা করা।

ইতিপূর্বে এপ্রিল মাসে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্যোগে গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেনঃ

সভাপতিঃ অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ, উপচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।  
কার্যকরী সভাপতিঃ অধ্যাপক পিকে বোস, উপ-উপরিচার্য (একাডেমিক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।   
কোষাধ্যক্ষঃ শী এইচ এম মজুমদার, উপ-উপরিচার্য (অর্থ সংক্রান্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।  
সম্পাদকঃ অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কলকাতা।

এখানে উল্লেখ্য যে এই দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যায়।

প্রায় একই সাথে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবিদের সংগঠন বাংলাদেশ ‘লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া’ গড়ে তোলা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদ, সম্পাদক ও সহসম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ও ড. বেলায়েত হোসেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সংগঠনের প্রযোজনা জহির রায়হান 'Stop Genocide' ছবিটি নির্মাণ করেন।

তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় "বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির”-এর সভাপতি ডঃ অজয় রায়, সম্পাদক আহমদ ছফা।

এছাড়া চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেণ বিশ্বাস প্রমুখ অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠন মূলত কাজ করেছে- যেসব স্থানে শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সাথে স্থানীয় জনগণের শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার লক্ষে, তারা নানা স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রচার করত।

এছাড়া গঠিত হয় ‘সাংবাদিক সমিতি 'চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি ' বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর’ প্রভৃতি।  
  
শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়ার সাথেই সমিতির প্রতিনিধিরা শরণার্থী শিবিরসমূহে ঘুরে এবং ঘোষণার মাধ্যমে শরণার্থী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। যারা সমিতির সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং তালিকাভূক্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যেঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১৫০, কলেজ শিক্ষক ১০৫০; স্কুল শিক্ষক ৫০০০। সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দুটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনা করে সমিতির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী কে একটি চিঠি প্রেরন করেন।  
  
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদল অন্তর্ভূক্ত ছিলেনঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ড. এ আর মল্লিক ও ড. আনিসুজ্জামান আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে ড. অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে যে প্রতিনিধি দলটি সাক্ষাৎ করেন, এতে ছিলেনঃ ড. এ, আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান ও জনাব কামরুজ্জামান।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করে সমিতি একটি ছাপানো আবেদনপত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের ও শিক্ষক সংগঠনের কাছে প্রেরণ করে। আবেদনটি ছিল নিম্নরূপঃ  
   
 BANGLADESH SIKSHAK SAMITI   
 (Bangladesh Teachers Association )  
 Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India  
  
  
  
 July 1, 1971.

Dear Friend,   
Perhaps you are aware that in face of unparalleled atrocities committed by the Pakistan Army on behalf of East Pakistan, now Bangladesh, a large number of teachers of all levels have crossed into India. Since the communities of teachers had played a significant role for over two decades in the movement for democracy, secularism and a just social order in the country, its members became naturally enough a special target of the Pakistan Army. Many teachers have been killed, others who are trapped in the occupied Zone are being harassed and persecuted a few have been forced at gun point to issue statements in support of the action of Pakistan Army. As a result, members of this harassed community are trekking Into India everyday. The teachers from Bangladesh, now in temporary exile in India, have formed an association of their own , on whose behalf we are writing you today .  
  
 About 100 University teachers, 1000 College teachers, and 3000 school teachers have registered their names with us , Several thousand others in different bordering state of India are yet to make contact with the association. Most of these teachers have come with their families and all are without any means to support themselves.   
  
 Having regard to the contribution that this community has made in the past and their expectant role in the reconstruction of society as and when the country achieves freedom, it is felt that we make all efforts to save it from impending doom. We have drawn up a number of schemes for providing the teachers with temporary academic occupation research publication and teaching the evacuee children in the refugee camps. The execution of this programme will require financial assistance from non- Government sources, in addition to what the Government of India the Government of Bangladesh may be in a position to make.  
  
 In the circumstances we appeal to you the members of the academic community the world over to contribution generously to the fund of our association. Contributions may be sent to the Bangladesh Shishak Samiti, Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta 12 India.   
  
 Sincerely yours   
 Dr. A R. Mallik   
 Vice - chancellor,   
 University of Chittagong   
 &  
 Bangladesh shikshak Samiti.

(অনুবাদ)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

(বাংলাদেশ টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন)

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, কোলকাতা ইউনিভার্সিটি, কোলকাতা- ১২, ইন্ডিয়া

জুলাই ১, ১৯৭১

প্রিয় বন্ধু,

পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে পাকিস্তানী আর্মির পূর্ব পাকিস্তানের উপর (এখন বাংলাদেশ) অকল্পনীয় নৃশংসতার ব্যাপারে আশা করি তুমি অবগত আছো। সকল পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক সীমান্ত অতিক্রম করে ইন্ডিয়া চলে এসেছে। যেহেতু শিক্ষক সম্প্রদায় দীর্ঘ দুই দশক ধরে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে, স্বাভাবিক কারণেই এর সদস্যরা পাক আর্মির বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। অনেক শিক্ষককে মেরে ফেলা হয়েছে। যারা দখলদার এলাকার মাঝে আটকা পড়েছে তাঁদের হয়রানি এবং নির্যাতন করা হচ্ছে। অনেককে বন্দুকের মুখে পাক আর্মির কার্যকলাপের পক্ষে বিবৃতি লিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। ফলে এই নির্যাতিত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিদিন ইন্ডিয়া পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ থেকে আগত অস্থায়ীভাবে নির্বাসিত শিক্ষকেরা নিজেদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে, আজ যার পক্ষে আজ আমরা তোমাকে লিখছি।

প্রায় ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়য় শিক্ষক, ১০০০ কলেজ শিক্ষক এবং ৩০০০ স্কুল শিক্ষক আমাদের কাছে তাঁদের নাম নিবন্ধন করেছেন। হাজারো অন্যান্য শিক্ষক ইন্ডিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে ছড়িয়ে আছেন এবং আমাদের সমিতির সাথে যোগাযোগের অপেক্ষায় আছেন। এই শিক্ষকদের প্রায় সকলেই পরিবার সমেত এসেছেন এবং নিজেদের ভরণপোষণের কোন সামর্থ্য ছাড়াই এসেছেন।

এই সম্প্রদায়ের অতীত অবদানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং আগামীর স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাঁদের প্রত্যাশী ভূমিকার কথা বিবেচনা করে মনে হচ্ছে যে তাঁদের নিয়তির গ্রাস থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার। আমরা বেশ কিছু অস্থায়ী একাডেমিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এর মাঝে রয়েছে গবেষণা প্রকাশনার জন্য বৃত্তি প্রদান এবং উদ্বাস্তু শিশুদের ক্যাম্পে শিক্ষাদান। এই কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নে বেসরকারি সূত্রে অর্থ সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান সরকারও সহায়তা করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা তোমার এবং বিশ্ব একাডেমিক সম্প্রদায়ের কাছে উদারভাবে আমাদের তহবিলে সহায়তার আবেদন জানাচ্ছি। সহায়তা পাঠানোর ঠিকানাঃ বাংলাদেশ শিক্ষা সমিতি, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা ১২, ইন্ডিয়া।

ইতি

ডঃ এ আর মল্লিক

ভাইস চ্যান্সেলর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়য়

এবং

বাংলাদেশ শিক্ষা সমিতি

সমিতি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা স্থানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সহায়তা কামনায় বিভিন্ন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

জুন মাসে প্রেরিত উত্তর ভারত প্রতিনিধি দল। ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান ও জনাব সুবিদ আলী এমপি। এই দলটি এলাহাবাদ, আলীগড়, দিল্লি-আগ্রা ও লক্ষনৌ প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে।

জুলাই মাসে প্রেরিত মধ্যপ্রদেশ প্রতিনিধিদলঃ মাজহারুল হক, ড.অজয় রায়, অধ্যাপক সামসুল আলম সায়িদ। এঁরা জব্বলপুর, ভূপাল, উজ্জয়িনী, রেয়া, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদলঃ ডঃ এ আর মল্লিক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বম্বে সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

এছাড়া ঐ মাসে অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম কেরালা ভ্রমণ করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ সম্পর্কিত নানা সভা ও সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এতে সমিতির ড. এ আর মল্লিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য সমিতি কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেঃ  
  
(১) শরণার্থী শিবিরসমুহে ক্যাম্প স্কুল স্থাপনঃ

আগরতলাসহ মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবির সমূহে সমিতি বেশ কিছু ক্যাম্প স্কুল স্থাপন করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল ও শিক্ষকের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান। এছাড়া প্রতি এলাকায় একজন করে উপপরিচালকও ছিলেন। সার্বিক দায়িত্ব ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল, যার সদস্য ছিলেন ডঃ অজয় রায়, জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং শ্রীমতি সুচন্দ্রিমা রায়।  
  
(২) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ ও যুদ্ধ শেষে উদ্বাস্তদের ত্বরিত পুনর্বাসনে সহয়তা দানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন।   
  
 (৩) উদ্বাস্ত ও যুব শিবিরসমুহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা (Socio-Cultural Dynamics): এর পরিচালক ছিলেন ডঃ এ আর মল্লিক এবং উপপরিচালক ছিলেন শ্রী অনুপম সেন।  
  
(৪) বাংলাদেশ স্কুল ও কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সমস্যাঃ পরিচালক ছিলেন ড. অজয় রায়।  
   
(৫) উদ্বাস্ত শিবিরসমূহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহঃ পরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম।  
  
বাংলাদেশ সরকারের প্লানিং সেলের সহযোগিতায় এইসব প্রকল্প তৈরী করা হয়। এই সব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সমিতি বিপুলসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। আমাদের এই সব কর্মসূচিতে আর্থিক ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলঃ ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC) যার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন শ্রী তরুণ মিত্র, শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় শাখা।  
  
এতদ্বতীত সমিতি ভারতবর্ষে ও বিদেশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে সহায়তা করে। সমিতি মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দানের জন্য বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষকের নাম সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এদের অনেককেই মুক্তাঞ্চলে গিয়ে প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ করেছিল।   
  
দেশ- বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমিতি কতিপয় প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কতৃর্ক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে। এই সব প্রকাশনায় বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। কতিপয় প্রকাশনার নাম এখানে উল্লেখিত হল।

(১) Bangladesh: A Reality *(বাংলাদেশঃ একটি বাস্তবতা)*

(২) Report on Bangladesh *(বাংলাদেশের উপর প্রতিবেদনসমূহ)*

(৩) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

-এই তিনটি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কতৃর্ক প্রকাশিত।

(৪) Bangladesh-The Truth *(বাংলাদেশঃ একটি সত্য)*

(৫) Conflict in East Pakistan *(পূর্ব-পাকিস্তানে সংঘাত)*

(৬) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ

(৭) আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচি - শেখ মুজিবুর রহমান

(৮) Bangladesh- Throes of A New Life *(বাংলাদেশ- নবজন্মের প্রসব বেদনা)*

(৯) Pakistanism and Bengali Culture *(পাকিস্তানবাদ এবং বাঙালি সংস্কৃতি)*

(১০) Bangladesh - Through the lens *(বাংলাদেশ- লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখা)*

(১১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(১২) Bleeding Bangladesh *(রক্তাক্ত বাংলাদেশ)*

(১৩) Bangladesh: The Background *(বাংলাদেশঃ পটভূমি)*

-পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত;

(১৪) রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ) কতৃর্ক প্রকাশিত;

(১৫) জাগ্রত বাংলাদেশ-আহমদ ছফা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত;

(১৬) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম - গাজীউল হক, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিকেশন কোং কলকাতা, পাকাশিত।

এছাড়াও বিভিন্ন সমিতি বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিস্থিতি ও গণহত্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রেরণ করে। আমাদের এই কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।  
  
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা উদ্যোগে আমরা কতিপয় প্রতিনিধিদল বিদেশেও প্রেরণ করি বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই দুই সমিতির পক্ষে থেকে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী (১৯২২ সালে কাবুলে 'মকতবই হাবিবিয়ার শিক্ষক ছিলেন) আফগানিস্তান গমন করেন ' ৭১-এর অক্টোবর মাসে। তিনি সেখানের বাদশাহ খান ও তদীয় পুত্র ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথে, আফগান পার্লামেন্টের সদস্যদের সাথে, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় মিলিত হন এবং বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভে চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরেন। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী বংশীভাই মেহতা ও শ্রীমতি সুশীলা মেহতা ইউরোপ এবং অন্য একজন প্রতিনিধি শ্রী পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় ইউরোপ-অ্যামেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার কাজে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষাসমূহের বিভাগের প্রধান ফাদার পি ফাঁলো (P. Fallon) আমাদের দুই সমিতির পক্ষ থেকে জুন মাসে ভ্যাটিকান শহরের মহামান্য পোপের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পোপকে জ্ঞাত করান এবং আমাদের সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন। পরে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন।   
  
সমিতি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, পুস্তক, দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি গঠন করেন। এর পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় আমরা ‘বাংলাদেশ তথ্য ব্যাংক’ গঠন করি। এই ব্যাংক দেশী-বিদেশী দৈনিক পত্রিকা, জার্নাল প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব জামিল চৌধুরী। পরে ড. এ আর মজুমদারকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই প্রকল্পে আমরা প্রবীণ ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাদাস তরফদার এবং শ্রী রামরায়ের অকুণ্ঠ সহযোগীতা পাই। যুদ্ধ শেষে ব্যাংক সংগৃহীত তথ্যাবলী ঢাকা জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্কাইভস সংগৃহীত কাগজপত্রাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।  
  
অন্যান্য সহযোগী সহায়ক সংগঠনের সহায়তায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে তিন প্রকার সহায়তা দানের চেষ্টা করি।  
  
(১) সীমিত সাধ্যে কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান।   
(২) মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ যেমন কম্বল, শীতবস্ত্র, পোশাক, জুতা ইত্যাদি ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ যুবশিবিরসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা।   
(৩) যুদ্ধাহত মুক্তিযুদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর - এর সাথে একসঙ্গে কাজ করেছি। এ প্রসঙ্গে ঐ সংগঠনের পরিচালক জনাব আমিরুল ইসলাম ও উপপরিচালক জনাব মামুনুর রশীদ কর্মতৎপরতার কথা স্মরণযোগ্য।  
  
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে গঠিত মেডিকেল ইউনিট এ ব্যাপারে আমাদের সার্বিক সহায়তা করে। শ্রীমতি মৃন্ময়ী বোসের নেতৃত্বাধীন পরিচালক এই ইউনিট ভারতীয় রেডক্রসের সহযোগীতায় এবং শ্রীমতি পদ্মজা নাইডুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই প্রচেষ্টার নিরলসভাবে কাজ করেন বেশ কিছু সদস্য এদের মধ্যে নিহত গোপাল সাহা, কুমার বিশ্বাস, ইমরুল কায়সার প্রভৃতির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়েছে।

সমিতি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাতে ও সহযোগীতা করছে। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি যে অর্থ সংগ্রহ করে তা অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠনের একজন প্রতিনিধি কলকাতায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমরা মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধির সাথে তার সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই এবং স্থির হয় যে, বাংলাদেশ সরকার আমেরিকায় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে সঠিক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভারতীয় জাতীয় কমিটির কার্যকরী সম্পাদক শ্রী ভি এন থিয়াগ রাজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি এ ব্যাপারে সর্বাত্মক ও কার্যকরী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।  
  
উপরিল্লিখিত কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিচালিত বাংলাদেশ এইড কমিটি আমাদের সর্বাত্নক সহযোগীতা প্রদান করে।   
  
শিবির কর্মাধ্যক্ষদের অনুরোধে শিক্ষা সমিতি মুক্তিযুদ্ধে উদ্ধুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজ শিক্ষককে আমরা প্রেরণ করি। নিযুক্ত শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মাঝে মাঝেই সমিতির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজও করেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আব্দুল হাকিমের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য। আমি নিজেও সমিতির সম্পাদক হিসেবে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা শিবির পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করছি। একদিনের ঘটনা আমার বেশ মনে পড়ে। শিবিরটি মুর্শিদাবাদে লালগোলা সীমান্তে। আমরা ক'জন কিছু ঔষধ ও অন্যান্য বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল ২২ শে নভেম্বর। শিবিরে শোকের ছায়া। রাজশাহীর নবাবগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। আমরা হারিয়েছি ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আর আমাদের বাহিনী ২৫ টি বাংকার ধ্বংস করেছে ও অসংখ্য পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে,আর ১২ জন রাজাকারকে ধরা হয়েছে। বন্দী রাজাকারদের দেখলাম। এর দিন কয়েক আগে নায়েক কাসেম শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সহ দু'জন রাজাকার কে গ্রেফতার করে। ক্যাপ্টেন গিয়াস এই সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। নায়েক কাসেম ঐ দিনের বাঙ্কারে পাক বাহিনীর একজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে ধরতে গিয়ে নিহত হন। এছাড়া ঐ দিনের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আর যারা শাহাদাৎবরণ করেছিলেন তারা হলেন- মোহর আলী (ইপিআর), নিযামউদ্দিন (ইপিআর), জিল্লুর রহমান (মুজাহিদ), আব্দুল হক( ছাত্র) এবং আরও দুজন ছাত্র। বেশ ক'জন আহত হয়েছেন। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। একজন ছাড়া আরও মৃতদেহ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আমরা অভিবাদন জানালাম সেই বীর শহীদদের।  
  
মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও প্রচারণা কাজেও সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। ডঃ বেলায়েত হোসেন এ কাজের সংগঠনিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করেন।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও বেশ কিছু শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করেছিলাম তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে পড়েছে।

অধ্যাপক আব্দুল মান্নান (কর্মাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),

আবুল কালাম আজাদ (সমাজ বিজ্ঞান, ঢা.বি)

গৌরাঙ্গ মিত্র (নটরডেম কলেজ),

নূরুন্নবী (ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),

মোয়াজ্জেম হোসেন (বাগেরহাট কলেজ),

আবু বকর সিদ্দিক (আয়ুব ক্যাডেট কলেজ,রাজশাহী),

হামিদুল হক( কচুয়া হাই স্কুল) এবং অধ্যাপক হান্নান প্রমুখ।

এদের মধ্যে মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব আবু বকর সিদ্দিকী শাহাদাৎবরণ করেছিলেন আমরা সে সময় সংবাদ পেয়েছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধে ও সরকার পরিচালনায় সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্ল্যানিং সেল মুখ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সেলের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ( ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)। অন্যান্য সদস্যরা হলেনঃ অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শেদ (ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,) অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন (অর্থনীতির অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. এস আর বোস। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে আমি সেলের শিক্ষা বিভাগের সাথে সংযুক্ত ছিলাম।

আমাদের বিভাগের (শিক্ষা ও সমাজসেবা বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

(১) Formation of Education policy for Secular democratic Socialist Bangladesh

(২) Collection of Data and views in connection with reform of the examination system

(৩) Preparation of a report on the problems of Primary and Secondary Education in Bangladesh

(৪) Preparation of a on the problems of Scientific and Technical Education in Bangladesh

(৫) Estimating the damage caused to educational institutions in Bangladesh and Studying the Socio- Psychological Problems of educational restoration and rehabilitation

(৬) Studying the problems of demobilized freedom fighters, students, non students and permanently disabled in the liberation war .

*(অনুবাদঃ*

*(১) ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন*

*(২) পরীক্ষা পদ্ধতি পুনঃগঠনের জন্য জন্য তথ্য ও মতামত সংগ্রহ*

*(৩) বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ*

*(৪) বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ*

*(৫) বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষয়ক্ষতি প্রাক্কলন ও শিক্ষাব্যবস্থা পুনঃস্থাপনে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা*

*(৬) গাজী মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, অছাত্র এবং মুক্তিযুদ্ধে স্থায়ীভাবে পঙ্গুদের সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা)*

আগষ্ট মাসে পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অব ইন্টটেলিজেন্টশিয়া যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় এক জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে (১৩ই আগস্ট)। সেদিন শহরের বেশ কিছু অংশ প্রদক্ষিন করে আমরা এই বিচার প্রহসন বন্ধ করার দাবীতে কলকাতার সকল বিদেশী দূতাবাসে আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করি। এর পর পরই পৃথিবীর নানা স্থানে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে এবং পাকিস্তানী সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ হতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে।  
  
আগস্ট মাসে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানতে ও উদ্বাস্তদদের অবস্থা পরিদর্শনের এলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ড. এ আর মলিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে একটি স্বারকলিপি প্রদান করে। এই স্বারকলিপিতে বাংলাদেশের অবস্থা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের সমর্থন কামনা করা হয়। এই স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রেরণ করি।   
  
সেপ্টেম্বর মাসে তদান্তীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবিরসমুহ পরিদর্শনে এলে আমরা পুনরায় তার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য আহবান জানাই। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের আশ্বাস দেন যে তা যথাসময়েই করা হবে।   
  
এছাড়া জুলাই- আগষ্ট মাসের দিকে ড. হেনরী কিসিঞ্জার দিল্লী আগমন করলে আমাদের প্রতিনিধি ড. মাযহারুল হক দিল্লী গমন করে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তনের দাবীতে একটি স্মারকলিপি তাঁকে প্রদান করেন।   
  
এতদসত্ত্বেও আমেরিকান সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী নীতি অব্যাহত থাকে এবং পাকিস্তান সরকারকে নানাভাবে সহায়তা দান চলতে থাকে। এই নীতির প্রতিবাদে সমিতির পক্ষ থেকে আমরা পুনরায় কলকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে নিক্সন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।  
  
নয় মাসব্যাপী যুদ্ধকালে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পরিদর্শক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং নানাভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (International Rescue Committee ):

জুন মাসে এই কমিটির পক্ষে আম্বাস্যাডার অঞ্জিয়ার বিডল ডিউক (Ambassador Angier Biddle duke),

মর্টন হামবুর্গ (Morton Hamburg , General Counsel-IRC)

মিসেস লী থ (Mrs. Lee Thaw),

ড. দানিয়েল এল, ওয়ানডার-শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন, নিউইয়র্ক (Dr. Daniel L. Wander-prof. Of Surgery, Albert Einst College Of medicine N.Y) এবং

মিঃ টমাস ডব্লিউ ফিপস-একজন লেখক (Mr. Thomas W. Phipps - an author ) আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আইআরসি আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে ক্যাম্প স্কুল প্রকল্পে সহায়তা দানে সম্মত হয়।   
  
জাপানে গঠিত 'বাংলাদেশ সলিডারিটি ফ্রন্ট- এর সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক সেৎসুরে সুরুসিমা (Setsure Tsurushima ) 'জাপান -বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ এসোসিয়েশন 'এর কার্যকরী সংসদের একজন সদস্য মিঃ টি, সুশুকি (T. Susuki) এবং মিঃ তেমিসুকা-একজন টিভি ক্যামেরাম্যান (Temisuka- a TV/cameraman ) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়।   
  
ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ এল বাসাম (এসোসিয়েশন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) জুন মাসের দিকে আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।   
  
‘ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিষ্ট এসোসিয়েশন’- এর সভাপতি অধ্যাপক নূড নেইলসন (knud Neilson) এবং WSCE, (Geneva) *(ওয়েস্ট সাব-আরবান কারেন্সি এক্সচেঞ্জেস, জেনেভা)* -এর মিঃ জ্যাক ল্যাকশির্ক (Jack Laksirch ) সেপ্টেম্বর -অক্টোবরে আমাদের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদেরকে কয়েকটি শরণার্থী শিবির ঘুরিয়ে দেখান হয়।  
  
স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলির কয়েকজন সাংবাদিক এস এ নেলসন (ষ্টকহোম), এ এম স্কিপার, *ডেনমার্ক* (A.M. Skipper-Denmark ), ভিএসবি বলকার্ট, ডেনমার্ক (V.S.B. Balkert -Denmark), এম আই ওজহা, সুইডেন (M.I. Ojha-Sweden) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। তাঁরা মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁদের মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়।

নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে নিউজিল্যান্ড ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদক ও সহসভাপতি যথাক্রমে অ্যালভিন এফ, আর্নল্ড (Alvin F. Arnold) ও ট্রেভন জে ওয়াল্টন (Trevon J. Walton) আমাদের সাথে দেখা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেন।   
  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় গঠিত ফ্রেন্ডস ফর দা বাংলাদেশ মুভমেন্ট-এর পক্ষ থেকে মিসেস এভেলিন চৈৎকিন (Evelyn Chaitkin) কলকাতায় এলে তাঁকে আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্প স্কুল ঘুরিয়ে দেখান হয়। তিনি এই প্রকল্পে আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।  
  
সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বহু সহায়ক সংগঠন আমাদের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে- তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।   
  
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও তার ভূমিকার কথা আজ সবারই জানা। শরণার্থী প্রায় সকল শিল্পীই এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরা ও এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।  
  
অবরুদ্ধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেঃ

নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে এবং বিপদকে মাথায় নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা নানাভাবে দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটের সহায়তায় আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি ও তথ্য সংগ্রহ করি।

ঢাকায় ড.আজাদ ও অন্যান্যদের সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সংবাদ পাচ্ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন শিক্ষক প্রতিরোধ-আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। শত বিপদের মধ্যে ও তাঁরা একটি কাগজ গোপনে বের করেছেন। নাম 'প্রতিরোধ '। ঢাকায় আমার আর একটি যোগাযোগ বিন্দু সুলতানা (ছদ্মনাম)। তিনি আমাদের লন্ডন যোগাযোগ বিন্দুর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর নিয়মিত পাঠাতেন। তাঁর প্রেরিত খবরে জানা গিয়েছিল ১ লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শিক্ষককে যোগদান করতে বলা হলেও বেশকিছু শিক্ষক ঐ আদেশকে উপেক্ষা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিতি খুবই কম। তাঁর মাধ্যমে ও অন্যান্য সূত্র থেকে তখন যে খবর আমরা পেয়েছিলামঃ অনুপস্থিত শিক্ষকদের তালিকায় শহীদশিক্ষকদের ও অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষকদের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা গেল বেশ ক'জন শিক্ষক দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ ডঃ আহম্মদ শরীফ, ডঃ মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক আকরাম হোসেন (বাংলা বিভাগ); শহীদুল হক মুন্সি ; অধ্যাপক নূরন্নবী ও অধ্যাপক অনোয়ার হোসেন।  
  
নতুন উপাচার্য হয়েছেন ডঃ সাজ্জাদ হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিন চলছে গেরিলা অপারেশন। সাথে সাথে পাকিস্তানীদের অত্যাচার।  
  
রশীদুল হাসান ও আহসানুল হক (ইংরেজী বিভাগ), সালাউদ্দিন আহমদ (সমাজবিজ্ঞান), ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), রফিকুল আসলাম (বাংলা), আ ন ম শহীদুল্লাহ (গনিত)- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ক'জন শিক্ষক ও বেশ ক'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সরকারি পদস্থ অফিসারদের মধ্যে রয়েছেন লোকমান হোসেন (টেলিফোন বিভাগ), জনাব ইউসুফ (শিক্ষা বিভাগ)। বহু শিক্ষক ও ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিককে পাকবাহিনীর অনুচরেরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি প্রদান করেছে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছেঃ অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস) ;

অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুর হক( অতিরিক্ত শিক্ষক(বাংলা বিভাগ)।

আর নিচের কয়েকজন শিক্ষককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছেঃ

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা)

ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী) ।

এছাড়া ১ লা জুলাই থেকে অনুপস্থিত সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে।  
  
নভেম্বরের মাঝামাঝিতে তিনদিন তিনরাত্রি ধরে ঢাকার আশেপাশের গ্রামে বুড়িগঙ্গার ওপারে কামরাঙ্গীরচর, নান্দাইল, কামার খাঁ, রুহিলা, বইৎপুর প্রভৃতি এলাকায় অসংখ্য নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডে অংশ নেয় পাক সেনারা ও তাদের অনুচর রাজাকার বাহিনী। সাথে সাথে চলে নারী নির্যাতন ও ধর্ষন। সংবাদদাতার মতে প্রায় হাজার খানেক নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে।  
  
খবর পাওয়া গেল ঢাকাবাসীর বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগন পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য পণ্য বর্জন করেছে, ঢাকায় ‘জয়বাংলা বাজার’ বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে।  
  
অন্যান্য অঞ্চল থেকে খবরঃ

আমরা নিয়মিতভাবে খবর পাচ্ছিলাম যে টাংগাইল এলাকায় বিরাট মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছে কাদের সিদ্দিকীকর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী। আগষ্টের শেষে খবর এল যে, এই বাহিনী সিরাজকান্দি ঘাটে একটি অস্ত্র জাহাজ দখল করেছে। আমরা জানতে পেরেছিলাম এই বাহিনীর সাথে অধ্যাপক নূরন্নবী ছাড়াও আরও কয়েকজন অধ্যাপক সংগে রয়েছেন। এরা হলেন কাগমারী কলেজের অধ্যাপক নূরুল আমীনও অধ্যাপক রফিক আজাদ।  
  
বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাচ্ছিলাম সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আবার নতুন করে অত্যাচার শুরু হয়েছে তথাকথিত সাধারন ক্ষমা ঘোষণার পরও। তথাকথিত ক্ষমা ঘোষনায় বিশ্বাস করে যেসব সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু বিশিষ্ট নাগরিক পালিয়ে আসতে পারেনি তাদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে, জমিজমা বাড়ীঘর দখল করা হচ্ছে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও চলছে। বিভিন্ন সুত্র থেকে খবর পাওয়া গেল যে নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তি বাধ্য হয়েছেন সপরিবারে মুসলমান নাম গ্রহণ করতেঃ  
  
শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা),

ময়মনসিংহ এ এম কলেজ,

শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তী অধ্যাপক, শিক্ষক -প্রশিক্ষন কলেজ, ময়মনসিংহ,

শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দত্ত, প্রভাষক (মনস্তত্ব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রী সুখেন্দু সোম,অধ্যাপক (গনিত), বরিশাল কলেজ,

শ্রী নিত্যগোপাল অধ্যাপক (বাণিজ্য), নাসিরাবাদ কলেজ ময়মনসিংহ।  
  
খবর এল যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক- জনাব মুজিবুর রহমান (গনিত) এবং জনাব সালেহ আহমেদ (সংখ্যাতত্ত্ব) কে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মাসের পর মাস শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালান হচ্ছে।  
  
ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকাঃ

২৩ শে এপ্রিল (১৯৭১)পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সেদিন হানাদার বাহিনী রুখতে ছাত্র ও সৈনিকদের সাথে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে তারা গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ একদিকে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে অরক্ষিত অসহায় অবাঙ্গালি নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিনের এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্র ছাড়াও যেসব শিক্ষক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন

ডঃ শামসুল ইসলাম,

ডঃ আব্দুল ওয়াদুদ,

মোস্তফা হামিদ হোসেন,

ডঃ আব্দুল লতিফ মিঞা,

জনাব শামসুদ্দিন খান ;

আর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন

মোহাম্মদ হোসেন,

শরিয়তউল্লাহ,

চাঁন মিয়া,

সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসেন।

কিন্তু প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল- ২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী প্রবেশ করল ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হানাদার বাহিনী যেসব শিক্ষককে লাঞ্চিত ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিলে তাঁরা হলেনঃ   
১। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমান  
২। ডীন ডঃ শামসুল ইসলাম  
৩। ডঃ শামসুদ্দিন

৪। জনাব আহম্মদ শফি

৫। ডঃ আমির হোসেন তালুকদার

৬। ডঃ শফিকুর রহমান

৭। ডঃ মুস্তফা হামিদ হোসেন  
৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব জাহিদুর রহিম  
৯। কর্মচারী জনাব জলিল ও

১০ মিঃ ডেভিড।  
  
আর অধিকৃত আমলে যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী জল্লাদ বাহিনীর হাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ   
  
জনাব আশরাফুল ইসলাম ভূইঁয়া, শিক্ষক

মুহাম্মদ আক্কাস আলী, ছাত্রাবাস কর্মচারী

মধুসূদন, মৎস্য বিভাগের কর্মচারী,

মুহাম্মদ নুরুল হক, ছাত্রাবাস কর্মচারী,

গাজী ওয়াহিদুজ্জামান, কর্মচারী,

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন ১৫ ই নভেম্বর,

মুহাম্মদ হাসান আলী, কীটতত্ত্ব বিভাগের ল্যাব এসিস্টেন্ট,

গিয়াসউদ্দিন, ছাত্রাবাস কর্মচারী।

কিন্তু এতেও পিছপা হননি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ। গোপন সহযোগিতা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন অবরুদ্ধ এলাকা থেকে। এর ফলে চাকরিচ্যুতির নির্দেশ আসে অনেক শিক্ষকের প্রতি। চাকরিচ্যুত হন। উপাচার্য স্বয়ং।

শিক্ষকদের মধ্যে

অধ্যাপক মোস্তফা হামিদ হোসেন (পদার্থবিদ্যা),

জনাব আলী নেওয়াজ (বাংলা),

জনাব শামসুজ্জামান খান (বাংলা),

জনাব আব্দুর রাজ্জাক (বাংলা),

এ আর এম মাসুদ (পদার্থবিদ্যা)

নুরুল ইসলাম নাজমী (ইংরেজী)

আব্দুল বাকী (উদ্ভিদবিদ্যা),

আবদুল হক (উদ্ভিদবিদ্যা),

আব্দুল হাকিম (কৃষি শিক্ষা),

মুহাম্মদ হোসেন (পরীক্ষাসমুহের নিয়ন্ত্রক)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লাম। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC) স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী তরুণ মিত্র, আমেরিকান মহলের সাথে বেশ জানাশুনা তাঁর। তাঁর সাথে দেখা করে সহকর্মীদের নাম দিলাম। অনুরোধ করলাম আই সি-র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে - অন্ততঃ তাদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে। কথা দিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মেসেজ ত্বরিত পাঠাবেন আই আর সি-র হেড অফিসে। তাছাড়া যোগাযোগ করবেন আমেরিকান দূতাবাসের সংগেও। সমিতির সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন দূতাবাসে ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে (জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলসহ) জরুরী বার্তা পাঠালাম।  
  
জয়নুল আবেদীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ঢাকা থেকে চলে এসেছেন। ওঁর কাছ থেকে ঢাকার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। ঢাকায় গেরিলাদের কর্মতৎপরতার কথা জানা গেল। খবরে পাওয়া গেল মুনীর চৌধুরীর, অধ্যাপক হাবিবুল্লাহর কবি শামসুর রাহমান এর, হাসান হাফিজুর রহমানের। তিনি আরও জানালেন- ঢাকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাহসিকতার সাথে।   
  
ঢাকা থেকে আমার ছাত্র ও সহকর্মী ডঃ একরামুল ইসলামের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। ও জামালপুরের একটি স্থানীয় গেরিলা ইউনিটের সাথে কাজ করছে। ঢাকা থেকে টাকা পয়সা, ঔষধপত্র সরবরাহ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু অস্ত্রের বেশী প্রয়োজন। যথাস্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া হল।  
  
অবশেষে এল সেই দিন ৩রা ডিসেম্বর। সন্ধ্যা সাতটায় এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে সম্বর্ধনা সভা -উত্তর ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টদের একটি প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করান হচ্ছে তাদের। হঠাৎ শিক্ষক সমিতির জনৈক কর্মী সভা থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। জানাল, পাকিস্তানী বিমান ভারতের গভীরে নানাস্থানে হামলা চালিয়েছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠছিলাম সেদিন। আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন। যুদ্ধ শুরু হল। ভারতীয় বাহিনী যোগ দিলেন আমাদের সাথে মিত্র বাহিনীরুপে।  
  
তারপর সাফল্য আর সাফল্য। প্রতিদিনই পতন হতে লাগল বিভিন্ন শহর। ঐ স্বাধীনতা । ঢাকা আর কতদূর। যশোর মুক্ত। মুক্ত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ। ঢাকা অবরুদ্ধ । মুক্তিবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে। গেরিলারা অভ্যন্তরে। বিজয় আসন্ন।   
  
কিন্তু এরই মধ্যে হৃদয়বিদারক খবর এল। ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় ১৩ ই ডিসেম্বর পাকসৈন্য ও তাদের অনুচরেরা হত্যা করেছে ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিককে। বিচলিত হয়ে পড়লাম, আশংকা করলাম হয়তো ঢাকাতেও অনুরূপ ঘটেছে বা ঘটতে চলছে। কলকাতায় মিত্র বাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে বি এস এফ এর সাথে যোগাযোগ করে আবেদন জানালাম যে করেই হোক, ঢাকাস্থ বুদ্ধিজীবিদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন রক্ষা করতে হবে। স্বাধীন বাংকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘন ঘন আবেদন জানানো হল-নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার । কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। স্বাধীনতা প্রাকমুহুর্তে আমরা হারালাম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের-চরম মূল্য দিতে হল স্বাধীনতার।  
  
তবু এর মধ্যে দিয়ে এল স্বাধীনতা। মুক্তি। বিজয়। আত্নসমর্পণ করল পাকিস্তানী বাহিনী, বিনাশর্তে যৌথ কমান্ডারের কাছে। দিনটি ১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।   
   
বিনা দ্বিধায় স্বীকার করব মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণৌজ্জ্বল দিন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ ঈশ্বর আমায় দিয়েছিলেন সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। নানা স্মৃতিতে ভাষ্কর এই দিনগুলি কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি, কখনও হতাশায় ভুগেছি, আবার কখনও আনন্দ উদ্বেল চিত্তে শিহরিত হয়েছি। নানাজনের কাছে নানাভাবে সহায়তা লাভ করেছি, এ জীবনের জন্য নানাজনের কাছে কৃতজ্ঞ। নাম করতে গেলে তালিকা হবে দীর্ঘ, তাই কারও নাম করব না, সকলের কাছে ক্ষমা চাইব। কিন্তু তবু চান্দিনার কাছে একটি ছোট খালের ধারে , ঝোপের আড়ালে অবস্থিত পর্ণকুটিরে যে বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মায়ের স্নেহে, নিঃসঙ্কোচে, তার কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব?   
   
 -ডঃ অজয় রায়

# শেষ কথা

* আমরা চাইলে প্রোফেশনাল কাউকে দিয়ে এই দলিলপত্র কম্পাইল/অনুবাদ করাতে পারতাম। কিংবা স্ক্যান করে ওসিআর-এর সাহায্যে দলিলপত্রকে ইউনিকোডে কনভার্ট পারতাম। কিন্তু আমরা সেই কাজ করবো না। আমরা চাই যে এই প্রজন্ম নিজে কম্পাইল করে/অনুবাদ করে ধীরে ধীরে শিখতে শিখতে নিজেদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগিয়ে তুলুক। কাজ থেকেই চেতনার জন্ম, কথা থেকে নয়।
* পাঠকালে বানান কিংবা অন্য যে কোন ইস্যুতে যে কোন ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়লে সাথে সাথে [আমাদের ফেসবুক পেইজে](https://www.facebook.com/muktizuddho1971?fref=ts) একটি মেসেজ দিয়ে জানাবেন। ভালো/মন্দ যে কোন ধরণের পরামর্শ অত্যন্ত আনন্দের সাথে গৃহীত হবে এবং আপনাকে অত্যন্ত দ্রুত আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে থেকে লাইভ চ্যাটের মতো রিপ্লাই দেয়া হবে। কারণ আমাদের ফেসবুক পেজটি একই সাথে দেশ এবং বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে এডমিন প্যানেলের কেউ না কেউ সারাক্ষণই অনলাইনে আপনার ফিডব্যাকের অপেক্ষায় আছেন। আমাদের ফেসবুক পেজের লিংকঃ

<https://www.facebook.com/muktizuddho1971>।

* প্রকল্পটি নতুনদের জন্য সদা উন্মুক্ত। অর্থাৎ আপনি যদি আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র নিয়ে কাজ করতে চান, তবে আমাদের ফেসবুক পেজে একটা মেসেজ পাঠিয়ে আপনার আগ্রহের কথা জানালেই হবে। আমরা কিছুদিন পর আপনাকে আমাদের কর্মযজ্ঞের অংশ করে নিবো। কাজ বুঝিয়ে দেবো। দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-পরিচয় নির্বিশেষে আমাদের এই উদ্যোগ। তাই সকলের শুভকামনা আমাদের কাম্য।
* এটি কোন একক ব্যক্তি কিংবা একক গ্রুপের উপর নির্ভরশীল প্রোজেক্ট নয়। তাই স্পেসিফিক কেউ একজন থাকলে বা না থাকলে এই প্রোজেক্টের কিছুই যাবে-আসবে না। আগামীকাল ইঞ্জিনিয়ার লিও নামক আইডিটি না থাকলে কিছুই আসে-যায় না। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ কাজ করতে থাকবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে কাজ চলতে থাকবে। ফেসবুক পেজ কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে তা আবার নতুন করে খোলা হবে। কারণ আমাদের হাতে দলিলপত্র আছে। ডেডিকেটেড লেখকেরা আছেন। তাই এই প্রোজেক্টটা থেমে যাওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। এভাবেই প্রোজেক্টটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রকৃতি শূণ্য স্থান পছন্দ করে না। আমরাও না। আমরা প্রকৃতির অংশ। আপনিও, তাই না?

-মাউ

